মুহাম্মদ

মহানবীর (স:) জীবনী

ক্যা রে ন আ র্ম স্ট্রং
অনুবাদ। শওকত হোসেন

৬১০ খৃষ্টাব্দের দিকে রমযান মাসে হিজাজের মক্কা নগরীতে এক আরব বণিক এমন এক অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ইনিই মুহাম্মদ ইবন আব্দাল্লাহ যাঁর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব। আরবে তখন চলছিল জাহিলিয়াহ্ বা অজ্ঞতার যুগ; বিভিন্ন গোত্র লিপ্ত ছিল পারস্পরিক হানাহানিতে। দুর্বল অসহায়েরা শোষিত হচ্ছিল আগ্রাসী পুঁজিবাদের অধীনে। এক ধরনের আধ্যাত্মিক অস্থিরতা কুরে-কুরে খাচ্ছিল সমগ্র আরব বিশ্বকে। এমনি এক পরিস্থিতিতে শান্তি ও সমন্বয়ের ধর্ম ইসলামের বাণী প্রচারের দায়িত্ব পান মুহাম্মদ (স:)। প্রায় একক প্রয়াসে ঐ অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক নতুন আদর্শের। কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না এ কাজ। তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে অসংখ্য বাধা বিপত্তির– ঘরে বাইরে। মুহাম্মদের (স:) সেই অসাধারণ জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন ক্যারেন আর্মস্ট্রং তার **মুহাম্মদ : আ বায়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট** গ্রন্থে। মহানবীর (স:) আগমনের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি, সেই সঙ্গে তুলে ধরেছেন বর্তমান বিশ্বে ইসলামের নামে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠীর কর্মকান্ডে ধর্মের মৌল বিষয়ের বিরোধিতার দিকটি; ব্যাখ্যা দিয়েছেন আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইসলামকে অনুসরণ করার গুরুত্ব। এই গ্রন্থে মহানবীর (স:) জীবনের প্রতিটি পর্যায় যুক্তির আলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার ফলে এটি মুসলিম তো বটেই, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর কাছেও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং রোমান ক্যাথলিক হিসেবে সাত বছর অতিবাহিত করার পর ১৯৬৯ সালে বৃত্তি ত্যাগ করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হতে আরবীতে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং এক সরকারি বালিকা স্কুলে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি ফ্রিল্যান্স লেখক ও ব্রডকাস্টারে পরিণত হন। দীর্ঘদিন থেকেই যুক্তরাজ্যে ধর্মীয় বিষয়ে অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার তিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই মর্যাদা অর্জনের পথে। বর্তমানে তিনি লিও বায়েক কলেজে জুডাইজম বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন এবং রাব্বী ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সোস্যাল সায়েন্স-এরও সম্মানিত সদস্য। ১৯৯৯ সালে তিনি 'মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স' কাউন্সিল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : *থ্রু দ্য ন্যারো গেইট (১৯৮১), বিগিনিং দ্য ওয়ার্ল্ড (১৯৮৩), দ্য গসপেল অ্যাকর্ডিং টু উওম্যান (১৯৮৭), হলি ওআর : দ্য ক্রুসেডস্ অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন টুডে'স ওয়ার্ল্ড (১৯৯১), দ্য ইংলিশ মিস্টিকস্ অব দ্য ফোরটিন্থ সেঞ্চুরি (১৯৯১), আ হিস্ট্রি অব গড : দ্য ফোর থাউজেন্ড ইয়ার কোয়েস্ট অব জুডাইজম, ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড ইসলাম (১৯৯৩), জেরুজালেম : ওআন সিটি, থ্রি ফেইথস্ (১৯৯৬), ইন দ্য বিগিনিং : আ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অব জেনেসিস (১৯৯৬), ইসলাম : আ শর্ট হিস্ট্রি (২০০১), বুদ্ধা (২০০০), দ্য ব্যাটল ফর গড : আ হিস্ট্রি অব ফান্ডামেন্টালিজম (২০০০) ও দ্য হিস্ট্রি অব মিথ*।

অনুবাদক : শওকত হোসেন-এর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে। বাবার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জেলায় কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। বই পড়ার নেশা পেয়েছেন বইপ্রেমী মায়ের কল্যাণে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টারস করেছেন তিনি। রানওয়ে জিরো এইট-এর মাধ্যমে আকস্মিকভাবেই লেখালেখি শুরু।

MUHAMMAD

A Biography of the Prophet

Karen Armstrong

মুহাম্মদ

মহানবীর (স:)জীবনী

মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ : শওকত হোসেন

সন্দেশ

সন্দেশ

ISBN-978-984-8088-30-2

মুহাম্মদ

মহানবীর (সঃ) জীবনী

মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ : শওকত হোসেন

Muhammad : A Biography of the Prophet by Karen Armstrong
Copyright © 2000 by Karen Armstrong
all rights reserved
অনুবাদস্বত্ব © ২০০২ সন্দেশ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০০৫
তৃতীয় প্রকাশ : বইমেলা ফেব্রুয়ারি ২০০৮
চতুর্থ প্রকাশ : মে ২০১১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : শৈশব কম্পিউটার ৫৬ বড় মগবাজার (কাজী হাউস), ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডি আই টি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩৩০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আব্বা ও আম্মা

শওকত হোসেন অনূদিত আরো বই :

ব্রেভহার্ট / র‍্যানডাল ওয়ালেস
মাই কাজিন র‍্যাচেল / দফনে দ্যু মরিয়ে
ইসলাম : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস / ক্যারেন আর্মস্ট্রং (প্রকাশিতব্য)
রোজেস ফ্রম দ্য আর্থ : অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের জীবনী / ক্যারল অ্যান লী
মায়া / ইয়স্তেন গার্ডার (প্রকাশিতব্য)
বালথ্যাজার এন্ড ব্লিমুন্ডা / যোসে সারামাগো (প্রকাশিতব্য)
ইন ব্যাবিলন / মার্সেল মোরিং (প্রকাশিতব্য)

অনুবাদকের কথা

ক্যারেন আর্মস্ট্রং **'মুহাম্মদ : আ বায়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট'** গ্রন্থখানা মূলত: পাশ্চাত্যের পাঠকদের জন্যে লিখেছেন, ভূমিকায় সেটা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে হাজার বছর ধরে চলে আসা অসংখ্য ভুল ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি সেগুলো খণ্ডানোর আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। মহানবীর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন প্রাথমিক মুসলিম উৎসের সহায়তা গ্রহণ করেছেন যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, মুহাম্মদ ইবন সা'দ, মুহাম্মদ ইবন হিশাম, মুহাম্মদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদি, ইমাম ইবন জাবির তাবারি। এখানে পাঠকদের প্রতি একটা বিষয় স্মরণ রাখার অনুরোধ থাকবে, সেটা হল, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মাঝে মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে বলে জানা যায়, তাঁর ঐতিহাসিক তথ্য গ্রহণে আপত্তি না থাকলেও ধর্ম সংক্রান্ত বিবরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিষেধ আছে। এছাড়া, আল-ওয়াকিদি মিথ্যা ও আজগুবী বিষয়ের অবতারণা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ধর্মবিদগণ তাঁকে ঘোর মিথ্যাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা বর্ণনার জন্যে তিনি পাশ্চাত্য লেখকদের প্রিয়পাত্র, ইসলাম ও মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে ছড়ানো বিদ্বেষের জন্যে মূলত: তাঁকেই দায়ী করা হয়। তবে ইবন হিশাম, ইবন তাবারি, ইবন সা'দ প্রমুখদের বিবরণ বিশ্বস্ত।

বাংলাভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর জীবনীর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মুষ্টিমেয় জীবনীগ্রন্থের মাঝে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মাওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন 'মোস্তফা চরিত'; কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' শিরোনামের গ্রন্থখানা সুপরিচিত। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন 'মরু ভাস্কর' নামে। এছাড়াও সৈয়দ আলী আহসান-এর 'মহানবী' এবং আল-হাজ্জ অধ্যক্ষ মো: শামসুল হুদার 'মহানবীর জীবন ও আদর্শ' ও উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদেশী জীবনীকারের রচিত গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হলেও সচেতন সম্পাদনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে আমরা মহানবী (স:) সম্পর্কে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে পারিনি, ফলে তাদের ধারণা বা উপলব্ধিতে ভ্রান্তি আছে কিনা তাই সাধারণ পাঠকদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ক্যারেন

আর্মস্ট্রং-এর এ গ্রন্থখানা এক্ষেত্রে পাঠকদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ক্যারেন আর্মস্ট্রং কোনও কোনও বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত/ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা অনেকের কাছে চিন্তার খোরাক বলে বিবেচিত হবে।

বইখানা অনুবাদের সময় কোরানের আয়াতসমূহের অনুবাদ হিসাবে আমি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর 'কোরান শরীফ : সরল বঙ্গানুবাদ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি, যেসব আয়াত সংখ্যা মূলগ্রন্থের উল্লিখিত আয়াতসংখ্যার সঙ্গে মেলেনি-সম্ভবত অনুবাদের ভিন্নতার কারণে—আমি সেখানে 'তথ্যসূত্র' অংশে লেখক উল্লিখিত আয়াতসংখ্যার পাশে প্রথম বন্ধনীর ভেতর বাংলা অনুবাদ-এ উল্লেখিত আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছি। এছাড়া, মহানবীর 'তায়েফ প্রার্থনা'র অনুবাদাংশটুকু আমি শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'মহানবী' গ্রন্থ থেকে নিয়েছি। প্রথম অনুচ্ছেদের উল্লেখিত ব্যাখ্যা আল-হাজ্জ অধ্যক্ষ মো: শামসুল হুদা'র 'মহানবীর জীবন ও আদর্শ' গ্রন্থ হতে গৃহীত। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে এঁদের প্রতি ঋণ স্বীকার করছি।

আরেকটি কথা, অনুবাদ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত কোনও ভুল-ত্রুটি ঘটে গিয়ে থাকতে পারে। কেউ তা ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ বোধ করব এবং আগামী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করব।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ, নবী ও রাসুলদের নামের পাশে (স:), (আ:) এবং সাহাবীদের নামের পাশে (রা:) দেয়া না থাকলেও যেন তাঁরা যথাস্থানে তা পাঠ করেন।

সন্দেশ-স্বত্বাধিকারী জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরীর তাগিদের ফলেই অত্যন্ত স্বল্পসময়ে বইটির অনুবাদকর্ম শেষ করা সম্ভব হয়েছে; তাঁর প্রতি রইল আমার বিশেষ ধন্যবাদ।

অনুবাদের পুরো সময়টিতে আমার স্ত্রী ফাহমিদা খাতুন এ্যানির অবিশ্বাস্য সহযোগিতা পেয়েছি, আমি তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সহকর্মী অগ্রজপ্রতিম জনাব খন্দকার আবুল হাসান মূল্যবান বই দিয়ে সাহায্য করেছেন, ধন্যবাদ রইল তাঁর প্রতিও।

ভুলক্রটির জন্যে পরম করুণাময়ের ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ধন্যবাদ।

শওকত হোসেন

বিষয়সূচী

লেখকের কৃতজ্ঞতা	১০
ভূমিকা	১১
মানচিত্র	১৯
বংশতালিকা	২১
১. প্রতিপক্ষ মুহাম্মদ	২৩
২. মুহাম্মদ, আল্-লাহর দূত	৫১
৩. *জাহিলিয়াহ্*	৬২
৪. প্রত্যাদেশ	৮১
৫. সতর্ককারী	১০৪
৬. স্যাটানিক ভার্সেস	১২৪
৭. *হিজরা* : নতুন দিক নির্দেশনা	১৫৪
৮. পবিত্র যুদ্ধ	১৯০
৯. পবিত্র শান্তি	২৪৫
১০. পয়গম্বরের পরলোকগমন?	২৮৯
তথ্যসূত্র	৩০৮

লেখকের কৃতজ্ঞতা

পাণ্ডুলিপির সযত্ন সম্পাদনা ও মূল্যবান পরামর্শের জন্যে গোলানয্-এ আমার সম্পাদক লিয নাইটস্ এবং পাণ্ডুলিপি-সম্পাদক পিটার জেমস্কে ধন্যবাদ জানাই। অমূল্য সহযোগিতার জন্যে আমি রানা কাব্বানির কাছেও বিপুলভাবে ঋণী।

ভূমিকা

আমরা যখন বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ঠিক সেই সময় ধর্মবিশ্বাস আবার এক শক্তিশালী বিষয় বলে পরিগণিত হচ্ছে। আমরা আবার ধর্মের ব্যাপক পুনরুত্থান দেখতে পাচ্ছি যা কিনা উনিশশো পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ছিল অচিন্তনীয়, ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা তখন ধরে নিয়েছিল যে সভ্য, যুক্তিবাদী মানুষ ধর্মের মত আদি কুসংস্কারকে অতিক্রম করে আসতে পেরেছে। অনেকে বেশ জোরের সঙ্গে ধর্মের বিলুপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : ধর্ম বড় জোর প্রান্তিক এবং ব্যক্তি পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে সীমিত হয়ে পড়বে, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এর আর কোনও গুরুত্ব বা প্রভাব থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে আমরা উপলব্ধি করছি, ওই অনুমান ছিল ভ্রান্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে, বেশ কয়েক দশকব্যাপী রাষ্ট্রিয় নাস্তিকতার পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেখানকার নারী-পুরুষ এখন ধর্ম অনুসরণের অধিকার দাবী করছে। পশ্চিমা বিশ্বে, যেখানকার জনগণ এতদিন যাবত প্রচলিত বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মানুসরণে খুব একটা আগ্রহী ছিল না, তারাও ইদানীং আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্গত জীবন সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হয়ে উঠছে। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে, সম্ভবত: একধরনের উগ্র ধার্মিকতা, আমরা যাকে সাধারণত 'মৌলবাদ' বলে অভিহিত করে থাকি, সেটাই অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটতে শুরু করেছে। এটা ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপক রাজনৈতিক রূপ এবং কেউ কেউ একে বিশ্বশান্তির প্রতি, মানবিক শান্তির প্রতি হুমকি বলে মনে করছেন। বিভিন্ন সরকার একে উপেক্ষা করে থাকে, বিপদ বলে মানতে অনাগ্রহী, কিন্তু তা সত্ত্বেও, অতীতে যেমনটি বারবার ঘটতে দেখা গেছে, ব্যাপক অবিশ্বাস আর সংশয়ের একটা কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরপর ধর্মীয় উন্মাদনার একটা পর্ব চলতে থাকে: ধর্ম মানুষের একটা বিশেষ চাহিদা বলে মনে হয়, যাকে খুব সহজে বাতিল করা বা একপাশে ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়, তা আমাদের সমাজ যত যুক্তিবাদী আর উন্নত হোক না কেন। বিশ্বাসের এই নব আবির্ভাবকে অনেকে স্বাগত জানাবেন, তুচ্ছ জ্ঞান করবেন কেউ কেউ, কিন্তু আমরা কেউই একে দেশের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে বাদ দিতে পারব না। ধর্মীয় অনুভূতি অত্যন্ত শক্তিশালী, একে ভাল বা খারাপ উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং আমাদের একে বুঝতে হবে এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে এর অন্তর্গত বিষয়াদি পরখ করতে হবে-সেটা কেবল আমাদের সমাজের নিরীখে নয়, অন্যান্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও।

নাটকীয়ভাবে ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে আমরা নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আবিষ্কার করেছি। নিজেদের আমরা এখন আর পৃথিবীর দূরপ্রান্তে বসবাসকারী মানুষ থেকে আলাদা বলে ভাবতে পারছি না, তাদের আর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়াও সম্ভব নয়। পরস্পরের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে। একই বিপদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা রয়ে যাওয়া সভ্যতাগুলো সম্পর্কেও আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারছি। প্রথমবারের মত আজ গোটা বিশ্বের মানুষ একাধিক ধর্মে অনুপ্রেরণার সন্ধান পেতে শুরু করেছে এবং তাদের অনেকেই অন্য সংস্কৃতির বিশ্বাস ধারণ করছে। এরই ফলে বৌদ্ধ মতবাদ পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, এককালে যেখানে খৃস্টধর্মের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মানুষ যখন পিতৃপুরুষের বিশ্বাসের অনুগামী থাকে, এমনকি তখনও মাঝে মাঝে তারা অন্যান্য ঐতিহ্যের প্রভাবের বলয়ে পড়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মহান হিন্দু দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক স্যার সারভেপাল্লী রাধাকৃষ্ণন (১৮৮৮-১৯৭৫) ক্রিশ্চান কলেজ অব মাদ্রাজে পড়াশোনা করেছিলেন এবং এর ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইহুদী-দার্শনিক মারটিন বুবার (১৮৭৮-১৯৬৫), যিনি মধ্যযুগীয় দুজন খৃস্টীয় সাধক নিকোলাস অব কুসা এবং মিয়েস্টার একহার্টের ওপর অভিসন্দর্ভ রচনা করেছিলেন, তাঁর গ্রন্থাবলী খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরা বেশ আগ্রহের সঙ্গেই পাঠ করে থাকে, এবং তাদের বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার ওপর তাঁর প্রবল প্রভাব রয়েছে। খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় ইহুদীদের তাঁর রচনার প্রতি কম আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তবে তারা প্রটেস্ট্যান্ট থিওলজিয়ান পল টিলিচ (১৮৮৬-১৯৬৫) এবং আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদ হার্ভে কক্সের রচনা পাঠ করে থাকে। ভৌগলিক দূরত্ব, বৈরিতা এবং ভয়, যা এতদিন বিভিন্ন ধর্মকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তার অবসান ঘটতে চলেছে।

যদিও অধিকাংশ পুরনো সংস্কার রয়ে গেছে, তবু এই পরিবর্তন আশাব্যাঞ্জক। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী ক্রিশ্চানদের প্রবল ইহুদী বিদ্বেষের পর ইহুদী এবং ক্রিশ্চান পণ্ডিতদের একটা নতুন সমঝোতায় পৌছার প্রয়াস লক্ষ্য করাটা খুবই আনন্দের বিষয়। এর মাঝে মানবজাতির ধর্মীয় অভিজ্ঞতার গভীর একাত্মতার ধারণার একটা আভাস মেলে এবং এক সময় 'আমরা' যেসব ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অবহেলা করেছি সেগুলো যে আমাদের পরিমণ্ডলে প্রকাশ পেতে পারে, আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, সেই উপলব্ধি যোগায়। এর তাৎপর্য ব্যাপক হতে পারে! আমরা আর নিজস্ব বা অপরাপর জনগণের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আগের মত করে বিবেচনা করতে পারব না। এর সম্ভাব্য পরিণতিকে গোটা বিশ্বের নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়া বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। অনেকেই এই পরিবর্তনকে দারুণ হুমকি বলে ধরে নেবেন এবং 'অন্যে'র বিরুদ্ধে নুতন প্রাচীর গড়ে তুলবেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে প্রসারিত দিগন্তের আভাস দেখতে

পেয়েছেন এবং তাঁরা ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, যা তাঁদের পূর্বপুরুষ হয়ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন।

কিন্তু প্রধান একটা ধর্ম এই পরিধির বাইরে রয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে এবং অন্তত পশ্চিমাবিশ্বে এর নেতিবাচক ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। জেন বা তাওবাদে অনুপ্রেরণা লাভকারীরা কিন্তু ইসলামের প্রতি তেমন একটা সুনজরে তাকায় না, যদিও তা অব্রাহাম-এর তৃতীয় ধর্ম এবং আমাদের ইহুদী-ক্রিশ্চান ধারার অনেক কাছাকাছি। পশ্চিমে ইসলামের প্রতি বৈরী ভাব দীর্ঘদিনের এবং তা ইহুদী বিদ্বেষের মতই জোরাল, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইয়োরোপে যার বিব্রতকর পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। অন্তত, যাহোক, কিছু মানুষ নাৎসি হলোকাস্টের পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রাচীন বিদ্বেষের আশঙ্কা করে আসছিলেন। তবে ইসলামের প্রতি ঘৃণা আটলান্টিকের উভয় প্রান্তেই অব্যাহত রয়ে গেছে, এবং এই ধর্মটিকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে কাউকে কুণ্ঠিত হতে দেখা যায় না। যদিও ধর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

এই বৈরিতা বোধগম্য, কারণ আমাদের বর্তমান শতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানের আগ পর্যন্ত কোনও রাজনীতি বা আদর্শ পাশ্চাত্য জগতের প্রতি অবিরাম চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিগণিত হয়নি–ইসলামের মত। সপ্তম শতকে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইয়োরোপ তখন ছিল অনুন্নত অঞ্চল। মধ্যপ্রাচ্যের ক্রিশ্চান অধ্যুষিত এলাকা অত্যন্ত দ্রুত ইসলামের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, এবং চার্চ অব রোমের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যাত চার্চ অব নর্থ আফ্রিকাও ইসলামের পদানত হয়। এই অসাধারণ সাফল্য ছিল হুমকি স্বরূপ : ঈশ্বর কি ক্রিশ্চানদের ত্যাগ করে শয়তানের পক্ষ নিয়েছেন? এমনকি অন্ধকার যুগ অতিক্রম করে নিজস্ব সভ্যতার বিকাশের পরেও ইয়োরোপে ক্রমবর্ধমান মুসলিম সাম্রাজ্যের আতঙ্ক রয়ে গিয়েছিল। শক্তিশালী এবং গতিশীল এই সংস্কৃতির ওপর ইয়োরোপ তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকের ক্রুসেডিং প্রজেক্টগুলো শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং পরবর্তীকালে অটোমান তুর্কীরা ইসলামকে ইয়োরোপের একেবারে দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েছে। এই আতঙ্কের ফলে পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের পক্ষে মুসলিম বিশ্বাসের প্রতি যুক্তি নিয়ে তাকান অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একই সময়ে তারা যখন ইহুদীদের নিয়ে কাল্পনিক আতঙ্কে ভুগছে, তখন ইসলামের একটা বিকৃত ভাবমূর্তিও গড়ে তুলছিল, যা ছিল তাদের নিজস্ব গোপন উদ্বেগের প্রতিফলন। পশ্চিমা পণ্ডিতরা ইসলামকে ঈশ্বর বিরোধী ধর্ম এবং পয়গম্বর মুহাম্মদ (স:) কে 'মহাপ্রতারক' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের মতে ইসলামের পয়গম্বর গোটা বিশ্ব দখল করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইয়োরোপের অদিবাসীদের কাছে 'মাহোমেট' শব্দটি আতঙ্কের প্রতীকে পরিণত হয়, অবাধ্য ছেলেমেয়েকে ভয় দেখানোর জন্যে মায়েরা এর ব্যবহার করতেন। 'মাম্মারস'এর নাটকে তাঁকে পশ্চিমা সভ্যতার শত্রু হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, আমাদের বীর সেইন্ট জর্জ যার বিরুদ্ধে লড়েছেন।

ইসলামের এই ভ্রান্ত ভাবমূর্তিই ইয়োরোপে স্থায়ীত্ব পেয়ে যায়। এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রভাবিত করে আসতে থাকে। আবার ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মুসলিমরা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পুষতে শুরু করার ফলে সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। ইসলামি বিশ্বের প্রতি ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান আচরণ অংশতঃ এর জন্যে দায়ী। ইসলাম জন্মগতভাবে ধ্বংসাত্মক বা অন্ধবিশ্বাস, এমনটি ভেবে নেয়া ঠিক নয়, যেমনটি মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে। ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম বিশ্বাস এবং এর মাঝে উগ্র প্রাচ্যবাদীতা বা পাশ্চাত্য-বিরোধিতা বলে কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিমরা যখন অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিক পশ্চিমের মোকাবিলা করে তখন অনেকেই এর আধুনিক রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে এবং একে অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস বা উৎসাহ তিক্ত-বিদ্বেষে রূপ নিয়েছে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বেশির ভাগ ধর্মের ক্ষেত্রেই 'মৌলবাদিতা'র প্রকাশ ঘটেছে, একে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আসার পর জীবনযাপনে অদ্ভুত টানাপড়েনেরই একটা প্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। উগ্র হিন্দুরা গোত্র প্রথা টিকিয়ে রাখতে, ভারতীয় মুসলিমদের বিরোধিতা করতে রাস্তায় নেমে এসেছে, ইহুদী-মৌলবাদীরা পশ্চিম তীর ও গাযা স্ট্রিপে অবৈধ বসতি গড়ে তুলে 'পবিত্র ভূমি' থেকে আরবদের উৎখাত করার শপথ নিয়েছে; সোভিয়েত ইউনিয়নকে শয়তানের সাম্রাজ্য বিবেচনাকারী জেরি ফলওয়েলের মরাল মেজরিটি এবং নয়া 'ক্রিশ্চান রাইট' ১৯৮০ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করেছে। সুতরাং মুসলিম চরমপন্থীদের তাদের বিশ্বাসের প্রতি আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভেবে নেয়াটা ভুল হবে। মরহুম আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে ইসলামের প্রতিমূর্তি ভাবা যেমন ভুল তেমনি প্রয়াত রাব্বি মেয়ার ক্যাহেনের অনৈতিকনীতি অনুসরণের কারণে জুডাইজমের উন্নত এবং জটিল ধারার বিনাশ ঘটবে এমনটি চিন্তা করাও ভুল বৈকি। মুসলিম বিশ্বে মৌলবাদিতা যদি প্রকট বলে মনে হয়, তার কারণ, বলতে হবে, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। একটা স্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইরানের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৯ মিলিয়ন, আজ তা ৫৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে; এবং জনসংখ্যার গড় বয়স সতের। উগ্র-ইসলাম, এর চরম এবং স্পষ্ট সমাধান নিয়ে, একজন তরুণের বিশ্বাসের ক্ষেত্র।

ঐতিহ্যবাহী ইসলামের এই নতুন জোয়ার পরিমাপ করে তাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করার মত যথেষ্ট জ্ঞান বেশিরভাগ পশ্চিমা পণ্ডিতের নেই। লেবাননের শিয়া মুসলিমরা যখন ইসলামের নামে কাউকে জিম্মি করে তখন ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসীরা স্বভাবতই খোদ ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ বোধ করে, তারা বুঝতে পারে না যে এই আচরণ বন্দীদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে কোরান প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধির পরিপন্থী। দুঃখজনকভাবে প্রচার মাধ্যম এবং জনপ্রিয় সংবাদপত্রসমূহ সব সময় আমাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয় না। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়,

ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে দেয়া আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর '*ফতোয়া*'র পক্ষে উগ্রভাবে সমর্থন প্রদানকারী মুসলিমদের যেমন ব্যাপক কাভারেজ দেয়া হয়েছিল তেমন প্রচারণা *ফতোয়ার* বিরুদ্ধাচরণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠরা পায়নি। সৌদী আরবের ধর্মীয়-কর্তৃপক্ষ এবং কায়রোস্থ মর্যাদাপূর্ণ আল-আযহার মসজিদের শেখগণ এই ফতোয়াকে অবৈধ এবং অনৈসলামিক বলে আখ্যায়িত করে নিন্দা করেছেন : মুসলিম আইন বিনা বিচারে কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা অনুমোদন করে না এবং ইসলামি জগতের বাইরে এর এখতিয়ার নেই। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ইসলামি কনফারেন্সে পঁয়তাল্লিশটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে চুয়াল্লিশটি সদস্য-রাষ্ট্র সর্বসম্মতভাবে আয়াতুল্লাহ্'র বিধান প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিষয়টি মামুলি স্থান পায় এবং বেশির ভাগ মানুষের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে গোটা মুসলিম বিশ্ব রুশদীর রক্তের জন্যে খেপে উঠেছে। মাঝে মাঝে গণমাধ্যম বরং চলতি বিরোধকে জাগিয়েও তোলে, ওপেক জ্বালানী সংকটকালে ১৯৭৩ সালে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। কার্টুন, বিজ্ঞাপন এবং জনপ্রিয় নিবন্ধে ব্যবহৃত ইমেজারির শেকড় বিশ্ব দখল করার মুসলিম ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পশ্চিমের প্রাচীন ভীতিরই মাঝেই নিহিত।

অনেকেই অনুভব করেন যে মুসলিম সমাজ আমাদের স্টেরিওটাইপ ধারণাকেই সমর্থন করে: জীবন যেন মূল্যহীন, সরকারসমূহ কখনও কখনও দুর্নীতি পরায়ণ এবং স্বৈরাচারী বলে প্রতীয়মান হয় এবং নারীরা নির্যাতিত হয়। এধরনের ঘটনার জন্যে 'ইসলাম'কে দায়ী করাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু পণ্ডিতজনরা একটি সমাজে যেকোনও ধর্মের ভূমিকার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এবং ইসলামের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মার্শাল জি. এস. হজসন উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিমে মুসলিম বিশ্বের যেসব বিষয় নিন্দিত হয় তা প্রাক আধুনিক সময়েরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনশত বছর আগে জীবন এতটা কঠিন ছিল না। কিন্তু অনেক সময় মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে খোদ ধর্মকে দায়ী করার একটা স্পষ্ট প্রবণতা বা ইচ্ছা পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। এভাবে নারীবাদীরা বারবার মহিলাদের খৎনা প্রথার জন্যে 'ইসলামে'র নিন্দা করে থাকে। যদিও এটা প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার রেওয়াজ এবং কোরানে এর কোনও উল্লেখ নেই, 'ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স'-এর চারটি প্রধান মতবাদের তিনটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নয়; তবে উত্তর আফ্রিকার চতুর্থ মতবাদে একে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে যা জীবনের একটা বাস্তবতা। ক্রিশ্চানিটির ন্যায় ইসলামের ক্ষেত্রে সরলীকরণ একেবারে অসম্ভব, উভয় ক্ষেত্রে ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক।

সরলীকরণের এক জোরাল উদাহরণ : সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় সৌদী আরবে প্রচলিত ইসলাম এই ধর্ম বিশ্বাসের সবচেয়ে খাঁটি রূপ। অর্থাৎ রূপটি পুরনো বলে মুসলিমদের প্রাথমিক সমাজে প্রচলিত ধর্মের অনুরূপ। দীর্ঘদিন আগে পাশ্চাত্য দুনিয়া সৌদী আরবের শাসকদের 'জঘন্য'' বলে ধরে নিয়েছে বলে 'ইসলাম'কেও

বাতিল করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। অথচ ওয়াহাবী মতবাদ ইসলামের একটি উপদল মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর বিকাশ এবং এটা সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস্ এবং ম্যাসাচুসেটসে বিকাশ লাভকারী ক্রিশ্চান পিউরিটান উপদলের মত। পিউরিটান এবং ওয়াহাবী মতবাদে বিশ্বাসীরা আদি বিশ্বাসে ফিরে যাবার দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে এদুটো মতবাদই একেবারে নতুন বিষয় এবং বিশেষ সময়ের প্রতি সাড়া মাত্র। ওয়াহাবী মতবাদ এবং পিউরিটান মতবাদ, উভয়ই মুসলিম ও ক্রিশ্চান বিশ্বের ওপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এদেরকে বিশেষ ধর্মের ক্ষেত্রে আদর্শ বলে ভাবা ঠিক হবে না। যে কোনও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য থাকে প্রতিষ্ঠাতার মূল আদর্শে প্রত্যাবর্তন, কিন্তু পূর্বেকার পরিস্থিতির পুনর্নির্মাণ কখনওই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ইসলাম একেবারে ত্রুটিহীন, এদাবী আমি করছি না। সকল ধর্মই মানবিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রায়ই মারাত্মক ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক ধর্মই কখনও কখনও নিজেকে অপর্যাপ্ত এবং নিন্দার্হ উপায়ে প্রকাশ করেছে। কিন্তু ধর্মসমূহের সৃজনশীলতাও আছে, লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষকে শারীরিক ভোগান্তি সত্ত্বেও জীবনের পরম মূল্য আর অর্থ বুঝতে সক্ষম করে তুলেছে। ইসলামকে অশুভ শ্রেণীতে স্থাপন বা এর প্রভাবকে পুরোপুরি বা সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক বিবেচনা করা একাধারে ভুল এবং অন্যায় হবে। এটা হবে পশ্চিমা বিশ্বের সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি প্রবণ চরিত্রের প্রতি অবিচার। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ইহুদী ও ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাসের বহু আদর্শ ও ধারণা ধারণ করে। পরিণামে এই ধর্মটি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই মূল্যবোধ গঠনে ভূমিকা রাখছে। ইহুদী ও ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাস একেশ্বরবাদ, ন্যায় বিচারের প্রতি উদ্বেগ, পরিচ্ছন্নতা, সহানুভূতি এবং মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একচেটিয়া অধিকারী নয়।

আসলে, একেশ্বরবাদের মুসলিম বিশ্বাসের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে এবং এ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে। আমি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠার পর থেকে এব্যাপারে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছি। কয়েক বছর আগেও এ ধর্মটি সম্পর্কে একবারে অজ্ঞ ছিলাম আমি। সমরখন্দে এক অবকাশকালীন সময়ে এই ট্র্যাডিশন যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম তা প্রথম বুঝতে পারি। ওখানে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের ইসলামি স্থাপত্যকলার দেখা পাই আমি যা কিনা আমার নিজস্ব ক্যাথলিক অতীতের অনুরণন। ১৯৮৪ সালে সুফিবাদের ওপর একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল আমাকে। সুফিবাদ হচ্ছে ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদ। অন্যান্য ধর্মের প্রতি সুফীবাদের স্বীকৃতি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল–ক্রিশ্চান ধর্মের ক্ষেত্রে এমনটি কখনও দেখিনি! এতে করে ইসলাম সম্পর্কে আমার এতদিনের সব ধারণা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এবং আমি আরও জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি। অবশেষে, ক্রুসেড এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংকটের ওপর একটা গবেষণা চালাতে গিয়ে আমি মুহাম্মদ (স:)-এর জীবন এবং কোরানের

শরণাপন্ন হই-কোরান পয়গম্বর কর্তৃক প্রাপ্ত ঐশী গ্রন্থ। আমি আর তখন খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী নই বা অন্য কোনও স্বীকৃত ধর্মও অনুসরণ করছি না, কিন্তু একই সময়ে আমি তখন ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা উল্টেপাল্টে দেখছিলাম, ধর্মীয় অভিজ্ঞতাও পুনর্বিবেচনা করছিলাম তখন। সকল মহান ধর্মের পয়গম্বর এবং দিব্যদ্রষ্টারা দুর্জ্ঞেয় এবং পরম সত্যের মুখোমুখি হওয়ার একই রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আমরা একে যেভাবেই ব্যাখ্যা করিনা কেন, মানুষের এই অভিজ্ঞতা জীবনের একটা বাস্তবতা। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধরা এক্ষেত্রে অলৌকিক কোনও কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকে : এটা মানসিক অবস্থার একটা পর্যায়, মানুষের জন্যে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অবশ্য একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো এই দুর্জ্ঞেয়কে 'ঈশ্বর' বলে আখ্যায়িত করে। আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মদ(স:) এমনি এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং মানবজাতির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যবান অবদান রাখতে পেরেছেন। আমরা যদি আমাদের মুসলিম প্রতিবেশীর প্রতি সুবিচার করতে চাই, আমাদেরকে অবশ্যই এই অত্যাবশ্যকীয় সত্যটিকে মেনে নিতে হবে এবং সেজন্যেই আমি এ বইটি রচনা করেছি।

সাধারণ পাঠকের বোধগম্য, মুহাম্মদ(স:)-এর এমন জীবনীর সংখ্যা বিস্ময়করভাবে নগণ্য। আমি বিশেষভাবে দুখণ্ডে রচিত ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াটের *মুহাম্মদ অ্যাট মেক্কা* এবং *মুহাম্মদ অ্যাট মদিনা*'র কাছে ঋণী, কিন্তু এগুলো ছাত্রদের উপযোগি এবং মুহাম্মদ (স:)-এর জীবন সম্পর্কে পূর্বধারণা দাবী করে যা সবার নেই। মারটিন লিংস-এর *মুহাম্মদ: হিজ লাইফ বেজড্ অন দ্য আরলিয়েস্ট সোর্সেস* অষ্টম, নবম এবং দশম শতাব্দীর মুহাম্মদ(স:)-এর জীবনীকারদের সম্পর্কে অসাধারণ তথ্য যোগান দেয়, কিন্তু লিংস এর রচনা নওমুসলিমদের জন্যে। একজন বহিরাগতের মনে উদয় হওয়া মৌলিক জিজ্ঞাসার জবাব লিংস দেননি। বর্তমানে প্রাপ্ত জীবনীসমূহের মধ্যে ম্যাক্সিম রডিনসন রচিত *মুহাম্মদ (স:)* সম্ভবতঃ সবচেয়ে আকর্ষণীয়। রডিনসন অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আপন জ্ঞান প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থ থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি, কিন্তু তিনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ ও অবিশ্বাসী হিসাবে কাজ করেছেন। পয়গম্বরের রাজনৈতিক এবং সামরিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেয়ার ফলে তিনি আসলে মুহাম্মদ (স:)-এর আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে জানার বা বোঝার ব্যাপারে তেমন সাহায্য করতে পারেননি।

আমার লক্ষ্য ছিল একেবারে আলাদা। অন্য যেকোনও প্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের তুলনায় মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে অনেক বেশি জানি আমরা, সুতরাং তাঁর জীবনের ওপর আলোচনা ধর্মীয় অনুভূতির মূল সুর অনুধাবনে সবিশেষ সাহায্য করতে পারে। সব ধর্মই পরম, বর্ণনার অতীত এক সত্তার সঙ্গে পার্থিব মানুষের কথপকথনের কথা বলে। মুহাম্মদের (স:) পয়গম্বর জীবনে আমরা এ প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব তারচেয়ে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করব যে, মুহাম্মদের (স:) আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইসরাইলের

অন্যান্য পয়গম্বর, অ্যাভিলার সেইন্ট তেরেসা এবং নরউইচের ডেম জুলিয়ানের অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ মিল রয়েছে। আমি মুসলিম ট্র্যাডিশনের বিশেষ কিছু বিষয়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে পয়গম্বরের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছি। সকল প্রধান ধর্মই এসব বিষয়ের অনেক কিছুই স্বীকার করে, তবে প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। এতে করে আমরা বুঝতে পারব মুসলিমরা কেন রাজনীতিকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করে। মুহাম্মদ (স:) অসাধারণ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং ক্রিশ্চানরা এমন ব্যাপক বিজয়কে আধ্যাত্মিকতার বিপরীত বলে মনে করতে চায়, কিন্তু জেসাসের মত ব্যর্থতাই কি ঈশ্বরের কাছাকাছি যাবার একমাত্র উপায়?

ইসলাম সম্পর্কে পূর্বধারণা আছে এমন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি পয়গম্বরকে দেখার প্রয়াস পেয়েছি। এভাবে আমরা যখন দেখব মুহাম্মদ (স:) মক্কা নগরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, আমাদের ভাবতে হবে তিনি কি সত্যিই তরবারির ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? একজন প্রেরিত পুরুষ কি করে যুদ্ধ এবং হত্যার জন্যে প্রস্তুত থাকতে পারেন? স্ত্রী এবং মেয়েদের সঙ্গে মুহাম্মদের (স:) সম্পর্ক বিবেচনা করার সময় আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে তিনি কি সত্যি শ্যাভেনিস্ট ছিলেন, একটি নারী-বিদ্বেষী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন?

১৯৯১ সালে সংঘটিত উপসাগরীয় যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে, আমরা পছন্দ করি বা না করি, মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আমরা গভীরভাবে সম্পর্কিত। সাময়িক মৈত্রীস্থাপন সত্ত্বেও, এটা স্পষ্ট যে পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামি জগতের আস্থা ব্যাপকভাবে হারিয়ে ফেলেছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে শূন্যতা একপক্ষের দোষ নয়, এবং পাশ্চাত্য জগৎ যদি আবার মুসলিম বিশ্বের পুরনো আস্থা আর সহানুভূতি ফিরে পেতে চায়, তাহলে একে অবশ্যই মধ্যপ্রাচ্যে নিজস্ব ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং ইসলামের পাশাপাশি নিজের সমস্যাগুলোও বিবেচনায় আনতে হবে। একারণেই বইটির প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের পয়গম্বরের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের ঘৃণার মূল অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অবশ্য, সামগ্রিক দৃশ্যটি একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়। একেবারে সূচনাকাল হতে কিছু ইয়োরোপিয়ান অনেক বেশি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তারা সংখ্যায় সবসময়ই কম এবং তাদের ব্যর্থতাও রয়েছে; তবে মুষ্টিমেয় এমনি কিছু ব্যক্তিই তাঁদের সমসাময়িকদের ভুল সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছেন এবং প্রচলিত মতবাদের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। নিঃসন্দেহে অধিকতর সহিষ্ণু সহানুভূতিশীল এবং সাহসী এই ধারণাকেই আমাদের উৎসাহ যোগাতে হবে।

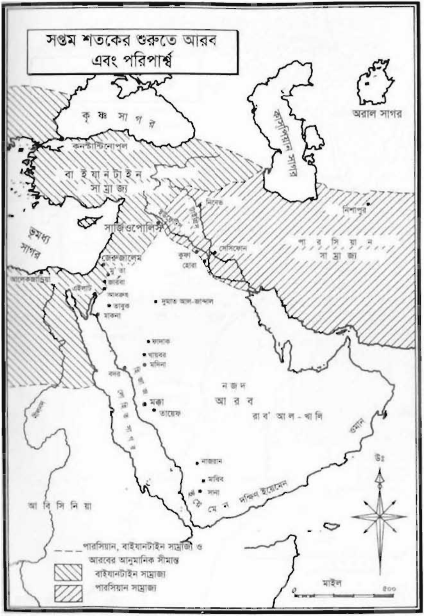
সপ্তম শতকের শুরুতে আরব
এবং পরিপার্শ্ব
কৃষ্ণ সাগর
অরাল সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
কনস্টান্টিনোপল
বাইযানটাইন সাম্রাজ্য
নিনেভ
নিশাপুর
সার্জিওপোলিস
ভূমধ্য সাগর
সেসিফোন
কুফা
হোরা
পারসিয়ান সাম্রাজ্য
জেরুজালেম
মু'তা
জার্বা
আলেকজান্দ্রিয়া
এইলাট
আযরুহ
তাবুক
মাকনা
দুমাত আল-জান্দাল
ফাদাক
খায়বর
মদিনা
বদর
নজদ
আরব
মক্কা
তায়েফ
রাব' আল-খালি
ওমান
উঃ
নাজরান
মারিব
সানা
ইয়েমেন
দক্ষিণ ইয়েমেন
আবিসিনিয়া
পারসিয়ান, বাইযানটাইন সাম্রাজ্য ও
আরবের আনুমানিক সীমান্ত
বাইযানটাইন সাম্রাজ্য
পারসিয়ান সাম্রাজ্য
মাইল
৫০০

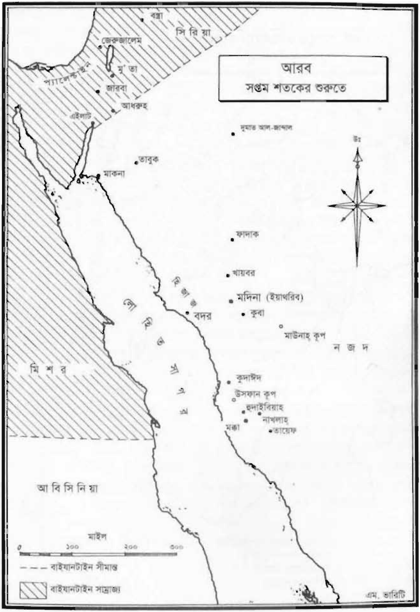
আরব
সপ্তম শতকের শুরুতে
বস্রা
সি রি য়া
জেরুজালেম
প্যালেস্টাইন
মু'তা
জারবা
আধরুহ
এইলাট
দুমাত আল-জান্দাল
তাবুক
মাকনা
উঃ
ফাদাক
খায়বর
মদিনা (ইয়াথরিব)
কুবা
বদর
মাউনাহ্ কূপ
ন জ দ
মি শ র
কুদাঈদ
উসফান কূপ
হুদাইবিয়াহ
নাখলাহ্
মক্কা
তায়েফ
আ বি সি নি য়া
মাইল
০
১০০
২০০
৩০০
বাইযানটাইন সীমান্ত
বাইযানটাইন সাম্রাজ্য
এম. ভারিটি

উপত্যকাবাসী কুরাইশ গোত্রসমূহ : ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতক
গোত্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম বক্সে দেখান হয়েছে, যেমন: তাঈম

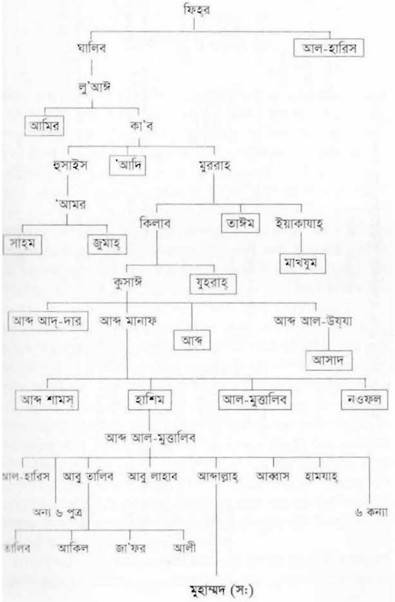

মুহাম্মদ (সঃ) এবং সম্পর্কিত পরিবারসমূহের বংশ তালিকা

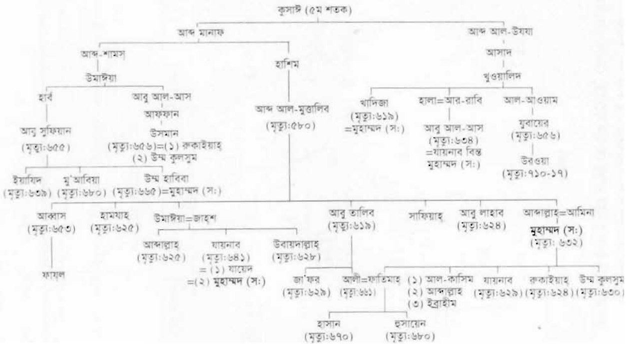

১. প্রতিপক্ষ মুহাম্মদ (স:)

সালমান রুশদীর '*দ্য স্যাটানিক ভার্সেস*'-এ উপস্থাপিত মুহাম্মদের (স:) কাল্পনিক বিবরণের প্রতি মুসলিমদের উগ্র প্রতিক্রিয়ার কারণ অনুধাবন করা পশ্চিমের জনগণের জন্যে দুঃসাধ্য ছিল। কোনও উপন্যাস যে এমন প্রবল ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে ওঠে এবং এই প্রতিক্রিয়াকে ইসলামের দুরারোগ্য অসহিষ্ণুতার প্রমাণ হিসাবে দেখা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন যে তাদের শহরেই একেবারে ভিন্ন, দৃশ্যতঃ ভিনদেশী মূল্যবোধ নিয়ে বসবাস করে এবং তা রক্ষার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত আছে-এটা বিশ্বাস করা ব্রিটেনে বসবাসকারী জনগণের জন্যে বিশেষভাবে বিব্রতকর। কিন্তু এই মর্মন্তুদ ঘটনায় পশ্চিমা অতীতের অস্বস্তিকর চিহ্নও রয়েছে। ব্রিটিশ জনগণ ব্র্যাডফোর্ডে যখন উপন্যাসটি ভস্মিভূত হতে দেখেছে তখন কি তারা একে বিভিন্ন শতাব্দীতে খৃস্টীয় ইয়োরোপে গ্রন্থ পোড়ানোর মহোৎসবের সঙ্গে তুলনা করেছে? উদাহরণ দেয়া যায় : ফ্রান্সের রাজা নবম লুই, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মহাপ্রাণ সাধক ইহুদী ধর্মগ্রন্থ তালমুদকে ব্যক্তি জেসাসের প্রতি তীব্র আক্রমণ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং রাজার উপস্থিতিতে পোড়ানো হয়। ফ্রান্সের ইহুদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তি পূর্ণ এবং যৌক্তিক উপায়ে আলোচনার আগ্রহ রাজা লুই দেখাননি। একবার তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন: 'কোনও ইহুদীর সঙ্গে তর্ক করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তার পেটে আমূল তরবারি বসিয়ে দেয়া।'[১] লুই স্বয়ং প্রথম গঠিত ইনকুইজিশনকে ক্রিশ্চান ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কেবল তাদের পুস্ত কাদি পুড়িয়ে ক্ষান্ত হননি বরং শত শত নারী-পুরুষকে পুড়িয়ে মেরেছেন। তিনি মুসলিম-বিদ্বেষীও ছিলেন এবং ইসলামী-বিশ্বের বিরুদ্ধে দুদুটো ক্রুসেডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লুইয়ের আমলে ইসলাম নয় বরং খৃস্টীয় পশ্চিমই অন্যদের সঙ্গে সহাবস্থানকে অসম্ভব বলে ভেবেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ধারণা করা হয়, মুসলিম-ক্রিশ্চান সম্পর্কের তিক্ত ইতিহাসের সূচনা ঘটেছে মুসলিম শাসিত স্পেনে মুহাম্মদের (স:) ওপর এক আক্রমণের ভেতর দিয়ে।

৮৫০ খৃস্টাব্দে পরেফেকটাস নামের জনৈক মঙ্ক মুসলিম রাষ্ট্র আল-আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভার সউকে (Souk) বাজার করতে যায়। ওখানে একদল আরবের

সঙ্গে দেখা হয় তার, আরবরা তার কাছে জানতে চায় জেসাস এবং মুহাম্মদের (সঃ) মাঝে পয়গম্বর হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব কার।

প্রশ্নের মাঝে চালাকি ছিল, এটা চট করে বুঝে যায় পারফেকটাস, কারণ মুহাম্মদকে (সঃ) অপমান করা তখন ইসলামি সাম্রাজ্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। তাই সতর্কভাবে জবাব দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিল সে। কিন্তু হঠাৎ করে ধৈর্য হারিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে দেয় সে, ইসলামের পয়গম্বরকে ভণ্ড, বিকৃতকামী এবং জেসাস বিরোধী আখ্যায়িত করতে থাকে। অবিলম্বে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

কর্ডোভার প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক ছিল ঘটনাটি, এখানে সাধারণভাবে ক্রিশ্চান-মুসলিম সম্পর্ক ছিল মোটামুটি ভাল। ইহুদীদের মত ক্রিশ্চানরাও ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীনে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত এবং অধিকাংশ স্পেনীয়রা ইয়োরোপের অপরাংশ থেকে বহু অগ্রসর এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করতে পেরে গর্ব বোধ করত। ওদেরকে প্রায়শই 'মোযারাব্‌স' বা 'অ্যারাবাইজারস' বলে অভিহিত করা হত।

> ক্রিশ্চানরা আরবদের কাব্য ও প্রেমকাহিনী পড়তে পছন্দ করত, আরব ধর্মবেত্তা ও দর্শনিকদের রচনাবলী পাঠ করত তারা– সেটা প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বরং শুদ্ধ ও কেতাদুরস্ত আরবী জানার জন্যে। পবিত্র গ্রন্থের ওপর ল্যাটিন আলোচনা পাঠকারী সেই সাধারণ ব্যক্তিটি আজ কোথায়, কোথায় গসপেল, পয়গম্বর বা সহচরদের গবেষক? হায়! মেধাবী তরুণ ক্রিশ্চানরা আগ্রহের সঙ্গে আরবের বই পড়ছে এবং গবেষণা করছে।[২]

পল আলভ্যারো নামে অপেশাদার যে স্পেনীয় স্পেনীয় মোযারাবদের ওপর এই আক্রমণের বিষয়টা বর্ণনা করেছিলেন, তিনি মঙ্ক পারফেকটাসকে একজন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বীর হিসাবে দেখেছেন। তার মুহাম্মদ (সঃ) বিরোধিতা কর্ডোভা নগরীতে এক বিচিত্র সংখ্যালঘু আন্দোলনের সূচনা করেছিল, নারী-পুরুষরা ইসলামি বিচারক কাজীর দরবারে হাজির হয়ে পয়গম্বরের ওপর তীব্র বিদ্বেষমাখা আত্মঘাতি আক্রমণ শানানোর মাধ্যমে খৃস্ট ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ রাখতে শুরু করেছিল।

কারাগারে উপস্থিত হওয়ার পর অসম্ভব আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পারফেকটাস, কাজী পারফেকটাস মুসলিমদের অন্যায় উস্কানীর শিকার হয়েছে বুঝতে পেরে মৃত্যুদণ্ড প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই পারফেকটাস দ্বিতীয়বারের মত আবার ধৈর্যচ্যুত হয় এবং এমন বিশ্রী ভাষায় মুহাম্মদকে (সঃ) গালিগালাজ করে যে কাজীর পক্ষে আইনের কঠোর প্রয়োগ এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। মঙ্ককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং এর পর পরই একদল ক্রিশ্চান–সমাজের প্রান্ত

সীমায় ছিল এদের অবস্থান–তার মৃতদেহকে খণ্ড বিখণ্ড করে শহীদের স্মৃতি সংগ্রহে রাখতে শুরু করে। কয়েক দিন পর ইসহাক নামের আরেকজন মঙ্ক কাজীর সামনে হাজির হয়ে মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর ধর্মকে এমন বিশ্রী ভাষায় আক্রমণ করে যে তাকে মাতাল কিংবা মস্তিস্ক বিকৃত ভেবে চড় কষিয়ে সচেতন করার প্রয়াস পান কাজী। কিন্তু ইসহাক খিস্তি খেউর অব্যাহত রাখে এবং আইনের এমনতর লঙ্ঘন অনুমোদন করতে পারেননি কাজী।

নবম শতকের কার্ডোভা ১৯৮৮ সালের ব্র্যাডফোর্ডের মত ছিল না। তখন মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী। এসব ধর্মান্ধ ক্রিশ্চানদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে তাদের বেশ অনীহ বলে মনে হয়েছে, এর কারণ অংশতঃ ক্রিশ্চানরা মানসিকভাবে সুস্থ ছিল না এবং একটা শহীদী গোত্র গড়ে উঠুক এটা তাদের কাম্য ছিল না। মুসলিমরা অন্য ধর্ম সম্পর্কে শুনতে অনিচ্ছুক নয়, মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় বহুত্বের মাঝে ইসলামের জন্ম, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সহাবস্থান ঘটে এসেছে। বাইযানটিয়ামের প্রাচ্য-খৃস্টীয় সাম্রাজ্যেও একইভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গ্রুপসমূহের যার যার ধর্ম পালন এবং নিজস্ব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান চালানোর অনুমতি ছিল। ইসলামি সাম্রাজ্যে ক্রিশ্চানদের ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কোনও রকম বিধিনিষেধ ছিল না, যদি তারা প্রিয় পয়গম্বর মুহাম্মদকে (স:) আক্রমণ না করে। সাম্রাজ্যের কোনও কোনও অংশে এমনকি সামালোচনা ও মুক্তচিন্তার ধারাও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, শালীনতার সীমা অতিক্রম না করলে এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশিত না হলে যা সহ্য করা হত। কার্ডোভায় কাজী এবং আমীর অর্থাৎ যুবরাজ উভয়ই পারফেকটাস এবং ইসহাককে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে অনীহ ছিলেন, কিন্তু আইনের লঙ্ঘন বরদাশত করতে পারেননি। কিন্তু ইসহাকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরেই তার মনেস্টারির আরও দুজন মঙ্ক উপস্থিত হয়ে আবার তীব্র ভাষায় মুহাম্মদকে (স:) আক্রমণ করে। ওই গ্রীষ্মে দুজন এভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। কর্ডোভার বিশপ এবং মোযারাবরা এদের নিন্দা জানিয়েছিলেন; তারা এমনি মৃত্যুবরণ করার প্রবণতায় দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শহীদরা দুজন পৃষ্ঠপোষক পেয়েছিল: ইউলোজিও নামের একজন প্রিস্ট এবং পল আলভ্যারো, এঁরা উভয়ই মৃত্যুবরণকারীদের ঈশ্বরের সৈনিক বলে আখ্যায়িত করেন, এরা নাকি বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছে। এঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে জটিল এক নৈতিক আক্রমণ শানিয়ে তোলেন যার মোকাবিলা করা মুসলিম কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁরা অন্যায় করছেন বলে মনে হতে পারত। সমাজের সর্বস্তর থেকে আত্ম-উৎসর্গকারীরা আসতে শুরু করেছিল : নারী, পুরুষ, মঙ্ক, প্রিস্ট, সাধারণ মানুষ, শিক্ষিত এবং বিশেষ করে পণ্ডিতগণ। তবে অনেকেই একটা স্পষ্ট, আলাদা পশ্চিমা পরিচয়ের সন্ধানে রয়েছে বলে মনে হয়েছে। কেউ কেউ আবার মিশ্র পারিবারিক পরিবেশ থেকে এসেছে, যাদের বাবা-মা মুসলিম ও ক্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী; বাকিরা মুসলিম সংস্কৃতির খুব কাছাকাছি চলে আসার আহবান পেয়েছিল-তাদের হয় আরব নাম[৩] দেয়া হয়েছিল অথবা সরকারী চাকুরি গ্রহণে বাধ্য

করা হয়েছিল যার ফলে তারা দ্বিধাগ্রস্ত এবং দিগভ্রান্ত বোধ করছিল। সাংস্কৃতিক পরিচয় হারানোটা প্রবলভাবে আন্দোলিত করতে পারে, এমনকি আমাদের বর্তমান সময়েও তা আক্রমণাত্মক এবং উগ্র ধার্মিকতার জন্ম দিতে পারে—নিজের অবরুদ্ধ পরিচয় উদ্ধারের জন্যে। পশ্চিমের বিভিন্ন মুসলিম সমাজে এবং পৃথিবীর অন্যত্র, যেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতির কারণে প্রচলিত মূল্যবোধ হুমকির সম্মুখীন, যেসব জায়গার বৈরিতা আর আক্রোশ দেখে বিস্ময় বোধ করার আগে আমাদের বোধ হয় কর্ডোভার সেইসব শহীদের কথা স্মরণ করা উচিত। আলভ্যারো ও ইউলোজিওর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শহীদী আন্দোলন যুগপৎভাবে ক্রিশ্চান মোযারাব এবং মুসলিমদের তিক্ত বিরোধিতার মুখে পড়েছিল, তাদেরকে সাংস্কৃতির পক্ষত্যাগী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ক্রিশ্চান রাজ্য প্যাম্পলনা গিয়েছিলেন ইউলোজিও এবং ফিরে আসেন পশ্চিমা গ্রন্থাবলী নিয়ে—ভার্জিল এবং জুভেনাল রচিত ল্যাটিন ফাদার্স অব দ্য চার্চ এবং রোমান ক্ল্যাসিক্যাল রচনাবলী। তিনি স্বদেশী স্পেনীয়দের আরবীকরণ রোধ করতে চেয়েছিলেন এবং ল্যাটিন পুনর্জাগরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন যা মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব দূর করার জন্যে দেশের রোমান অতীতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু কাজী কর্তৃক স্বয়ং ইউলোজিওকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ফলে আন্দোলন মৃত্যুবরণ করে। কাজী তাঁকে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন এরপর কেউ তাঁর ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে খোঁজ নিতে যাবে না-তিনি যেন আর সব বোকা এবং নির্বোধের মত ঘৃণিত এবং মারাত্মক আত্মধ্বংসের পথে না যান। কিন্তু ইউলোজিও স্রেফ তাকে তরবারি শানানোর জন্যে বলেছিলেন।

এই অদ্ভুত ঘটনাটি মুসলিম-স্পেনের জীবন ধারার সঙ্গে বেমানান ছিল। কারণ পরবর্তী ছয়শ বছর ঐতিহাসিক তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারীরা অপেক্ষাকৃত শান্তি আর সম্প্রীতিতে বাস করতে পেরেছিল : ইহুদী, ইয়োরোপের অন্যান্য অংশে যাদের হত্যা করা হচ্ছিল, এখানে তারা নিজস্ব শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের স্বাদ পাচ্ছিল। কিন্তু কর্ডোভার শহীদদের কাহিনী এমন একটা প্রবণতার কথা প্রকাশ করে যা পরে পশ্চিমে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। সেই সময় ইসলাম ছিল এক পরাশক্তি, অথচ ইয়োরোপ সেই সময় বিভিন্ন বর্বর গোত্রের অত্যাচারে সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাদপদ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। আজ যেমন গোটা বিশ্বকে পশ্চিমা বলে মনে হয়, আসলে পরবর্তীকালে তা ইসলামি বলে মনে হবার কথা ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বের কাছে ইসলাম একটা চলমান চ্যালেঞ্জ হিসাবে ছিল। এখন মনে হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত ঠাণ্ডা লড়াই এবার ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ঠাণ্ডা লড়াইতে পরিণত হবে।

ইউলোজিও এবং আলভ্যারো, এঁরা দুজনই বিশ্বাস করতেন যে ইসলামের উত্থান নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত মহা-প্রতারক অ্যান্টি-ক্রাইস্টের আগমনেরই পূর্বাবস্থা-যার আগমন কেয়ামতের ইঙ্গিতবাহী। *সেকেন্ড এপিস্টল্ টু দ্য থ্যাসালোনিয়ানস্-এর*

লেখক ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'গ্রেট অ্যাপসটেসি' না ঘটা পর্যন্ত জেসাস ফিরে আসবেন না : একজন বিদ্রোহী 'টেম্পল-অব-জেরুজালেমে' নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করবে এবং তার বিশ্বাসযোগ্য মতবাদের সাহায্যে বহু ইহুদীকে বিভ্রান্ত করবে। '*দ্য বুক অব রিভেলেশনে*'ও এক বিশাল দানবের উল্লেখ রয়েছে, যার দেহে রহস্যময় ৬৬৬ সংখ্যাটি চিহ্নিত থাকবে, মহাগহ্বর থেকে বুকে হেঁটে উঠে আসবে এই দানব, টেম্পল মাউন্ট অধিকার করে গোটা বিশ্ব শাসন করবে সে।[৮] প্রাচীন এই ভবিষ্যদ্বাণীর বক্তব্যের সঙ্গে ইসলাম যেন খাপেখাপে মিলে যায়। ৬৩৮ খৃস্টাব্দে মুসলিমরা জেরুজালেম জয় করে টেম্পল মাউন্টে দুটো অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদ নির্মাণ করে এবং সত্যি সত্যি তারা পৃথিবী শাসন করছে বলে প্রতিভাত হয়। যদিও জেসাসের অনেক পরে মুহাম্মদ (স:) জন্মগ্রহণ করেছেন, যখন আর নতুন রিভেলেশনের প্রয়োজন ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে পয়গম্বর দাবী করেন এবং বহু খৃস্ট ধর্ম বিশ্বাসী ধর্মত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। ইউলোজিও এবং আলভ্যারোর কাছে মুহাম্মদ (স:)-এর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল যেখান থেকে ওরা জেনেছিলেন যে তিনি স্পেনীয় বছর ৬৬৬ সালে-প্রচলিত ধারণার আটত্রিশ বছর আগে-পরলোকগমন করেছেন। অষ্টম শতকের শেষ দিকে খৃস্টবিশ্বের পশ্চাদপদ এলাকা প্যাম্পলনার নিকটবর্তী লেয়ারের মনেস্টারিতে রচিত হয়েছিল মুহাম্মদের (স:) এই জীবনীটি। ক্রিশ্চান বিশ্ব তখন ইসলামি মহীরুহের মুখোমুখি হয়ে থরথর কম্পমান ছিল। রাজনৈতিক হুমকি ছাড়াও, ইসলামের উত্থান একটা চিন্তা জাগানো ধর্মীয় জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল : ঈশ্বর কেমন করে ধর্মহীন এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা হতে দিলেন? তাহলে কি আপন জনগণকে তিনি ত্যাগ করেছেন?

কর্ডোভার শহীদরা এই অ্যাপোক্যালিপ্টিক জীবনীর ভিত্তিতেই মুহাম্মদ (স:) কে গালাগালি করেছে। শঙ্কাভরা এই কল্পকাহিনীর বর্ণনায় মুহাম্মদ (স:) ছিলেন একজন প্রতারক এবং ভণ্ড, যিনি বিশ্বকে ভুল পথে নেয়ার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর সেজেছেন। যিনি নিজে একজন লম্পট, জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত থেকে অনুসারীদেরও একই পথ অবলম্বনে উৎসাহিত করেছেন; তরবারির মুখে যিনি মানুষকে তার স্বধর্ম ত্যাগে বাধ্য করেন। ইসলাম কোনও স্বাধীন প্রত্যাদেশ নয়, সুতরাং এটা আসলে ধর্ম বিরোধী এবং খৃস্ট বিশ্বাসের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র: এটা তরবারির ধর্ম যা যুদ্ধ এবং হত্যা উৎসাহিত করে। কর্ডোভার শহীদী আন্দোলনের অবসানের পর ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলের কিছু লোক তাদের কাহিনী জানতে পারে, কিন্তু তেমন একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তবে মোটামুটি ২৫০ বছর পর, ইয়োরোপ যখন আবার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, খৃস্টীয় কিংবদন্তীগুলো মুহাম্মদের (স:) এই কাল্পনিক রূপ অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে হাজির করে। বিদগ্ধ কিছু পণ্ডিত পয়গম্বর এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে গঠনমূলক ধারণা লাভের প্রয়াস পেলেও 'মাহাউন্ড'র কাল্পনিক এই রূপটি জনসাধারণের মাঝে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। উদীয়মান পশ্চিমা পরিচয়ের বিশাল শত্রুতে পরিণত হন তিনি, আমরা যা অবাঞ্ছিত মনে করি তিনি তারই প্রতিভূ। আজও পুরনো সেই কল্পকথার ছাপ রয়ে গেছে।

এখনও পাশ্চাত্যের জনগণ খুব স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয় মুহাম্মদ (স:) বিশ্ব জয় অথবা ইসলামকে তরবারির ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই ধর্মকে 'ব্যবহার' করেছেন; যদিও মাহাউন্ডের এই কিংবদন্তীকে মিথ্যা প্রমাণকারী ইসলাম ও পয়গম্বর সম্পর্কে গঠনমূলক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অসংখ্য গবেষণার অস্তিত্ব রয়েছে।

একাদশ শতকের শেষ নাগাদ, পোপের নেতৃত্বে আবার জেগে উঠছে তখন ইয়োরোপ, পিছু হটিয়ে দিচ্ছে ইসলামকে : ১০৬১ সালে নরম্যানরা ইটালি এবং সিসিলির মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেছিল, ১০৯১ সালে অঞ্চলটি তারা অধিকার করে নেয়। উত্তর স্পেনের ক্রিশ্চানরা আল-আন্দালুসের মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনঅধিকারের যুদ্ধ শুরু করে এবং ১০৮৫ সালে টলেডো দখল করে নেয়। ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবার ইয়োরোপের সকল নাইটের প্রতি জেরুজালেমস্থ খৃস্টের সমাধি উদ্ধারের আহবান জানান–এই অভিযান পরবর্তীকালে প্রথম ক্রুসেড হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রয়াসের পর ১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখলে সক্ষম হয় এবং প্রথমবারের মত নিকট-প্রাচ্যে পশ্চিমা কলোনি স্থাপন করে। পশ্চিমের এই নতুন সাফল্য ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপ ধারণ করে, কিন্তু গোড়াতে ইয়োরোপের কারুরই মুসলিম ধর্ম বা এর পয়গম্বরের প্রতি বিশেষ কোনও ঘৃণাবোধ ছিল না। তারা বরং আপন গৌরবের স্বপ্ন আর ইয়োরোপে পোপের শাসনের বিস্তার দেখতে চেয়েছিল। প্রথম ক্রুসেডের সময় রচিত '*সং অব রোল্যান্ডে*' ইসলামি বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পায়। শার্লামেইন এবং রোল্যান্ডের মুসলিম প্রতিপক্ষকে মূর্তিপূজক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে-যারা ত্রয়ী দেবতা অ্যাপোলো, টারভাজান্ট আর মাহোমেটের সামনে প্রণামে নত হয়; কিন্তু তারা বীর যোদ্ধা, যুদ্ধ যাদের কাছে আনন্দের খোরাক। এশিয়া মাইনরে প্রথম ক্রুসেডের সৈন্যরা যখন প্রথমবারের মত তুর্কীদের মুখোমুখি হয়, তখন তারা তাদের সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভক্তি প্রকাশ করেছে :

> অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধই হোক না কেন, তুর্কীদের দক্ষতা, ক্ষমতা আর সাহসের বর্ণনা দিতে পারবে এমন লোক কোথায়, কে ভাবতে পেরেছিল আরব, সারাসেন, আর্মেনিয়ান, সিরিয়ান আর গ্রিকদের মত করে ভয়ঙ্কর তীরের হামলায় ফ্র্যাঙ্কদের মনেও আতঙ্ক জাগিয়ে তুলবে তারা? তা সত্ত্বেও, প্রিয় ঈশ্বর, তারা কখনও আমাদের মত ভাল হতে পারবে না। জনশ্রুতি আছে তারা নাকি ফ্র্যাঙ্কদের মতই এক জাতের এবং জন্মগতভাবে নাইট হবার যোগ্য। এটা সত্য, এবং কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না, যদি তারা খৃস্টধর্মে প্রবল আস্থা বজায় রাখত আর তিনটি সত্তায় এক মাত্র ঈশ্বরকে মেনে নিতে রাজি হত... ওদের চেয়ে শক্তিশালী বা সাহসী কিংবা দক্ষ সৈন্য আর মিলত না, কিন্তু তারপরেও ঈশ্বরের অপার কৃপায়, তারা আমাদের হাতে পরাস্ত হয়েছে।[৭]

১০৯৭ সালে সংঘটিত ডরিলিয়ামের যুদ্ধে ফ্র্যাঙ্করা মুসলিমদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছিল, কিন্তু দুবছর পর ক্রুসেডারদের হাতে জেরুজালেমের পতন ঘটলে তারা আর মুসলিমদের রক্তমাংসের মানুষ ভাবতে পারছে না বলে মনে হয়েছে। তারা শহরের অধিবাসীদের এমনভাবে হত্যা করেছিল যা দেখে তাদের সমসাময়িকরাও হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। এরপর মুসলিমদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করে পবিত্র স্থানসমূহ থেকে বিতাড়ন করা হয়েছিল : ক্রুসেডিং জারগনে সরকারীভাবে মুসলিমদের ফিলদ্ বা অপবিত্র বলে উল্লেখ করা হত।

১১০০ সালের আগে ইয়োরোপে মুহাম্মদ (স:)-কে নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি, কিন্তু ১১২০ সাল নাগাদ সবাই তাঁর পরিচয় জেনে যায়। শার্লামেইনের কিংবদন্তীর সমসাময়িক কালেই কিং আর্থার আর রবিনহুডের কাহিনী পশ্চিমে জন্মলাভ করে, তখনই মাহাউন্ডের কিংবদন্তী, খৃস্ট জগতের ছায়া-সত্তা এবং প্রতিপক্ষ পশ্চিমের মনোজগতে স্থায়ী হয়ে যায়। আর. ডবলু. সাদার্ন তাঁর '*ওয়েস্টার্ন ভিউজ অব ইসলাম ইন দ্য মিড্‌ল এজেজ*' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন :

> রচনার সময় এসব কিংবদন্তী আর কল্পকথার যে বর্ণিত বিষয় সমূহের মোটামুটি বাস্তবানুগ একটা বিবরণ দেয়ার উদ্দেশ্যে ছিল তাতে সন্দেহের খুব একটা অবকাশ তাই। কিন্তু রচনার অব্যবহিত পরেই এগুলো নিজস্ব সাহিত্যিক সত্তা পেয়ে যায়। জনপ্রিয় ছড়ার পর্যায়ে মাহোমেট এবং তার সারাসেনরা প্রজন্মান্তরে খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। গল্পকাহিনীর জনপ্রিয় চরিত্র সমূহের মত এদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ আশা করা হয়, এবং লেখকগণ শত শত বছর ধরে তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে চলেন।[৮]

মাহাউন্ডের কাল্পনিক অস্তিত্ব মুহাম্মদ (স:)-কে নেপোলিয়ন বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মত মর্যাদা লাভের উপযোগি ঐতিহাসিক একটি চরিত্র হিসাবে মেনে নেয়ার বেলায় পশ্চিমা জনগণের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। '*স্যাটানিক ভার্সেস*'-এ উপস্থাপিত মাহাউন্ডের কাল্পনিক বর্ণনা প্রচলিত পশ্চিমা কল্পকাহিনীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

মুহাম্মদ (স:)-এর সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিংবদন্তীতে দাবী করা হয়েছে যে, সহজ সরল আরবদের হাত করা এবং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের গির্জা ধ্বংস করার জন্যে ভুয়া 'অলৌকিক' ঘটনার সৃষ্টিকারী একজন যাদুকর তিনি। একটি কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে : একটা শাদা ষাঁড় এলাকার জনগণকে সন্ত্রস্ত করার পর অবশেষে মুহাম্মদ (স:) কর্তৃক আরবদের জন্যে আনীত কোরানসহ উপস্থিত হয়েছে– পবিত্র গ্রন্থখানা ষাঁড়ের দুই শিঙয়ের মাঝখানে অলৌকিকভাবে শূন্যে ভাসছিল। এও বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ (স:) একটা প্রশিক্ষিত ঘুঘুকে তাঁর কান থেকে মটরদানা খেতে দিতেন যাতে করে মনে হয় পবিত্র আত্মা তাঁর কানে কানে

কথা বলছে। তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসমূহকে এই বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে তিনি মৃগী রোগী ছিলেন, সেই সময় একথার অর্থ ছিল তার ওপর 'অশুভ আত্মা'র প্রভাব রয়েছে। বিকৃত এবং বিস্তারিতভাবে তার যৌনজীবন আলোচিত হয়েছে: মানুষের জানা যত বিকৃতি আছে সবই তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে; তিনি নাকি মানুষকে তার সবচেয়ে জঘন্য প্রবৃত্তি সন্তুষ্ট করার উৎসাহ দিয়ে তাদের আপন ধর্মে আকৃষ্ট করতেন। মুহাম্মদের (স:) দাবীর কোনওরকম সত্যতা নেই : একজন ঠাণ্ডা মাথার প্রতারক তিনি, গোটা জাতিকে যিনি হাত করেছিলেন। তাঁর যেসব অনুসারী ভিত্তিহীন ধারণার ফাঁক ধরতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা আপন স্বার্থ হাসিলের জন্যে নীরব থেকেছেন। মুহাম্মদের (স:) বিস্ময়কর এবং সফল ধর্মীয় দর্শন ব্যাখ্যা করার একটা উপায়ই আছে পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের, এর নিজস্ব অনুপ্রেরণাকে অস্বীকার করা: ইসলাম খৃস্টীয় মতবাদেরই এক পরিবর্তিত রূপ, ধর্ম ত্যাগের সেরা উদাহরণ। বলা হয়ে থাকে, সারজিয়াস নামের ধর্মত্যাগী এক মঙ্ককে ন্যায়সঙ্গতভাবে খৃস্টরাজ্য থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল– আরবে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করে ওখানে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে নিজের ভ্রান্ত ধারণা মুহাম্মদকে (স:) শিক্ষা দেয় সে। তরবারির অনুপস্থিতিতে মোহামেডানিজম কখনওই প্রতিষ্ঠা পেত না : ইসলামি বিশ্বে মুসলিমরা আজও ধর্ম নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতে পারে না। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) এর মানানসই একটা পরিণতি দেয়া হয়েছে: এক অশুভ খিঁচুনীর সময় একপাল শুকর তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

এইসব কল্পকাহিনীর কিছু বর্ণনায় ক্রিশ্চানদের আপন উদীয়মান পরিচয়ের ব্যাপারে উদ্বেগের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। ক্রুসেডের সময় ইসলামকে 'তরবারির ধর্ম' হিসাবে পরিচিতি দেয়া হয়েছিল, তখন ক্রিশ্চানরা নিশ্চয়ই আপন বিশ্বাসের এমনি আক্রমণাত্মক রূপের ব্যাপারে তলে তলে উদ্বিগ্ন ছিল, যার সঙ্গে জেসাসের শান্তির বাণীর কোনওই সম্পর্ক ছিল না। গির্জা যখন অনিচ্ছুক পুরোহিত সমাজের ওপর কৌমার্য প্রথা চাপিয়ে দিচ্ছে সেই সময় মুহাম্মদের (স:) যৌনজীবনের অবিশ্বাস্য কাহিনী পয়গম্বরের নিজস্ব জীবনের বিবরণের চেয়ে ক্রিশ্চানদের বঞ্চিত হবার কথাই যেন বেশি করে প্রকাশ করেছিল। ইসলামকে অসংযত এবং সহজ ধর্ম হিসাবে বর্ণনা করার মাঝে গোপন ঈর্ষার একটা সুর লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত 'ইসলাম' নয়, পাশ্চাত্যই ধর্মীয় বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ক্রুসেডের সময় ইয়োরোপ যেন বুদ্ধিবৃত্তির সমরূপতার জন্যে খেপে উঠেছিল এবং ভিন্ন মত পোষণকারীদের এমন নিষ্ঠুরভাবে সাজা দিয়েছে ধর্মের ইতিহাসে যা নজীরবিহীন। ইনকুইজিটরদের ডাইনী নিধন এবং ক্যাথলিক কর্তৃক প্রটেস্ট্যান্টদের ওপর চালানো নির্যাতন এবং এর বিপরীত ঘটনা সংঘটনের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে দুর্বোধ্য ধর্মতত্ত্বীয় মতামত যা ইহুদী এবং ইসলাম উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই একান্ত ব্যক্তিগত ও ঐচ্ছিক একটা বিষয়। ইহুদী বা ইসলাম ধর্ম বিদ্রোহের খৃস্টীয় ধারণা সমর্থন করে না, যা পরম সত্তা সম্পর্কে মানবীয়

ভাবনাকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করে যা এত বেশি উচ্চমার্গীয় যার ফলে তা পৌত্তলিকতার একটা ধরনের মত হয়ে পড়ে। ক্রুসেডের সময়, যখন কাল্পনিক মাহাউন্ড প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, তখন ইয়োরোপ জুড়ে ব্যাপক চাপ আর অস্বীকৃতির একটা পর্বও চলছিল। সেটাই ইসলামকে নিয়ে আতঙ্কের মাঝে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে, পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা মুসলিম বা বাইযানটাইনদের মত সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী আর মতবাদের অনুসারীদের স্থান দিতে সক্ষম হবে না। ইয়োরোপের মাটিতে তখন একমাত্র ভিন্ন ধর্ম ছিল ইহুদী ধর্ম এবং প্রথম ক্রুসেড বাহিনী ইয়োরোপে প্রথম হত্যাযজ্ঞ আর লুণ্ঠন পরিচালনার সময় রাইন উপত্যকাবাসী ইহুদী গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল। ক্রুসেড কালে অ্যান্টি-সেমিটিজম এক দুরারোগ্য ইয়োরোপীয় ব্যধির রূপ নেয় এবং ক্রিশ্চানরা যখন মাহাউন্ড আর সারাসেন সংক্রান্ত কাহিনী ফাঁদছে তখন ইহুদীদের নিয়েও ভয়ঙ্কর সব কাহিনী তৈরি করার প্রয়াস পেয়েছে। ইহুদীরা নাকি ছোট্ট শিশুদের হত্যা করে তাদের রক্ত পাসওভার ব্রেডের সঙ্গে মেশায়: উদ্দেশ্য : খৃস্টের শেষ ভোজসভাকে অসম্মানিত করা যাতে ক্রিশ্চান বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করার এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক চক্রান্তে অংশ নেয়া যায়। ইসলামি বিশ্বে এধরনের ইহুদী বিরোধী কোনও কল্পকাহিনীর অস্তিত্ব নেই: এসব কাহিনী পাশ্চাত্যের মনোজগতের এক অস্বাস্থ্যকর অস্থিরতা ও অসুস্থতার কথা জানায়। স্পেন, দক্ষিণ ইটালি এবং সিসিলির দখলদাররা বুঝতে পারছিল যে, খৃস্টীয় বিশ্বের সীমানার অভ্যন্তরে এখন লক্ষ লক্ষ মুসলিমের অধিবাস রয়েছে। এই বহিরাগতদের সঙ্গে কুলিয়ে ওঠার এস্টাবলিশমেন্টের একটা উপায়ই যেন ছিল, সরকারীভাবে বর্ণবাদী নীতি গ্রহণ, প্রতিবেশী মুসলিম ও ইহুদীদের সঙ্গে যেন ক্রিশ্চানরা কোনওরকম যোগাযোগ রাখতে না পারে। ১১৭৯ এবং ১২১৫ সালে ল্যাটারান কাউন্সিলে গৃহীত স্পেশাল চার্চ লেজিসলেশন এদুটো সম্প্রদায়কে সাধারণ শত্রু হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। মুসলিম ও ইহুদীদের বাড়িঘর থেকে সেবা গ্রহণ, ওদের বাচ্চাদের দেখা শোনা, ওদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ কিংবা একসঙ্গে আহার গ্রহণের অপরাধের শাস্তি হিসাবে গির্জার সদস্যপদ বাতিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে সম্পত্তি ক্রোকের মত বিধান জারি করা হয়েছিল। ১২২৭ সালে পোপ নবম গ্রেগরি আরও কিছু ডিক্রি যোগ করেন : মুসলিম এবং ইহুদীদের আলাদা পোশাক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়: ক্রিশ্চানদের উৎসবের সময় তারা রাস্তায় বেরুতে পারবে না কিংবা ক্রিশ্চান প্রধান দেশে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করতে পারবে না: এবং রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলিমদের প্রার্থনার আহবান জানাতে আযান দিয়ে ক্রিশ্চানদের শ্রুতিযন্ত্রের ওপর অত্যাচার চালানো মুয়াজ্জিনদের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

পোপ পঞ্চম ক্লিমেন্ট (১৩০৫-১৪) ঘোষণা করেছিলেন যে, ক্রিশ্চান ভূমিতে মুসলিমদের উপস্থিতি ঈশ্বরের প্রতি আঘাত স্বরূপ। ক্রিশ্চানরা ইতিমধ্যে এই

অশ্লীলতা দূর করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। ১৩০১ সালে ফ্রান্সের রাজা, চার্লস অব আনজো সিসিলি, দক্ষিণ ইটালি এবং লুসেরা রিজার্ভেশনের মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন; লুসেরার রিজার্ভেশনকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, 'কীটপতঙ্গের আস্তানা... দূষিত... আপুলিয়ার নোংরা ঘা।'[৮] ১৪৯২ সালে ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা গ্রানাডা দখল করে নেয়ার ফলে ইয়োরোপে মুসলিমদের শেষ শক্ত ঘাঁটিটিও ধ্বংস হয়ে যায় : শয়তানের বিরুদ্ধে ক্রিশ্চানদের বিজয়ে গোটা ইয়োরোপ জুড়ে গির্জার ঘণ্টা আনন্দের সুরে বাজছিল তখন। কয়েক বছর বাদে স্প্যানিশ মুসলিমদের দেশত্যাগ বা ধর্মান্তরিত হবার মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অনেকেই ইয়োরোপ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে কেউ কেউ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তী আরও ৩০০ বছর স্প্যানিশ ইনকুইজিশন এদের উত্তরসুরীর ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে যায়। কর্ডোভার শহীদদের চেতনা আদি সহিষ্ণুতার স্থান দখল করে নেয় এবং স্প্যানিশ ক্রিশ্চানরা অদৃশ্য মুসলিমদের আতঙ্কে ভুগতে শুরু করে: সমাজের শত্রু হিসাবে তাদের মাঝেই বাস করছিল এই মুসলিমরা।

ইসলামের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের অসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শঃ বিশ্রীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ছিলেন ইসলামোফিল, ক্রিশ্চান ইয়োরোপের চেয়ে মুসলিম বিশ্বে তিনি অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন, কিন্তু একই সময়ে তিনি তাঁর আপন দ্বীপ সিসিলি থেকে বিশেষ কায়দায় মুসলিমদের হত্যা ও নির্বাসিত করেছিলেন। নিকট প্রাচ্যের মুসলিমদের নিধনে ক্রিশ্চানরা যখন ব্যস্ত, অন্যরা তখন স্পেনে মুসলিম পণ্ডিতদের পায়ের কাছে বসেছিলেন। ক্রিশ্চান, ইহুদী এবং মোযারাবিক পণ্ডিতগণ এক ব্যাপক অনুবাদ প্রকল্পে একসঙ্গে অংশ নিয়ে পশ্চিমে ইসলামি শিক্ষা পৌছে দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। ইবন সিনা এবং ইবন রুশদের মত মুসলিম দার্শনিকগণ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসাবে সম্মানিত ছিলেন, যদিও ওদের মুসলিম পরিচয় মেনে নোয়াটা জনগণের জন্যে ক্রমশঃ অসুবিধাজনক হয়ে উঠছিল। দান্তে'র '*দ্য ডিভাইন কমেডি*'তে এ সমস্যাটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইবন সিনা এবং ইবন রুশদ (ইয়োরোপে এঁরা আভিসেনা এবং আভেরোয়েস নামে পরিচিত) পাশ্চাত্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা ইউক্লিড, টলেমি, সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলদের মত জ্ঞানী প্যাগানদের সঙ্গে লিম্বোতে রয়ে গেছেন; কিন্তু মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং পড়েছেন নরকের অষ্টম বৃত্তে, আপন উপদল নিয়ে। বিশেষ ধরনের ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে তাঁকে :

নো কাস্ক স্টৌভ ইন ক্যান্ট অর মিড্‌ল এভার
সো গেপড্ অ্যাজ ওয়ান আই স' দেয়ার, ফ্রম দ্য চিন
ডাউন টু দ্য ফ্যার্ট- হোল স্প্লিট অ্যাজ বাই আ ক্লিভার।

হিজ ট্রাইপস হাঙ বাই হিজ হিলস; দ্য প্লাক অ্যান্ডস স্প্লিন

শোউড উইদ দ্য লিভার অ্যান্ড দ্য সরডিড স্যাক
দ্যার্টস টার্নস টু ডাঙ দ্য ফুড ইট সোয়ালোজ ইন।[১০]

কিন্তু দান্তে মুহাম্মদকে (স:) স্বাধীন ধর্মীয় দর্শনের অধিকারী হতে দিতে চাননি। তিনি কেবল একজন বিদ্রোহী, যিনি আদি বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে গেছেন। এধরনের কল্পনা ইসলামের প্রতি ক্রিশ্চানদের বুকে জেগে ওঠা ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ, তবে এথেকে পাশ্চাত্যের মনোজগতে একটা ভাঙনের ছবিও পাওয়া যায়, ইসলামকে এরা যা মানতে পারে না তারই ছায়া হিসেবে কল্পনা করে। ঘৃণা আর আতঙ্কও, যা কিনা জেসাসের ভালোবাসার বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত, পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চান জনগোষ্ঠীর সত্তায় এক গভীর ক্ষত চিহ্নও প্রকাশ করে।

অবশ্য অন্যরা আরও বস্তুনিষ্ঠ বা বাস্তবানুগ ধারণা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন। ইহুদী আর মুসলিমরা যখন ক্রিশ্চানদের কল্পনায় সাধারণ শত্রুর রূপ নিচ্ছে, তখন এটা উল্লেখযোগ্য যে, পিটার আলফনসি নামে এক স্প্যানিশ ইহুদীর কাছ থেকে পশ্চিমে প্রথম মুহাম্মদের(স:) ইতিবাচক একটা ভাবমূর্তি বেরিয়ে আসে। আলফনসি ১১০৬ সালে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং প্রথম হেনরির চিকিৎসক হিসাবে ইংল্যান্ডে বসবাস করছিলেন। ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হলেও 'সত্য' ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী না হয়েও একজন মানুষ যুক্তিসঙ্গতভাবে তৈরি হতে পারে বোঝানোর জন্যে তিনি এটা উপস্থাপন করেছিলেন। ১১২০ সাল নাগাদ, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ যখন চরমে পৌঁছেছে, উইলিয়াম অব মামেসবারি ইয়োরোপীয়দের মধ্যে প্রথমবারের মত ইসলামকে পৌত্তলিকতা থেকে আলাদা বলে শনাক্ত করেছিলেন : 'সারাসেন এবং তুর্কীরা ঈশ্বরকে স্রষ্টা হিসাবে উপাসনা করে এবং মুহাম্মদকে (স:) ঈশ্বর নয়, বরং পয়গম্বর হিসাবে শ্রদ্ধা করে থাকে।'[১১] অনেক পশ্চিমবাসী এই ধারণাটি মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল : এখনও কেউ কেউ মুসলিমরা যে ক্রিশ্চান এবং ইহুদীদের মত একই ঈশ্বরের উপাসনা করে জেনে সত্যি সত্যি বিস্ময় প্রকাশ করে থাকে। তারা মনে করে 'আল্লাহ' একেবারে ভিন্ন এক উপাস্য, রোমান প্যান্থিয়নের জুপিটারের মত। অন্যরা মনে করে 'মুহাম্মাডানরা' তাদের পয়গম্বরের প্রতি ক্রিশ্চানরা যেভাবে জেসাসকে শ্রদ্ধা জানায় ঠিক সেভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকে।

কল্পকথা থেকে সত্যকে আলাদা করার অসুবিধা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ছদ্ম-টারপিন রচিত '*দ্য হিস্ট্রি অব শার্লামেইন*'-এ, ১১৫০ সালের কিছু আগে যা রচিত হয়েছে। এই রোমান্সে বর্ণনা করা হয়েছে যে পৌত্তলিক সারাসেনরা অ্যাপোলো আর টারভাজান্টের পাশাপাশি মাহোমেটেরও উপাসনা করছে– '*চ্যানসনস ডি গেস্টেস*'-এর প্রচলিত কায়দায়। কিন্তু এসব কিছুর মাঝখানে, রোল্যান্ড এবং মুসলিম পণ্ডিত ফেরাকাটাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক যুক্তি ভিত্তিক বিতর্কে মুসলিমরা ঈশ্বরের উপাসনা করে এই স্বীকৃতি বেরিয়ে আসে। মোটামুটি একই সময়ে কাহিনীকার অটো অব ফ্রেইজিং মুসলিমদের মূর্তিপূজার কিংবদন্তী অস্বীকার করেন :

এটা সর্বজন বিদিত যে গোটা সারাসেন গোষ্ঠী একজন মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের আইন মেনে চলে, খৎনার আনুষ্ঠানিকতা পালন করে। তারা জেসাস বা তাঁর সহচরদের অবমাননা করে না। একটা ক্ষেত্রেই তারা– জেসাসকে ঈশ্বরপুত্র হিসাবে স্বীকার না করে এবং পথভ্রষ্টকারী মাহোমেটকে মহান ঈশ্বরের পয়গম্বর বলে দাবী করে–মুক্তির দুয়ার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।[১২]

দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি, এভাবে ইসলাম সম্পর্কে খানিকটা সঠিক ধারণা ব্যাপক প্রচার পেতে শুরু করে, কিন্তু বাস্তবানুগতার মহত্ব বৈরিতার কল্পকাহিনীকে হটিয়ে দেয়ার মত যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। সত্য এবং কল্পকথার সহাবস্থান চলছিল, এমনকি মানুষ আন্তরিকভাবে বস্তুনিষ্ঠ হতে চাইলেও কোনও না কোনও পুরনো ঘৃণা উদয় হত। মুহাম্মদ (স:) তখনও একজন প্রতারক এবং ধর্মত্যাগী, যদিও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অটোর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি যৌক্তিক ছিল।

ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাবার লক্ষ্যে পরিচালিত দ্বাদশ শতকের বিভিন্ন প্রয়াসের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পিটার দ্য ভেনেরেবল, মহান অ্যাবট অব ক্লানির প্রচেষ্টা। ১১৪১ সালে তিনি ক্রিশ্চান স্পেনের বেনেডিকটাইন মনেস্টারি সমূহ পরিদর্শনে যান এবং ইংলিশম্যান রবার্ট অব কেটনের নেতৃত্বে ক্রিশ্চান ও মুসলিম পণ্ডিতদের একটা দলকে কিছু ইসলামি রচনা অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেন–১১৪৩ সালে এই প্রকল্প শেষ হয়। এঁরা কোরানের প্রথম ল্যাটিন অনুবাদ করেছিলেন, এছাড়া মুসলিম কিংবদন্তী, মুসলিম ইতিহাস (বিশ্বের), মুসলিম শিক্ষার ব্যাখ্যা এবং *দ্য অ্যাপলজি অব আল-কিন্দি* নামের এক বিতর্ক গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছিলেন তাঁরা। একটা উল্লেখ্যযোগ্য কৃতিত্ব ছিল সেটা; এতে করে পাশ্চাত্যের জনগণ প্রথমবারের মত ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা চালানোর উপাদানের সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু খুব একটা অগ্রগতি হয়নি তাতে। এই সময় নিকট প্রাচ্যে ক্রিশ্চানরা ক্রুসেডার রাজ্যসমূহ প্রথম সামরিক পরাজয়ের আস্বাদ পেতে শুরু করেছিল। ফলে নতুন করে আবার মুসলিম বিরোধী অনুভূতি জেগে উঠেছিল। অ্যাবট অব ক্লেয়ারভক্স বার্নার্ড তাতে ইন্ধন যোগান। কোরানের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা চালানোর উপযুক্ত সময় ছিল না সেটা। পিটার তাঁর রচিত প্রবন্ধে মুসিলমদের নরম এবং সহানুভূতির সুরে সম্বোধন করেছিলেন: 'আমি অন্যান্যের মত অস্ত্র নয় বরং ভাষার সাহায্যে ; শক্তি নয়, যুক্তির সাহায্যে ; ঘৃণা নয়, ভালবাসা দিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি... আমি তোমাদের ভালবাসি, ভালবেসেই তোমাদের লিখছি, ভালবেসে তোমাদের মুক্তির দিকে আহবান জানাচ্ছি।'[১৩] কিন্তু প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল '*সামারি অব দ্য হোল হেরেসি অব দ্য ডায়াবলিক সেক্ট অব দ্য সারাসেনস*।' অ্যাবট অব ক্লানির ল্যাটিন প্রবন্ধ পড়তে পারলেও খুব কম সংখ্যক মুসলিমই এধরনের সম্বোধন সহানুভূতিসূচক বলে মেনে নিত। দয়াবান অ্যাবটও, যিনি তাঁর

সময়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার প্রতি নিজের বিরোধিতার পরিচয় রেখেছেন, ইয়োরোপ ও ইসলামের সম্পর্কে নিয়ে বিকৃত মানসিকতার প্রমাণ রেখেছিলেন। ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই ১১৪৭ সালে দ্বিতীয় ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য অভিযানে যান, পিটার তাঁর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, তিনি আশা করেন রাজা তত মুসলিম হত্যা করতে পারবেন মোজেস এবং জোশুয়া যত অ্যামোরাইট আর কানানাইট হত্যা করেছিলেন।[১৪]

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে এক সামরিক ক্রুসেডের পটভূমিতে আরেকজন মহান ক্রিশ্চান মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। দুর্যোগময় পঞ্চম ক্রুসেডের এক বিরতিকালীন সময়ে (১২১৮-১৯), ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি, নীল নদের বদ্বীপে ক্রিশ্চান ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত হন, শত্রু রেখা অতিক্রম করে সুলতান আল কামিলের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা হয়, তিনি নাকি তিন দিন সুলতানের সঙ্গে কাটিয়েছেন, গসপেলের বাণীর ব্যাখ্যা শুনিয়ে আল-কামিলকে খৃস্টধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। তিনি পয়গম্বর মুহাম্মদ (স:) এর স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা না জানানোয় মুসলিমরা তাঁর বক্তব্য শুনতে প্রস্তুত ছিল, এবং জীর্ণ চেহারার অপরিষ্কার লোকটার কথায় বরং মুগ্ধ হয়েছিল বলা যায়। তাঁর বিদায়ের সময় কামিল বলেছিলেন : 'আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন, যেন ঈশ্বর আমাকে তাঁর পছন্দের আইন আর ধর্ম চিনে নিতে সাহায্য করেন।' তিনি ফ্রান্সিসকে আবার ক্রিশ্চান শিবিরে 'পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং নিরাপত্তার সঙ্গে'[১৫] ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে ফ্রান্সিস একদল ভিক্ষুকে স্পেন এবং আফ্রিকার মুসলিমদের দীক্ষা দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, এবং তারা একেবারে অন্য কায়দায় ইসলামি বিশ্বের মুখোমুখি হয়েছিল। সেভিলে পৌঁছার পর তারা কর্ডোভার শহীদদের কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে তারা শুক্রবারে জুম্মার প্রার্থনার সময় মসজিদে ঢোকার প্রয়াস পায়, তাড়িয়ে দেয়ার পর আমিরের প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে পয়গম্বর মুহাম্মদ (স:)কে গালাগালি করতে থাকে। ইসলামি জগতে প্রথম মিশনারি প্রয়াসে সারাসেনদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসার কোনও চিহ্ন ছিল না। ফ্রান্সিসকানরা মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না, শহীদি দরজা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাদের ভাষা এত জঘন্য হয়ে উঠেছিল যে এঘটনায় বিব্রতবোধকারী কর্তৃপক্ষ তাদের বন্দী করতে বাধ্য হয়, প্রচারণা এড়াতে কারাগার থেকে কারাগারে স্থানান্তর করতে থাকে। মৃত্যুদণ্ড দানের ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল তারা, কিন্তু স্থানীয় মোযারাব ক্রিশ্চানরা এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে ধর্মান্ধদের কারণে তারা না বিপদগ্রস্ত হয়, ফলে তারা কর্তৃপক্ষের কাছে ওদের তাড়িয়ে দেয়ার আবেদন জানায়। পরবর্তীকালে ফ্রান্সিসকানদের মরোক্কোর সিউটায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, ওখানেও তারা সোজা মসজিদে গিয়ে হাজির হয় এবং শুক্রবারে জুম্মার প্রার্থনায় মুসলিমদের জমায়েতের সময় পয়গম্বর মুহাম্মদ (স:)কে গালাগালি করতে থাকে। অবশেষে কর্তৃপক্ষ তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হয়। এ

খবর পাওয়ার পর ফ্রান্সিস নাকি সানন্দে বলে উঠেছিলেন: 'এখন আমি জানি, আমার পাঁচজন ফ্রাইয়ার মাইনর আছে।'[১৬]

পরবর্তীকালের ফ্রান্সিসকান মিশনগুলোর চরিত্রের মধ্যে যেন রয়ে গিয়েছিল এই প্রবণতা। ১২২৭ সালে সিউটায় আরেকটা গ্রুপকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বাড়িতে লেখা চিঠিতে তারা উল্লেখ করেছিল তাদের মিশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মৃত্যু এবং শয়তানদের বিনাশ।'[১৭] অন্যরা গিয়েছিল পবিত্র ভূমিতে। জেমস্ অব ভিট্রি, দ্য বিশপ অব অ্যাকর, এদের কৌশলের নিন্দা জানিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন : জেসাসের ধর্ম এবং গসপেলের শিক্ষার কথা বলার সময় সারাসেনরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ফ্রাইয়ারস মাইনরদের কথা শুনেছে। কিন্তু যখন তাদের আলোচনা মুহাম্মদ (স:)-এর বিরুদ্ধে গেছে, ওদের সারমনে তাঁকে জঘন্য মিথ্যুক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তখন তারা কোনওরকম রাখ-ঢাক ছাড়াই আঘাত হেনেছে, ঈশ্বর যদি অলৌকিক উপায়ে ওদের রক্ষা না করতেন, তাহলে হয়ত ওরা ওদের খুনই করে ফেলত, তাড়িয়ে দিত শহর থেকে।[১৮]

এভাবে মধ্যযুগে মানুষ যখন বাস্তবানুগ ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে বা খৃস্টধর্মের বাণী নিয়ে মুসলিমদের কাছাকাছি যাচ্ছে, তখনও বৈরিতার সৃষ্টি হয়েছে, কখনও কখনও মারাত্মক রূপ নিয়েছে তা। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে ডমিনিকার পণ্ডিত রিকাল্ডে ড্যা মন্টে ক্রসে বিভিন্ন মুসলিম দেশ ভ্রমণ করে তাদের ধার্মিকতা দেখে মুগ্ধ হন : মুসলিমরা ক্রিশ্চানদের লজ্জায় ফেলে দিয়েছে, লিখেছেন তিনি। কিন্তু যখন দেশে ফিরে এলেন *ডিসপিউট্যাটিও কন্ট্রা সারাসেনোস এট আলকোরানাম* রচনার উদ্দেশ্যে, তখন সেই পুরনো কিংবদন্তীরই পুনরাবৃত্তি করলেন। ইসলামের পশ্চিমা ইমেজ এমন একটা শক্তিশালী কর্তৃত্ব পেতে শুরু করেছিল যা প্রকৃত মুসলিমের সঙ্গে যে কোনও ইতিবাচক যোগাযোগের চেয়ে অনেক জোরাল। ক্রুসেডের কালে, পশ্চিম এর প্রাণের দেখা পেয়েছিল। আমাদের অধিকাংশ আবেগ আর উৎসাহের মূল রয়েছে সেই সময়ে মাঝে। উমবার্তো ইকো তাঁর প্রবন্ধ '*ড্রিমিং অব দ্য মিড্ল এজেস*'-এ যেমনটি উল্লেখ করেছেন :

> প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান এবং ইয়োরোপীয়ান উভয় জনগোষ্ঠীই পশ্চিমের উত্তরাধিকার বহন করছে আর পশ্চিমা জগতের সকল সমস্যার মূলে রয়েছে মধ্যযুগ : আধুনিক ভাষা, বাণিজ্য নগরী, পুঁজিবাদী অর্থনীতি (ব্যাঙ্ক, চেক আর প্রাইম রেটসহ) ইত্যাদি মধ্যযুগ সমাজের আবিষ্কার। মধ্যযুগে আমরা আধুনিক সেনাবাহিনীর উত্থান দেখি, দেখি জাতি-রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণা এবং অতিপ্রাকৃত ফেডারেশনের ধারণা (জার্মান সম্রাটের অধীনে কোনও ডিয়েট দ্বারা নির্বাচিত নির্বাচক কনভেনশনের মত কার্যক্রম); ধনী-দরিদ্রের সংঘাত, ধর্মত্যাগ বা আদর্শগত মতভেদ, এমন কি ভালবাসাকে মারাত্মক দুঃখজনক একটা ব্যাপার

হিসাবে দেখার চিন্তাও। এর সঙ্গে আমি যোগ করতে পারি গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ, ট্রেড ইউনিয়ন (অবশ্য এক ধরণের গঠনমূলক রূপে) শ্রমের কারিগরি রূপান্তর।[১৯]

তিনি আরও যোগ করতে পারতেন : ইসলামের সমস্যা। মধ্যযুগের পর পাশ্চাত্যের জনগণ মধ্যযুগীয় বহু কিংবদন্তী বহন করে এসেছে। আরও ইতিবাচক এবং বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালানো হয়েছে, কিন্তু 'ইসলাম' এবং এর পয়গম্বর ভয়ঙ্কর কোনও ব্যাপার নয়, যেমনটি মানুষ ভাবে, পণ্ডিতদের মাঝে এ বিষয়ে ঐকমত্য বেড়ে উঠলেও প্রচলিত সংস্কার থেকেই যায়।

কর্ডোভার শহীদদের হাতে প্রচার পাওয়া ইসলামের রহস্যময় রূপটি ক্রুসেডের সময়ও অব্যাহত থাকে, যদিও তা তখন আর মুখ্য বিষয় ছিল না। ১১৯১ সালে সিংহহৃদয় রিচার্ড যখন তৃতীয় ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়ে পবিত্র ভূমি সফরে যান, তখন সিসিলির মেসিনায় ইটালীর বিখ্যাত আধ্যাত্ম সাধক জোয়াকিম অব ফ্রায়োরির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। জোয়াকিম রিচার্ডকে বলেছিলেন যে তিনি অবশ্যই সালাদিনকে পরাজিত করতে পারবেন। ভুল হয়েছিল তাঁর, তবে বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক পর্যবেক্ষণও ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রলয় আসন্ন এবং বিদ্রোহী ইসলাম অ্যান্টিক্রাইস্টের একটা অস্ত্র, তবে তিনি যোগ করেছিলেন যে অ্যান্টিক্রাইস্ট ইতিমধ্যে রোমে বসবাস করছে এবং তার পোপ পদে অধিষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী। ইয়োরোপের জনগণ তাদের সমাজের ব্যাপারে আরও সমালোচনামুখর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম অভ্যন্তরীন শত্রুর অংশ হয়ে পড়েছিল। সংস্কারবাদীরা বিশ্বাস বিহীন পৌরহিত্য (ওদের নিজস্ব চিরশত্রু) এবং ইসলামের মধ্যে একই রকম পরিচয় চিহ্ন আবিষ্কার করে। ফলে চতুর্দশ শতকের ইংরেজ সমাজ-সংস্কারক জন ওয়াইক্লিফের শেষদিকের রচনাবলীতে 'ইসলামে'র প্রধান ত্রুটিসমূহ আর পাশ্চাত্যের গির্জার প্রধান ত্রুটি একই রকম ছিল : অহঙ্কার, প্রলোভন, অরাজকতা আর ক্ষমতা ও অধিকারের জন্যে লালসা। 'আমরা পশ্চিমা মাহোমেটরা', সামগ্রিকভাবে পশ্চিমা গির্জার কথা ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন তিনি, 'গোটা গির্জা ব্যবস্থার অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ, মনে করি সারা বিশ্ব আমাদের বিচার বিবেচনায় চলবে এবং আমাদের নির্দেশে কম্পমান থাকবে।'[২০] যতক্ষণ না গির্জা গসপেলের প্রকৃত চেতনায় ফিরছে, ভাগ্যে বিশ্বাস করছে, ততক্ষণ এই 'ইসলামি' চেতনা প্রাচ্যের মত পাশ্চাত্যেও জোরাল হতে থাকবে। এটা ছিল 'ইসলাম' ও মুহাম্মদ (স:)কে আমরা যা কিছুর আশা করি (বা ভয় পাই) তার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর অতি পুরনো অভ্যাসের সূক্ষ্ম প্রকাশ।

ওয়াইক্লিফকে অনেক অনির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল, কিন্তু কোরানের অনুবাদ পড়েছিলেন তিনি, এবং মনে করেছিলেন মুহাম্মদ (স:) এবং রোমের গির্জার মাঝে তুলনা করার মত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পেয়েছেন। গির্জার মত,

যুক্তি দিয়েছেন তিনি, বাইবেল নিয়ে যাচ্ছেতাই করেছেন মুহাম্মদ (স:), নিজের সুবিধামত কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন, বাকিটা বাদ দিয়েছেন। ধর্মীয় নির্দেশাবলীর মত মুহাম্মদ (স:) এমন নতুন কিছু যোগ করেছেন যা বিশ্বাসীদের ওপর বাড়তি চাপের সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি, গির্জার মত মুহাম্মদও(স:) ধর্ম নিয়ে মুক্ত আলোচনা নিষিদ্ধ করেছেন। কোরানের নির্দিষ্ট কিছু অংশে পুরনো মধ্যযুগীয় সংস্কারের দেখা পেয়েছেন ওয়াইক্লিফ যেখানে ধর্মীয় আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি, তবে বলা হয়েছে কোনও কোনও ধর্মীয় বিষয়ের বিতর্কের ফলে পুরনো কিছু ধর্মে বিভক্তি দেখা দিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন গোত্রে ভাগ হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কিত কিছু ধারণা একেবারেই অনুমাননির্ভর : উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কেউই ইনকারনেশন সম্পর্কিত ধারণার প্রমাণ দিতে পারবে না, যা মুহাম্মদের (স:) কাছে কিছু কিছু ক্রিশ্চান পয়গম্বর জেসাসের আদি বার্তার সঙ্গে যোগ করেছে বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য ওয়াইক্লিফ, তথাকথিত এই ইসলামি অসহিষ্ণুতাকে গির্জার সমস্যামূলক বিভিন্ন মতবাদ যেমন শেষ ভোজসভা, ক্রিশ্চানদের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলা, ইত্যাদির প্রতি গির্জার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

লুথার এবং অন্যান্য প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকরা এই অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। জীবনের শেষদিকে, ইয়োরোপে অটোমান তুর্কীদের বিপজ্জনক সীমালঙ্ঘনের মুখোমুখি হয়ে লুথার কর্ডোভার শহীদদের দুঃস্বপ্নে আক্রান্ত হন এবং বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে ইসলাম কর্তৃক ক্রিশ্চান বিশ্ব গ্রাস হয়ে যেতে পারে। ১৫৪২ সালে তিনি নিজের অনূদিত রিকাল্ডো ডা মন্টে ক্রসে'র *'ডিসপিউট্যাটিও'* প্রকাশ করেছিলেন। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন, এটা অনেক বছর আগে পড়লেও মানুষ এমন বলগাহীন মিথ্যাচার বিশ্বাস করতে পারে বলে ভাবতে পারেননি তখন। কোরান পড়তে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কোনও ল্যাটিন অনুবাদ পাননি–আর. ডব্লু. সাদার্ন উল্লেখ করেছেন, এ থেকে ষোড়শ শতকে ইসলামি গবেষণার দুরবস্থার আলামত পাওয়া যায়–কিন্তু অতি সম্প্রতি তাঁর হাতে একটা কপি আসায় তিনি বুঝতে পেরেছেন সত্যিই কথাই বলেছিলেন রিকাল্ডো। তিনি জিজ্ঞাসা রেখেছেন মুহাম্মদ (স:) এবং মুসলিমরা অ্যান্টিক্রাইস্ট কিনা; জবাবে বলেছেন, এমন ভয়ঙ্কর পরিণতি সংঘটনের মত শক্তি 'ইসলামে'র নেই। আসল শত্রু হচ্ছে পোপ এবং ক্যাথলিক চার্চ, ইয়োরোপ যতদিন এই গৃহশত্রুকে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন মুহাম্মাডানদের হাতে পরাজয়ের হুমকির মুখে থাকতে হবে। যিউঙগলিসহ আরও কয়েকজন সংস্কারক একই ধরনের বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁরা রোমকে অ্যান্টিক্রাইস্টের 'মস্তিষ্ক' হিসাবে দেখেছেন, 'মুহাম্মাডানিজম' তার শরীর। এই প্রটেস্ট্যান্ট ধারণা দেখায় যে, ইসলামকে ইয়োরোপের বহু লোকই আত্মস্থ করে নিয়েছিল এবং তা তাদের আবেগের দৃশ্যপটে চূড়ান্ত অশুভের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছিল। নরম্যান ড্যানিয়েল তাঁর গবেষণা *'দ্য আরবস্ অ্যান্ড মেডিয়াভাল*

ইয়োরোপ-এ ব্যাখ্যা করেছেন : এটা আর বাহ্যিক ঐতিহাসিক বাস্তবতা ছিল না যা অন্য সব কিছুর মত পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। সংস্কারকরা 'ইসলাম'কে অভ্যন্তরীণ একটা অবস্থা হিসাবে তুলে ধরার ধারণা দিয়েছিলেন যা খাঁটি মতবাদের শত্রুদের ওপর আরোপ করা যেতে পারে (লেখক যেভাবেই তার সংজ্ঞা দিন না কেন)। এটা করতে গিয়ে তাঁরা আসলে ইসলামকে 'শত্রু' (অপৃথকীকৃত) হিসাবে আত্মস্থ করার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন, যা ইয়োরোপীয় কল্পনায় আগে থেকেই ছিল।'[২১] ড্যানিয়েল ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের উদাহরণ দিয়ে ইসলামের সঙ্গে তাঁদের ক্রিশ্চান প্রতিপক্ষের তুলনা টেনেছেন, কিন্তু তুলনার পরিণাম ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। সপ্তদশ শতকের ক্যাথলিক মিশনারি এম. লেফেবভ্রে মুসলিমদের 'মুহাম্মাডান প্রটেস্ট্যান্ট' হিসাবে দেখেছেন, যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে : 'মাহোমেটের ওপর বিশ্বাসের ফলে সকল পাপ থেকে মুক্তির আশা করে ওরা।' কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রটেস্ট্যান্ট পর্যটক-লেখক এল. রঅউলফ্ মুসলিমদের 'মুহাম্মাডান ক্যাথলিক' হিসাবে দেখেছেন : 'সৎ কাজ, দান, প্রার্থনা, উপবাস আর দাসমুক্তির মত স্বআবিষ্কৃত বিষয়াদির প্রতি নজর দেয় ওরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে।'[২২] মধ্যযুগে ক্রিশ্চানরা ইসলামকে খৃস্ট ধর্মমতের অপভ্রংশ হিসাবে চিন্তা করত, যার ফলে মুহাম্মদের (স:) একজন ধর্মত্যাগী দ্বারা আদেশপ্রাপ্ত হওয়ার কিংবদন্তী তৈরি হতে পেরেছে। পরবর্তীকালে খৃস্ট জগতে নতুন অভ্যন্তরীণ ভাঙনের আলোকে পাশ্চাত্যবাসীরা মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর ধর্মকে পুরোপুরি খৃস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে শুরু করেছিল : তারা যেন বাস্তবিক ঐতিহাসিক সত্য ভুলে গিয়েছিল, তারা এটাও ভাবেনি যে মুসলিমরা নিজস্ব স্বাধীন প্রেরণার অধিকারী হতে পারে, যে কারণে ক্রিশ্চানদের আচার-আচরণের আলোকে তা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়।

কিন্তু রেনেসাঁর সময়ে পশ্চিমের অপরাপর লোকজন ইসলামি বিশ্ব সম্পর্কে আরও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা লাভের প্রয়াস পেয়েছিল। তারা পিটার দ্য ভেনের‍্যাবলের ঐতিহ্য আর প্রেরণা ধারণ করেছে যা জন অব সেগোভিয়া এবং নিকোলাস অব কুসা'র মত পণ্ডিতদের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বজায় থাকে। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য বাইযানটিয়াম দখল করে ইসলামকে একেবারে ইয়োরোপের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবার পর জন অব সেগোভিয়া উল্লেখ করেছেন যে ইসলামি ভীতির বিরুদ্ধে কুলিয়ে ওঠার জন্যে নতুন পথের খোঁজ করতে হবে। যুদ্ধ বা প্রচলিত মিশনারি কার্যক্রমের সাহায্যে একে কখনও পরাস্ত করা যাবে না। তিনি নতুন করে কোরান অনুবাদের কাজে হাত দেন, সালামানকা থেকে আগত একজন মুসলিম জুরিস্টের সঙ্গে যৌথ প্রয়াসে। তিনি একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানেরও প্রস্তাব রাখেন, যেখানে মুসলিম ও ক্রিশ্চানদের মাঝে মত বিনিময় হতে পারবে। ১৪৫৮ সালে জন মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর প্রকল্প দুটো আলোর মুখ দেখার আগেই, তবে তাঁর বন্ধু নিকোলাস অব কুসা এই নতুন কৌশলের ব্যাপারে আশাবাদী

ছিলেন। ১৪৬০ সালে তিনি '*ক্রিবেশিয়ো আলকোরান*'(দ্য সিভ অব দ্য কোরান) রচনা করেন, এটি প্রচলিত যুক্তিখণ্ডনের ভঙ্গিতে রচিত হয়নি, বরং সংঘবদ্ধভাবে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস চালানো হয়েছে–জন অব সেগোভিয়া যাকে জরুরি বলে বিবেচনা করেছিলেন। রেনেসাঁর সময়, আরবী গবেষণাসমূহ প্রকাশ পায় এবং এই ব্যাপক ও বহুজাতিক প্রয়াস আরও অনেক পণ্ডিতকে ইসলাম সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে রুক্ষ ক্রুসেডীয় ধ্যানধারণা ত্যাগে উৎসাহিত করে। কিন্তু মধ্যযুগে, প্রকৃত ঘটনার কদর বাড়লেও তা ঘৃণার পুরনো ভাবমূর্তি দূর করার জন্যে যথেষ্ট ছিল না, পশ্চিমের মনোজগতে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছিল ওটা।

১৬৯৭ সালে অন্ধকার কেটে যাবার শুরুর দিকে যখন দুটো শক্তিশালী গ্রন্থ প্রকাশ পায় তখন এটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমটি বার্থলমি ড'হারবেলট রচিত '*বিবলিওথেক ওরিয়ান্টালে*' যা উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত ইংল্যান্ড এবং ইয়োরোপে ইসলাম এবং ওরিয়েন্টাল গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে–একে ইসলামের প্রথম *বিশ্বকোষ* হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ড'হারবেলট আরবী, তুর্কী এবং পারস্যের সূত্র ব্যবহার করে অন্ধ ক্রিশ্চান ধারণা মোচনের প্রয়াস পেয়েছিলেন : যেমন, উদাহরণ দেয়া যায়, তিনি প্রাচ্যে প্রচলিত সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিকল্প কিংবদন্তী তুলে ধরেছেন। এ ধরনের কৌশল ইতিবাচক এবং উন্নত চেতনার পরিচায়ক। কিন্তু 'মাহোমেট' শিরোনামে আমরা নিচের কষ্টদায়ক পরিচিত উল্লেখ দেখতে পাই :

> 'এই হচ্ছে কুখ্যাত প্রতারক মাহোমেট, এক বিদ্রোহী-বিশ্বাসের রচয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা, যা একটা ধর্মের রূপ নিয়েছে। আমরা যাকে বলি মুহাম্মাডান। ইসলাম শিরোনামে দেখুন।
>
> আলকোরানের তরজমাকারী এবং মুসলিম বা মুহাম্মাডান আইনের অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই ছদ্ম পয়গম্বরকে সেইসব প্রশংসাসূচক অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন যেগুলো কিনা আর্য, পলিসিয় বা পলিয়সয়নিস্ট এবং অন্য ধর্মদ্রোহীরা জেসাস ক্রাইস্টকে তাঁর পবিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সময় আখ্যায়িত করেছিল...[২৩]

ড'হারবলেট ধর্মের আসল নামটা যদিও জানতেন, তবু তিনি 'মুহাম্মাডান' বলেই উল্লেখ করে গেছেন, কারণ 'আমরা' এ নামই ব্যবহার করি, একইভাবে ক্রিশ্চান বিশ্ব পয়গম্বরকে এখনও নিজেদের বিকৃত উপায়ে 'আমাদের' হীনতর রূপে দেখে।

একই বছর ইংরেজ প্রাচ্য বিশারদ হামফ্রি প্রিডক্স প্রকাশ করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ '*মাহোমেট : দ্য ট্রু নেচার অব ইমপোস্টার*'। নাম দেখেই বোঝা যায় তিনি

পুরনো মধ্যযুগীয় সংস্কার হজম করেছেন– আসলেও, প্রধান উৎস হিসাবে তিনি রিকোল্ডো ডা মন্টে ক্রসে'র নাম উল্লেখ করেছেন– যদিও তাঁর দাবী ছিল অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে যতটা সম্ভব ধর্ম সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি যৌক্তিক ও আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করার। যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে, প্রিডক্স যুক্তি তুলে ধরে ছিলেন যে, ইসলাম খৃস্টধর্মের অনুকরণ মাত্র তবে এটা খৃস্টধর্মসহ সব ধর্মের নির্বুদ্ধিতার একটা উদাহরণ, যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকলে যার ফলে ধ্বংস নেমে আসতে পারে। যুক্তির কাল মানুষকে ক্রুসেডের সময়কার পঙ্গু করে তোলা ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু প্রিডক্স অতীতের সকল যুক্তিহীন বিকারের পুনরাবৃত্তি করেছেন। মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> জীবনের প্রথমাংশে তিনি খুবই উচ্ছৃঙ্খল ও লাম্পট্যময় দিন কাটিয়েছেন ; ধ্বংস, লুটতরাজ আর রক্তপাতে অনন্দ লাভ করতেন—আরবদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী—যারা মোটামুটি এধরনের জীবনাচারেই অভ্যস্ত ছিল, কারণ গোত্রগুলোর মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত, তারা পরস্পরের সম্পত্তি লুটপাটে ব্যস্ত থাকত...
>
> তাঁর প্রধান দুটো দুর্বলতা ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লালসা। সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্যে তাঁর বেছে নেয়া উপায়টি প্রথমটির দিকেই আঙুলিনির্দেশ করে; আর যে হারে তিনি নারীদের সঙ্গ ভোগ করেছেন তা দ্বিতীয়টির পরিচয়বাহী। আর প্রকৃতই তাঁর ধর্মের গোটা কাঠামো জুড়ে রয়েছে এ দুটো বিষয়, তাঁর আল-কোরানে এমন একটা অধ্যায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে যুদ্ধ বা রক্তপাতের আইনের উল্লেখ করা হয়নি, কিংবা নারীদের ভোগ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি অথবা পরকালে তাদের উপভোগের প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি, লালসা পরিপূরণের জন্যে।[২৪]

তবে অষ্টাদশ শতকে মানুষ ইসলামকে আরও ভালভাবে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছিল। ফলে ১৭০৮ সালে সাইমন ওকলি তাঁর রচিত '*হিস্ট্রি অব দি সারাসেনস*'-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশ করেন যা তাঁর অনেক পাঠককে হতাশ করেছিল, কারণ তিনি ইসলামকে তরবারির ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন না করে সপ্তম শতকের *জিহাদকে* মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। ১৭৩৪ সালে জর্জ সালে কোরানের এক অনবদ্য ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন যা এখনও নির্ভুল বলে বিবেচিত, যদিও তা খানিকটা একঘেয়ে। ১৭৫১ সালে ফ্রাঁসোয়া ভলতেয়ার প্রকাশ করেন '*লেস মোয়ারস এট লেসপ্রিট দেস নেশনস্*' যেখানে তিনি মুহাম্মদকে (স:) একজন মহান রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং একটি যুক্তিনির্ভর ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তুলে ধরেছেন; তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম জনগোষ্ঠী সবসময় ক্রিশ্চান ট্রাডিশনের চেয়ে অনেক বেশি সহিষ্ণু। ওলন্দাজ প্রাচ্যবিদ জোহান জ্যাকব রেইস্কে

(মৃ: ১৭৭৪) আরবী ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন পণ্ডিত ছিলেন যিনি মুহাম্মদের (স:) জীবনে ঐশ্বরিক উপাদান দেখতে পেয়েছিলেন– ইসলামের উৎপত্তিতেও (কিন্তু এজন্যে তাঁর কয়েকজন সহকর্মী কর্তৃক হয়রানির শিকার হয়েছিলেন)। অষ্টাদশ শতকে একটা ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল যেখানে মুহাম্মদ (স:)কে জ্ঞানী, যৌক্তিক আইনপ্রণেতা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। হেনরি, কমটে দ্য বোউলানভিলিয়ে, তাঁর *ভি ডে মাহোমেদ* (প্যারিস, ১৭৩০, লন্ডন, ১৭৩১) প্রকাশ করেন যেখানে পয়গম্বরকে যুক্তিবাদী কালের (Age of Reason) বার্তাবাহক হিসাবে চিত্রিত করা হয়। বোউলানভিলিয়ে মধ্যযুগীয়দের সঙ্গে একটা বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে মুহাম্মদ (স:) বিশ্বের শাসক হওয়ার উদ্দেশ্যে ধর্ম তৈরি করেছেন, তবে গোটা বিষয়টি তিনি আমূল পাল্টে দিয়েছেন। খৃস্টধর্মের বিপরীতে ইসলাম একটি স্বাভাবিক-প্রত্যাদিষ্ট নয়-ট্র্যাডিশন এবং এখানেই এর আলাদা বৈশিষ্ট্য। মুহাম্মদ (স:) ছিলেন জুলিয়াস সিজার এবং আরেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মত মহান সমরবিদ। এটা ছিল আরেকটা কল্পনা, কারণ মুহাম্মদ (স:) নিঃসন্দেহে দেবতা-স্থানীয় ছিলেন না, তবে এটা অন্তত পয়গম্বরকে দেখার ইতিবাচক প্রয়াস ছিল। ওই শতকের শেষদিকে, এডওয়ার্ড গিবন তাঁর '*দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার*' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামের সুউচ্চ একেশ্বরবাদীতার প্রশংসা করেন এবং দেখান যে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মুসলিম প্রয়াসের স্থান পাওয়া উচিত।

কিন্তু পুরনো সংস্কার এত গভীরে প্রোথিত ছিল যে এই লেখকদের অনেকেই এক আধবার একতরফাভাবে পয়গম্বরকে নিন্দা করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি, তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রাচীন ধ্যান-ধারণা মুছে যায়নি। একারণেই সাইমন ওকলি মুহাম্মদকে (স:) 'খুবই সূক্ষ্ম এবং কৌশলী মানুষ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, 'যিনি ওপরে ওপরে ভাল গুণাবলীর অধিকারী হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করলেও তাঁর অন্তরের নীতি ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর লালসা'।[২৫] জর্জ সালে তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় একমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'এটা নিঃসন্দেহে একটা জোরাল প্রমাণ যে মোহাম্মাডানিজম মানুষের উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু নয়, প্রচার আর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ধর্মটি পুরোপুরি তরবারির কাছে ঋণী ছিল।'[২৬] *লেস - মোয়ারস* প্রবন্ধের শেষ অংশে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক পর্যবেক্ষণের সমাপ্তি টানতে গিয়ে ভলতেয়ার বলেছেন মুহাম্মদ (স:) 'ছিলেন যাঁরা তাঁকে প্রতারক বলে জানতেন এবং অন্য যাঁরা তাঁকে পয়গম্বর হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন তাদের উভয়ের চোখেই এক মহাপুরুষ।'[২৭] ১৭৪১ সালে '*মাহোমেট অব ফ্যানাটিসিজম*' নাটকে ভলতেয়ার যেসব ভণ্ড কৌশল আর মিথ্যাচারের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মের বেড়াজালে আটক করেছে তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে মুহাম্মদের (স:) নাম উল্লেখ করেছেন : কিছু পুরনো কাহিনী অপর্যাপ্তভাবে ভাঁড়ামিপূর্ণ দেখে তিনি আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে কিছু কৌতুকময় ঘটনার সৃষ্টি করেছিলেন। এমনকি গিবনও মুহাম্মদকে (স:)

ছাড় দিতে রাজি হননি, তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ) লুটের মাল আর যৌনতার টোপ দিয়ে আরবদের প্রলুব্ধ করেছেন। কোরানের ঐশী মর্যাদা সংক্রান্ত মুসলিম বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে গিবন একে সভ্য মানুষের জন্যে অসম্ভব একটা অবস্থা বলে ঘোষণা করেছেন :

এই যুক্তিটি আরবীয় ধর্মপ্রাণ লোকের কাছে অত্যন্ত জোরালভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যার মন বিশ্বাস আর ফুর্তির প্রতি অনুরক্ত, যার শ্রবণেন্দ্রিয় সঙ্গীতের ঝংকারে বিমোহিত হয়, যার অজ্ঞতা মানুষের উদ্ভাবনের তুলনা করতে অক্ষম। এর সুর আর রচনা কৌশল ইয়োরোপিয় দুরাত্মার কাছে অনুবাদে পৌছবে না; সে অধৈর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন উপকথার বয়ান পড়ে যাবে, পড়বে ধর্মীয় আদেশ আর আবৃত্তি যা কদাচিৎ কারও অনুভূতি বা ভাবনাকে দোলা দেয়, কখনও তা ধূলিতে গড়াগড়ি যায় বা হারিয়ে যায় মেঘমালায়।[২৮]

এখানে পাশ্চাত্যের নতুন আত্মবিশ্বাস দেখা যাচ্ছে। ইয়োরোপিয়ানরা আর ইসলামের হুমকির ভয়ে জড়সড় হয়ে যাচ্ছে না, বরং ইসলামকে তারা দেখছে আমোদিত করুণার সঙ্গে, মনে করছে 'আমরা' যদি কোরান না বুঝি তাহলে তার মানে দাঁড়াবে ওতে আসলে কিছু নেই। ১৮৪১ সালে টমাস কার্লাইলও মুহাম্মদের (সঃ) ওপর দেয়া বক্তৃতা '*দ্য হিরো অ্যাজ প্রফেট*'-এ তীব্র অসন্তোষের সঙ্গে কোরানকে নাকচ করে দিয়েছেন। অবশ্য এটা ছিল মুহাম্মদের (সঃ) জন্যে এক আবেগ তাড়িত আবেদন আর মধ্যযুগীয় কল্পকাহিনীর প্রত্যাখ্যান। বলতে গেলে প্রায় প্রথমবারের মত ইয়োরোপে কেউ মুহাম্মদকে (সঃ) প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু কোরানকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরস গ্রন্থ হিসেবে নিন্দা করা হয়েছে : 'ক্লান্তিকর, অগোছাল, অসংগঠিত, এলোমেলো, সীমাহীন পুনরাবৃত্তিতে প্যাঁচানো, জটপাকানো, একেবারে অগোছাল, এলোমেলো, সমর্থন অযোগ্য বোকামির মত।'[২৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকের একটা ঘটনা থেকে ইয়োরোপিয়দের আস্থার গতিধারার একটা আভাস পাওয়া যায়। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন মিশরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন, সঙ্গে ছিল ইনস্টিটুট ড'ঈজিপ্টের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাচ্যবিদ। এই নতুন স্কলারশিপ আর উপলব্ধিকে তিনি ইসলামি বিশ্বকে আয়ত্তে আনা এবং ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার জন্যে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। মাটিতে পা রাখার পরপরই নেপোলিয়ন তার পণ্ডিতদের এক তথ্য সংগ্রহ মিশনে পাঠান, কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ওদের পরামর্শ মোতাবেক চলার জন্যে। প্রাথমিক প্রস্তুতি ভাল ছিল, বলতেই হবে। আলেকজান্দ্রিয়ায় মিশরীয় এক জনসমাগমে তাচ্ছিল্য মেশানো ভাষায় নেপোলিয়ন দাবী করেছিলেন : '*নাউস সোমস্ লেস্ ভ্রেইস মুসলমানস*।' তারপর কায়রোর বিখ্যাত মসজিদ আল-

আয্‌হারের ষাটজন শেখকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় নিজের অন্দর মহলে নিয়ে যান তিনি। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পয়গম্বরের প্রশংসা করেন এবং ভলতেয়ারের 'মাহোমট' প্রসঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন, শিক্ষিত *উলেমাদের* কাছে আপন মতামত তুলে ধরেন। মুসলিম হিসাবে নেপোলিয়নকে কেউই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি, কিন্তু ইসলামের প্রতি তাঁর সহানুভূতি মেশানো উপলব্ধি বৈরিতার প্রাবল্য খানিকটা হলেও কমিয়েছিল। নেপোলিয়নের অভিযান তেমন কিছু অর্জনে সমর্থ হয়নি : ব্রিটিশ এবং তুর্কীদের কাছে পরাজয় বরণ করেন তিনি এবং ইয়োরোপে ফিরে আসেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য ছিল ঔপনিবেশিক চেতনা, যার ফলে ইয়োরোপিয়দের মধ্যে এমন একটা অসংগত ধারণা গড়ে উঠছিল যে তারা অপরাপর জাতি সমূহের চেয়ে উন্নততর : একটা *'মিশন সিভিলাইজেট্রিসে'র* মাধ্যমে এশিয়া ও 'আফ্রিকার বর্বর জগতকে মুক্তিদানের দায়িত্ব তাদের ওপরই যেন বর্তেছে। এটা অনিবার্যভাবে ইসলামের প্রতি পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল, ব্রিটেন তখন চোরাচোখে তাকিয়েছিল পতনোন্মুখ অটোমান সাম্রাজ্যের দিকে। ফ্রেঞ্চ ক্রিশ্চান অ্যাপোলজিস্ট ফ্রাঁসোয়া রেনে দ্য শ্যাতোব্রায়াভ-এ, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমরা দেখতে পাই নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে আবার ক্রুসেডের আদর্শের পুনর্জাগরণ। নেপোলিয়নের অভিযান তিনি পছন্দ করেছিলেন, তাঁকে ক্রুসেডার-প্রিলগ্রিম হিসাবে দেখেছেন। ক্রুসেডাররা প্রাচ্যে খৃস্টধর্ম পৌঁছানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি। সকল ধর্মের মাঝে একমাত্র খৃস্টধর্মই 'স্বাধীনতার প্রতি সবচেয়ে বেশি সহায়ক', কিন্তু ক্রুসেডিং প্রয়াসে ইসলামের সঙ্গে এর বিরোধ লেগেছিল : 'সভ্যতার শত্রু এক গোত্র, অজ্ঞতার পৃষ্ঠপোষক, স্বেচ্ছাচার আর দাসত্বের প্রতিভূ।'[৩০] ফ্রেঞ্চ রেভ্যুলেশনের পরবর্তী উন্মাতাল দিনগুলিতে 'ইসলাম' আবার 'আমাদের' প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। পৌরহিত্য মানসিকতার মধ্যযুগে, কোনও কোনও সমালোচক দাস আর নারীদের মত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বেশি ক্ষমতা দেয়ার জন্যে 'ইসলামে'র দোষ ধরেছিলেন। এই স্টেরিওটাইপটি এখন একেবারে উল্টে গেছে, মানুষ ইসলামকে আরও ভাল করে জানতে পেরেছে বলে নয়, বরং তা আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায় এবং আমরা আমাদের সাফল্য পরিমাপ করার জন্যে একটা ব্যর্থতার উপাদান পাই সেজন্যে।

শ্যাতোব্রায়াভ তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ '*জার্নি ফ্রম প্যারিস টু জেরুজালেম অ্যান্ড ফ্রম জেরুজালেম টু প্যারিস*' (১৮১০-১১)-এ ক্রুসেডিয় কল্পকাহিনীগুলো প্যালেস্টাইনের ওপর আরোপ করেছেন। আরবরা, তিনি লিখেছেন, 'নেতৃত্ববিহীন একদল সৈন্যের মত, আইন প্রণেতাহীন নাগরিক, পিতৃহীন পরিবার।' ওরা 'বর্বরতার পর্যায়ে নিপতিত সভ্য মানুষের'[৩১] একটা উদাহরণ। এজন্যে তারা পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণের জন্যে আর্তনাদ করছে, কেননা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ওদের নেই। কোরানে 'সভ্যতার প্রয়োজনীয় নীতিমালা যেমন নেই, তেমনি নেই চরিত্র গঠনের মত কোনও

নির্দেশাবলী।' খৃস্টধর্মের বিপরীতে 'ইসলাম' 'স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণাও জাগায় না আবার স্বাধীনতাকে ভালবাসতেও বলেনা।'[৩২]

প্রভাবশালী ফরাসী ফিলোলজিস্ট আর্নেস্ট রেনান এইসব নব্য বর্ণবাদী উপনিবেশবাদী কিংবদন্তীর বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, হিব্রু আর আরবী আর্যভাষা থেকে অপভ্রংশ হয়ে তৈরি ভাষা, এগুলোর ত্রুটি শোধনযোগ্য নয়। এই সেমেটিক ভাষাগুলোকে বাধাপ্রাপ্ত উন্নয়ন আর 'আমাদের' ভাষাগত ব্যবস্থার প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্য রহিত ভাষার উদাহরণ হিসাবেই কেবল পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সেজন্যে আরব ও ইহুদী উভয়েই 'উনে কম্বিনেইশন ইনফেরিউরে ডি লা নেচার হিউম্যাইন।'

> সবকিছু মিলিয়ে যে কেউ বুঝতে পারবে যে সেমেটিক জাতি এর সারল্যের কারণেই জাতি হিসাবে অপূর্ণ। এই জাতি –যদি সাহস করে শব্দটা প্রয়োগ করি– ইন্দো-ইয়োরোপিয়ান পরিবারের এমন একটা অংশ যাকে কোনও চিত্রকর্মের সঙ্গে পেন্সিলের স্কেচের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এর বৈচিত্রের অভাব রয়েছে, রয়েছে সীমাবদ্ধতা, আর নিখুঁত হওয়ার পূর্বশর্ত প্রাচুর্যেরও ঘাটতি আছে। এটা সেইসব ব্যক্তির মত যারা চমৎকার কৈশোর কাটানোর পর নামমাত্র উর্বরতা লাভ করে ; সেমেটিক জাতিসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বাধিক ফল পেয়েছে এবং তারপর আর তাদের প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটেনি।[৩৩]

কিন্তু তাসত্ত্বেও, ইহুদী আর আরবরা একটা মাত্র ইমেজে একীভূত হয়ে গেছে যা 'আমাদের' উন্নত গুণাবলীর তোষামুদে বর্ণনার যোগান দেয়। নতুন এই বর্ণবাদ ইয়োরোপিয় ইহুদী জনগোষ্ঠীর জন্যে ভয়ঙ্কর পরিণাম ডেকে এনেছিল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে সেক্যুলার ক্রুসেডে ক্রিশ্চানদের ঘৃণার পুরনো প্যাটার্নের ওপর আশ্রয় নিয়েছিলেন হিটলার, খাঁটি আর্য ও ইয়োরোপিয় মাটিতে বহিরাগত জাতির উপস্থিতি মেনে নিতে পারেননি তিনি।

ইয়োরোপে কোনও মুসলিমের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চরা তাদের দেশে আক্রমণ চালাতে শুরু করেছিল। ১৮৩০ সালে আলজিয়ার্সে উপনিবেশ গড়ে ফ্রান্স, আর ১৮৩৯ সালে অ্যাডেনে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল ব্রিটিশরা, ওরা টিউনিসিয়া (১৮৮১), মিশর (১৮৮২) সুদান (১৮৯৮) এবং লিবিয়া ও মরোক্কো (১৯১২) নিজেদের মাঝে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। ১৯২০ সালে, যদিও তারা আরবদেশগুলোকে কথা দিয়েছিল যে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের পর ওদের স্বাধীনতা দেবে, কিন্তু ব্রিটিশ আর ফ্রান্স ম্যান্ডেট আর প্রটেকটরেটের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য কুক্ষিগত করে নেয়।

আজকের মুসলিমরা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ আর ক্রিশ্চান মিশনারি কার্যক্রমকে ক্রুসেডের সঙ্গে এক করে দেখে। এখানে তাদের কোনও ভুল নেই। ১৯১৭ সালে

জেনারেল অ্যালেনবি যখন জেরুজালেমে পৌঁছান, তিনি ক্রুসেডের সমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছিলেন; আর ফ্রেঞ্চরা ডামাসকাস পৌঁছার পর তাদের কমান্ডার গ্রেট মস্কে সালাদিনের কবরে গিয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন: '*নোউস রেভেননস্, সালাদীন!*' ক্রিশ্চান মিশনারি প্রচেষ্টা উপনিবিশবাদীদের স্বার্থ উদ্ধার করেছে, মুসলমানদের ঐতিহ্যকে অপমান ও তাদের দেশ দখলের প্রয়াসে; আর ক্রিশ্চানদের স্থানীয় গ্রুপগুলোকে যেমন লেবাননের ম্যারনাইট, প্রটেকটরেট পরিচালনার ক্ষেত্রে অসমানুপাতিক ভূমিকা দেয়া হয়েছিল। উপনিবেশবাদীরা হয়ত যুক্তি দেখাবে প্রগতি আর শিক্ষা আনার, কিন্তু সে প্রয়াসের পেছনে ছিল ঘৃণা আর শক্তি। যেমন আলজেরিয়ায় শান্তি স্থাপনের কথা বলা যায়, এতে বহু বছর সময় লেগেছে এবং যে কোনও প্রতিরোধ প্রয়াস পাল্টা হামলা চালিয়ে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহত করা হত। সমসাময়িক ফরাসি ঐতিহাসিক এম. বড্রিকোর্ট সেসব হামলা সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিয়েছেন :

> অভিযান থেকে ফিরে আসা আমাদের সৈন্যরা ছিল লজ্জিত... প্রায় ১৮,০০০ গাছ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, নারী, শিশু আর বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়েছে। রূপার দুল, নুপুর আর বাজুবন্ধ পরিহিত হতভাগ্য নারীরা বিশেষ করে লালসা জাগিয়ে তুলেছে। এসব অলঙ্কারের ফরাসি ব্রেসলেটের মত কোনও মুখ নেই। ছোটবেলায় মেয়েদের হাত পায়ে পরিয়ে দেয়া হয় বলে বড় হয়ে ওঠার পর আর খুলতে পারে না। ওগুলো খোলার জন্যে সৈন্যরা হাত পা কেটে দিয়েছে, জ্যান্ত অবস্থায় ফেলে এসেছে তারপর।[৩৪]

উপনিবেশবাদীরা ইসলামের প্রতি তাদের ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। মিশরে লর্ড ক্রমার উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ আব্দুহর (মৃত্যু : ১৯০৫) কিছু ইসলামি ধ্যান-ধারণা পুনর্বিবেচনার প্রয়াস বাতিল করে দিয়েছিলেন। ইসলাম, তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, সংস্কারের উপযোগি নয় এবং আরবদের নতুন করে সমাজ গড়ে তোলার যোগ্যতা নেই। দুই খণ্ডে রচিত '*মডার্ন ঈজিপ্ট*'গ্রন্থে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন 'প্রাচ্য' চিরকালীন ছেলেমানুষ এবং 'আমাদের' একেবারে বিপরীত মেরুর।

> স্যার আলফ্রেড লায়াল একবার আমাকে বলেছিলেন : 'প্রাচ্য মননে সঠিকতা পরিত্যাজ্য। প্রত্যেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে এই সূত্রটি মনে রাখতে হবে।' সঠিকতার অভাব, যা সহজেই অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, প্রাচ্য মননের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
>
> ইয়োরোপিয়ান প্রখর যুক্তিবাদী, তার বক্তব্যে কোনও রকম দ্ব্যর্থবোধকতা থাকে না, জন্মগতভাবেই সে যুক্তি মেনে চলে, তার যুক্তিশাস্ত্রের পড়াশোনা নাও

থাকতে পারে; প্রকৃতিগতভাবে সে সন্দেহবাদী, যেকোনও জিনিস বিশ্বাস করার আগে প্রমাণের খোঁজ করে, তার প্রশিক্ষিত বুদ্ধিমত্তা যন্ত্রের মত কাজ করে। অন্যদিকে, প্রাচ্য মনন, তার ছবি সদৃশ রাস্তার মত, যেখানে সামঞ্জস্যতার চরম অভাব রয়েছে। তার যুক্তি একেবারে অগোছাল। যদিও প্রাচীন আরবরা ভাষা বিজ্ঞানে কিছুটা উন্নতি অর্জন করেছিল, কিন্তু তাদের উত্তরপুরুষরা যুক্তির দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। সত্য মেনে নিতে পারবে এমন মামুলি প্রস্তাবনা থেকেও সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য উপসংহারে পৌঁছতে প্রায়ই তারা ব্যর্থ হয়।[৩৫]

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা আরব ও মুসলিমদের সম্পর্কে আরও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাবার প্রয়াস অব্যাহত রাখলেও ঔপনিবেশিক উন্নাসিকতা অনেককেই এ বিশ্বাসে প্ররোচিত করেছে যে, 'ইসলাম' তাদের মনোযোগ লাভের উপযুক্ত নয়।

পশ্চিমের এই আক্রমণাত্মক প্রবণতা নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বকে দূরে ঠেলে দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। আজকাল ইসলামে পাশ্চাত্য বিরোধী অনুভূতি অত্যন্ত প্রকট বলে মনে হয়, তবে এটা একেবারেই নতুন একটা ব্যাপার। পাশ্চাত্য মুহাম্মদকে (স:) প্রতিপক্ষ কল্পনা করে নানা গল্প বিশ্বাস করেছিল হয়তবা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ মুসলিম ২০০ বছর আগেও পশ্চিমের অস্তিত্বের বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল না। ইয়োরোপের ইতিহাসে ক্রুসেড অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং পশ্চিমের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এর গঠনমূলক প্রভাব রয়েছে, অন্যত্র এর সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়েছি আমি।[৩৬] কিন্তু, যদিও ওসব নিকট প্রাচ্যের মুসলিমদের জীবনে জোরাল প্রভাব রেখেছে, অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্বের ওপর ক্রুসেডগুলোর খুব একটা প্রভাব পড়েনি, ওখানে তা ছিল তুচ্ছ দূরবর্তী সীমান্ত বিরোধমাত্র। মধ্যযুগীয় এই পাশ্চাত্য আক্রমণ থেকে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রাণভূমি ইরাক এবং ইরান একেবারেই মুক্ত ছিল। ফলে শত্রু হিসাবে পশ্চিমের অস্তিত্ব তাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। মুসলিমরা ক্রিশ্চান বিশ্বের কথা চিন্তা করার সময় বাইযানটিয়ামের পশ্চিমে কিছু কল্পনা করতে পারত না; সেই সময় পশ্চিম ইয়োরোপ ছিল বর্বর, পৌত্তলিক পশ্চাদ্‌ভূমির মত, যা [illegible] অবশিষ্ট সভ্য বিশ্বের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল।

কিন্তু ইয়োরোপ এগিয়ে এসেছিল এবং মুসলিম বিশ্ব নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কি ঘটছে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। নিকট প্রাচ্যের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে নেপোলিয়নের মিশর অভিযান চক্ষু উন্মোচক ছিল, যারা ফরাসী সৈন্যদের সহজ আত্মবিশ্বাসী আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, ওরা ছিল বিপ্লব-উত্তর সেনাদল। মুসলিমরা সবসময়ই অন্যান্য সংস্কৃতির উপাদানের প্রতি সাড়া দিয়েছে এবং অনেকেই পশ্চিমের বিপ্লবী ও আধুনিক ধারণায় আকৃষ্ট হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামি বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী উদারপন্থী আর সাংবিধানিকীকরণের পক্ষে ছিলেন। এই উদারপন্থীরা পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ ঘৃণা করতেন ঠিক, কিন্তু তাঁরা ভেবেছিলেন ইয়োরোপের উদারপন্থীরা তাঁদের পক্ষে থাকবে এবং

লর্ড ক্রমারের মত লোকদের বিরোধিতা করবে। তাঁরা পশ্চিমা জীবনধারাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন যা ইসলামি ঐতিহ্যের অনেক বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করেছে বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য গত পঞ্চাশ বছর সময়কালে আমাদের এই সুনাম হারিয়ে গেছে। মুসলিম বিশ্বের দূরে সরে যাবার একটা কারণ হচ্ছে তাদের পয়গম্বর ও ধর্মের প্রতি বৈরিতা ও ঘৃণার ক্রমআবিষ্কার, যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এত গভীরে প্রোথিত যে উত্তর উপনিবেশিককালে এসেও তা মুসলিম দেশগুলোর প্রতি তাদের নীতিকে প্রভাবিত করে বলে তারা মনে করে।

লেটার টু ক্রিশ্চানডোম-এ সিরীয় লেখক রানা কাব্বানি যেমন উল্লেখ করেছেন :

> পশ্চিমা বিবেক কি বাছাই করতে জানে না? পাশ্চাত্য আফগান মুজাহিদিনের জন্যে সহানুভূতি বোধ করে,নিকারাগুয়ার কন্ট্রাদের মত একইভাবে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের পৃষ্ঠপোষকতা পায়, কিন্তু যেসব জঙ্গীমুসলিম তাদের হয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধে অংশ না নিলেও তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে তাদের জন্যে কোনওরকম সহানুভূতি বোধ করে না। আমার এই লেখার সময় অধিকৃত এলাকায় প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে প্যালেস্টাইনিরা– সর্বশেষ হিসাবে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৬০০ ও ৩০,০০০ এরও বেশি আহত হয়েছে আর বিনাবিচারে কারাগারে আটক রয়েছে ২,০০০ মানুষ... তারপরও পশ্চিমের চোখে ইসরাইল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রয়ে গেছে, পশ্চিমা সভ্যতার একটা আউটপোস্ট। এমন দ্বৈত নীতির সম্পর্কে কি ভাবা যেতে পারে?[৩৭]

ইসলামের নতুন উগ্র রূপ সৃষ্টির দায়দায়িত্ব কিছুটা হলেও পাশ্চাত্যকে বহন করতে হবে, যার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন কল্পনার কোনওভাবে গভীর সম্পর্কে রয়েছে। আজ ইসলামি বিশ্বের অনেকেই পশ্চিমকে ধর্মহীন, বিচারহীন আর অধ:পতিত বলে মনে করে। ম্যাক্সিম রডিনসন, রয় মটাহেডেহ, নিক্কি আর. কেড্ডি এবং গিলস্ কেপেলের মত পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা নতুন এই ইসলামি মুডের মানে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু যথারীতি মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সংকট সম্পর্কে অধিকতর স্পষ্ট বস্তুনিষ্ঠ এবং সহানুভূতিশীল ধারণা লাভের চেষ্টা এখনও সংখ্যালঘু কিছু মানুষের মাঝে সীমিত। আরও আক্রমণাত্মক কণ্ঠগুলো উপলব্ধির ইচ্ছার চেয়ে ঘৃণার পুরনো ঐতিহ্যকে এগিয়ে দিতেই বেশি আগ্রহী।

কেবল পশ্চিমের প্রতি ঘৃণা নতুন উগ্র ইসলামকে অনুপ্রাণিত করেনি অবশ্য। এটা আবার কোনও সমন্বিত আন্দোলনও নয়। উগ্র মুসলিমরা প্রধানত নিজের ঘর সামলানোর ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে জড়িত এবং আধুনিক সময়ে ঘটে যাওয়া সাংস্কৃতিক স্থানচ্যুতি রোধ করতে ব্যস্ত। ধর্ম থেকে এই চরম একটা রূপের আবির্ভাবের সরলীকরণ প্রকৃতই অসম্ভব। দেশে দেশে এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে, কেবল তাই না, এমনকি শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পার্থক্য লক্ষ্য করা

যায়। মানুষ নিজেকে উন্মূল মনে করে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তাদের জীবনের একেবারে অভ্যন্তরে হানা দিয়েছে। এমনকি তাদের বাড়ির আসবাবপত্রও ব্যাপক পরিবর্তনের শিকার হয়েছে এবং প্রভূত সাংস্কৃতিক ক্ষতির বিব্রতকর চিহ্নে পরিণত হয়েছে। ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে অনেকেই তাদের মূলে ফেরার প্রয়াস পাচ্ছে এবং হুমকির সম্মুখীন পরিচয় পুনরুদ্ধার করতে চাইছে। কিন্তু প্রত্যেক এলাকায় ইসলামের প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর স্থানীয় ঐতিহ্য, বিশেষভাবে ধর্মীয় নয়, এমন অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। মাইকেল জাইলসনান তাঁর রূপদী গ্রন্থ *'রিকগনাইজিং ইসলাম, রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসায়েটি ইন দ্য মিড্‌ল ইস্ট'*-এ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এক এলাকার সঙ্গে অপর এলাকার পার্থক্য এত ব্যাপক যে 'ইসলাম' বা 'মৌলবাদ' শব্দটি উত্তর-ঔপনিবেশিককালের মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়ার জন্যে মোটেই যথার্থ নয়। মিডিয়া যেভাবে প্রচার করতে চায় ব্যাপারটা আসলে তার চেয়ে ঢের বেশি জটিল। ওই অঞ্চলের মুসলিমদের অনেকেই হয়ত কর্ডোভার সেই শহীদদের মত আত্মপরিচয় হারানোর শঙ্কা বোধ করে থাকতে পারে, যারা ভেবেছিল তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক মূল্যবোধ বৈদেশিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

'ইসলাম' সম্পর্কে আমাদের জন্মগত ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমরা ক্রমাগত নতুন স্টেরিওটাইপ সৃষ্টি করি। ১৯৭০ দশকে আমরা ধনকুবের আরব শেখদের ছায়ার কথা ভেবে শঙ্কাবোধ করেছি, ১৯৮০ দশকে ধর্মান্ধ আয়াতুল্লাহর; সালমান রুশদী পর্বের পর থেকে 'ইসলাম' সৃজনশীলতা ও শিল্পীর স্বাধীনতা লঙ্ঘনকারী ধর্মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসবের কোনওটিই বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বাস্তব অবস্থা আরও অনেক বেশি জটিল। কিন্তু এতে করে ঢালাও এবং ভ্রান্ত মন্তব্য করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা যাচ্ছে না। রানা কাব্বানি ফে ওয়েল্ডন এবং কনোর ক্রুজ ও'ব্রায়েনের দুটো বিদ্বেষমূলক মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। রুশদী বিতর্কে তার অবদান সম্পর্কে *স্যাকরেড কাউ*'তে ওয়েল্ডেন লিখেছেন :

> কোরান কোনও ভাবনা উদ্রেক করে না। এটা কোনও সমাজের নিরাপদ বা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভর করার মত কোনও কাব্য নয়। এটা চিন্তা রোধকারীদের অস্ত্র আর শক্তি যোগায়– আর চিন্তা বিরোধীরা অনায়াসে আগে বাড়ে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে... আমি যাঁকে ঈশ্বর বলে সংজ্ঞায়িত করি তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্রে এটাকে খুবই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়।[৩৮]

আমি শুধু এটুকু বলতে পারি এই মন্তব্যের সঙ্গে আমার কোরান এবং ইসলামের ইতিহাস পাঠ করার অভিজ্ঞতা মেলে না। কিন্তু কনোর ক্রুজ ও'ব্রায়েন ইসলামের প্রতি যেকোনও রকম শ্রদ্ধা প্রকাশকে সাংস্কৃতিক পক্ষবদল আখ্যা দেয়ার সংস্কৃতিতে ফিরে গিয়ে আমাকে হিপোক্রিট আখ্যা দেবেন। মুসলিম সমাজ, লিখেছেন তিনি :

মারাত্মকভাবে বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী... বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী বলেই এমনটি মনে হয়...মুসলিম সমাজকে শ্রদ্ধা জানানোর দাবী জানায় পশ্চিমের এমন নাগরিক পশ্চিমের মূল্যবোধ মেনে চলে থাকলে তাকে বলতে হবে সে হয় হিপোক্রিট নয়তো নির্বোধ, কিংবা উভয়ই।

উপসংহারে তিনি বলেছেন : 'আরব সমাজ অসুস্থ, দীর্ঘকাল ধরেই অসুস্থ। গত শতাব্দীতে আরব চিন্তাবিদ জামাল আল আফগানি লিখেছিলেন : "প্রত্যেক মুসলিম অসুস্থ আর তার ওষুধ হচ্ছে কোরান।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অসুস্থতা বাড়ছে যতই ওষুধ নেয়া হোকনা কেন।'[৩৯]

অবশ্য সব সমালোচকই এরকম যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করেননি। আমাদের বর্তমান শতকের বহু পণ্ডিত ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা বিস্তার করার প্রয়াস পেয়েছেন : লুসি ম্যাসিগনন, এইচ. এ. আর. গিব, হেনরি করবিন, অ্যানমারি শিমেল, মার্শাল জি. এস. হজসন এবং উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা পিটার দ্য ভেনের‍্যারল এবং জন অব সেগোভিয়ার পথ অনুসরণ করেছেন এবং প্রজ্ঞা দিয়ে তাঁদের কালের কুসংস্কারকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছেন। শত শত বছর ধরে ধর্ম যে কোনও সমাজের সদস্যদের মাঝে গভীর সমঝোতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। মানুষ হয়ত সব সময় তাদের ধর্মীয় আদর্শ যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তারা ন্যায় বিচারের ধারণা, মহত্ব, শ্রদ্ধা আর অন্যের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে এমন একটা মানদণ্ড স্থাপন করেছে যার বিপরীতে আমরা নিজেদের বিচার করতে পারি। ইসলাম সম্পর্কে এক নিবিড় গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪০০ বছর ধরে কোরান মুসলিমদের আধ্যাত্মিক কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ক্যানাডিয় পণ্ডিত উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথের মত পণ্ডিতগণ এমনও বলেছেন যে, 'ইসলাম শক্তিশালী এবং জোরাল নিখাদ, সৃজনশীল ও সুস্থ হলেই কেবল মুসলিম সমাজ বিকশিত হতে পারে।'[৪০] পশ্চিমের সমস্যার একটা অংশ হচ্ছে শত শত বছর ধরে মুহাম্মদকে (সঃ) ধর্মীয় চেতনার বিপরীত ও সভ্য সমাজের প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা হয়েছে। এর বদলে আমাদের বোধ হয় তাঁকে নীতিবান ব্যক্তি হিসাবে দেখা উচিত যিনি আপন জনগণের জন্যে শান্তি আর সভ্যতা বয়ে এনেছেন।

২. মুহাম্মদ (সঃ), আল্-ল্লাহ'র দূত

৬১০ খৃস্টাব্দের দিকে রমযান মাসে হিজাজের মক্কানগরীতে একজন আরব ব্যবসায়ী এমন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রতি বছর মুহাম্মদ ইবন আব্দাল্লাহ স্ত্রী-পরিবার ছেড়ে মক্কা উপত্যকার হিরা পর্বতের গুহায় চলে যেতেন আধ্যাত্মিক ধ্যানের উদ্দেশ্যে। সেই সময় আরবীয় পেনিনসুলায় এটা খুব সাধারণ একটা রেওয়াজ ছিল : গোটা মাস প্রার্থনা করে কাটাতেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং এই পবিত্র সময়ে যে সব দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর কাছে আসত তাদের খাবার আর সাহায্য দিতেন তিনি। খাঁজকাটা পর্বত-শীর্ষ থেকে নিচের সমতলে বিছিয়ে থাকা মক্কা নগরী পরিষ্কার দেখা যেত। আর সব মক্কাবাসীর মত মুহাম্মদ(সঃ)ও তাঁর শহর নিয়ে গর্ব বোধ করতেন। আরবের আর্থিক লেনদেনের প্রাণকেন্দ্র এবং শক্তিশালী বসতি হয়ে উঠেছিল ওই নগরী। হিজাজের অন্য যেকোনও আরবের চেয়ে মক্কার ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি ধনবান হয়ে উঠেছিল, দু-প্রজন্ম আগেও যা ছিল কল্পনাতীত, তখন তারা আরবের খোলা প্রান্তরে যাযাবর জীবন যাপন করত। সর্বোপরি, মক্কাবাসীরা কা'বা নিয়ে দারুণ গর্ব বোধ করত, নগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত চৌকো আকৃতির উপাসনালয়টিকে অনেকেই আরবদের পরম প্রভু আল্-ল্লাহ'র প্রকৃত মন্দির বলে বিশ্বাস করত। আরবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয় ছিল ওটা, এবং প্রতিবছর পেনিসসুলার সকল অংশ থেকে তীর্থযাত্রীরা হজ্জের উদ্দেশ্যে আসত এখানে। কুরাইশ গোত্র, মুহাম্মদের (সঃ) গোত্র, মক্কা নগরীর বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল, তারা জানত যে আরব গোত্রসমূহের মাঝে তাদের আলাদা সম্মান প্রাপ্তির পেছনে ওই বিশাল গ্রানিট মন্দিরের হেফাযত ও এর পরিত্রতা রক্ষার অতুলনীয় দায়িত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আরবদের কেউ কেউ মনে করত যে আল্-ল্লাহ, যার নামের অর্থ 'ঈশ্বর' বোঝাত, সে-ই দেবতা ইহুদী এবং ক্রিশ্চানরাও যাঁর উপাসনা করে।[১] কিন্তু 'আহল আল-কিতাবে'র বিপরীতে, আরবরা ওই দুই মহান ধর্মকে এনামেই অভিহিত করত, আরবরা দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করত 'তিনি' কখনও ওদের কাছে কোনও প্রত্যাদেশ বা কোনও ঐশী গ্রন্থ প্রেরণ করেননি, যদিও 'তাঁর' মন্দির রয়েছে তাদের কাছেই, স্মরণাতীত কাল থেকে। ইহুদী ও ক্রিশ্চানদের সংস্পর্শে আসা আরবগণ তীব্র

হীনম্মন্যতায় ভুগত : তাদের মনে হত ঈশ্বর বুঝি আরবদের তাঁর স্বর্গীয় পরিকল্পনা থেকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু রমযান মাসের সতের তারিখে এর পরিবর্তন ঘটল, পাহাড়ের গুহায় তখন নিদ্রাভঙ্গ হল মুহাম্মদ (স:)-এর, এক প্রবল স্বর্গীয় সত্তা দ্বারা আক্রান্ত হলেন তিনি। পরে এই অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে একজন ফেরেশতা তাঁকে প্রবলভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন যার ফলে তাঁর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। ফেরেশতা তাঁকে সোজাসাপ্টা নির্দেশ দেন : '*ইকরা!*' 'আবৃত্তি কর!' মুহাম্মদ ক্ষীণ প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন : তিনি আবৃত্তি করতে জানেন না, তিনি '*কাহিন*' নন–*কাহিন* আরবের অন্যতম ভাববাদী পয়গম্বর। কিন্তু, তিনি বলেছেন, তাঁকে আবার আলিঙ্গন করেছিলেন ফেরেশতা, যখন তাঁর মনে হল সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন; তখনই এক নতুন ঐশী গ্রন্থের অলৌকিক অনুপ্রেরণাজাত শব্দাবলী তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। প্রথমবারের মত আরবে ঈশ্বরের বাণী উচ্চারিত হল এবং অবশেষে আরবদের সামনে তাদের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করলেন ঈশ্বর স্বয়ং। পবিত্র গ্রন্থের নাম কোরান : উচ্চারণ।

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাব হয়েছিল ব্যাপক। মুহাম্মদ (স:) যখন মক্কা নগরীতে এই বাণী প্রচার শুরু করেন তখন গোটা আরব জগত দীর্ঘস্থায়ী অনৈক্যে ভুগছে। পেনিনসুলার অগণিত বেদুঈন গোত্রগুলোর প্রত্যেকটা ছিল আলাদা আইন, অন্যান্য উপজাতি গ্রুপের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত তারা। আরবদের একতাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তখন অসম্ভব মনে হয়েছিল, এর অর্থ ছিল বিশ্বে একটা স্থান পাওয়ার মত সভ্যতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্মান পাওয়ার সামর্থ তাদের নেই। হিজাজ যেন বুনো বর্বতার অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল, সভ্যতার সীমানার বাইরে ছিল তার অস্তিত্ব। তেইশ বছর পরে, ৬৩২ খৃস্টাব্দের ৮ জুন মুহাম্মদ (স:) যখন পরলোকগমন করেন, ততদিনে তিনি প্রায় সকল গোত্রকে তাঁর নতুন মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা অনস্বীকার্য যে, ব্যাপারটা ছিল অনিশ্চিত একটা অবস্থা। বেদুঈনদের অনেকেই, মুহাম্মদ (স:) যা ভাল করেই জানতেন, পুরনো পৌত্তলিকতাকে গোপনে আঁকড়ে ছিল। কিন্তু, সব রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আরবদের এই একতা অটুট রয়ে যায়। মুহাম্মদের (স:) রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল খুবই উচ্চমার্গের : তিনি তাঁর জনগণের অবস্থা আমূল পাল্টে দিয়েছিলেন, তাদের অর্থহীন সহিংসতার ও বিনাশের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন এবং দিয়েছেন গৌরবময় এক নতুন পরিচয়। তারা এখন নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সন্ধানলাভের জন্যে প্রস্তুত, মুহাম্মদ (স:)-এর শিক্ষা এমন শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছিল যে একশো বছরের মধ্যে জিব্রালটার থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল আরব সাম্রাজ্যের পরিধি।

যদি এই রাজনৈতিক সাফল্যই মুহাম্মদ (স:)-এর একমাত্র অর্জন হত, তাহলেও হয়ত আমাদের শ্রদ্ধা কাড়তে সক্ষম হতেন তিনি। কিন্তু তাঁর সাফল্য ধর্মীয় দর্শনের

ওপর নির্ভরশীল ছিল যা তিনি আরবদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের জনমানুষ অত্যন্ত দ্রুত গ্রহণ করে নিয়েছিল, একটা আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার স্পষ্ট পূরণ ঘটেছিল। মুহাম্মদ (স:) এবং প্রথম দিকের মুসলিমরা খুব সহজে বিজয় অর্জন করেননি, যেমনটি মাঝে মাঝে মনে করা হয়ে থাকে। এক মরিয়া এবং কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে তাঁদের, এই ধর্মটি যদি পয়গম্বর এবং তাঁর নিকট সহযোগিদের কাছে আগে না আসত তাহলে হয়ত তাঁরা টিকতেই পারতেন না। বিপদসঙ্কুল ওই বছর গুলোয়, মুহাম্মদের (স:) বিশ্বাস ছিল তিনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করছেন, তবে তাঁর নিজস্ব মেধারও ব্যবহার করেছিলেন তিনি। মুসলিমরা তাদের পয়গম্বরের অসাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল, তিনি ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন তাও তারা বুঝতে পেরেছিল। ক্লাসিক্যাল ইসলামি যুগে চারজন প্রধান ইতিহাসবিদ তাঁর জীবন নিয়ে লিখেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃত্যু : ৭৬৭), মুহাম্মদ ইবন সা'দ (মৃত্যু : ৮৪৫), আবু জাফর আত-তাবারি (মৃত্যু : ৯২৩) এবং মুহাম্মদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদি (মৃত্যু : ৮২০), যাঁরা মুহাম্মদের (স:) সামরিক অভিযানসমূহের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। এসব রচনা মুহাম্মদ (স:) এর জীবনের যেকোনও দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র এবং আমি বারবার এগুলোর কথা উল্লেখ করব। এই ঐতিহাসিকগণ কেবল তাঁদের নিজস্ব ধ্যান ধারণার ওপর নির্ভর করেননি বরং ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁরা অতীতের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন, লোককথার আদি উৎস আবিষ্কার করেছেন, এবং যদিও মুহাম্মদ (স:)কে তাঁরা প্রেরিত পুরুষ হিসাবে মর্যাদা দিতেন, কিন্তু সামালোচনা বর্জিত উপাখ্যান রচনা করেননি। এভাবে তাবারি বর্তমানের কুখ্যাত *স্যাটানিক ভার্সেসের* বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা মুহাম্মদ (স:) ভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন বোঝাতে চেয়েছে। ইবন সা'দ এবং ইবন ইসহাক, উভয়েই একেবারে তোষামুদে নয় এমন ধরনের কাহিনী ও গল্পও অন্তর্ভুক্ত করেছেন : বিশেষ করে মুহাম্মদের (স:) স্ত্রী আয়েশা ছিলেন স্পষ্টভাষী নারী, এবং স্বামী সম্পর্কে তাঁর তীব্র মন্তব্যসমূহ সতর্কতার সঙ্গে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই জীবনীগ্রন্থগুলো থেকে, বিষয়বস্তুর গুণাবলীর ব্যাপারে যথেষ্ট প্রত্যয়ী এগুলো, কোনওরকম লুকোছাপার মধ্যে যায়নি, আমরা অসাধারণ এই ব্যক্তির মনোগ্রাহী ও বাস্তবভিত্তিক চিত্র পাই।

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাথমিক জীবনীকারগণ আধুনিক পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মত একই মানসিকতা নিয়ে কাজ করেননি। তাঁরা ছিলেন ভিন্ন সময়ের মানুষ এবং বারবার অলৌকিক প্রকৃতির কাহিনী যোগ করেছেন বর্তমানে যেগুলো ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতাম আমরা। কিন্তু উপকরণের জটিলতার কথা তাঁরা জানতেন, বুঝতেন সত্যের পলায়নপর চরিত্র। আমরা দেখতে পাব মুসলিম চেতনা গভীরভাবে সাম্যবাদী। ইসলামি চিত্রকলায়, অ্যাবারেস্ক-এর পুনরাবৃত্ত মটিফ দিয়ে পারসপেক্টিভ বা পটভূমির মাধ্যমে বিশেষ কোনও উপাদানকে বাড়তি প্রাধান্য দেয় না।

সামগ্রিকভাবে একটা প্যাটার্ন বিভিন্ন সমঅংশের ভেতরকার জটিল সম্পর্কের ভেতর দিয়ে মূলমর্ম প্রকাশ করা হয়। চারজন ঐতিহাসিকের মাঝেও আমরা একই চেতনা লক্ষ্য করি। তাঁরা কোনও একটি তত্ত্ব বা ঘটনার একমাত্র ব্যাখ্যা ব্যবহার করে অন্যগুলোকে উপেক্ষা করেননি। কখনও কখনও একই ঘটনার দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিবরণ পাশাপাশি উপস্থাপন করেছেন এবং সেগুলোর অমিল দূর করার জন্যে কোনও রকম ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়াস পাননি। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা দেখব, তাবারি *স্যাটানিক ভার্সেসের* ঘটনার একেবারে আলাদা দুটো বর্ণনা দিয়েছেন এবং ইবন ইসহাক উমর ইবন আল-খাত্তাবের ধর্মান্তরের দুটো পৃথক বিবরণ পাশাপাশি বর্ণনা করে দৃশ্যমান বৈপরীত্য সম্পর্কে কোনও মন্তব্য পর্যন্ত করেননি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তাঁর তথ্যের উৎস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও ওই সূত্র (*সিলসিলা*) আধুনিক প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেক ঘটনার বর্ণনা প্রদানে তাঁরা সমান গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। গৃহীত সকল কাহিনীর সঙ্গে তাঁরা একমত প্রকাশি করেননি। এ থেকেই বোঝা যায়, পয়গম্বরের প্রতি স্পষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করলেও, এই প্রাথমিক ঐতিহাসিকগণ যথাসাধ্য সততা ও সত্যনিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁর কথা বলার চেষ্টা করেছেন।

ওঁদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা আছে। চল্লিশ বছর বয়সে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি শুরু হওয়ার পূর্বজীবন সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানা যায় না। মুহাম্মদের (স:) জন্ম, ছেলেবেলা, যৌবনকাল সম্পর্কে অনিবার্যভাবে ভক্তিপূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু অগ্রসর হওয়া যায় এমন জোরাল কিছু নেই। আবার মক্কার মুহাম্মদের (স:) পয়গম্বর জীবনের সূচনালগ্নের ক্ষেত্রেও তেমন তথ্য নেই। সেই সময়, যখন তিনি প্রায় অখ্যাত ছিলেন, কেউ তাঁর কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু জীবনের শেষ দশ বছরে, মদিনায় *হিজরার* পর মুসলিমরা তাদের চোখের সামনে ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে বুঝতে পারে এবং অনেক বিস্তারিতভাবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

ঐতিহাসিকগণ পয়গম্বরের নিকট- সহযোগিদের জানা তথ্য বা ট্র্যাডিশনের ওপর নির্ভর করেছেন, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যা বলে যাওয়া হয়েছিল। নবম শতকে মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারি ও মুসলিম ইবন আল-হিজাজ আল-কুশায়রির মত পণ্ডিতগণ প্রত্যেকটা ট্র্যাডিশন বা *হাদিসের* উৎস সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। কোনও ট্র্যাডিশন বা *হাদিসের* সূত্র পরম্পরা (চেইন অব অথরিটিজ) নির্ভরযোগ্য না হলে, সেটা তথ্যগত বিচ্যুতি বা বক্তার সততা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশের কারণে হতে পারে, তাঁদের *হাদিস* সংগ্রহ থেকে সেটাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বাদ দেয়া হয়েছে, তা সেটা পয়গম্বরের বা প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের যত বড় বা প্রশংসাসূচক হোক না কেন। আমরা দেখতে পাব, *আল-হাদিস শরী'আর* (ইসলামের পবিত্র আইন) একটা প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে, আর *হাদিসের* সম্পাদনা থেকে বোঝা যায় মুসলিমরা তাদের প্রাথমিক

ইতিহাসকে সমালোচকের চোখে দেখতে পারে। প্রাথমিক কালের ঐতিহাসিকদের কাজেও এই বস্তুনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁরা কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমরা সংগৃহীত সব *হাদিসকে* সমান বৈধ বা কর্তৃত্বপূর্ণ বলে মনে করেনি।

কোরানই আমাদের তথ্যের মূল উৎস। কোরান অবশ্যই মুহাম্মদ (স:)-এর জীবনের বর্ণনা নয়: বার্তাবাহক নয় বরং স্রষ্টারই প্রকাশ ঘটেছে এতে। তবে এটা পরোক্ষভাবে ইসলামি সমাজ সম্পর্কে আমাদের অমূল্য তথ্য জোগায়। পাশ্চাত্যের লোকজনের কাছে কোরান একটা কঠিন বই বলে বিবেচিত। পরবর্তী অধ্যায়গুলোয় এনিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, তবে গোড়াতে এই ঐশী গ্রন্থের প্রকৃতি এবং একে আমাদের কিভাবে গ্রহণ করা উচিত তা ব্যাখ্যা করা বোধ হয় জরুরি। মুহাম্মদের (স:) দাবী ছিল তেইশ বছর ধরে তিনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে বাণী বা *ওহী* পেয়েছেন যা বর্তমানে কোরান নামে আখ্যায়িত বইটিতে লিপিবদ্ধ। গোটা কোরান একবারে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়নি–তোরাহ বা আইনের মত–যা বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী সিনাই পর্বতের চূড়ায় একবারেই মোজেসের এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মুহাম্মদের (স:) কাছে কোরান এসেছে লাইনের পর লাইন, পঙক্তির পর পঙক্তি, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, এভাবে। কখনও কখনও মক্কা বা মদিনার বিশেষ কোনও অবস্থা নিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কোরানে যেন ঈশ্বর মুহাম্মদের (স:) কিছু কিছু সমালোচকের জবাব দিয়েছেন; মুসলিম সমাজের মধ্যেই সংঘটিত কোনও যুদ্ধ বা বিরোধের গভীর তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মুহাম্মদের (স:) কাছে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ামাত্র [মুহাম্মদ (স:) হিজাজের বহু আরবের মত নিরক্ষর ছিলেন বলে কথিত] তিনি তা উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতেন, মুসলিমরা তা মুখস্থ করে ফেলত আর যারা লিখতে জানত লিপিবদ্ধ করে ফেলত তারা। আরবদের কাছে কোরান খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল : তাদের পরিচিত সাহিত্যের মত নয় একেবারেই। কেউ কেউ, আমরা লক্ষ্য করব, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরিত হয়েছে, একমাত্র ঐশী প্রেরণার কারণেই এ রকম অসাধারণ ভাষা সৃষ্টি সম্ভব বলে বিশ্বাস জন্মেছিল তাদের। যারা ধর্মান্তরিত হতে রাজি হয়নি তারাও বিহ্বল হয়ে গেছে, এই প্রত্যাদেশের কি ব্যাখ্যা হতে পারে বুঝতে পারেনি। আজও মুসলিমরা কোরান দ্বারা উদ্বেলিত হয়। তারা বলে কোরান শোনার সময় এর বাণীর স্বর্গীয় মাত্রা দ্বারা তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পড়ে, ঠিক হিরা পর্বতে মুহাম্মদের (স:) ফেরেশতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়ার মত কিংবা পরে যখন তিনি আকাশের যেদিকে তাকিয়েছেন সেদিকই ঐ অতিপ্রাকৃত সত্তার উপস্থিতিতে ভরে উঠতে দেখেছিলেন, সেই সময়ের মত।

পশ্চিমের মানুষ এ ব্যাপারটা একেবারে বুঝে উঠতে পারে না। আমরা দেখেছি ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল গিবন ও কার্লাইলের মত ব্যক্তিগণও কোরান নিয়ে বিহ্বল বোধ করেছেন। অবশ্য এটা তেমন বিস্ময়কর নয়। অন্য সংস্কৃতির পবিত্র গ্রন্থ অনুধাবন করা সবসময়ই কঠিন। প্রথমবারের মত পশ্চিম সফরে আসা এক দল জাপানী সম্পর্কে একটা গল্প চালু আছে। মোটামুটি ভাল ইংরেজি জানত তারা, এবং

সব সময় যেদেশে ভ্রমণে যেত সেখানকার ধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করত। তো আন্তরিকভাবেই বাইবেল পড়তে শুরু করে তারা। বাইবেল পাঠ করে দারুণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে তারা এবং যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেই সমস্যাগুলো নিয়ে এক নামকরা পণ্ডিতের শরণাপন্ন হয়। বইটি মনযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেও, ব্যাখ্যা করল তারা, নিজেদের জীবনের জন্যে কোনও ধর্ম খুঁজে পায়নি। পণ্ডিত ব্যক্তি বেশ আমোদিত হয়ে সায় দিয়ে জানালেন যে এসব ঐশীগ্রন্থ বিশেষ মানসিক অবস্থায় পাঠ না করলে প্রাচীন ইহুদী জনগণের ইতিহাসের এই গ্রন্থে অধ্যাত্মিক বা অলৌকিক কিছু খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

কোরানের ক্ষেত্রে অনুবাদের সমস্যাও রয়েছে। শেক্সপীয়রের সুন্দরতম বাক্যগুলোও প্রায়ই ভিন্ন ভাষায় একেবারে গতানুগতিক শোনায়, কারণ কবিতার খুব সামান্যই ভিন্ন বাক্যরীতিতে প্রকাশ করা যায়; আর আরবী এমন এক ভাষা যা অনুবাদ করা বেশ কঠিন। আরবরা বলে যে মূল আরবী ভাষায় পঠিত কবিতা বা গল্পের অন্য ভাষায় অনুবাদ তাদের কাছে অচেনা ঠেকে। আরবীতে এমন কিছু আছে যা ভিন্ন বাক্যরীতিতে প্রকাশ করা যায় না : এমনকি ইংরেজি অনুবাদে আরব রাজনীতিকদের ভাষণও আরোপিত, কৃত্রিম আর অপরিচিত শোনায়। যদি সাধারণ আরবীর জাগতিক উচ্চারণ বা প্রচলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে অত্যন্ত জটিল, নিবিড় এবং পরোক্ষ ভাষায় লিখিত কোরানের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি সত্যি হতে বাধ্য। এমনকি যেসব আরব চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে তারাও ইংরেজি অনুবাদে কোরান পড়ার সময় একেবারে ভিন্ন কোনও গ্রন্থ পাঠ করার অনুভূতির কথা বলেছে। আমি বহুবার কোরান থেকে উদ্ধৃতি দেব, কিন্তু পাঠক যেন প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের মত এ বাণী দ্বারা বিমুগ্ধ হবার প্রত্যাশা না করেন।

তবে তার অর্থ এই নয় যে আমরা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কোরানকে নাকচ করে দেব। আর পাঁচটা গ্রন্থের মত পাঠ করার নয় এটি। সঠিকভাবে যদি পাঠ করা হয়, বিশ্বাসীদের দাবী, এটা স্বর্গীয় সত্তার উপস্থিতির অনুভূতি সৃষ্টি করে। ক্রিশ্চান ঐতিহ্যে বেড়ে ওঠা কারও পক্ষে এটা বোঝা কঠিন, কারণ ক্রিশ্চানদের কোনও পবিত্র ভাষা নেই, যেমন হিন্দুদের আছে সংস্কৃত, ইহুদীদের হিব্রু আর মুসলিমদের আরবী। ধর্মগ্রন্থের বিষয় নয়, জেসাস স্বয়ং ক্রিশ্চানদের প্রত্যাদেশের প্রতীক; নিউ টেস্টামেন্ট গ্রিকের মাঝে পবিত্রতার কিছু নেই। মুসলিমদের এই আধ্যাত্মিকতা ইহুদীরা অনেক সহজে বুঝতে পারবে, কারণ তারা তোরাহ্‌কে (প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ, ক্রিশ্চানরা যাকে 'দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট' বলে অভিহিত করে) একইভাবে সম্মান দেয়, তোরাহ্‌ পড়ার সময় ইহুদীরা তথ্য সংগ্রহের জন্যে কোনও পৃষ্ঠায় চোখ বোলায় না, তারা জোরে উচ্চারণ করে, ঈশ্বর নিজেকে মোজেসের কাছে প্রকাশ করার সময় যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তার আস্বাদ গ্রহণ করে যতক্ষণ না তা মনে গেঁথে যায়। তোরাহ পাঠকালে তারা একবার সামনে একবার পেছনে দোল খেতে থাকে যেন

ঈশ্বরের আত্মার নিঃশ্বাসে কাঁপছে। সুতরাং ইহুদীরা যখন তোরাহ পাঠ করে তখন অবশ্যই ক্রিশ্চানদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন এক গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা লাভ করে, আর ক্রিশ্চানরা প্রায়শঃ পেন্টাটিউককে দুর্বোধ্য আইনের চরম একঘেয়ে সংগ্রহ হিসাবে ধরে নেয়। মুসলিমরাও কোরানে ঈশ্বরের পবিত্র বাণীতে এক ধরণের *বারাকাহ্* (পরমসুখ) অনুভব করে। শেষ ভোজসভার মত– এটা আমাদের মাঝে ঐশীবাণীর প্রকৃত উপস্থিতির প্রকাশ করে– এখানে মানবীয় আকৃতিতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ইসলামি জগতের অনেকেই পবিত্র গ্রন্থের ভাষা শেখার জন্যে নিজের ভাষা ত্যাগ করেছে, এ থেকেই কোরানের শক্তি বোঝা যেতে পারে।

এখন যেমন আছে, কোরানে বিভিন্ন সুরা মুহাম্মদ (স:) যে ধারাক্রমে উচ্চারণ করেছিলেন সে অনুযায়ী নেই। আনুমানিক ৬৫০ খৃস্টাব্দে যখন সরকারীভাবে কোরান সংকলিত হয়, মুহাম্মদ (স:) এর পরলোকগমনের প্রায় বিশ বছর পরে, সম্পাদকগণ দীর্ঘ সুরাগুলোকে শুরুতে স্থান দিয়েছেন, আর ক্ষুদ্র সুরা–এর মাঝে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সুরাও অন্তর্ভুক্ত–স্থান পেয়েছে শেষে। ব্যাপারটা খামখেয়ালি মনে হলেও আসলে তা নয়, কারণ কোরান এমন কোনও বিবরণ বা রচনার প্রকাশ নয় যার ধারাবাহিক ক্রমের প্রয়োজন রয়েছে। বরং আমরা এতে পাই প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পয়গম্বরদের জীবন, আর শেষ বিচারের মত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ঘোষণা ও আলোচনা। পশ্চিমাদের কাছে কোরান ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট, কারণ বারবার যেন একই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এখানে, কিন্তু গ্রন্থটি একান্তে পড়ার জন্যে নয় বরং প্রার্থনাসভায় আবৃত্তির জন্যে। মুসলিমরা যখন মসজিদে কোনও সুরা শোনে, একটি মাত্র আবৃত্তিতে ধর্ম বিশ্বাসের মূল সুর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য অমুসলিমরা কোরানে মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে তথ্যের মূল্যবান উৎস পাবে। যদিও তাঁর মৃত্যুর আগে সরকারীভাবে সংকলিত হয়নি, তবু একে নির্ভুল, নিখাদ ধরা যেতে পারে। আধুনিক পণ্ডিতগণ, যাঁরা বিভিন্ন সুরা অবতীর্ণ হওয়ার দিনকাল মোটমুটি নির্ভুলভাবে জানতে পেরেছেন, তাঁরা উল্লেখ করেছেন, উদাহরণ স্বরূপ, কোরানের গোড়ার অংশসমূহ মুহাম্মদের (স:) সামনে আসা বিশেষ সমস্যাসমূহের প্রতি নজর দিয়েছে, যখন তাঁর ধর্মটি ছোট্ট এক গোত্র হিসাবে যুঝছিল, যেগুলো পারবর্তীকালে ইসলাম বিজয়ী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিস্মৃত হবে। সুতরাং কোরানে আমরা মুহাম্মদের (স:) সমসাময়িক জীবনের বিবরণ পাই যা ধর্মের ইতিহাসে বিরল : এ থেকে আমরা তিনি কত অদ্ভুত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা বুঝতে সমর্থ হই, এবং কিভাবে তাঁর দর্শন প্রবল ও বিশ্বজনীন হবার জন্যে বিকশিত হচ্ছিল জানতে পারি।

বিপরীতে জেসাস সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতে পারি। আদি ক্রিশ্চান লেখক ছিলেন সেইন্ট পল, জেসাসের মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পর তিনি প্রথম রচনা প্রকাশ করেছিলেন। জেসাসের প্রাথমিক জীবন নিয়ে পল কোনও আগ্রহ দেখাননি, বরং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছেন।

পরে গসপেল সমূহে সুসমাচারের লেখকগণ প্যালেস্টাইনে জেসাসের জীবন এবং তাঁর লিপিবদ্ধ বাণী নিয়ে প্রচলিত লোককথার ওপর বেশি নির্ভর করেছেন। মার্ক, দ্য ফার্স্ট, সত্তর দশকে জেসাসের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর রচনা করেছিলেন; ম্যাথু এবং ল্যুক আশির দশকে এবং জন ১০০ খৃস্টাব্দে লিখেছেন। কিন্তু এসব গসপেল আরব ঐতিহাসিকদের রচিত মুহাম্মদের (স:) প্রথম দিককার জীবনী থেকে একেবারে আলাদা। এগুলো ঐতিহাসিক বাস্তবতার চেয়ে বরং জেসাসের জীবনের ধর্মীয় তাৎপর্য অনুসন্ধানেই বেশি উদ্যোগী এবং বারবার আসল ঘটনার চেয়ে আদি গির্জার প্রয়োজন, আচ্ছন্নতা আর বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, নিউ টেস্টামেন্ট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন জেসাসের আবেগ আর মৃত্যু সংক্রান্ত গসপেলের বিরবণ বিভ্রান্তিকর, বাস্তব ঘটনার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। এ সময়ে ক্রিশ্চানরা নিজেদের ইহুদীদের থেকে আলাদা করার জন্যে উদগ্রীব ছিল, তাই জেসাসের মৃত্যুর জন্যে রোমানদের বদলে ইহুদীদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। জেসাসের বক্তব্যের খুব সামান্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে গসপেলসমূহ অসত্য। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সত্যের প্রকাশ করে ওগুলো। জেসাস তাঁর শিষ্যদের কাছে আত্মা, পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সুতরাং তাদের গভীরতম প্রেরণাসমূহ একঅর্থে তাঁরও।

গসপেল সমূহের আদর্শ ঐশ্বরিক গুণাবলীর জেসাসের তুলনায় একেবারে ভিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছেন মুহাম্মদ (স:)। মুহাম্মদের (স:) প্রতি একধরনের প্রতীকী ভক্তি গড়ে তুলেছে মুসলিমরা, দশম অধ্যায়ে আমি এর ব্যাখ্যা দেব, কিন্তু তাঁকে স্বর্গীয় বলে কখনও দাবী করেনি তারা। গোড়ার ইতিহাসে তিনি প্রকৃতই একজন মানবীয় সত্তা। এমনকি ক্রিশ্চান সাধুর সঙ্গে তেমন কোনও মিলও ছিল না তাঁর, যদিও সাধু বেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলে সব সাধুই একেবারে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসে অবশ্যই। মুহাম্মদ (স:)কে বরং ইহুদী পবিত্র গ্রন্থের বৈচিত্রময় চরিত্র মোজেস, ডেভিড, সোলোমন, এলিজাহ্ বা ইসায়াহর মত মনে হয় -যারা আন্তরিকভাবে ধার্মিক হলেও একেবারে নিখুঁত ছিলেন না। ক্রটিপূর্ণ করুণ মানব জীবনে কেউ কেউ যাঁকে ঈশ্বর বলে ডাকে সেই অলৌকিক বর্ণনাতীত সত্তাকে ধারণ করা কঠিন এক সংগ্রাম। মুহাম্মদ (স:) নিরীহ সন্ত ছিলেন না। বিপজ্জনক এবং উন্মাতাল এক সমাজে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। কখনও কখনও যাঁকে এমন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে যাকে আমরা যারা এক নিরাপদ জগতে বাস করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি তাদের চোখে অস্বস্তিকর ঠেকবে। কিন্তু আমরা যদি পবিত্রতার ক্রিশ্চান প্রত্যাশা ভুলে থাকতে পারি, তাহলে এক দরদী এবং জটিল মানুষকে আবিষ্কার করব। মুহাম্মদ (স:) দারুণ রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন–দুটোর এমন সহাবস্থান বিরল—এবং তিনি মনে করতেন ভাল ও ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠনে সকল ধার্মিক জনগণের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং অশান্ত হয়ে উঠতে পারতেন, কিন্তু আবার কোমল,

আবেগপ্রবণ, দুর্বল দয়ালুও হয়ে উঠতেন। আমরা কখনও জেসাসের হাসার কথা পড়িনি, কিন্তু আমরা বারবার ঘনিষ্ঠ জনদের সঙ্গে মুহাম্মদকে (সঃ) হাসতে ও রসিকতা করতে দেখি। তাঁকে আমরা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে দেখব, স্ত্রীদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে দেখব, কাঁদতে দেখব বন্ধুর মৃত্যুতে, আর যেকোনও গর্বিত পিতার মত নবজাত শিশুপুত্রকে প্রদর্শনরত অবস্থায়ও দেখতে পাব।

অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে আমরা যেভাবে দেখে থাকি সেভাবে যদি মুহাম্মদকেও (সঃ) দেখতে পারি, তাহলে অবশ্যই তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম মহাত্মা হিসাবে মেনে নেব। একটা অসাধারণ সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি, একটা প্রধান ধর্ম প্রতিষ্ঠা আর নতুন বিশ্বশক্তি সৃষ্টি মামুলী সাফল্য নয় মোটেই। কিন্তু তাঁর মেধার পূর্ণ অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই তিনি যে সমাজে জন্ম নিয়েছিলেন এবং যেসব শক্তির মোকাবিলা করেছেন তাকে পর্যালোচনা করতে হবে। ঈশ্বরের বাণী আরবদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে মুহাম্মদ (সঃ) যখন হিরা পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন, একটা অসাধ্য সাধনে হাত দিয়েছিলেন তিনি। পেনিনসুলার নগণ্য সংখ্যক আরব একেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকছিল, কিন্তু একজন মাত্র ঈশ্বরে এই বিশ্বাস স্থাপনের তাৎপর্য তারা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। এটা বিস্ময়কর কিছু নয়। ইয়াহওয়েহকে একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে মেনে নিতে ইহুদীদের কয়েক শ বছর লেগে গিয়েছিল। প্রবীণ ইহুদীরা সম্ভবত মনোল্যাট্রির অনুশীলন করেছে : অর্থাৎ কেবল ইয়াহওয়েহর উপাসনা করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল তারা, কিন্তু অন্যান্য দেবতার অস্তিত্বও বিশ্বাস করত। এমনকি মোজেসও হয়ত পুরোদস্তুর একেশ্বরবাদী ছিলেন না। আপন জনগণের জন্যে নিয়ে আসা তাঁর টেন কমান্ডমেন্টস্ অন্যান্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল : 'আমার সামনে অচেনা দেবতাদের রাখবে না।' 'মোজেসের নেতৃত্বে মিশর থেকে এক্সোডাস (১২৫০ খৃঃ পূঃ) আর দ্বিতীয় ইসায়াহ নামে খ্যাত পয়গম্বরের–যিনি নির্বাসিত ইহুদীদের সঙ্গে আনুমানিক ৬৫০ খৃস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলনে বাস করেছেন। দ্ব্যর্থহীন একেশ্বরবাদের মাঝখানে প্রায় সাতশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে–অথচ মাত্র তেইশ বছরে আরবদের ওই অর্জনকে সফল করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)। আমরা লক্ষ্য করব যে কিছু সংখ্যক আরব তাঁর প্রতি একটি মনোল্যাট্রাস সমাধানে পৌঁছে অন্যান্য দেবতার অস্তিত্ব মেনে নেয়ার আবেদন জানিয়েছিল, যাতে তিনি আর তাঁর অনুসারীরা কেবল আল্-লাহর উপাসনা করতে পারেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) আপস প্রস্তাব জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

একেশ্বরে বিশ্বাস ঘোষণা স্রেফ চিন্তাগত, বুদ্ধিজাত উন্নতি নয়; এর জন্যে চেতনাজগতের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়। বাইবেলে দেখা যায় প্রাচীন ইসরাইলবাসীরা পৌত্তলিকতার প্রলোভন প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং আমরা দেখতে পাব আরবরা তাদের পিতৃপুরুষের দেব-দেবীদের ত্যাগে অসহনীয় যাতনা ভোগ করেছে। ব্যাবিলনিয়ান সাম্রাজ্যে নির্বাসিত অবস্থায় ইহুদীরা শেষ পর্যন্ত

পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছিল, এতে হয়ত বিস্মিত হবার কারণ নেই। বিশ্বের সকল প্রধান ধর্মের মত একেশ্বরবাদ এক অর্থে সভ্যতারই একটা উপাদান। বিশ্বজগতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিশ্বকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে, যার ফলে আঞ্চলিক দেবতারা নগণ্য ও অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো সভ্যতার বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত, এবং মানুষ দেখতে শুরু করেছিল যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা নিয়মতান্ত্রিক জায়গা বা সম্ভবত কোনও একক নিয়ন্ত্রণাধীন। বড় বড় নগরসমূহে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয় আর মানুষ তার আচরণে আগামী বংশধরদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে এটা উপলব্ধিতে আসায় আলাদা বিবেক জন্মলাভ করে। কিন্তু আদিম সমাজে, যেমন সপ্তম শতকের আরব, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অসম্ভব ছিল। জীবন যখন বিপদসঙ্কুল, নিয়তি যেখানে হেঁয়ালির মত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জায়গায় যেখানে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা আর সামাজিক নিরাপত্তা যেখানে অপ্রতুল সেখানে স্বয়ম্ভু আর দয়াময় একা সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন ছিল প্রায় অসম্ভব। একটা আদিম পৌত্তলিক বিশ্বে বিভিন্ন দেবতা ক্ষমতা আর প্রভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, একমাত্র ঈশ্বরকে বেছে নিয়ে সাহায্যের সম্ভাব্য একটা উৎসের দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া পাগলামির মত। এটা সত্যি যে কিছু সংখ্যক আরব, মক্কাবাসীদের মত, শহরে বাস করত, কিন্তু মরুভূমি তখনও টাটকা স্মৃতি, গোত্রীয় বৈশিষ্ট্য বেশ প্রভাবশালী রয়ে গিয়েছিল।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাফল্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাঁর বিচ্ছিন্নতা। জুডাইজম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে জানলেও তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। ইসরাইলের পয়গম্বরদের বিপরীতে মুহাম্মদ (সঃ) নিজস্ব গতি আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত ধারার সমর্থন নিয়ে এক কঠিন একেশ্বরবাদী সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন না যার শত শত বছর ধরে চালু নৈতিক সহযোগিতা দেয়ার শক্তি ছিল। জেসাস এবং সেইন্ট পল, দুজনকেই জুডাইজমে গ্রহণ করা, হয়েছে, প্রথম ক্রিশ্চানগণ ইহুদী এবং তাদের সমর্থক সাইনাগগের গডফিয়ারারদের মাঝ থেকেই এসেছে। রোমান সাম্রাজ্যে খৃস্ট ধর্ম শেকড় গেড়েছিল যেখানে ইহুদী সম্প্রদায় পৌত্তলিকদের মনকে প্রস্তুত করে পথ নির্মাণ করেছিল। কিন্তু মুহাম্মদকে (সঃ) বলতে গেলে শূন্য থেকে কাজ শুরু করতে হয়েছে এবং তাঁর নিজস্ব আমূল নতুন একেশ্বরবাদী আধ্যাত্মিকতার পথ তৈরি করতে হয়েছে। তিনি যখন মিশন শুরু করেন, নিরপেক্ষ কোনও পর্যবেক্ষক হয়ত তাঁর সাফল্যের কোনও সম্ভাবনাই দেখতেন না, আরবরা, সম্ভবত আপত্তি উত্থাপন করতেন তিনি, একেশ্বরবাদের জন্যে প্রস্তুত নয় : তারা আসলে এই উন্নত দর্শনের উপযোগি হয়ে গড়ে ওঠেনি। আসলে, এই উত্তপ্ত ভয়ঙ্কর সমাজে ব্যাপক ভিত্তিতে এর প্রচার চালাতে গেলে তা মারাত্মকভাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে, জীবন নিয়ে পালাতে পারলে ভাগ্যবান বলতে হবে মুহাম্মদকে (সঃ)।

সত্যিই বহুবার মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে মুহাম্মদকে (সঃ), রক্ষা পাওয়া ছিল অলৌকিক ঘটনার মত। কিন্তু তিনি সফল হয়েছেন। জীবনের শেষ

দিকে তিনি অঞ্চলের দুষ্টক্ষত পৌনঃপুনিকভাবে সংঘটিত গোত্রীয় সহিংসতার মূলউৎপাটন করেছিলেন, পৌত্তলিকতা তখন আর উদ্বেগের বিষয় ছিল না। আরবরা তখন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশের জন্যে প্রস্তুত। এই অসাধারণ সাফল্যকে বুঝতে হলে আমাদের ইসলামের আগমনের আগে আরবের পরিস্থিতি বুঝতে হবে যে সময়কে মুসলিমরা *জাহিলিয়াহ্*-অজ্ঞতার কাল-বলে আখ্যায়িত করে।

৩. জাহিলিয়াহ্

আরব বিশ্ব আজ পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ এলাকা, পরাশক্তিগুলো এখানে তাদের তেলের স্বার্থ খুব উদ্বেগের সঙ্গে রক্ষা করে চলে। কিন্তু ৫৭০ খৃস্টাব্দের দিকে, মুহাম্মদ (স:) যখন মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন তখন ওই অঞ্চলের কোনও শক্তিই আরবকে নিয়ে কোনওরকম চিন্তাভাবনা করত না। পারসিয়া ও বাইযানটিয়াম উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিরোধে জড়িয়েছিল, মুহাম্মদ (স:)-এর পরলোকগমনের অল্পদিন আগে যার সমাপ্তি ঘটে। দুটো রাজাই পেনিনসুলার দক্ষিণ পর্যন্ত, আজ যা ইয়েমেন নামে পরিচিত, আরব সাম্রাজ্য বিস্তারে উদগ্রীব ছিল। দক্ষিণ আরবের রাজ্যটি ওই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকার তুলনায় একেবারে ভিন্ন রকম ছিল : মৌসুমী বৃষ্টির আশীর্বাদ থাকায় এখানে উর্বর জমি আর প্রাচীন ও উন্নত সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আবাধ্য আরবের মরুপ্রান্তর ছিল ভয়ঙ্কর রকম বুনো, বুনো স্বভাবের এক মানব গোষ্ঠীর বাস ছিল এখানে গ্রীকরা যাদের নাম দিয়েছিল 'সারা কেনোই'-তাঁবুবাসী। পারসিয়া বা বাইযানটিয়াম এই উষর এলাকা আক্রমণের চিন্তাই করেনি, এটা কারও কল্পনাতেও ছিল না যে এখানেই জন্ম নেবে এক নতুন বিশ্ব ধর্ম, যা শিগরিরই মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

আসলেই আরবকে তখন ঈশ্বরবিহীন এলাকা বলে মনে করা হত, আধুনিকতা ও প্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত অগ্রসর কোনও ধর্মই এখানে আসার সুযোগ করে উঠতে পারেনি। এটা সত্যি যে অজ্ঞাত উৎসের নগণ্য সংখ্যক ইহুদী গোত্র ইয়াথরিবের (যা পরবর্তীকালে মদিনা নগরী হিসাবে খ্যাতি লাভ করে) কৃষিপ্রধান অঞ্চল খায়বর ও ফাদাকে বসবাস করত, কিন্তু এই ইহুদীরা কার্যতঃ তাদের প্রতিবেশী আরব মূর্তিপূজকদের চেয়ে খুব একটা আলাদা ছিল না। ওদের ধর্ম ছিল অনেক প্রাথমিক পর্যায়ের। সভ্য এলাকায় বহু আরব খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল, চতুর্থ শতকে তারা তাদের নিজ সিরিয়াক চার্চের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে মরুবাসী বেদুঈন আরবরা ইহুদী ও খৃস্ট উভয়ই ধর্মকেই সন্দেহের চোখে দেখত, যদিও তারা উপলব্ধি করেছিল যে, এ ধর্মগুলো তাদের নিজস্ব ধর্মের চেয়ে অনেক উন্নত, অগ্রসর। তারা জানত পারসিয়া ও বাইযানটিয়াম পরাশক্তিদ্বয় যার যার রাজত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্যে উভয় ধর্মকে ব্যবহার করতে সদাপ্রস্তুত। দক্ষিণ সৌদি আরব রাজ্যে এই বিষয়টি খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল, ৫৭০ খৃস্টাব্দে চিরদিনের মত স্বাধীনতা

হারিয়েছিল অঞ্চলটি, এ বছরই মুহাম্মদ (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। বাইযানটিয়ামের ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য আবিসিনিয়া, বর্তমান ইথিওপিয়াকে করদ রাজ্যে পরিণত করেছিল, এখানে তখন মনোফিজিটিজম নামে পরিচিত খৃস্টধর্মের একটা বিকৃতরূপ গড়ে উঠেছিল, এই মতবাদ অনুযায়ী জেসাস কেবল স্বর্গীয় প্রকৃতির অধিকারী। বাইযানটিয়াম সীমানার অভ্যন্তরে ধর্মদ্রোহীদের ওপর নির্যাতন চালাত হয়ত কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে এদের আনন্দের সঙ্গেই কাজে লাগিয়েছিল। আবিসিনিয়াকে কুক্ষিগত করার পর বাইযানটিয়াম এর শাসক নেজাসকে ইয়েমেনে অনুপ্রবেশে উৎসাহ জোগাতে থাকে যাতে অঞ্চলটি কন্সট্যান্টিনোপলের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে আনা যায়। আপন পায়ে দাঁড়ানোর পরিবর্তে দক্ষিণ আরবের অধিবাসীগণ আবিসিনীয় হুমকির মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্যে পারসিয়ার কাছে আবেদন জানায়। পারসিয়ান স্যাসানিডরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পারসিয়ানরাও সাম্রাজ্য বিস্তারের এই যুদ্ধে বাইযানটিয়ামের খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে ইহুদীধর্মের পক্ষাবলম্বন করে ধর্মকে আদর্শগত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। ৫১০ ইউসুফ আসা'য়ীতে দক্ষিণ আরবের রাজা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ধু নুয়াস, হি অব দ্য হ্যাঙগিং লক্স নামে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু পারসিয়ানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ওই প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়-৫২৫ খৃস্টাব্দে ইহুদী রাজ্য আবিসিনিয়ার কাছে পরাজয় বরণ করে : সুদর্শন তরুণ রাজা, বলা হয়ে থাকে, হতাশা থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে সাগরের দিকে ছুটে যান, যতক্ষণ না ঘোড়া এবং সওয়ারী উভয়ই ঢেউয়ের আড়ালে হারিয়ে যায়। দক্ষিণ আরব আবিসিনিয়ার একটা প্রদেশে পরিণত হয়, এখানকার জনগণ অবিরাম পারসিয়ার সাহায্য চাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজা খসরু ৫৭০ খৃস্টাব্দে এ অঞ্চলে আক্রমণ চালান এবং দক্ষিণের গর্বিত রাজ্যটি এবার পারসিয়ার একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। এই সময় ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাসের বিকৃত রূপ নেস্টোরিয়ানিজম (এ মতবাদ অনুযায়ী জেসাসের প্রকৃতি দুরকম, একটি মানবীয় অপরটি স্বর্গীয়; পারসিয়া এ মতবাদের পক্ষে ছিল) রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়। হিজাজ ও নজদের বেদুঈন আরবরা তাদের দক্ষিণ আরব প্রতিবেশীদের নিয়ে খুব গর্ব বোধ করত, তাদের পতন মহাদুর্যোগ বলে মনে হয় ওদের চোখে। অনিবার্যভাবে ইহুদী ও খৃস্টধর্ম সন্দেহের পাল্লায় পড়ে যায়।

উত্তরের ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর দুটি ধর্মের প্রতি ওদের অবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, ওখানে মহাশক্তিদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজস্ব সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বুনো সারাসেনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল। তীব্র খরা মৌসুমে সারাসেনরা পর্যায়ক্রমে বসতি এলাকায় হামলা চালাত। দুপক্ষই উত্তরের আরব গোত্রগুলোকে ব্যবহার করত, এরা খৃস্টধর্মের বিকৃতরূপে দীক্ষিত হয়েছিল। মনেস্টারি ও কাল্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সীমান্ত এলাকার আরবদের বিকৃত ধর্ম গ্রহণে উৎসাহ জুগিয়েছিল বাইযানটিয়াম। ফলে বাইযানটাইন সীমান্তে

শীতকালে আশ্রয়গ্রহণকারী ঘাসান গোত্রটি মনোফিসিট ক্রিশ্চানিটি গ্রহণ করে বাইযানটাইনের অংশে পরিণত হয়। সারজিয়োপলিসের রুফাসার বাইরে দক্ষিণের শীতকালীন ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল ওরা, এখানে বাইযানটাইন কায়দায় ওদের গোত্রপ্রধানের জন্যে চমৎকার একটা হল বানানো হয়েছিল যার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। ঘাসানিডরা এক বাইযানটাইন বাফার স্টেট গড়ে তোলে, পারসিয়ার যরোসট্রিয়ান সাম্রাজ্যের হামলা থেকে ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার কথা ছিল ওদের।[১] কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা ছিল পারসিয়ার। পূর্ব সিরিয়ার ল্যাখমিড আরবরা নেস্টোরিয়ানে রূপান্তরিত হয়, পারসিয়ান সাম্রাজ্যের মেসোপটেমিয় এলাকার আরবরা এই ধর্মবিশ্বাসের পৃষ্ঠপোষক ছিল। যথারীতি স্যাসানিডরা একটা বাফার স্টেটের ল্যাখমিড আরব শাসকদের ওপর ওদের নিজস্ব সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিল, এই রাজ্যের রাজধানী ছিল হিরায়। কিন্তু পারসিয়া ও বাইযানটিয়াম, উভয়ই এই আরব রাজ্যগুলো থেকে সরে যায় : ৫৮৪ খৃস্টাব্দে পারসিয়ার সঙ্গে এক যুদ্ধের সময় আর্থিক নীতির অংশ হিসাবে বাইযানটাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস ঘাসানিডদের ভর্তুকী প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর ৬০২ খৃস্টাব্দের দিকে রাজা খসরু ল্যাখমিড শাসনের অবসান ঘটান এবং আরবদের স্থলে পারসিয়ান শাসক নিয়োগ করেন। আনুমানিক তিরিশ বছর পরে মুহাম্মদ (স:)-এর পরলোকগমনের পর মুসলিম সেনাবাহিনী যখন এই অঞ্চলে আক্রমণ চালায়, তখন পরাশক্তিগুলোর প্রতি আরবদের অসন্তুষ্টির প্রকাশ দেখা গিয়েছিল এবং ইসলাম গ্রহণের জন্যে তৈরি ছিল তারা।

কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের ঘটনা। সপ্তম শতকের শুরুর দিকে সেন্ট্রাল অ্যারাবিয়ার আরবরা ক্রিশ্চান ধর্মের নানান রূপ দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল : দক্ষিণের নাজরানে অবস্থিত ক্রিশ্চান চার্চ ছিল বেদুঈনদের বিস্ময়ের এক আধার, তবে এসব ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রতি তাদের অবিশ্বাস অটুট রয়ে গিয়েছিল, মহাশক্তিগুলোর আওতার বাইরে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল ওরা। একই সময়ে এক ধরনের অসন্তোষের অনুভূতিও ছিল ওদের মাঝে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই নিজেদের হীন বোধ হচ্ছিল আরবদের। ঐক্যবদ্ধ বেদুঈন রাষ্ট্র গঠন করে যতক্ষণ নিজের ভাগ্য নিজের হাতে না নিতে পারছে ততক্ষণ শোষণের শিকার হওয়ার আশঙ্কা এমনকি দক্ষিণের আরবদের মত স্বাধীনতা হারানোরও ভয় ছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ বেদুঈন রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ বলেই মনে হয়েছে তখন। শত শত বছর ধরে হিজাজ ও নজদের আরবরা বিভিন্ন উপজাতীয় দলে যাযাবরের মত বাস করে এসেছে, এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। কাল পরিক্রমায় ওরা এমন বিশেষ ধরনের এক জীবনধারা গড়ে তুলেছিল যা কিনা ষষ্ঠ শতকে পেনিনসুলার একটা আদর্শে পরিণত হয়েছিল। এমনকি যেসব আরব বড় বড় শহর আর বসতিতে থাকত তারাও প্রাচীন রাখালদের মত জীবন যাপন করত : উট পালন করত আর নিজেদের মনে করত মরুভূমির সন্তান।

গোত্রীয় নীতিমালা নির্দিষ্ট কিছু কারিগরি ও সামাজিক দক্ষতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত গুণাবলীও দাবী করত এবং এগুলো খুব যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেয়া হত। পেনিসসুলার আরবগণ বরাবরই যাযাবর ছিল। ওদের জীবনযাত্রাকে সম্ভব করে তোলা উট আমাদের বর্তমান সময়ের দু হাজার বছর আগে পোষ মানানো হয়েছিল। পানি মওজুদ রাখার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী এই পশুটি অবিশ্বাস্য গতিতে মরুভূমির ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে পারে। মূলতঃ ফার্টাইল ক্রিসেন্টের অপেক্ষাকৃত সভ্য এলাকার আরবরা কৃষিকাজ করত। যাতায়াতের জন্যে পশু পালনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর কিছু সংখ্যক বেপরোয়া আরব খরা বা শুষ্ক মৌসুমে ঊষর, বিরান প্রান্তরে পাড়ি জমায়।[২] এরকম বৈরী পরিস্থিতিতে জীবীকার খোঁজ করা নিষ্ঠুর নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর অবজ্ঞা প্রকাশের সামিল, হয়ত এরকম অসম্ভব অবস্থাতেও আরবদের টিকে থাকার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। ক্রমে তারা মরু অঞ্চলের আরও গভীরে এগিয়ে গেছে, সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোর সঙ্গে নিজেদের একটা দূরত্ব গড়ে তুলেছে। গ্রীষ্মকালে গোত্রগুলো যার যার কুয়োর পাশে উট চরাত আর শীতকালে ঘুরে বেড়াত মরুপ্রান্তরে, তরতাজা উদ্ভিদে ঢাকা থাকত এই প্রান্তর, বৃষ্টির পর পোষা জানোয়ারের জন্যে স্বর্গে পরিণত হত তা। উটের দুধ আর শিকারিদের শিকার করা পশুর মাংস খেয়ে বেঁচে থাকত ওরা। কিন্তু যাযাবরদের পক্ষে একাকী বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না, প্রয়োজন ছিল কৃষিজীবীদের সহায়তার, যারা ওদের সামান্য খাবারের পরিপূরক গম আর খেজুর সরবরাহ করত। যাযাবররা ক্রমে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট ও আরবীয় পেনিনসুলার মরু এলাকায় প্রবেশ করার ফলে অগ্রগামী কৃষিজীবীরাও তাদের পেছন পেছন এগিয়ে এসে মরুদ্যানসমূহ সুফলা করে তোলে। পালাক্রমে কৃষিজীবীরাও যাযাবরদের চলিষ্ণুতার ওপর বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, কারণ ওরা দূর-দূরান্ত থেকে রসদপত্র এবং পণ্যসামগ্রি এনে ওদের কাছে পৌঁছে দিত। দক্ষ যোদ্ধা হওয়ায় যাযাবররা উৎপাদিত পণ্যের একটা নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে বসতি গড়ে তোলা আরবদের নিরপত্তার ব্যবস্থা করত।

মরুপ্রান্তরের জীবন ছিল খুবই অনিশ্চিত। যাযাবররা মোটামুটি সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকত, অপুষ্টিতে ভুগত : জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত ওরা। টিকে থাকার একমাত্র উপায় ছিল সংঘবদ্ধভাবে বাস করা, কারও পক্ষেই একাকী বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে যাযাবররা রক্তের সম্পর্ক আর আত্মীয়তার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন দল গড়ে তোলে। এক প্রকৃত অথবা কিংবদন্তীর সাধারণ পূর্বপুরুষের সূত্রে একতাবদ্ধ হয় ওরা, এবং নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করে, উদাহরণ স্বরূপ, বনী কাল্ব বা বনি আসাদ (কাল্ব ও আসাদের সন্তান) হিসাবে। এই দলগুলো এরপর আরও বৃহৎ এবং আরও শিথিলভাবে অন্য দলসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, পশ্চিমে ছোট দলকে আমরা সাধারণত 'ক্ল্যান' বলি আর বড় দলকে বলি 'ট্রাইব'। আরবরা অবশ্য এদুটো শব্দের মাঝে কোনও পার্থক্য করে না, ছোট-

বড় উভয় দলের ক্ষেত্রেই *ক্বাওম* (জনগণ) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। গোত্রগুলো যাতে আকারে খুব বড় হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে না পারে সেজন্যে দলগুলো ক্রমাগত পুনর্গঠিত হত। কৃত্রিম এবং এর সম্পর্কিত মিত্রদের মধ্যে তীব্র এবং পরম আনুগত্য গড়ে তোলা খুব জরুরি ছিল। একমাত্র গোত্রের পক্ষেই এর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু আমাদের পরিচিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কোনও অবকাশ ওখানে ছিল না, ছিল না এর সঙ্গে জড়িত অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়টিও। সবকিছু পরিচালিত হত গোত্রের স্বার্থে। এই গোত্রীয় চেতনা গড়ে তোলার জন্যে আরবরা *মুরুবাহ* (muruwah) নামে এক মতবাদ জন্ম দিয়েছিল, পশ্চিমা পণ্ডিতগণ যার অনুবাদ করেছেন 'পৌরুষ' হিসাবে, তবে এর প্রকৃত অর্থ আরও বেশি জটিল এবং ব্যাপক। '*মুরুবাহ্*'র মানে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস, ধৈর্য, আর কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা এবং গোত্রের প্রতি কোনও অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নেয়ার কর্তব্যবোধ, দুর্বল সদস্যদের রক্ষা করা আর শক্তিমানদের প্রতিরোধ করা। প্রত্যেক গোত্র যার যার নিজস্ব ধরনের *মুরুবাহ্* নিয়ে গর্ব বোধ করত, একে মনে করা হত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণ। দলের *মুরুবাহ্* টিকিয়ে রাখার স্বার্থে প্রত্যেক সদস্যকে তার সতীর্থকে রক্ষার জন্যে তৈরি থাকতে হত, গোত্র প্রধানের নির্দেশ পালন করতে হত বিনাপ্রশ্নে। গোত্রের বাইরে দায়দায়িত্ব থাকত না, আরবদের বিকাশের এই পর্যায়ে বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত কোনও ধারণার অস্তিত্ব ছিল না।

মুরুবাহ্ ধর্মের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করত, এটা আরবদের এই আদর্শ আর দর্শন দিয়েছিল, ওদের বিপদসঙ্কুল অস্তিত্বের একটা অর্থ খুঁজে পেতে সক্ষম করে তুলেছিল। এটা ধর্মই ছিল, তবে তা একেবারেই পার্থিব। গোত্র ছিল এর পবিত্র বিষয়, পরলোক সম্পর্কে কোনও ধারণা আরবদের ছিল না, কোনও ব্যক্তির আলাদা বা চিরকালীন গন্তব্য ছিল না। গোত্রের মাঝেই কেউ অমরত্ব লাভ করতে পারত, আর তার চেতনার অবিচ্ছেদ্যতায়। গোত্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রত্যেককে *মুরুবাহ্*র বিকাশ ঘটাতে হত। এভাবে একটি গোত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত। গোত্র প্রধান দলের দুর্বল সদস্যদের হেফাযত করবেন এবং সম্পদ ও রসদ সমানভাবে বণ্টন করবেন, এটাই প্রত্যাশা করা হত। উপহার প্রদান ছিল একটা প্রয়োজনীয় গুণ : গোত্রের সদস্য এবং অন্যান্য গোত্রের বন্ধু ভাবাপন্নদের উদারহস্তে আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে গোত্রপ্রধান তাঁর ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস (গোত্রের ক্ষমতাও) প্রদর্শন করতে পারতেন। আরবদের মাঝে উদারতা আর আতিথেয়তা আজও বড় গুণ হিসাবে স্বীকৃত। নিঃসন্দেহে এর মাঝে একটা প্রায়োগিক দিক ছিল। আজকের ধনী কোনও গোত্র আগামী কাল দুর্দশায় পড়তে পারে; এখন তুমি যদি দানের ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত হয়ে থাক, তখন প্রয়োজনের সময় কে আসবে সাহায্য করতে? তবে উপহার আদান-প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ফলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন না হয়ে আরবরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কঠিন সংগ্রামের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল। এতে করে জীবন যাত্রার জন্যে জরুরি বস্তুর অনটনপূর্ণ কোনও এলাকায় রসদপত্রের প্রতি

একধরনের উদাসীনতা গড়ে উঠেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি *মুরুবাহর* গভীর অদৃষ্টবাদীতা : *দাহর* (সময় বা নিয়তি)-এরও শিক্ষা দিয়েছিল যা জীবনের এক পরম সত্যি এবং তাকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করতে হত। কিছু কিছু দুর্যোগকে যদি মানুষ অনিবার্য বলে স্বীকার করে না নিত তাহলে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। আরবরা তাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে মানুষের জীবনের মেয়াদ (*আজল*) বৃদ্ধি বা খাদ্য ও রসদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা (*রিজ্ক*) করার কোনও উপায় নেই।

গোত্র এবং এর সদস্যদের রক্ষা করার জন্যে গোত্রপ্রধানকে প্রত্যেকটা আঘাতের বদলা নিতে প্রস্তুত থাকতে হত। কেন্দ্রীয় কোনও কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করতে পারে এমন সাধারণ আইনের অনুপস্থিতিতে সামান্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় ছিল রক্তাক্ত বিবাদ বা প্রতিহিংসা। জীবন ছিল সস্তা, মানুষ হত্যায় কোনও পাপ ছিল না, কেবল স্বগোত্রীয় বা মিত্রদের কাউকে হত্যা অন্যায় বলে গণ্য হত। ঘাতকগোত্রের কাউকে হত্যার মাধ্যমে প্রত্যেক গোত্রকে তার কোনও সদস্যের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হত। একমাত্র এভাবেই গোত্রপ্রধান তাঁর গোত্রের সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারতেন : প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হলে তাঁর *কাওমকে* কেউ শ্রদ্ধা করত না এবং শাস্তির ভয় না করেই গোত্রীয় সদস্যদের নির্বিচারে হত্যা করত। যেহেতু আরবে তখন ব্যক্তির পক্ষে কোনও চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল তাই ঘাতককেই শাস্তি দিতে হবে, এমন কোনও নিয়ম ছিল না। তার পরিবর্তে আক্রমণকারী গোত্র সমান সংখ্যক সদস্য হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ত। এখানেই আমরা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে গোত্রীয় মানসিকতার প্রকাশ দেখতে পাই : এসব ক্ষেত্রে একটি গোত্রের একজন সদস্য আরেক গোত্রের একজন সদস্যের সমান। এধরনের সামাজিক সংগঠন বহুদিন আগে পেছনে ফেলে আসায় প্রতিশোধের এই নীতি আমাদের চোখে অগ্রহণযোগ্য ঠেকে, কিন্তু আধুনিক পুলিশ বাহিনীর অনুপস্থিতিতে এটাই ছিল ন্যূনতম নিয়ম ও শান্তিরক্ষার একমাত্র উপায়। এ ব্যবস্থা মোটামুটি শক্তির ভারসাম্যও বজায় রাখত, কেননা আক্রমণকারী গোত্রের একজন সদস্য হারানোর ফলে তা তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত। এর ফলে একটি আক্রমণকারী গোত্র যেমন অপর কোনও গোত্রের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারত না, তেমনি ব্যবস্থাটি আরবদের ঐক্যবদ্ধ হবার পক্ষে অন্তরায়ও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপর্যাপ্ত সম্পদ একীভূত করার পরিবর্তে আরবরা যেন সহিংসতার একটা চক্রে আটকা পড়ে গিয়েছিল, যেখানে একটা প্রতিশোধ নতুন প্রতিশোধের জন্ম দিত—যদি কোনও গোত্রের চোখে গৃহীত প্রতিশোধ অবিচার বলে ঠেকত।

শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার যুগোপযোগি আরেকটা পদ্ধতি ছিল *ঘাযু* বা আক্রমণ, যা পুরোদস্তুর পেশা এবং জাতীয় ক্রীড়ার মত ছিল। দুঃসময়ে এক গোত্রের সদস্যরা শত্রুদের কোনও এলাকায় হামলা চালাত-উট, গবাদিপশু এবং অন্যান্য রসদ লাভের আশায়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রক্তপাত এড়ানোর চেষ্টা চালান হত, কারণ তা না হলে প্রতিশোধ স্পৃহা জন্ম নিত। আত্মীয়-স্বজন বা সহযোগিদের ছাড়া

অন্য কারও জিনিস ছিনিয়ে নেয়াটা অনৈতিক ছিল না। *ঘাযু* উল্লেখযোগ্য সম্পদের আগমন নিশ্চিত করত এবং কঠিন উপায়ে সংগৃহীত খাদ্য ও রসদপত্র একই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী গোত্র সমূহের মাঝে ভাগাভাগি করা হত।

সন্দেহাতীতভাবে নিষ্ঠুর হলেও *মুরুব্বাহর* অনেক শক্তি ছিল এবং তারই কিছু কিছু পরে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধে পরিণত হয়েছে। সামাজিক সংগঠনের আর কোনও পদ্ধতি জানা না থাকায় মুহাম্মদ (স:) মুসলিম সমাজকে গোত্রীয় ভাবধারায় সংগঠিত করেছিলেন। মুসলিমদের মাঝে গড়ে ওঠা ইসলামি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সত্ত্বেও গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ কঠোরভাবে বজায় ছিল। গোত্রীয় ব্যবস্থায় সুবিধাভোগী উচ্চবিত্তের কোনও স্থান না থাকায় মুসলিম দর্শনে সাম্যবাদও জরুরি ছিল। আভিজাত্য বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ক্ষমতার কোনও অবকাশ ছিল না। গোত্রপ্রধান তাঁর ছেলের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতেন না, কারণ এ কাজের জন্যে গোত্রের যোগ্যতম লোকের প্রয়োজন ছিল, অভিভাবকত্ব বা সুবিধা নির্বিশেষে গভীর ও শক্তিশালী এই সমতার ধারণা ইসলামি চেতনার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। আর তা এর ধর্মীয় রাজনৈতিক এমনকি শিল্পকলা ও সাহিত্যের মূল সুরে পরিণত হয়।

তবে তা বুনো মূল্যবোধ হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। একমাত্র শক্তিমানরাই টিকে থাকবে, যার মানে দুর্বলদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল, তাদের দুঃখজনকভাবে শোষণ করা যেত। শিশু হত্যা ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক উপায় : কন্যা শিশুদের বাঁচার হার ছেলে শিশুদের তুলনায় বেশি ছিল এবং যেহেতু কোনও গোত্রের পক্ষেই একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি নারী সদস্যের ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না, তাই কোনও রকম অনুশোচনা ছাড়াই কন্যা শিশুদের হত্যা করা হত। আসলে ক্রীতদাসদের মত নারীদের কোনও রকম আইনগত বা মানবাধিকার ছিল না, কেবল তুচ্ছ সম্পদ হিসাবে তারা বিবেচিত হত। তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করা হত, তারা সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির আশাই করতে পারত না। পুরুষরা ইচ্ছামাফিক অসংখ্য বিয়ে করতে পারত। যেহেতু বংশগতি নারীদের মাধ্যমে চিন্তা করা হত, তাই সরকারীভাবে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত, কিন্তু তাতে করে তারা কোনওরকম ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পারত না। অনেক সময় কেবল তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার জন্যে পুরুষরা নারীদের বিয়ে করত।

এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে প্রচলিত অর্থে ধর্ম নিয়ে চিন্তা করার যথেষ্ট সময় আরবদের ছিল না। পুরহিত বা ওঝাদের মত কোনও দল পোষার ক্ষমতা ছিল না তাদের–যারা গোত্রের পৌরাণিক কাহিনীর জন্ম দিয়ে থাকে। সেজায়গায় কবিরা গোত্রের মহিমা বর্ণনা করে গান গাইত, যা ছিল আরবদের সবচেয়ে মূল্যবান গুণ, বিভিন্ন পঙক্তিতে তাকে অমরত্ব দান করত। দেবতার কাহিনী, তাদের মহাজাগতিক যুদ্ধের বর্ণনা বা এসব কিংবদন্তী বা গল্পে তাদের আত্মার জটিল গতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে গোত্রের বিভিন্ন যুদ্ধ আর সাফল্য বর্ণনা করত কবিরা। বিপর্যয় ভুলিয়ে দিত

আর গোত্র সদস্যদের *মুরুব্বাহর* বিশেষত্ব অনুধাবনে সাহায্য করত। কবিতা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এক নৈপুণ্য, আরবরা একে বেশ গুরুত্ব দিত। পেনিনসুলায় নিরক্ষরতা যেহেতু ব্যাপক ছিল তাই কবিরা তাদের কবিতা উচ্চস্বরে পাঠ করত। তারা অনুভব করত *জিনের*– পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানো এক ধরনের আত্মা– আসর হয়েছে, আর সত্যিকার অর্থে কবিতাকে কেবল অতিমানবীয়ই মনে করা হত না বরং এর যাদুকরী ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস ছিল। অনুপ্রাণিত কোনও কবির অভিশাপ শত্রুর ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারত। অপার্থিব শক্তির কবলে পড়ার অনুভূতি আরবে আধিভৌতিক অভিজ্ঞতার সাধারণ একটা বিষয় ছিল, আরবের কবি অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুরহিত বা পয়গম্বরদের নানা দায়িত্ব পালন করত। গোত্রের অবচেতন আশা আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিত সে, লোকে যখন তার কথা শুনত তখন যেন নিবিড়ভাবে আপনকণ্ঠস্বরই শুনতে পেত। ফলে আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে কবিদের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, তারা আমাদের সমাজের সংবাদপত্রের মত দায়িত্ব পালন করত, তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করত এবং ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা অন্যান্য গোত্রের কাছে পৌঁছাত যা প্রচারণা লড়াইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত।

অবশ্য আরও কিছু অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল যারা মুহাম্মদ (স:)-এর কালে এতটা সম্মানের অধিকারী ছিল না। *কাহিন* বা ভবঘুরে দরবেশরা ছিল বাইবেলের আদি পুস্তকসমূহে উল্লিখিত চারণ-ভবিষ্যৎবক্তাদের মত। তারা সামাজিক অর্থে পয়গম্বর ছিল না, বরং অনেকটা ছিল গণকের মত, কারও উট হারিয়ে গেলে বা ভবিষ্যৎ জানার জন্যে এদের শরণাপন্ন হত। *কাহিনরা* প্রায়শঃই অজ্ঞতা আড়াল করার জন্যে দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তার আশ্রয় নিত, ফলে সামঞ্জস্যহীন বা দুর্বোধ্য সুরে আবৃত্তি শুরু করত তারা। আমরা দেখব কেবল মুহাম্মদ (স:)-এর *কাহিনদের* প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না; তিনি তাদের ভবিষ্যৎবাণীকে তুচ্ছ অমঙ্গলময় আর অর্থহীন মনে করতেন।

তবে আরবদেরও আধ্যাত্মিক জীবন ছিল, এবং তার গুরুত্ব ছিল ওদের কাছে অপরিসীম। বিভিন্ন স্থানকে পবিত্র বলে গণ্য করা হত, উপাসনাগৃহও ছিল যেগুলোয় নির্দিষ্ট প্রাচীন দেবতার অধিষ্ঠান ছিল যাকে কেন্দ্র করে পূজা-আর্চা চলত। এসব উপাসনাগৃহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কা'বা, পবিত্র কুয়ো যমযমের কাছে এর অবস্থান। চৌকো গ্রানিট বাক্সের মত উপাসনালয়টি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন, ধ্বংস হয়ে যাওয়া অন্যান্য সৌধ আর উপাসনালয়ের মত ছিল দেখতে। এর পূর্ব কোণে স্থাপিত ছিল কৃষ্ণপাথর- যা সম্ভবতঃ কোনও এককালে মহাকাশ থেকে ছুটে আসা কোনও উলকাপিণ্ড ছিল-পৃথিবী ও স্বর্গের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। মুহাম্মদ (স:)-এর সময় কা'বাগৃহ আনুষ্ঠানিকভাবে দেবতা হুবালের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, বর্তমান জর্ডানে অবস্থিত নাবাতিয়ান রাজ্য থেকে যার আমদানি হয়েছিল আরবে। কিন্তু উপাসনালয়ের বিশেষত্ব আর মক্কার প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ধারণা করা হত যে

উপাসনালয়টি হয়তবা প্রকৃতপক্ষে আল্‌-লাহ্‌র–আরবদের পরম ঈশ্বর-নামে নিবেদিত ছিল। কা'বার চারপাশে একটা বৃত্তাকার এলাকা রয়েছে যেখানে তীর্থযাত্রীরা *তাওয়াফ* করার উদ্দেশ্যে সমবেত হত-*তাওয়াফ* ছিল সূর্যের দিকে মুখ করে উপাসনালয়টিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার একটি আচার। উপাসনালয়ের চারপাশে আরও ৩৬০ টি মূর্তি বা দেবী প্রতিমা ছিল, এগুলো হয়ত নির্দিষ্ট মাসে এখানে উপসানার উদ্দেশ্যে আগত বিভিন্ন গোত্রের টোটেম ছিল। মক্কার চারপাশের ভূমি (কা'বাকে কেন্দ্র করে বিশমাইল ব্যাসার্ধের এলাকা) ছিল পবিত্র, স্যাঙ্কচুয়ারি, যেখানে সব ধরনের সহিংসতা ও সংঘাত ছিল নিষিদ্ধ।

অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে বেড়ে ওঠা কারও কাছে একে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু কা'বার মত উপাসনাগৃহ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আচার আরবের গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটাত হয়ত; আমরা দেখব, মুহাম্মদ (স:) সারাজীবন কা'বার প্রতি রহস্যময় আকর্ষণবোধ করেছেন; আর প্রদক্ষিণের আনুষ্ঠানিকতা, বহিরাগতের চোখে যা খেয়ালি আর ক্লান্তিকর মনে হতে পারে, মক্কাবাসীদের কাছে ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এটা ক্ষোভ আর নিরাসক্ততার সঙ্গে পালন করে চলা একঘেয়ে কোনও দায়িত্ব ছিল না মোটেই। এতে তারা আনন্দ খুঁজে পেত এবং একে দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত করেছিল। সারাদিন সফল শিকার শেষে বাড়ি ফেরার আগে আনন্দের সঙ্গে কা'বাগৃহকে ঘিরে একবার চক্কর মেরে যেত; হয়ত বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিকটস্থ বাজারে মদ পান করতে রওনা দিয়েও আবার তার বদলে সন্ধ্যাটি প্রদক্ষিণের পেছনে ব্যয় করত, যখন দেখত তাদের পানের সঙ্গীরা আসেনি। এই আনুষ্ঠানিকতার কি এমন আকর্ষণ ছিল, লোকে কি অর্জন করছে বলে ভাবত?

মনে হয় যে উপাসনাগৃহটি সেমেটিক বিশ্বে সাধারণ ছিল। বৃত্ত, চারকোণ (পৃথিবীর চার কোণের প্রতীক) আর চারপাশের ৩৬০ প্রতীক সম্ভবত প্রাচীন সুমারিয়ান ধর্ম থেকে এসেছিল। সুমারিয়ান বছর ৩৬০ দিনে গণনা করা হত, আর বাড়তি ৫টি ছুটির দিন, যা 'বহিস্থঃ সময়' হিসাবে ব্যয়িত হত স্বর্গ-মর্ত্যকে সম্পর্কিতকারী বিশেষ অনুষ্ঠানাদি পালনের ভেতর দিয়ে। আরবীয় মতে এই পাঁচটি বিশেষ দিন সম্ভবত *হজ্জ* অনষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হত। বছরে একবার এই অনুষ্ঠানটি পালিত হত এবং পেনিনসুলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত আরবরা এতে অংশ নিত। কা'বায় শুরু হওয়ার পর হজ্জ মক্কার বাইরের বিভিন্ন উপাসনালয়ে ছড়িয়ে পড়ত—এসব উপসনালয় অন্যান্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। আদিতে শরৎকালে *হজ্জ* অনুষ্ঠিত হত, এটা মনে করা হয় যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুমূর্ষু সূর্যকে শীতের বৃষ্টি বয়ে আনতে রাজি করানোর প্রয়াস চালানো হত এর মাধ্যমে। তীর্থযাত্রীরা একযোগে মায্‌দালিফার গহবরে-বজ্রদেবতার আবাস-হাজির হয়ে আরাফাত পর্বতের– মক্কা থেকে ষোলমাইল দূরে পাহাড়টির অবস্থান– চারপাশে রাত জেগে পর্যবেক্ষণ চালাত। মিনার তিনটি পবিত্র স্তম্ভের উদ্দেশ্যে পাথর

ছুড়ত এবং সবশেষে পশু কোরবাণী দিত। আজ কেউ বুঝতে পারবে না এসব আনুষ্ঠানিকতার তাৎপর্য কি। মুহাম্মদ (স:)-এর সময় আসতে আসতে আরবরাও হয়ত এসবের তাৎপর্য ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু তারা প্রবলভাবে কা'বা ও আরবের অন্যান্য মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, ভক্তির সঙ্গেই আচার-অনুষ্ঠান পালন করে যেত।

আমাদের সবারই একান্ত একটা জায়গার প্রয়োজন রয়েছে যেখানে একাকী সময় কাটান যায় : তাতে আমরা আরও গোছাল এবং সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারি। আরবে যেখানে গোটা জীবনই ছিল তীব্র সংগ্রামের মত সেখানে উপসনালয়ের নিশ্চয়ই প্রবল প্রয়োজন ছিল। আরবরা এখানে শিথিল পরিস্থিতিতে মিলিত হতে পারত, জানত এখানে অবস্থানের সময়টুকু গোত্রীয় প্রতিশোধের রীতি রদ অবস্থায় থাকবে। কার্যক্ষেত্রে এখানে তারা পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পাদন করতে পারত, শত্রু পক্ষের গোত্রের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত অবস্থায়। এছাড়া মক্কার উপাসনালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল যেখানে বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হত। তবে উপাসনাগৃহ এবং এর আচার-অনুষ্ঠানাদি সম্ভবতঃ অত্যাবশ্যকীয় আধ্যাত্মিক অবকাশও জোগাত। *তাওয়াফ* ছিল বিনোদনের মত, আবরবদের নিজেদের গুছিয়ে নিতে এবং তাদের জীবনের অনন্ত মাত্রার একটা প্রতীকী ইংগিত খুঁজে পেতে সাহায্য করত।

একটি কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসা চারটি কোণের মাধ্যমে উপাসনাগৃহটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রতীক ছিল: বৃত্তটা যেন, প্রায় সব সংস্কৃতিতেই, অন্তহীনতার প্রতীক হিসাবে পরিলক্ষিত– সেটা বিশ্ব ও মনন উভয়েরই আদর্শরূপে। সময় এবং স্থান উভয় অর্থে এটা সামগ্রিকতাকে বোঝায় : একটা বৃত্তকে অনুসরণ বা প্রদক্ষিণ–বহু সংস্কৃতিতেই সাধারণ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা–বোঝায় যে তুমি ক্রমাগত যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানেই ফিরে আসছ : আবিষ্কার করছ শেষের মাধ্যমে আবার শুরু করছ তুমি। বৃত্তের কেন্দ্রে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর স্থির ক্ষুদ্র বিন্দুটি অনন্ত, পরম অবর্ণনীয় অর্থ; এর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে তীর্থযাত্রী নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে শেখে, নিজের এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের দেখা পায়। প্রদক্ষিণ ধ্যানের একটা পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে : অনেকটা দুলকিচালে সম্পাদিত হত, যেন *প্যাস জিমন্যাস্টিকের* চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। এতে শারীরিক একাগ্রতার প্রয়োজন যা কিনা একঘেয়ে হলেও মনকে উন্মুক্ত করতে সক্ষম করে তোলে। সব ধর্মের বেশির ভাগ পবিত্র স্থান পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলে বিশ্বাস করা হয় এবং তা তাদের দেবতাদের নির্মিত প্রথম স্থান। তীর্থযাত্রীর কাছে এসব আদি সূচনার মহত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তার মাঝে কোনওভাবে শক্তির কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটা অনুভূতি জাগে।

অভ্যন্তরীণ প্রবণতা গড়ে তুলতে সহায়তা করতে আমাদের সবার জীবনেই আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে : উদাহরণ স্বরূপ, সৌজন্যের আচার আমাদেরকে অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আমাদের

অপেক্ষাকৃত অধিকতর সেক্যুলার সমাজে অনেকেই আর এখন এ ধরনের প্রতীকী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না, তাই একে খেয়ালি আর পাগলামি মনে হয়। আমাদের জগতে, শিল্পী সমাজ জীবনের ভিন্নমাত্রা আবিষ্কারে সাহায্য করার জন্যে অর্থবহ প্রতীক সৃষ্টি করে থাকে। *তাওয়াফ* বা *হজ্জ* এর মত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আরবরা এক ধরনের শিল্পদক্ষতা অর্জন করছিল যার ভেতর দিয়ে তারা এমন এক অর্থ বা তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে যা সহজে ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। ওরা হয়ত অপ্রকাশ্য কিন্তু গভীর একটা স্তরে ওরা কি করছে তার প্রতীকী বৈশিষ্ট্যময় প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পেরেছিল–মনের এই অবস্থা আমরা পশ্চিমের অনেকেই হারিয়ে ফেলেছি। প্রটেস্ট্যান্ট সমাজে যারা বেড়ে উঠেছে তাদের পক্ষে এটা বুঝতে পারা বিশেষভাবে কষ্টকর, কারণ প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের কোনও কোনও ধারা আচার-অনুষ্ঠানকে গভীর প্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সন্দেহ আর বৈরিতার চোখে দেখে।

কা'বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাসনাগৃহ ছিল, তবে অন্য উপাসনালয়ও ছিল। প্রদক্ষিণ এবং ইসলামপূর্ব *হজ্জ* এ আরাফাত পর্বতে পালিত দাঁড়ান অবস্থায় উপাসনা করার পদ্ধতি পেনিনসুলার সর্বত্র গোত্রীয় অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ছিল। তেমনি ছিল আশ্রয়গ্রহণের অধিকারসহ আলাদা করে নেয়া জমি খণ্ড(*হিমা*)ও। অন্য কোনও উপাসনাগৃহই টিকে থাকেনি, তবে ইয়েমেনের নাজরান এবং মক্কার দক্ষিণে আল-আবালাতে কা'বার মত উপাসনালয়ের অস্তিত্বের কথা আমরা জানি, তবে আমাদের উপাখ্যানের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাসনালয় ছিল মক্কার খুব কাছে যেগুলো আল্-লাহ'র তিন কন্যা (*বানাত আল্-লাহ*)র জন্যে নিবেদিত ছিল। প্রাচীর ঘেরা তায়েফ নগরীতে ছিল আল্-লাতের মন্দির, যার নামের অর্থ স্রেফ 'দেবী', সাকিফ গোত্র এর পূজা করত; দেবীকে তারা আল্-রাব্বা, বা সার্বভৌম বলে সম্বোধন করতেও পছন্দ করত। নাখ্লাহয় ছিল আল-উয্যা'র মন্দির, তিন দেবতার মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয়, যার নামের অর্থ 'শক্তিমতী', এবং সাগর তীরবর্তী কুদাইদ-এর মন্দির ছিল মানাত বা নিয়তি-দেবীর। এসব দেবী গ্রেকো-রোমান দেব-দেবীদের মত ছিল না। জুনো বা প্যালাস অ্যাথেনার মত চরিত্র ছিল না এরা, যাদের নিজস্ব কাহিনী, কিংবদন্তী আর ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তাদের প্রভাবের বিশেষ কোনও স্তরও ছিল না-যুদ্ধ বা ভালবাসার মত। এসব স্বর্গীয় চরিত্রের প্রতীকী গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে আরবরা কোনওরকম কিংবদন্তী গড়ে তোলেনি; আর যদিও এদের ঈশ্বরের কন্যা বলে আখ্যায়িত করা হত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা একটা উন্নত দেবকুলের অংশ ছিল। আরবরা প্রায়শঃই বিমূর্ত সম্পর্ক বোঝাতে আত্মীয়তাসূচক শব্দের ব্যবহার করে থাকে, যেমন উদাহরণ স্বরূপ, *বানাত আল-দাহর* (আক্ষরিক অর্থে কাল/নিয়তির কন্যা) সোজাসুজি দুর্ভাগ্য বা ভাগ্যের উত্থান-পতন বোঝায়। *বানাত আল্-লাহর* মানে হয়ত কেবল 'স্বর্গীয় সত্তা' হতে পারে। উপাসনাগৃহে মানবাকৃতি প্রতিমা বা চিত্র দ্বারা এদের উপস্থাপিত করার বদলে খাড়াভাবে রাখা পাথরের সাহায্যে উপস্থাপন করা হত, বাইবেলে কানানবাসীদের যে ধরনের উর্বরতার

প্রতীকের বর্ণনা দেয়া আছে সেরকম। আরবরা যখন এসব পাথরকে সম্মান জানাত তখন কিন্তু সহজ অপরিণত উপায়ে উপাসনা করত না, বরং এগুলোকে তারা স্বর্গীয় অস্তিত্বের কেন্দ্র হিসাবে দেখত। এমনও মনে করা হয় যে এই তিন দেবী সেমেটিক উর্বরতার দেবী আনাত এবং ইশ্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সুতরাং আরবরা যাযাবর জীবন শুরু করার আগেই হয়ত তাদের উপাসনা শুরু হয়েছিল, যখন তারা সমতলে বাস করে কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল।[৩]

আরবরা হয়ত আল্-লাত, আল-উয্যা এবং মানাতকে প্রতিমা রূপে পূজা করত না, তবে আমরা দেখব তারা ওদের প্রতি খুবই আবেগপ্রবণ ছিল। এদের উপাসনা মন্দিরেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই গ্রিক এবং রোমানরা যেমন বাড়িতে বাড়িতে তাদের দেব-দেবীর পূজা করত তেমনটি ওরা করত না।[৪] কিন্তু হিজাজের বেদুঈনদের আধ্যাত্মিক দৃশ্যপটের অত্যাবশ্যকীয় অংশ ছিল এরা, যারা নাখলাহ্, তায়েফ এবং কুদাইদকে পবিত্র স্থান এবং উপাসনার গৃহ হিসাবে মনে করত, আরবরা যেখানে নিজেদের অস্তিত্বের খোঁজ পেত। দেবতাদের প্রাচীনত্ব ওদের উপসনা করার আরেকটা কারণ ছিল। আরবরা যখন বিভিন্ন মন্দিরে তাদের উপাসনা করত তখন তারা পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করত, তারাও এখানে *বানাত আল-ল্লাহর* প্রতি সম্মান দেখিয়েছিল, এতে করে তারা একধরনের ধারাবাহিকতার পরশও লাভ করত। ওদের উপসনালয়গুলো কা'বার মত গুরুত্ব না পেলেও আরবে তা পবিত্রস্থান বলে বিবেচিত হত এবং আরবের অপরাপর পবিত্র স্থানের মত দৃশ্যপটে অধিকার দাবী করার বিমূর্ত উপায় ছিল, আরবের রুক্ষ মরুপ্রান্তরকে যা এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রাসঙ্গিকতা দান করত। অনেক আরবের মৌলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এই প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি যেকোনও আঘাতের আশঙ্কাকে তারা নিজেদের প্রতি হুমকি বলে মনে করত।

কিন্তু অন্য আরবরা প্রাচীন ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল, এবং *জাহিলিয়াহর* শেষদিকে যেন আরবে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অস্থিরতা আর অসুস্থতা দেখা দিয়েছিল। গোত্র ব্যবস্থা ও প্রাচীন পৌত্তলিকতা শত শত বছর যাবত বেদুঈনদের প্রয়োজন মিটিয়ে এলেও ষষ্ঠ শতকে জীবনযাত্রা বদলে গিয়েছিল। যদিও আরবীয় পেনিনসুলার অধিকাংশ এলাকা সভ্যতার মূলধারার বাইরে ছিল, তবু আরবরা এর কিছু কিছু ধারণা আর প্রেরণা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ যেন ইহজীবনের পরে অন্যজীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কেও জানতে পেরেছিল যা, উদাহরণ স্বরূপ, ব্যক্তির পারলৌকিক নিয়তিকে মূল্যবান করে তুলেছিল। গোত্রীয় ব্যবস্থার সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এর মিল কোথায়? সভ্য এলাকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত আরবরা মনকাড়া গল্প বয়ে আনছিল, কবিদের মুখেমুখে ফিরছিল সিরিয়া আর পারসিয়ার চমকপ্রদ বর্ণনা। তবে এও মনে করা হত যে আরবরা হয়ত এ ধরনের ক্ষমতা আর জাঁকজমকের আশা করতে পারে না। গোত্র ব্যবস্থার ফলে তাদের পক্ষে স্বল্প পরিমান সম্পদ একত্রিত

করে ঐক্যবদ্ধভাবে দুনিয়ার মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, যার সম্পর্কে ওদের ধারণা ছিল আবছা। গোত্রগুলো যেন অন্তহীন সংঘাত আর প্রতিহিংসার চক্রে ঘুরপাক খেয়ে মরছিল : একটা রক্তবিবাদ অনিবার্যভাবে আরেকটা বিবাদের জন্ম দিত, একই সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নতুন জ্ঞান অস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক রীতিনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি উন্মূল ধারণা জন্ম নিয়েছিল স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী আরবদের মনে। ষষ্ঠ শতকে একটা গোত্র দক্ষিণ আরবের এক সংঘাতময় এলাকা থেকে ইয়াথরিবের মরুদ্যানে অভিবাসী হয়ে ওখানকার ইহুদী গোত্রসমূহের আশপাশে বসতি গড়ে। এখানে কৃষিকাজে সফল হয় তারা, কিন্তু এটা বুঝতে পারে যে আরবরা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ঘুরে না বেড়িয়ে পরস্পর কাছাকাছি বসবাস করলে গোত্র ব্যবস্থা আর কার্যকর থাকে না। সপ্তম শতকের শুরুর দিকে গোটা মরুদ্যান যেন সহিংসতা আর যুদ্ধবিগ্রহের দুষ্টচক্রে আটকা পড়েছিল। কিন্তু মক্কায় কুরাইশ গোত্র- এই গোত্রেই ৫৭০ খৃস্টাব্দের দিকে মুহাম্মদ (স:) জন্মলাভ করেন- আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল, আরও বেশি দুর্বোধ্য এক অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়েছিল এটা, কারণ তারা আবিষ্কার করেছিল নাগরিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পুরনো ধ্যান-ধারণা আর কাজে আসছে না।

পঞ্চম শতকের শেষের দিকে কুরাইশরা মক্কায় বসতি গড়ে তোলে। ওদের পূর্বপুরুষ, কুসাঈ, তাঁর ভাই যুহ্‌রা এবং চাচা তাঈম উপাসনাগৃহের পাশে মক্কা উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন। অপর এক চাচার ছেলে মাখযুম এবং তার চাচাত ভাই জুমাহ্‌ ও সাহ্‌ম কুসাঈয়ের সঙ্গে বসতি করেছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের নামধারী পরিবার কুরাইশ অব দ্য হলো[৫] নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। কুসাঈয়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা আশপাশের গ্রামাঞ্চলে বসতি গড়ে এবং কুরাইশ অব দ্য আউটস্কার্টস নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে যে কুসাঈ সিরিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে আল-লাত, আল-উযযা আর মানাত এই তিন দেবীকে হিজাজে নিয়ে আসেন, আর তিনিই নেবাতীয় দেবতা হুবলকে কা'বায় স্থাপন করেন। শক্তি আর কৌশলের মিলিত এক লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে কুরাইশরা মক্কার নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হয়েছিল এবং পবিত্র আস্থা রাখতে ব্যর্থ বলে বিবেচিত এর হেফাযতকারী গোত্র খুযা'অহকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। কুসাঈয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আব্দ আদ-দার এবং আব্দ মানাফ স্পষ্টতই বিবাদে লিপ্ত হন এবং তাঁদের এই বিরোধের জের উত্তরপুরুষের মাঝেও প্রবাহিত হয়ে মুহাম্মদ (স:)-এর সময় পর্যন্ত মক্কার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে চলে। আব্দ আদ-দার ছিলেন কুসাঈয়ের সবচেয়ে প্রিয় ছেলে এবং মাখযুম, সাহ্‌ম, জুমাহ্‌, তাদের চাচা আদি এবং পরিবার তাঁকে সমর্থন জোগাত। তারা আহলাফ বা কনফেডারেট নামে পরিচিত হতে থাকেন। কুসাঈয়ের কনিষ্ঠ পুত্র আব্দ মানাফ উত্তরাধিকারের দাবী তুলে ধরেন এবং ভাস্তে আসাদ, যুহরাহ্‌ এবং সম্মানিত আল-হারিস ইবন ফিহ্‌রের সমর্থন লাভ

করেন। কাবা'য় সুগন্ধী ভর্তি এক গামলায় হাত ডুবিয়ে তারা চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলেন বলে মুতায়াবান বা সেন্টেড ওয়ান নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু কোনও পক্ষই ব্যাপক সংঘাতে জড়াতে রাজি ছিল না, ফলে একটা আপোসরফায় পৌঁছান গিয়েছিল যার ফলে আব্দ আদ-দার এবং কনফেডারেটরা নামমাত্র সুবিধা বজায় রাখলেও মূল ক্ষমতা চলে গিয়েছিল আব্দ মানাফ এবং সেন্টেড ওয়ানদের হাতে। তাদের উত্তরাধিকারীরা পুরনো এই মৈত্রী বজায় রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল।

পশু পালনের প্রাচীন পেশার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু করেছিল কুরাইশরা। দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে মক্কার অবস্থান ছিল লাগসই। কা'বার সম্মান বা মর্যাদা প্রত্যেক বছর হজ্জ উপলক্ষ্যে বহু আরবকে টেনে আনত, আর স্যাঙ্কচুয়ারি সৃষ্ট পরিবেশও ব্যবসায়ের উপযোগি ছিল। আরবের দুটো প্রধান বাণিজ্য পথের মাঝখানে সুবিধাজনক জায়গায় ছিল মক্কার অবস্থান : হিজাজ রোড, লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূল বরাবর এগিয়ে যাওয়া এপথটি ইয়েমেনকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল; আর নজদ রোড, যা ইয়েমেনকে ইরাকের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। কুরাইশরা অত্যন্ত সফল হয়ে উঠেছিল। এলাকার বেদুঈনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তুলেছিল ওরা। যাযাবররা কুরাইশদের তুলনায় দক্ষ যোদ্ধা ছিল, সামরিক সহায়তার বিনিময়ে তারা মক্কার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশীদারী পেয়েছিল। *হিলম* নামে পরিচিত এক চতুর হিসাবী রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা কৌশল চর্চার মাধ্যমে ষষ্ঠ শতকে কুরাইশরা আরবের মহাশক্তিতে পরিণত হয়।

ওরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে পরাশক্তির হাতে শোষিত হওয়া চলবে না, তাই দক্ষিণের রাজ্যের ভাগ্য বরণ এড়াতে পারসিয়া ও বাইযানটিয়ামের যুদ্ধে কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। কিন্তু ৫৬০ খৃস্টাব্দের দিকে বাইযানটাইনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে,[৬] দক্ষিণ আরব তখনও আবিসিনিয়ার একটা প্রদেশ ছিল, আবিসিনিয়া ছিল আবার বাইযানটিয়ামের করদরাজ্য। আবরাহা, দক্ষিণ আরবের আবিসিনিয় গভর্নর মক্কার বাণিজ্যিক সফলতায় সম্ভবত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল, নগরী আক্রমণ করার প্রয়াস পেয়েছিল সে। এই ঘটনাটি কিংবদন্তীর অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছে। তবে মনে করা হয় যে কুরাইশদের সাফল্যের ক্ষেত্রে কা'বার গুরুত্ব আবরাহা বুঝতে পেরেছিল। তীর্থযাত্রীদের দক্ষিণ আরবে নিয়ে যেতে এবং সেই সুবাদে ব্যবসার আকার বাড়ানোর লক্ষ্যে সানায় ডোরাকাটা মার্বল পাথরের একটা ক্রিশ্চান গির্জা নির্মাণ করেছিল সে; বলা হয়ে থাকে, যখন সে মক্কার উপকণ্ঠে শিবির ফেলে, তার প্রতিজ্ঞা ছিল কা'বা ধ্বংস করার। কিন্তু নগরীর দ্বারপ্রান্তে আসামাত্র তার সেনাবাহিনী যেন মহাব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পশ্চাদপসারণে বাধ্য হয়। এই নাটকীয় রক্ষাপ্রাপ্তি কুরাইশদের চোখে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হয়। আবিসিনিয়রা তাদের সঙ্গে একটা হাতি নিয়ে এসেছিল, মক্কাবাসীরা বিশালদেহী অদ্ভুতদর্শন

প্রাণীটিকে দেখে বিস্ময় অভিভূত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এটা বলা হতে থাকে যে, নগরীর বাইরের পবিত্র এলাকায় আসার পর হাতিটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং সামনে বাড়তে অস্বীকৃতি জানায়: এরপর ঈশ্বর উপকূল থেকে এক ঝাঁক পাখি পাঠিয়ে দেন, পাখিগুলো আবিসিনিয়দের ওপর বিষাক্ত পাথর নিক্ষেপ করে, যার ফলে তারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। হাতির এই ঘটনাটি কুরাইশদের কাছে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, মুহাম্মদ (স:)-এর প্রথম জীবনীকার যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, অলৌকিক ঘটনার পর বেদুঈনরা কুরাইশদের দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে, তারা বলত, 'ওরা ঈশ্বরের জাতি: ঈশ্বর ওদের পক্ষে লড়াই করেছেন আর শত্রুপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।'[৭] হাতির গল্প মুহাম্মদ (স:)কেও আলোড়িত করেছিল, কোরানের ১০৫ নম্বর সুরায় যার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনার পর কুরাইশরা তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হয়ে ওঠে, সপ্তম শতকের শুরুর দিকে যাযাবর জীবনে যা কল্পনারও অতীত ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি ধনী হয়ে গিয়েছিল তারা। স্বভাবতই সম্পদ আর পুঁজিবাদে মুক্তি দেখতে পেয়েছিল তারা, যেন এগুলোই তাদের দারিদ্র আর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, দিয়েছে ঈশ্বরসম নিরাপত্তা। তারা আর ক্ষুধায় কাতর ছিল না, শত্রু গোত্রের আক্রমণে ব্তিব্যস্তও নয়। অর্থ, আমরা দেখব, প্রায় ধর্মীয় মূল্য পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু আগ্রাসী পুঁজিবাদ প্রাচীন সাম্প্রদায়িক গোত্রীয় মূল্যবোধের সঙ্গে মানানসই ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তা এক ধরনের বলগাহীন লোভ আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে উৎসাহ জুগিয়েছিল। বিভিন্ন ক্ল্যান তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, মুহাম্মদ(স:) যখন কিশোর, তখন তারা দুটো প্রধান দলে ভাগ হয়ে যায়। দুর্বল ক্ল্যানগুলোর কিছু কিছু, হাশিমের ক্ল্যানসহ–মুহাম্মদ (স:)-এর জন্ম এ দলেই— অন্যদের মত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি, তাদের মাঝে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অনুভূতি জেগে উঠেছিল। প্রাচীন গোত্রীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী সমভাবে সম্পদ ভোগ করার পরিবর্তে ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পদ গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এতিম আর বিধবাদের অধিকার হরণ করছিল তারা, এদের সম্পদ কুক্ষিগত করছিল, দুর্বল ও নারীদের প্রতি মনযোগ দেয়া হচ্ছিল না, প্রাচীন রীতি অনুযায়ী যেটা করা উচিত ছিল। নব অর্জিত সমৃদ্ধি প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ঘটিয়েছিল এবং ব্যর্থ কুরাইশদের অনেকেই এক ধরনের ভ্রান্তি আর সর্বস্বান্ত বোধে আক্রান্ত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর সফল ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার আর অর্থযোগানদাতারা নতুন ব্যবস্থায় খুবই খুশি ছিল। প্রায় ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে তারা উগ্রভাবে আরও সম্পদ আহরণে মেতে উঠেছিল। যাযাবর জীবনের দরিদ্র অবস্থা থেকে মাত্র দুপ্রজন্ম সময়ের ব্যবধানে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে অর্থ আর পণ্য সামগ্রী তাদের রক্ষা করতে সক্ষম এবং যত বেশি সম্ভব এসব জিনিস সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউ ক্রমশঃ মোহমুক্ত

হয়ে উঠছিল, তারা যেন নগরীর এই অসুস্থ আর অস্থির আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অবস্থার নতুন সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, ইসলাম মরুভূমির ধর্ম, কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। কোরানের বাণীকে দুটো প্রাচীন গোত্রীয় নীতিমালা প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু দুর্দম পুঁজিবাদ আর বিপুল সমৃদ্ধির পরিবেশে মক্কার আরবরাই প্রথম নতুন ধর্মকে গ্রহণ করেছে। অন্য সকল মহান কনফেশনাল ধর্ম ও গ্রীসের দার্শনিক যুক্তিবাদের মত ইসলামও নগরীরই সৃষ্টি। আমরা যারা নাযারেথের স্বর্গীয় জেসাসকে ধর্মীয় চেতনার প্রতীক বা সারকথা বলে ভেবে বড় হয়েছি তাদের কাছে বিষয়টি বিসদৃশ মনে হতে পারে। একজন পয়গম্বর লন্ডন নগরীতে বা ওয়ালস্ট্রিটে বেড়ে উঠবেন, এটা আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, কুনফুসিয়ানবাদ-সবই বাণিজ্য এলাকায় বিকশিত হয়েছে। গ্রিক দার্শনিকেরা '*আগোরা*'য় শিক্ষাদান করতেন, আর ইসরাইলের মহান পয়গম্বররাও এমন এক সময়ে বিভিন্ন নগরে ধর্মপ্রচার করেন যখন ইসরাইলীরা সবে যাযাবর জীবন পেছনে ফেলে আসতে শুরু করেছে। এই বিশ্ব ধর্মগুলো নাগরিক জীবনের বাণিজ্যিক আবহে গড়ে উঠেছে, এমন এক সময়ে যখন ব্যবসায়ীরা একসময় কেবল রাজা, অভিজাত মহল আর পুরহিত সমাজের হাতে থাকা ক্ষমতার একটা অংশ কেড়ে নিতে শুরু করেছিল। নতুন সমৃদ্ধি ধনী গরীবের মাঝের ব্যবধানের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, সামাজিক ন্যায় বিচারের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল তারা। সকল ধর্মীয় মহান নেতা এবং পয়গম্বরগণ এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন এবং নিজস্ব বিশেষ সমাধানের উপায় বলেছেন। সপ্তম শতকের শুরুর দিকে, কুরাইশ এবং অন্যান্য কিছু আরব যখন যাযাবর জীবন পেছনে ফেলে স্থায়ী বসতি করার সামাজিক সমস্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, তখন ইসলামের পয়গম্বর আরবদের কাছে এক নতুন ধর্মীয় বাণী নিয়ে আসেন।

মানুষ ইতিমধ্যে একটা একেশ্বরবাদী ধর্ম খুঁজে ফিরতে শুরু করেছিল, এবং কেউ কেউ ঈশ্বরের একত্ববাদ সংক্রান্ত মুহাম্মদের (স:) বাণী শোনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল। তিনি যখন মক্কায় ধর্ম প্রচার শুরু করেন তখন সাধারণভাবে স্বীকার করা হত যে কা'বা হুবালের আশ্রয় স্থান হলেও আসলে তা পৌত্তলিক আরবদের সর্বোচ্চ দেবতা আল-লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে বহু সংখ্যক আরবের জীবনে আল-লাহ্ অতীতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। অনেক আদিম ধর্মেই সর্বোচ্চ বা পরম ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, যাঁকে মাঝে মাঝে আকাশ দেবতা বলে ডাকা হত। এই দেবতা স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি করার পর যেন অবসরে গেছেন বলে বিশ্বাস করা হত। দেখা যেত না বলে মানুষ এই অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল, তাঁর স্থান দখল করে নিয়েছিল আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং বোধগম্য দেব-দেবী। উর্বরতার দেবীরা বিশেষ করে নারী-পুরুষরা স্থায়ী বসতি গড়ে চাষাবাদ শুরু করার পরপরই তাদের জীবনে দ্রুত

প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইহুদী ধর্মগ্রন্থে আমরা এটা দেখতে পাই। প্রাচীন ইসরাইলীরা বা'আল, আনাত আর অস্টারদ'র উপাসনা শুরু করেছিল কানানে বসতি করার পরপর–পরম ঈশ্বর ইয়াহওয়েহর পাশাপাশি। এসব প্রাচীন দেব-দেবীকে উপেক্ষা করা নির্বুদ্ধিতার সামিল বলে মনে করা হয়েছে, কারণ জমি সম্পর্কে ওদের জ্ঞান ছিল ঢের বেশি। কিন্তু বিপদ-আপদের সময় তারা আবার ইয়াহওয়েহরই শরণাপন্ন হত।

যাযাবর কালে আরবীয় দেবীদের প্রাচীন উর্বরতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্ভবতঃ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল, ফলে পরম ঈশ্বর আল্-লাহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। পবিত্র কোরান এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে কুরাইশরা বিশ্বাস করত আল্-লাহ পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন। এই বিষয়টি নিশ্চিত বলে ধরে নেয়া হয়েছে :

যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর,
"কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে
এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে?"
ওরা অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ্..."[৮]

কিন্তু তারা অপরাপর দেবতার উপাসনা অব্যাহত রেখেছিল, ওদের কাছে যাদের গুরুত্ব অনেক গভীর ছিল। প্রাচীন ইসরাইলীদের মত আরবরা সহজ সময়ে আল্-লাত, আল-উয্যা এবং মানাতের উপাসনা করত, কিন্তু সঙ্কটকালে সহজাতভাবেই আল্-লাহর শরণাপন্ন হত, বিপদে সাহায্য করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই ছিল। কোরানে দেখা যায় যে, ওরা যখন সমুদ্র যাত্রা করত-আরবদের কাছে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এটা-তখন ঘনঘন আল্-লাহকে স্মরণ করত যতক্ষণ না বিপদ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু নিরাপদে তীরে পৌছার পরই আবার অন্য দেবতাদের দিকে ঝুঁকে পড়ত।[৯]

তবে কেউ কেউ যেন আরও অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল। সপ্তম শতকের শুরুর দিকে অধিকাংশ আরব বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে তাদের পরম ঈশ্বর আল্-লাহ'ই ক্রিশ্চান ও ইহুদীদের উপাস্য ঈশ্বর। ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষাগ্রহণকারী আরবরাও তাদের ঈশ্বরকে 'আল্-লাহ' সম্বোধন করত এবং পৌত্তলিকদের পাশাপাশি তাঁর উপাসনালয়ে হজ্জ পালন করত। কিন্তু আরবরা ক্রমবর্ধমান হারে আল্-লাহ যে তাদের কোনও গ্রন্থ প্রেরণ করেননি সে ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছিল। মুহাম্মদ (স:)-এর প্রথমদিকের জীবনীগুলোয় আমরা দেখতে পাই 'কিতাবধারী জনগণে'র প্রতি পৌত্তলিক আরবদের মাঝে প্রগাঢ় সম্মানবোধ ছিল, যাদের সঙ্গে ছিল ওদের জনগণের অনেক ফারাক। ওদের কেউ কেউ এমন এক সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে মনস্থির করেছিল যা পরাশক্তি বা ঔপনিবেশিকতাবাদ আর বিদেশী নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সংযোগের ফলে কলুষিত হয়ে পড়েনি। পঞ্চম শতকের

গোড়ার দিকে, সযোমেনাস নামের এক প্যালেস্টাইনী ক্রিশ্চান ঐতিহাসিক আমাদের জানাচ্ছেন যে, আরবদের কেউ কেউ অব্রাহামের ধর্মকে পুনরাবিষ্কার করে সেই আমলের মত করে অনুশীলন শুরু করেছিল। স্পষ্ট করে বলতে গেলে অব্রাহাম ক্রিশ্চান বা ইহুদী কোনওটিই ছিলেন না। মোজেসের আগে এসেছিলেন তিনি। ইসরাইলবাসীদের জন্যে তোরাহ নিয়ে এসেছিলেন মোজেস। মুহাম্মদ (স:) যখন প্রত্যাদেশ পাচ্ছিলেন সেই সময়ের আরবে, আমরা লক্ষ্য করব, কিছু সংখ্যক আরব অব্রাহামের ধর্ম পালন করছিল।

জীবনীগ্রন্থে ইবন ইসহাক আমাদের জানাচ্ছেন, মুহাম্মদ (স:) তাঁর মিশন শুরু করার অব্যবহিত আগে কুরাইশদের চারজন সদস্য কা'বায় মূর্তিপূজা থেকে নিজেদের বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা সত্য ধর্মানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। এক গোপন চুক্তিতে উপনীত হন তাঁরা এবং স্বগোত্রীয়দের উদ্দেশে বলেন, ওরা :

> পিতা অব্রাহামের ধর্মকে অপবিত্র করেছে আর এক পাথরকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে যেটা মূল্যহীন, এর শোনার, দেখার, কারও ক্ষতি বা সাহায্য করার ক্ষমতা নেই : 'একটা ধর্ম অনুসন্ধান করো তোমরা,' বলেছেন তাঁরা, 'কারণ ঈশ্বরের দোহাই, তোমাদের কোনও ধর্ম নেই।' সুতরাং তাঁরা *হানিফায়াহ* বা অব্রাহামের ধর্মের খোঁজে পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।[১০]

কোনও কোনও পশ্চিমা পণ্ডিত যুক্তি দেখান যে ক্ষুদ্র *হানিফায়াহ্* গোত্র আসলে একটা ধর্মীয় কিংবদন্তী, *জাহিলিয়াহর* শেষ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক অস্থিরতার প্রতীকী রূপ, ঐতিহাসিক বাস্তবতা নয়। তবে এর বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয়ই ছিল। চারজন সদস্যের মধ্যে তিনজন সদস্য মুহাম্মদ (স:)-এর জীবনে মিশে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হয়েছেন, এবং চতুর্থজন উসমান ইবন আল-হুয়েরিথ, মুহাম্মদের (স:) বয়স যখন বিশের কোঠায় তখন মক্কার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বণিক, ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা লাভ করে সগোত্রীয় লোকদের তাঁকে রাজা হিসাবে মেনে নেয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে বাইযানটাইনদের সঙ্গে সহজ শর্তে ব্যবসা করার ব্যবস্থা করবেন, যারা সম্ভবতঃ মক্কাকে করদরাজ্য হিসাবে পেতে চেয়েছিল। তাঁর প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয় : সকল আরবদের মত কুরাইশরাও রাজতন্ত্রের ধারণার ঘোরতর বিরোধী ছিল।

অন্য তিন *হানিফ* মুসলিমদের সূচনাকালে সুপরিচিত ছিলেন। উবায়দাল্লাহ ইবন জাহ্শ ছিলেন মুহাম্মদ (স:)-এর চাচাত ভাই। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও পরে আবার খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরও দেখব যে ওয়ারাকা ইবন নাউফলও ক্রিশ্চান হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন মুহাম্মদ (স:)-এর প্রথম স্ত্রীর চাচাত ভাই এবং তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির সময় মূল্যবান প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। কিন্তু কিংবদন্তীর এই গোত্রের সর্বশেষ সদস্যটি

আজীবন সন্ধানী রয়ে যান এবং স্বীকৃত কোনও ধর্মমতই গ্রহণ করেননি। যায়েদ ইবন আম্‌র কেবল কাবা'য় উপাসনাই বন্ধ করেননি, তিনি পৌত্তলিকতার একজন উচ্চকণ্ঠ সমালোচক ছিলেন বলেও শোনা যায়। তার সৎভাই খাত্তাব ইবন নুফায়েল গোঁড়া পৌত্তলিক ছিল, যায়েদের দেবীদের প্রতি অশ্রদ্ধা আর ধর্মদ্রোহী আচরণে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে শহর ছাড়তে বাধ্য করেছিল। বলা হয়ে থাকে উগ্র পৌত্তলিকদের একটা দল গঠন করে মক্কার উপকণ্ঠের পাহাড়সারি প্রহরা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল সে যাতে আত্মগোপনের স্থান থেকে যায়েদ উপাসনাগৃহে আসতে না পারেন। ফলে যায়েদ হিজাজ ত্যাগ করে সত্য ধর্মের সন্ধানে সভ্য দেশগুলো ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছিলেন। ইরাকের মাসুল থেকে শুরু করে সিরিয়া পর্যন্ত যান তিনি, পথে যেখানে মঙ্ক বা রাব্বির দেখা পেয়েছেন সেখানেই অব্রাহামের খাঁটি ধর্মের কথা জানতে চেয়েছেন। এভাবেই এক মঙ্কের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর, যে তাঁকে জানায় যে মক্কায় এক পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে যিনি তার কাঙ্ক্ষিত ধর্ম প্রচার করবেন, তো যায়েদ তখন আবার স্বদেশের পথ ধরেছিলেন, কিন্তু সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান, মুহাম্মদ (স:)-এর সঙ্গে আর যোগাযোগ ঘটেনি তাঁর। অবশ্য তার ছেলে সা'দ মুহাম্মদের (স:)-একজন বিশিষ্ট সহচরে পরিণত হয়েছিলেন।

কাহিনীটি শিক্ষা-মূলক। অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় সেই সময়ের কিছু আরবের অনুসন্ধিৎসু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধিতাকারী কি ধরনের শাস্তি পেতে পারে তাও দেখা যাচ্ছে। খাত্তাব ইবন নুফায়েলের মত অনেক কুরাইশ ছিল যারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি অনুগত ছিল, তারা প্রাচীন দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনতে পারত না। তারা পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করত না : কা'বার ধর্ম যথেষ্ট অর্থবোধক এবং নাগরিক কুরাইশদের একতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তা। আমরা দেখব খাত্তাবের ছেলে উমর প্রবলভাবে তাঁর বাবার প্রাচীন ধর্মের প্রতি ভালবাসাকে মূল্য দিতেন। কিন্তু বিকল্প ধর্মের আকাঙ্ক্ষা রয়েই গিয়েছিল। কথিত আছে যে, মক্কা নগরী ত্যাগে বাধ্য হওয়ার আগের দিন, কা'বার পাশে উপাসনাগৃহের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যায়েদ, প্রদক্ষিণরত কুরাইশদের উদ্দেশে তিনি বলছিলেন : 'হে কুরাইশগণ, যার হাতে যায়েদের জীবন তার দোহাই, আমি ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কেউই অব্রাহামের ধর্মের অনুসরণ করছে না।' তারপরই তিনি যোগ করেছিলেন : 'হে ঈশ্বর, যদি জানতাম কিভাবে উপাসনা তোমার পছন্দ তাহলে সেভাবেই তোমার উপাসনা করতাম, কিন্তু আমি যে জানি না।'[১১] অবশ্য অচিরেই এই আরবের প্রার্থনার সাড়া মিলেছিল।

৪. প্রত্যাদেশ

মুহাম্মদ (স:)-এর প্রথমে জীবন সম্পর্কে খুব বেশি জানা নেই আমাদের। চল্লিশ বছর বয়সে পয়গম্বরত্ব লাভের আগে তাঁর অভিজ্ঞতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় পবিত্র কোরানে :

> 'তিনি কি তোমাকে অনাথ অবস্থায় পাননি আর তোমাকে আশ্রয় দেননি?
> তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হাদিস দেননি?
> তিনি তোমাকে কি অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেননি?'[1]

পরবর্তীকালে মুসলিম কিংবদন্তী এসব অতি বাস্তব বিষয়কে আরোপিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আড়াল করেছে, অনেকটা ম্যাথু ও ল্যূক লিখিত গসপেলে যেমন জেসাসের জন্মসংক্রান্ত কাল্পনিক গল্প আরোপিত হয়েছে, জেসাসের জন্ম, শিশুকাল আর শৈশব ধর্মীয় বাস্তবতার কাব্যিক রূপ : এগুলো জেসাসের মিশনের প্রকৃতির কথা বলে এবং বোঝানোর চেষ্টা করে যে মাতৃজঠরে থাকা অবস্থাতেই তিনি মহৎ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জেসাস এবং মুহাম্মদ (স:) দুজনই নায়কে পরিণত হয়েছেন, প্রায় রূপদী অর্থে। দুজনই অভিজ্ঞতার নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন, বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন এবং আপন জনগোষ্ঠীর কাছে এমন এক উপহার পৌঁছে দিয়েছেন যা তাদের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে, প্রমিথিউস যেমন দেবতার কাছ থেকে আগুন চুরি করে মাটির পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলার জন্যে। এ ধরনের মহাপুরুষদের ছেলেবেলার কাহিনী প্রায়ই তাঁদের এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন আমাদের জ্ঞানের অতীত কোনও শক্তির বলে ব্যতিক্রমী নিয়তির জন্যে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। জেসাস একজন ক্যারিশম্যাটিক চিকিৎসকে পরিণত হয়েছিলেন এবং অলৌকিকতা ছিল তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের অন্যতম উপাদান। অন্যদিকে মুহাম্মদ (স:) কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখাননি, তিনি সবসময় বলতেন কোরান অবতীর্ণ হওয়াটাই অলৌকিক ঘটনা এবং তা এর ঐশী উৎসের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন তিনি 'আর সব মানুষের মতই' এবং কোরান তা নিশ্চিত করেছে। সবে উদ্ধৃত

কোরানের আয়াতে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেছেন তখন মুহাম্মদ (স:) 'ভুল করছিলেন'।[২] সুতরাং তাঁর মায়ের অন্তসত্ত্বা হওয়ার অলৌকিক কাহিনী এবং ছেলেবেলার গল্প বাকী জীবনের বৈশিষ্ট্যসূচক নয়, তবে এগুলো তাঁর পয়গম্বরত্বের প্রকৃতির কাব্যিক চিন্তার প্রকাশ, এবং তিনি 'জাতি সমূহের কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ছিলেন'–পরবর্তীকালে মুসলিমদের এ বিশ্বাসেরও পরিচায়ক : এমনকি ক্রিশ্চান ও ইহুদীরাও তাঁর আগমনের অধীর আপেক্ষা করছিল।

জনৈক ক্রিশ্চান মঙ্ক যায়েদ ইবন 'আমর অর্থাৎ *হানিফের* কাছে একজন আরবীয় পয়গম্বরের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। মুহাম্মদ (স:)-এর তরুণ বয়সে এবং মুসলিম সমাজে এটা স্থায়ী মটিফ। প্রকৃতপক্ষে হিজাজের আরবদের সঙ্গে ক্রিশ্চানদের খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না, খৃস্টধর্ম সম্পর্কে বলতে গেলে তারা অজ্ঞই ছিল। মুহাম্মদ (স:)-এর পরলোকগমনের পরেই মুসলিমরা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে সমৃদ্ধ ও কার্যকর গির্জার সঙ্গে পরিচিত হয়, খৃস্টধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কোরানের উপলব্ধি সীমিত, কিন্তু জেসাসের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বৈরী নয়। মুহাম্মদের (স:) প্রতি প্রেরিত প্রত্যাদেশকে কোরান অতীতের ধর্মবিশ্বাসের ধারাবাহিকতা ও নিশ্চয়তা হিসাবে দেখেছে। সিরিয়াক চার্চের কিছু আরব ক্রিশ্চান গসপেলের একটি অনুচ্ছেদকে এমনভাবে অনুবাদ করেছিল যাতে মনে হয় তারা মুহাম্মদ (স:)-এর বাণীর প্রত্যাশা করছিল। জেসাস বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর অনুসারীদের কাছে একজন সান্ত্বনাদাতা (Paraclete) পাঠাবেন, যিনি তাঁর শিক্ষা মনে করিয়ে দিয়ে বুঝতে সাহায্য করবেন।[৩] সিরিয়াক লেকশনারীতে 'প্যারাক্লিট' শব্দটি অনূদিত হয়েছে '*মুনাহহেমা*'(munahhema) হিসাবে, যা ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে 'মুহাম্মদের' কাছাকাছি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অন্য আরব ক্রিশ্চানরা 'প্যারাক্লিটে'র পরিবর্তে *পেরিক্লিইটোস* (Periklytos) পাঠ করত যা আরবী ভাষায় '*আহমেদ*' হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। আরবে এটা একটা প্রচলিত নাম ছিল এবং মুহাম্মদের মত এরও অর্থ ছিল 'প্রশংসিত'। মুহাম্মদ (স:) নিঃসন্দেহে এই অনুবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, কেননা 'আহমেদ' নামের একজন পয়গম্বর তাঁর পরবর্তীকালে আগমন করে তাঁর বাণীকে পূর্ণতা দেবেন, জেসাসের এমন ভবিষ্যৎবাণীর কথা কোরানে উল্লেখ রয়েছে।

উত্তরের কৃষিভিত্তিক বসতির আরব ইহুদীরাও পেনিনসুলায় একজন পয়গম্বরের আগমনের অপেক্ষা করছিল বলে বিশ্বাস রয়েছে। এমন হতে পারে ত্রাণকর্তার আগমন সংক্রান্ত বিশ্বাস জোরাল হয়ে উঠেছিল যা প্রচলিত ইহুদী কাহিনীগুলো *জাহিলিয়াহর* শেষ পর্যায়ের আরবের অস্থিরতাকে তুলে ধরেছে। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন একজন রাব্বি সিরিয়া থেকে ইয়াথরিবে আগমন করেছিলেন। তাঁকে যখন লোকে জিজ্ঞেস করেছিল চমৎকার উর্বরা দেশ ছেড়ে কেন তিনি 'কষ্টময় আর ক্ষুধাপ্রবণ দেশে' এসেছেন, তিনি জবাব দিয়েছিলেন 'মহাপুরুষে'র আগমন মুহূর্তে তিনি হিজাজে থাকতে চান। 'তাঁর আগমনের সময় হয়ে গেছে,' ইয়াথরিবের ইহুদী

গোত্রসমূহের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের আগে যেন আর কেউ তাঁর দেখা না পায়, হে ইহুদীগণ, কারণ তাঁকে পাঠানো হবে রক্তপাত ঘটাতে আর যারা তাঁর বিরোধিতা করবে তাদের স্ত্রী আর বাচ্চাদের বন্দী করার জন্যে। কিন্তু সেজন্যে তোমরা তাঁর থেকে দূরে সরে থেক না।'[৫] ত্রাণকর্তার আগমন সংক্রান্ত উত্তেজনা ইয়াথরিবের পৌত্তলিক আরবদের মাঝে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারা গ্রন্থের মাধ্যমে ইহুদীদের কাছে রক্ষিত প্রত্যাদেশের তুলনায় নিজেদের ধর্মকে নিম্নমানের ও অপর্যাপ্ত মনে করত। পরবর্তীকালে এদেরই একজন মরুদ্যানে আরব গোত্র ও ইহুদীদের মাঝে বিরাজমান উত্তেজনা স্মরণ করে বর্ণনা দিয়েছে :

> আমরা ছিলাম বহু-ঈশ্বরবাদী, মূর্তি পূজা করতাম, আর ওরা (ইহুদী) ছিল ঐশীগ্রন্থের জাতি, আমাদের চেয়ে জ্ঞানী। আমাদের মাঝে লাগাতার বৈরিতা ছিল, আমরা যখন ওদের চেয়ে ভাল কিছু পেতাম, ঘৃণা উস্কে উঠত তাদের মনে, তারা বলত : 'প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের আগমনের সময় হয়ে গেছে। তাঁর সাহায্যে আমরা তোমাদের হত্যা করব যেভাবে আদ আর ইরাম ধ্বংস হয়েছিল। প্রায়ই ওদের একথা বলতে শুনতাম আমরা।[৬]

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখব এতে করে ইয়াথরিবের আরবরা মুহাম্মদ (স:)-এর আগমনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল এবং তাঁর কাছাকাছি আসামাত্র তাঁকে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসাবে চিনে নিয়েছে। গসপেলেও প্যালেস্টাইনে এক ধরনের প্রবল প্রত্যাশার অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকার কথা বলা হয়েছে, ওখানেও একই ধরনের ত্রাণকর্তার আবির্ভাব সংক্রান্ত পরিবেশ ছিল বলে মনে হয়। ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেন যে পয়গম্বর তিনি আবার তার জনগণেরও মুখপাত্র বটে, তাদের আশা আর আতঙ্ককে ভাষা প্রদান করেন। তিনি তাঁর সময়ের অস্থিরতা আর বিশৃঙ্খলার অংশভোগী হবেন আবার গভীরতর স্তরে সেগুলোর সমাধানে সক্ষম হবেন। ইহুদী ও ক্রিশ্চানদের প্রত্যাশার কাহিনীগুলো সপ্তম শতকের শুরুতে আরবের আধ্যাত্মিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ, তবে জেসাস বা মুহাম্মদের (স:) মত পয়গম্বরসুলভ বীরগণ তাঁদের আপন যুগ ও পরবর্তী প্রজন্মের ওপর কত প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তাও দেখায় : তাঁদের সাফল্য এত চমকপ্রদ এবং যুগের চাহিদার সঙ্গে এমন চমৎকারভাবে মানানসই ছিল যে রহস্যজনক কোনওভাবে নিয়তি নির্ধারিত বলে ধারণা জাগে; অতীতের ধর্মীয় আশাআকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে যেন।

মুহাম্মদ (স:) মক্কার সমসাময়িক ব্যাপক সাফল্য সত্ত্বেও সেখানকার সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অস্থিরতা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। ৫৭০ খৃস্টাব্দে হাশিমের ক্ল্যানে তাঁর জন্ম, এই গোত্রটির ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে এক ধরনের প্রতিকূলতার মুখে পড়েছিল। কুসাঈর পৌত্র হাশিম ইবন আব্দ মানাফ সারা জীবন মক্কার একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রতিবছর মক্কা থেকে সিরিয়াগামী

ক্যারাভান দুটোকে প্রথম সজ্জিত করেছিলেন এবং আবিসিনিয়ার নেজাস ও বাইযানটিয়ামের সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। গোড়ার দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোত্র ক্রমাগত সফলতার মুখ দেখছিল। হাশিমের ছেলে আব্দ আল-মুত্তালিব ছিলেন একজন ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব, তিনিই মক্কায় কুরাইশদের ধর্মহীন পূর্বসূরীদের বুজিয়ে ফেলা পবিত্র যমযম কুপ পুনরাবিষ্কার করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। সুতরাং তীর্থযাত্রীরা হজ্জ পালনের জন্যে আগমন করলে যমযম থেকে পানি সরবরাহ করার অধিকার এই উপদলটিই ভোগ করত। আব্দ আল-মুত্তালিব সম্পদশালী বণিকও ছিলেন, তাঁর বিশাল উটের পাল বোঝায় যে পুরনো যাযাবর পেশার কিছু তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর দশ পুত্র এবং ছয় কন্যা ছিল, প্রত্যেকেই তারা অসাধারণ সুদর্শন ছিল। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবন সা'দ মক্কাবাসীদের ওপর আব্দ আল-মুত্তালিবের ছেলেদের প্রভাব বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'আরবদের মাঝে এর চেয়ে দর্শনীয় আর জাঁকাল পুরুষ আর ছিল না, এমন অভিজাত ছাপও না। ওদের নাক এত দীর্ঘ ছিল যে ঠোটের আগে নাক পান করত।'[৭] কনিষ্ঠ পুত্র আব্দাল্লাহ আব্দ আল-মুত্তালিবের বিশেষ আদরের ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে তিনি তাঁর বাকি ভাইদের চেয়ে অনেক সুদর্শন ছিলেন : আব্দাল্লাহই মুহাম্মদ (স:)-এর পিতা।

কিন্তু কুরাইশদের সঙ্কট-সময় চলছিল তখন, ক্রমাগত বিভিন্ন উপদলের সম্পদ হ্রাস পাচ্ছিল। মুহাম্মদ (স:)-এর ছেলেবেলায় সংঘটিত এক ঘটনায় আহ্লাফ (কনফেডারেট) ও মুতায়াবান (দ্য সেন্টেড ওয়ানস্)দের পুরোনো বিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, আব্দ আল-মুত্তালিবের বৃদ্ধ বয়সে হাশিমের সম্পদ নাটকীয়ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইয়েমেনের জনৈক বণিক সাহম গোত্রের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে কিছু পণ্য বিক্রি করেছিল, যে ছিল কনফেডারেটদের অন্তর্গত। কিন্তু সে পণ্যমূল্য পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়, ইয়েমেনি ব্যবসায়ী তখন ন্যায়বিচারের আশায় বিষয়টি গোটা কুরাইশগোত্রের নজরে আনে। তাঈম গোত্রের প্রধান-সেন্টেডওয়ানস-এর অন্তর্গত এটি-একটি সভা আহবান করে ন্যায়বিচার ও সদাচারপন্থী সবাইকে তাতে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানান। হাশিম, আল-মুত্তালিব, আসাদ এবং যুহরা-এঁরা সবাই সেন্টেড ওয়ানস দলের অন্তর্গত ছিলেন–এঁদের গোত্রগুলো আহবানে সাড়া দিয়ে একটা চুক্তিতে উপনীত হয় যা পরবর্তীকালে হিলফ আল-ফুযুল-দ্য লীগ অব ভার্চুয়াস[৮] নামে পরিচিতি পেয়েছিল। তাঁরা সবাই একসঙ্গে কা'বায় গিয়ে শপথ গ্রহণ করেন যে তাঁরা সবসময় নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের পক্ষাবলম্বন করবেন। বালক মুহাম্মদ (স:) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে বলা হয় এবং এই সাহায্যকারী সমিতির পক্ষে উষ্ণ এবং অনুমোদনসূচক বক্তব্য রেখেছেন। তবে হিলফের সম্ভবত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও ছিল। এই সংগঠনে যোগদানকারী উপদলগুলো কনফেডারেট উপদলগুলোর তুলনায় দুর্বল অবস্থায় ছিল, মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করছিল তারা, অন্যদের ঠেলে দিচ্ছিল চরম অবস্থায়। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও হিলফের গঠনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে।

মুহাম্মদ (স:)-এর ছেলেবেলার প্রেক্ষাপট আমাদের জানাচ্ছে যে তাঁর পরিবার কঠিন সময়ের সম্মুখীন হয়েছিল। তরুণ আব্দাল্লাহ বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর আব্দ আল-মুত্তালিব, যুহরা পরিবারের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে নিজেই আবার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজে এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে হালা বিনত উহায়েব এবং আমিনা বিনত ওয়াহব, অর্থাৎ মুহাম্মদ (স:)-এর মাতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুহাম্মদ (স:)-এর জন্মলাভ সংক্রান্ত কাহিনীর সঙ্গে ম্যাথু এবং ল্যুক লিখিত জেসাসের জন্ম কাহিনীর বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে কখনওই কৌমার্য প্রথার কোনও অবকাশ ছিল না, এ ধর্মের পয়গম্বরের জন্ম কুমারী মাতার গর্ভে হয়নি। আব্দ আল-মুত্তালিব এবং তাঁর ছেলে মক্কার রাস্তা ধরে তাঁদের নবপরিণীতা স্ত্রীদের দেখতে যাচ্ছিলেন, তখন এক মহিলা ছুটে এসে আব্দাল্লাহকে তার বিছানায় আমন্ত্রণ জানায়। ইসলাম-পূর্ব আমলে আরবরা যেকোনও সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, এবং যদিও আব্দাল্লাহ তখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন, তাঁর কাছে এ আমন্ত্রণ অশোভন বলে মনে হয়নি। তিনি কেবল জবাব দিয়েছিলেন যে তাঁকে বাবার সঙ্গে থাকতে হবে, কিন্তু পরদিন সকালে বাড়ি ফেরার পথে মহিলার সংস্পর্শে আসার ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি। আমিনার বাবার বাড়িতে পৌছার পর তিনি বিবাহকে পূর্ণতা দান করেন এবং মুহাম্মদ (স:) আমিনার গর্ভে আসেন। কিন্তু পরদিন যখন তিনি আমন্ত্রণকারী মহিলাকে খুঁজে বের করলেন, দেখা গেল মহিলা আর উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আগের দিন আব্দাল্লাহর দুচোখের মাঝখানে একটা দ্যুতি ছিল, বলে মহিলা, যার অর্থ ছিল তিনি তাঁর জাতির পয়গম্বর জন্ম দিতে যাচ্ছেন। আজ সেই দ্যুতি অদৃশ্য হয়েছে, অন্য কোনও মহিলা ঈশ্বরের বাণীবাহকের গর্ভধারিণী হয়েছেন।

আমিনার অন্তসত্বা অবস্থাতেই মারা যান আব্দাল্লাহ, তাঁর পরিবার তখন এমন দুঃস্থ অবস্থায় পড়েছিল– পাঁচটি উট এবং বাহিরা নামে এক দাসী ছাড়া আর কিছুই পরিবারের জন্যে রেখে যেতে পারেননি তিনি। কথিত আছে মুহাম্মদ (স:) গর্ভে ধারণ করার সময় আমিনা কোনওরকম কষ্ট ভোগ করেননি। বরং এই মর্মে অদৃশ্য বার্তা পেয়েছিলেন যে তিনি আরবদের ত্রাতাকে ধারণ করছেন। তিনি তাঁর গর্ভ থেকে একটা আলো বের হতে দেখেছেন যা বাসরা ও সিরিয়ার– ইসলামের আলোপ্রাপ্ত পরবর্তী দেশ– বিভিন্ন দুর্গ থেকে দেখা গেছে। ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মুহাম্মদ (স:) জন্মগ্রহণ করেন, অবিলম্বে আমিনা আব্দ আল-মুত্তালিবের কাছে সংবাদ পাঠান, এবং তাঁকে জানান যে এই শিশু একদিন মহামানবে পরিণত হবেন। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে বৃদ্ধ মুত্তালিব নবজাত নাতীকে কা'বায় নিয়ে যান। বলা হয়ে থাকে যে মুহাম্মদের (স:) উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আগেই জানতে পেরেছিলেন তিনি : জনৈক *কাহিন* ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে তাঁর বংশধরদের মাঝে কেউ একজন পৃথিবী শাসন করবেন, এবং একরাতে তিনি নিজেও স্বপ্ন দেখেছিলেন যে শিশুর বুক থেকে একটা বৃক্ষ জন্ম নিচ্ছে, গাছটার অগ্রভাগ

আকাশ ছুঁয়েছে, পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে ওটার ডালপালা। গাছ থেকে একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আরব এবং পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী পারসীরা যার উপাসনা করছে।

মরুভূমিতে বাচ্চাদের লালনপালনের দায়িত্ব অনেক সময়ই পালক পিতা-মাতার হাতে ন্যস্ত করা হত, কারণ বিশ্বাস করা হত যে নগরীর তুলনায় এটা তাদের স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল। বেদুঈন নারীরা কুরাইশ সন্তান পোষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অগ্রহী ছিল, কেননা এতে করে তারা পরিবার ও গোত্রের দিক থেকে উপহার আর সাহায্যের আশা করতে পারত, কিন্তু আমিনার দারিদ্রতার কারণে কেউই মুহাম্মদের (স:) ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি। আরবের জন্যে সেটা একটা বাজে বছর ছিল, বহু গোত্রই তীব্র খরার কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল। বনি সা'দ-এর গোত্র মরিয়া হয়ে উঠেছিল এবং হালিমা বিনত আবু দুয়ায়েব, গোত্রের দরিদ্রতম পরিবারের একজন সদস্য, এমনিতেই মুহাম্মদকে (স:) গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন, কেননা স্তন্যপান করানোর জন্যে আর কাউকে পাচ্ছিলেন না তিনি। কিন্তু হালিমা নিজেই এত ক্ষুধার্ত ছিলেন যে আপন শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মত উপায়ও তাঁর ছিল না, তাঁর উটের দুধও শুকিয়ে গিয়েছিল, এমনকি যে গাধাটার পিঠে চেপে তিনি মক্কা এসেছিলেন সেটাও মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শিশু মুহাম্মদকে (স:) গ্রহণ করার পরপরই যা ঘটে তা এরকম :

ওকে আমার মালপত্রের কাছে নিয়ে গেলাম, এবং ওর মুখে স্তন ছোঁয়াতেই আমার বুক দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করল ও, ওর দুধ-ভাইও খেল। এরপর ওরা দুজনই ঘুমিয়ে পড়ে, অথচ এর আগে ওকে নিয়ে আমরা ঘুমাতে পারছিলাম না। আমার স্বামী উঠে উটের কাছে গেলেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার ওটার ওলান দুধে ভরে উঠেছিল, তিনি দুধ দোহানোর পর আশ মিটিয়ে দুধ খেলাম আমরা দুজনই। সকালে আমার স্বামী বললেন : 'তুমি কি জান, হালিমা, এক আশীর্বাদপুষ্ট শিশু পেয়েছ তুমি!' আমি বললাম, 'আল-ল্লাহর দোহাই, আমিও তাই আশা করি।' এরপর আমরা রওনা হয়ে যাই, ওকে নিয়ে গাধাটার পিঠে চাপি আমি, আর এমন বেগে ছুটতে শুরু করে ওটা যে অন্য গাধাগুলো তাল মেলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল। আমার সহযাত্রীরা আমাকে বলছিল, 'আশ্চর্য তো! থেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো। এই গাধাটার পিঠে চেপেই না এসেছিলে এখানে?' 'এটাই সেটা,' বলেছিলাম আমি। তারা জবাব দিয়েছিল, 'হায় আল্-ল্লাহ্ অদ্ভুত একটা কিছু ঘটেছে।' পরে বনি সা'দ অঞ্চলে আমাদের বসতবাটিতে আসি আমরা, এমন উষর এলাকা দুনিয়ায় আছে বলে আমার জানা ছিল না।

আমাদের সঙ্গে ও থাকার সময় পশুগুলো প্রচুর পরিমাণ দুধ দিচ্ছিল। আমরা দুধ দুইয়ে খেতাম, অথচ অন্যরা এক ফোঁটাও খেতে পাচ্ছিল না, উটের

ওলানেও কিছু পাচ্ছিল না ওরা, তো আমাদের গোত্রের লোকজন তাদের রাখালদের উদ্দেশে বলত, 'দুর্ভাগ্য তোমাদের, আবু দুয়াবের মেয়ের রাখাল যেখানে যায়, তোমরা সেখানে তোমাদের পশুর পাল নিয়ে যাও।' তারপরেও ওদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসত, এক ফোঁটাও দুধ দিত না, অথচ আমার গুলোর দুধ ছিল অফুরন্ত।[৯]

এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে হালিমা মুহাম্মদ (স:) কে হারাতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং আরও কিছুদিন তাঁকে কাছে রাখার অনুমতি দেয়ার জন্যে আমিনার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু একটা শঙ্কাজনক অথচ অসাধারণ ঘটনায় তিনি মত পাল্টাতে বাধ্য হন।

কাহিনীটি এরকম, একদিন মুহাম্মদের (স:) দুধ ভাইয়েরা বাবা-মায়ের কাছে ছুটে এসে আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে জানায় যে শাদা পোশাকের দুজন লোক মুহাম্মদকে (স:) ধরে নিয়ে তাঁর পেট কেটে ফেলেছে। দৌড়ে অকুস্থলে গিয়ে হাজির হন হালিমা, ছোট বালককে দুর্বলভাবে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখেন : পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (স:) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে ওই দুই ব্যক্তি তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে বরফের সাহায্যে ধুয়েছেন, এরপর ওঁরা তাঁকে একটা নিক্তিতে স্থাপন করে ঘোষণা দেন যে তিনি সকল আরবের সম্মিলিত ওজনের চেয়েও ওজনদার। শেষে তাঁদের একজন তাঁর কপালে চুম্বন দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলেছেন : 'হে ঈশ্বরের প্রিয়, আপনি আর কখনও আতঙ্কিত হবেন না এবং যদি জানতেন আপনার জন্যে কি কি মঙ্গল অপেক্ষা করছে তাহলে অত্যন্ত খুশি হতেন।'[১০] এ কাহিনী অপরাপর সংস্কৃতির ধর্ম প্রবর্তকের সূচনা বর্ণনাকারী কিংবদন্তীর অনুরূপ, পবিত্র বাণীকে কলুষিত না করে স্রষ্টার সংস্পর্শে আসার জন্যে প্রবর্তকের প্রয়োজনীয় নিষ্কলুষতার প্রতীক এটা। কোনও কোনও মুসলিম লেখক এই ঘটনা 'রাতের ভ্রমণে'র [মুহাম্মদ (স:)-এর জীবনে সংঘটিত সর্বাধিক অলৌকিক ঘটনা/অভিজ্ঞতা, সপ্তম অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করব] অব্যবহিত আগের বলে বর্ণনা করেছেন, এ থেকে বোঝা যায় ওঁরা সবাই এর প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

কিন্তু দরিদ্র হালিমা এবং তাঁর স্বামী আল-হারিস এসব কিছুই জানতেন না, সঙ্গত কারণেই আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। মুহাম্মদ (স:) কোনওরকম আঘাত পেয়েছেন আশঙ্কা করে অবিলম্বে ওঁরা তাঁকে মক্কায় নিয়ে যান যাতে ক্ষতিটা পরে চোখে পড়ে। কিন্তু আমিনা ওঁদের আশ্বস্ত করে পুরো ঘটনা বলতে উৎসাহিত করেন এবং নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন : মুহাম্মদ (স:) এক ব্যতিক্রমী শিশু, ওর সম্পর্কে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। মুহাম্মদকে (স:) তিনি নিজের কাছে মক্কায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদের (স:) বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, আমিনা ইন্তেকাল করেন এবং আবার এতীম হয়ে যান তিনি। দাদা আব্দ আল-মুত্তালিবের বাড়িতে আশ্রয় পান তিনি, মুত্তালিব তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। নিজের বেশি

বয়সের বিয়ের সুবাদে দুটো ছেলে ছিল তাঁর, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর দুই চাচা আব্বাস ও সদাপ্রফুল্ল হামযাহ্'র সঙ্গে বেড়ে উঠছিলেন, যাঁরা তাঁর সমবয়সী ছিলেন। আব্দ আল-মুত্তালিব তখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে প্রায়। তিনি বিছানাসহ কা'বায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেন উপাসনাগৃহের ছায়ায় বড় ছেলেদের মাঝে শুয়ে থাকতে পারেন। মুহাম্মদ (সঃ) প্রফুল্লমনে তাঁর পাশে বিছানার ওপর লাফালাফি করতেন এবং দাদা স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন তাঁর দিকে, হাত বুলিয়ে দিতেন বালকের পিঠে। মুহাম্মদের (সঃ) বয়স যখন আট, তখন তিনি মারা যান, তখন মুহাম্মদ (সঃ) হাশিম গোত্রের নতুন প্রধান চাচা আবু তালিবের বাড়িতে চাচাত ভাই তালিব ও আকিলের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন।

আবু তালিব সজ্জন ছিলেন, পরিবারের অবস্থা পড়তির দিকে থাকা সত্ত্বেও মক্কায় বেশ সম্মান পেতেন। বাবা-মা হারা ভাতুষ্পুত্রের প্রতি বরাবর সদয় ছিলেন তিনি, যদিও তাঁর আর্থিক অবস্থা দিন দিন ক্রমবর্ধমান হারে অবনতির দিকে যাচ্ছিল। এক মওসুমে তিনি মুহাম্মদকে (সঃ) সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ওঁরা যখন বাসরায় পৌঁছলেন, কুরাইশদের বিস্মিত করে স্থানীয় মঙ্ক নিজ আশ্রম থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ওঁদের খাবারের আমন্ত্রণ জানালেন। সাধারণত কারাভানকে উপেক্ষা করতেন তিনি, কিন্তু এবছর লক্ষ্য করেছিলেন যে ক্যারাভান এক টুকরো উজ্জ্বল মেঘে ঢেকে আছে, যা থেকে তিনি বুঝতে পারেন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পয়গম্বর নিশ্চয়ই উপস্থিত আছেন। টেম্পল-এ হারিয়ে যাওয়া জেসাস সংক্রান্ত গসপেল কাহিনীর মুসলিম সমতুল্য এটা, কিন্তু গোড়ার দিকের এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এই প্রাচীন সূত্রগুলি খৃস্টধর্ম সম্পর্কে কতখানি অজ্ঞ ছিল : মঙ্কের বাহিরা (Bahira) নামের সঙ্গে সিরিয়াক *ভিরা* (Bhira) শব্দ, যার অর্থ 'রেভারেন্ড', গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। ক্রিশ্চানদের দাবী হচ্ছে বাহিরাই তাদের কথিত 'মুহাম্মাডানিজম' নামক বিকৃত ধর্মে মুহাম্মদকে (সঃ) শিক্ষা দিয়েছেন।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর বয়স কম ছিল বলে তাঁকে রসদপত্র পাহারা দেয়ার জন্যে বাইরে রেখে কুরাইশরা বাহিরার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল। খাবার গ্রহণের সময় বাহিরা ব্যবসায়ীদের তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করেন কিন্তু গ্রন্থে প্রাপ্ত পয়গম্বরের বর্ণনার সঙ্গে কারও চেহারার মিল পাননি। আর কেউ কি আছে ওদের সঙ্গে? সহসা মহান আব্দ আল-মুত্তালিবের নাতীকে বাইরে ক্রীতদাসের মত একাকী ফেলে আসার কথা মনে করে লজ্জিত বোধ করল কুরাইশরা। তাঁকে ভেতরে নিয়ে এল তারা, তাঁকে মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলেন মঙ্ক। খাবার পর্ব শেষ হবার পর বাহিরা মুহাম্মদকে (সঃ) এক পাশে ডেকে নিয়ে তাঁর জাতির দেবী আল-লাত, আল-উযযার নামে শপথ নিয়ে তাঁর প্রশ্নের সত্যি জবাব দেয়ার আহ্বান জানালেন। 'আমাকে আল-লাত এবং আল-উযযা'র শপথ নিতে বলবেন না,' প্রতিবাদ জানালেন মুহাম্মদ (সঃ), 'কারণ, আল্-লাহ'র দোহাই, আমার চোখে ওই দুজনের চেয়ে ঘৃণিত আর কেউ নেই।' পরিবর্তে তিনি কেবল আল্-লাহ'র নামে শপথ নিয়ে নিজ জীবন

সম্পর্কে বাহিরার প্রশ্নের জবাব দিলেন। এরপর মঙ্ক তাঁর দেহ পরীক্ষা করেন এবং পিঠে পয়গম্বরের বিশেষ চিহ্ন দেখতে পান। 'ভাতুষ্পুত্রকে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাও এবং ওকে ইহুদীদের চোখের আড়াল করে রেখো' আবু তালিবকে উপদেশ দিয়েছিলেন বাহিরা, 'কেননা, আল্-ল্লাহর শপথ, ওরা যদি ওকে দেখে আর আমি যা জানি তা জেনে যায়, তাহলে ওর অনিষ্ট করবে; তোমার ভাতুষ্পুত্রের সামনে অসাধারণ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে, ওকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'[১১]

কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর বয়স পঁচিশ বছর হওয়ার আগে এই অসাধারণত্বের তেমন একটা লক্ষণ দেখা যায়নি, যদিও তিনি শক্ত সমর্থ এক যুবায় পরিণত হয়েছিলেন। মক্কায় তিনি আল-আমিন : বিশ্বাসী হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন : সারা জীবন তিনি অপরের মনে আস্থা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন, গড় উচ্চতার সুগঠিত শরীর ছিল তাঁর, মাথার চুল এবং দাড়ি ছিল ঘন এবং কোঁকড়ান, চেহারায় ছিল উজ্জ্বল অভিব্যক্তি যা বিশেষভাবে নজরকাড়াও; সকল সূত্রেই এর উল্লেখ রয়েছে। দৃঢ় সঙ্কল্প ও আন্তরিক ছিল তাঁর চরিত্র, ফলে যখন যা করতেন তাতে পূর্ণ মনসংযোগ ঘটাতে পারতেন, এ থেকে তাঁর শারীরিক ক্ষমতারও আভাস পাওয়া যায়। তিনি কখনও পেছনে তাকাতেন না, এমনকি কাঁটাঝোঁপে পোশাক আটকা পড়লেও না : পরবর্তী সময়ে সহচরগণ তাঁর পেছনে নিশ্চিন্তে আলোচনা বা হাসাহাসি করতেন, তাঁরা জানতেন মুহাম্মদ (সঃ) ঘাড় ফিরিয়ে ওঁদের দেখতে যাবেন না। কখনও কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হলে তিনি আংশিকভাবে তাদের দিকে ঝুঁকতেন না বরং পুরোপুরি ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্বোধন করতেন। করমর্দন করার বেলায় তিনি কখনও আগে আপন হাত ছাড়িয়ে নেননি। চাচারা তাঁকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়েছিলেন, ফলে তিনি দক্ষ তীরন্দাজ, কুশলী অসিচালক এবং কুস্তিগীর হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তরুণ চাচা হামযাহ্‌র মত যুদ্ধক্ষেত্রে ততটা নৈপুণ্য তিনি কখনওই দেখাতে পারেননি। হামযাহ্ অবিশ্বাস্য শারীরিক শক্তিমান এক বিশাল মানবে পরিণত হয়েছিলেন। অপর চাচা আব্বাস একজন ব্যাঙ্কারে পরিণত হয়েছিলেন এবং মুহাম্মদ (সঃ) হয়েছেন ব্যবসায়ী—সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় ক্যারাভানের নেতৃত্ব দেয়া ছিল যাঁর কাজ। পশ্চিমে প্রায়শঃই তাঁকে উট-চালক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাঁর দায়িত্ব বহুল প্রশাসনিক কাজের বর্ণনা হিসাবে যা অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য সমসাময়িক কোনও কোনও পাশ্চাত্যের পণ্ডিত তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তাঁদের দাবী : মুহাম্মদ (সঃ)-এর সিরিয়া ও অন্যান্য সভ্য দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনও জ্ঞান ছিল না এবং কোরানে সিরিয়ার ক্রিশ্চানিটির চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় মিছিল ও অনুশীলনের কোনও উল্লেখ নেই–যা পেনিসসুলার অন্যান্য কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে।[১২] কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর শুরু দিকের পেশা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করাটা বিকৃতির পরিচয় বলে মনে হয়, কারণ এমন কিছু কেউ আবিষ্কার করতে পারে চিন্তা করাই কষ্টকর।

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থানের কারণে পিছিয়ে পড়ছিলেন তিনি। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক ছিল, এবং আমরা দেখব মুহাম্মদ (স:) তাঁর সারাজীবন এতীমদের দুঃখদুর্দশা ও তাদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। দুরবস্থার কারণে বিয়ে করা কঠিন হয়ে পড়েছিল তাঁর জন্যে। এক পর্যায়ে আবু তালিবের মেয়ে, সমবয়সী ফাখিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি। তখন আবু তালিব তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন যে এখনও বিয়ে করার মত অবস্থা তাঁর হয়নি। মেয়েকে সম্ভ্রান্ত মাখযুম পরিবারে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। আবু তালিব দয়ালু এবং কৌশলী হলেও ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাঁকে গভীর দুঃখ দিয়েছিল। মুহাম্মদ (স:) ছিলেন প্রেমিক পুরুষ, নারী সঙ্গ প্রয়োজন ছিল তাঁর। এখানেই তাঁর সঙ্গে অন্যান্য অনেক সমসাময়িকদের পার্থক্য। পরবর্তীকালে তাঁর কোনও কোনও ঘনিষ্ঠ সহচর, যাদের স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল নারীদের তাদের স্বস্থানেই রাখা উচিত, উল্লেখ করেছেন যে-ইসলাম পূর্ব আমলে অধিকাংশ মক্কাবাসী নারীদের নিয়ে তেমন একটা ভাবনা চিন্তা করত না। আমরা দেখেছি *জাহিলিয়াহ্*'র যুগে নারীদের কোনও মর্যাদা ছিল না, এমনকি বিখ্যাত অনেক মুসলিমদের কেউ কেউ তাঁদের স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে রূঢ় আচরণও করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) সম্ভবতঃ নারী সঙ্গ প্রকৃতই উপভোগ করতেন, ঘনিষ্ঠতা আর ভালবাসা প্রয়োজন ছিল তাঁর। পরবর্তীকালে, নারীদের প্রতি এমনকি তাঁর আপাত শৈথিল্য এবং সৌজন্য কোনও কোনও ঘনিষ্ঠ সহচরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলেছে। পাশ্চাত্য কিংবদন্তীর বিকৃত মানসিকতার লম্পট ছিলেন না তিনি, প্রিয় বন্ধু এবং প্রেমিকা হিসাবে নারীর প্রয়োজন ছিল তাঁর।

যাহোক, ৫৯৫ খৃস্টাব্দে নাটকীয়ভাবে তাঁর ভাগ্যে পরিবর্তন আসে। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় খাদিজা বিনত খুওয়ালিদ তাঁর পণ্য সামগ্রি সিরিয়ায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দেন মুহাম্মদ (স:)কে। নাগরিক জীবন প্রায়শঃই কোনও কোনও নারীকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সফল হওয়ার সুযোগ করে দেয় : ইয়োরোপে দ্বাদশ শতকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী এবং দোকান-মালিক আসামান্য সাফল্যের অধিকারী হয়েছিলেন, সম্ভবতঃ মক্কার ক্ষেত্রেও একই রকম ছিল ব্যাপারটা। খাদিজার দুবার বিয়ে হয়েছিল, বেশ কয়েকজন সন্তানও ছিল তাঁর। আসাদ গোত্রের সদস্য ছিলেন তিনি, সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে এই গোত্রটি হাশিম গোত্রের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, ব্যবসায়ী হিসাবে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন তিনি। মুহাম্মদ (স:) তাঁর কাজ নিতে সম্মত হন এবং দুঃসাহসী অভিযাত্রায় পথে নামেন। সফরসঙ্গী জনৈক মায়সারা অসংখ্য অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল, যথাযথভাবে তা খাদিজাকে অবহিত করেছে সে। এক মঙ্ক, দাবী করেছিল সে, তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলেছে মুহাম্মদ (স:) সেই পয়গম্বর আরব বিশ্ব যাঁর পথ চেয়ে আছে। পরে, সবিস্ময়ে জানিয়েছিল সে, দুজন ফেরেশতাকে প্রখর সূর্যের রশ্মি থেকে মুহাম্মদকে (স:) ছায়া দিতে দেখার কথা। এসব ঘটনা শোনার পর খাদিজা সরাসরি চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফল, অর্থাৎ *হানিফের* সঙ্গে

পরামর্শ করতে যান। নওফল খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। ওয়ারাকাও আরব বিশ্বের পয়গম্বরের জন্যে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন, খাদিজার কাছে খবর পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন তিনি : 'একথা যদি সত্যি হয়, খাদিজা, মুহাম্মদই নিঃসন্দেহে আমাদের জাতির পয়গম্বর।'[১৩]

খাদিজা মুহাম্মদের (সঃ) কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। কেবল ওয়ারাকার আগ্রহ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি তা নয়, তরুণ আত্মীয়ের ব্যক্তিগত গুণাবলী দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। দুজনের বয়সের পার্থক্য স্বত্ত্বেও, খাদিজার একজন স্বামীর প্রয়োজন ছিল এবং মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন যোগ্যপাত্র। 'আমাদের সম্পর্কের কারণে আপনাকে আমি পছন্দ করি', মুহাম্মদকে (সঃ) বলেছিলেন খাদিজা, 'গোত্রের মাঝে আপনার সুনাম, আপনার বিশস্ততা, এবং সচ্চরিত্র ও সত্যবাদিতা আমার ভাল লাগে।'[১৪] কথিত আছে, খাদিজার বয়স তখন ছিল চল্লিশ বছর, কিন্তু যেহেতু মুহাম্মদ (সঃ)-এর ছয়টি সন্তান ধারণ করেছিলেন, হয়ত বয়স কিছু কমও হয়ে থাকতে পারে, তবে স্বামীর চেয়ে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বয়স্কা ছিলেন তিনি। পশ্চিমের মানুষ অনায়াসে বয়স্কা ধনী নারীকে বিয়ে করার বিষয়টি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকেন। বোঝানোর চেষ্টা থাকে যে মুহাম্মদ (সঃ) ফূর্তির জন্যে এই বিয়েতে সম্মত হয়েছিলেন। এমনকি ম্যাক্সিম রডিনসন তাঁর সহানুভূতিভাবাপন্ন জীবনীগ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে মুহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয়ই এই বিয়েকে শারীরিক ও আবেগের দিক থেকে হতাশাব্যাঞ্জক বলে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু বিপরীতটি বরং সত্যি হওয়ার কথা। পয়গম্বরত্ব প্রাপ্তির প্রথম বছরগুলোয় খাদিজার সমর্থন আর আধ্যাত্মিক পরামর্শ ছাড়া মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষে এগুনো সম্ভব ছিল না। চমৎকার মহিলা ছিলেন খাদিজা। তিনি ছিলেন, বলছেন ইবন ইসহাক, 'দৃঢ়প্রতীজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমতী। যখনই মুহাম্মদ(সঃ) শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন তখনই শান্তির জন্যে সোজা স্ত্রীর কাছে চলে গেছেন এবং খাদিজা তাঁর বাকি জীবনে-যিনি সর্বপ্রথম তাঁর স্বামীর ব্যতিক্রমী ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন– তাঁকে 'সহজ করতেন, ভারমুক্ত করতেন, তাঁর সত্য ঘোষণা করতেন।'[১৫] আবেগময় পুরুষ ছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) কিন্তু খাদিজার সঙ্গে বিবাহিত জীবন কালে আর কোনও তরুণী ভার্যা গ্রহণ করেননি–পরবর্তীকালে যারা তাঁকে বহুবিবাহের জন্যে সমালোচনা করে তাদের এবিষয়টি জেনে রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, খাদিজার মৃত্যুর পর, খাদিজার প্রশংসা করে অন্যান্য স্ত্রীদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন তিনি এবং একবার খাদিজার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন ভেবে শোকে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়তি সুবিধা প্রাপ্তি এ বিয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না : পারিবারিক আয়ের একটা বিরাট অংশ দরিদ্রের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং নিজে পরিবার নিয়ে দরিদ্র হালে জীবন কাটিয়েছেন।

কৃচ্ছ্রতা সাধন সত্ত্বেও সুখের সংসার ছিল। মুহাম্মদ (সঃ)-এর অন্তত ছয় সন্তানের জননী হয়েছিলেন খাদিজা। তাঁদের দুপুত্র আল-কাসিম এবং আব্দাল্লাহ্– উভয়ই শিশু

অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু চার কন্যা : যায়নাব, রুকাইয়াহ্, উম্ম কুলসুম আর ফাতিমা বেঁচে ছিলেন। বাচ্চাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন মুহাম্মদ (সঃ)। সারাজীবন শিশুদের বুকে টেনে নিয়েছেন, চুমু খেয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে খেলেছেন। মেয়েদের প্রতি খুব টান ছিল তাঁর। আরবদের মাঝে প্রথম ছেলে জন্মলাভের পর '*কুনিয়া*' বলে পরিচিত একটা খেতাব গ্রহণের প্রচলন ছিল এবং সেই অনুযায়ী মুহাম্মদ (সঃ)কে প্রায়ই আবু আল-কাসিম (কাসিমের বাবা) বলে সম্বোধন করা হত, এনামটি তাঁকে বরাবর বিশেষ আনন্দ দিত। খাদিজাকে সম্বোধন করা হত উম্ম আল-কাসিম, কাসিমের মাতা বলে।[১৮] তবে ছেলে হারানোর শোক খানিকটা ভুলতে পেরেছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)। বিয়ের দিন খাদিজা তাঁকে এক তরুণ দাস উপহার দিয়েছিলেন, যিনি উত্তর আরবীয় গোত্র কালব-এর সদস্য ছিলেন তিনি। যায়েদ ইবন হারিস তাঁর মনিবের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর অভিবাবকরা যখন সন্ধান পেয়ে তাঁকে মুক্ত করার জন্যে টাকা নিয়ে হাজির হয়, তিনি মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে থাকার জন্যে ব্যাকূল হয়ে পড়েছিলেন। বিনিময়ে মুহাম্মদ(সঃ) তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন, যায়েদ তাঁর পোষ্যপুত্রে পরিণত হন। কয়েক বছর পর, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বয়স যখন বার বছর, তখন আবার নতুন অতিথির আগমন ঘটে পরিবারে। ততদিনে আবু তালিব আর্থিক সঙ্কটে পড়ে গেছেন, সেবছর তীব্র খরা চলছিল বলে আরও হ্রাস পাচ্ছিল তাঁর অর্থ-সম্পদের পরিমাণ। তাঁর ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে আব্বাস দায়িত্ব নিয়েছিলেন ছোট ভাই জাফরের এবং মুহাম্মদ (সঃ) আবু তালিবের পাঁচ বছর বয়সী ছোট ছেলে আলীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। মুহাম্মদ (সঃ) নিজে এতীম ছিলেন বলে এই দত্তক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। যখনই তাঁর বেদুঈন পালক বাবা-মা তাঁকে দেখতে আসতেন, তিনি তাঁদের খাবার কিংবা বা ভেড়া উপহার হিসাবে দিতেন। যায়েদ এবং আলী উভয়ই তাঁর আদর-যত্নে বড় হয়ে উঠছিলেন; মুসলিমদের প্রাথমিক যুগে তাঁরা বিখ্যাত নেতায় পরিণত হন; বিশেষ করে আলীর যেন বন্ধু-বান্ধবের ভেতর গভীর ভক্তি জাগিয়ে তোলার প্রবল ক্ষমতা ছিল।

ঘটনাবিহীন এই বছরগুলোতে আহবান পাবার আগে, মক্কায় মুহাম্মদের(সঃ) মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দরিদ্র এবং দাসদের প্রতি সদয় আচরণের জন্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি। এমনি একটা ঘটনা যেন অলৌকিক ইঙ্গিতবহ ছিল। ৬০৫ খৃস্টাব্দে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর বয়স তখন আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর, কুরাইশরা কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে : বেশ কিছু পাথর খসে পড়েছিল উপাসনালয়ের, নতুন ছাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সম্প্রতি চোরের উপদ্রব ঘটছিল সেখানে। কিন্তু দালানের পবিত্রতার কারণে একাজ ঝুঁকিপূর্ণ এবং জটিল হয়ে দাঁড়ায়। সকল প্রাচীন সমাজেই পবিত্র বস্তুগুলো সংস্কারের মত, খুব সাবধানতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হয়। কুরাইশগণ মহামন্দিরের ধ্বংস সাধন নিয়ে দারুণ উদ্বেগে পড়ে গিয়েছিল তবু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়

তারা। মাখযুম গোত্রের প্রধান ওয়ালিদ ইবন আল-মুঘিরা ছিলেন মক্কার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি, গাঁইতি নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে কা'বার দিকে এগিয়ে যান তিনি আর বলেন : 'হে ঈশ্বর, ক্ষুব্ধ হবেন না, হে ঈশ্বর, আমরা ভাল কিছু করারই মনস্থ করেছি।' কাজ শুরু করার অনুমতি পাওয়া গেল, প্রত্যেক গোত্র একটা বিশেষ অংশ পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করল যাতে একে গোটা জাতির সম্মিলিত প্রয়াসে পরিণত করা যায়। অবশ্য ভিত্তিপ্রস্তরে যখন পৌছল তারা, বলা হয়ে থাকে, গোটা নগরী কেঁপে উঠেছিল, তাই কুরাইশরা ওই অংশ অক্ষত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

নতুন দেয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হল, কিন্তু কৃষ্ণ-পাথরটি আবার যথাস্থানে স্থাপনের প্রশ্নে আবার এক উত্তপ্ত বিবাদের সূচনা ঘটল, কারণ প্রত্যেক গোত্র এককভাবে সম্মানের দাবীদের হতে চাইছিল। পাঁচ দিন পেরিয়ে গেল, তখনও বিবাদের মীমাংসা সুদূর পরাহত, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব যে মক্কার গোত্রীয় সংহতি ধ্বংস করেছিল এটা তারই আলামত ছিল। শেষ পর্যন্ত, সন্তোষজনক একটা সমাধানে পৌছার জন্যে মরিয়া হয়ে গোত্রগুলো সিদ্ধান্ত নিল দৃশ্যপটে আগমনকারী প্রথম ব্যক্তির সিদ্ধান্তই মেনে নেবে তারা। এবং দেখা গেল সেই ব্যক্তি মুহাম্মদ (স:), তিনি সবে এক ব্যবসায়িক সফর শেষে ফিরে এসেছিলেন এবং পৌছার পরপর যথারীতি *তাওয়াফ* করার উদ্দেশ্যে সোজা কা'বায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রচণ্ড স্বস্তির সঙ্গে স্বাগত জানান হল তাঁকে, 'আল-আমিন এসেছেন,' চিৎকার করে উঠেছিল সবাই, 'আমরা সন্তুষ্ট।'[১৭] মুহাম্মদ (স:) তাদের একটা চাদর আনতে বললেন, তারপর প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন যাতে তারা বস্ত্রখণ্ডটি কিনারা ধরে একযোগে জায়গামত রাখতে পারে। কা'বাগৃহকে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করার পর মুহাম্মদ(স:) একে আরও মৌলিকভাবে পুনর্নির্মাণ করেন, তিনি আল্-লাহর পবিত্র গৃহের চারপাশে বসতিকারী কুরাইশদের আবার ঐক্যবদ্ধ করে তোলার দায়িত্বও লাভ করেছিলেন।

আমরা আগেই দেখেছি মুহাম্মদ(স:) যখন চল্লিশ বছর বয়সে পড়েন তখন থেকে তিনি নিয়মিতভাবে আধ্যাত্মিক ধ্যান শুরু করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী আয়েশা বলেছেন যে তিনি অনেক বেশি বেশি সময় একাকী ঈশ্বরের প্রার্থনায় ব্যয় করতে শুরু করেছিলেন। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন তিনি, যেগুলো ছিল প্রতিশ্রুতি আর আশায় ভরপুর, 'ভোরের আলোর মত।' এই নিঃসঙ্গতার সময়ে তিনি আরবদের কাছে পরিচিত '*তাহান্নুত*' নামক আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতেন এবং দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করতেন : প্রার্থনা এবং দান, এদুটো পরে আল্-লাহ'র ধর্মের অনুশীলনে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ অধিকাংশ সময় উদ্বেগভরা চিন্তায় ব্যয় করতেন তিনি। তাঁর পরবর্তী জীবন থেকে আমরা জানি যে তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবে তৎকালীন মক্কার অস্থিরতা ধরতে পেরেছিলেন। নিঃসন্দেহে গভীর হতাশা জেগেছিল তাঁর মাঝে : মক্কার কেউ তাঁর ধারণাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি এবং আপন গোত্রের হতদরিদ্র অবস্থা তাঁর নাগরিক জীবনে নেতৃস্থানীয়

ভূমিকা পালনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার নিজের অব্যবহৃত ব্যতিক্রমী গুণাবলীর ব্যাপারেও নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন তিনি। কোরানে প্রায়ই উল্লেখ আছে যে ঈশ্বর কুরাইশদের কাছে কোনও পয়গম্বর প্রেরণ করেননি, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির কাছে পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছে। মুহাম্মদ (স:) সম্ভবত: বিশ্বাস করতেন একমাত্র ঈশ্বর প্রেরিত কোনও বার্তাবাহকের পক্ষেই তাঁর নগরীর সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, কিন্তু কোরান থেকে আমরা জানি এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি নিজেই পয়গম্বর হতে যাচ্ছেন এটা ভাবেননি।[১৮] মোজেসের মতই ৬১০ খৃস্টাব্দের রমযান মাসের সতের তারিখ রাতে তিনি নিজ পাহাড়ে আরোহন করে সেখানেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

'*তাহান্নুত*' সম্পর্কে বিস্তারিত জানা নেই- আমাদের, তবে সম্ভবতঃ তা কিছু সুশৃঙ্খল অনুশীলনের সম্মিলন ছিল; বেশির ভাগ ধর্মীয় প্রথায় যার আবির্ভাব ঘটেছিল, যা সাধারণ সাধককে অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করত। পরবর্তীকালে নিজের অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুহাম্মদ (স:) বলেছেন যে তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা এসেছিলেন, গুহায় তাঁর পাশে উপস্থিত হয়ে ফেরেশতা তাঁকে নির্দেশ দেন, 'আবৃত্তি কর!' কোনও কোনও হিব্রু পয়গম্বরের মত, যাঁরা ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণে গভীরভাবে অনীহ ছিলেন, মুহাম্মদ (স:)-ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'আমি আবৃত্তিকার নই!' জোর দিয়ে বলেছেন তিনি, ভেবেছিলেন ফেরেশতা হয়ত তাঁকে আরবের গণক কুখ্যাত *কাহিনদের* কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ফেরেশতা স্রেফ 'এমনভাবে আমাকে আলিঙ্গন করলেন যে আমার সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলাম,'[১৯] এবং তারপরই মুহাম্মদ (স:) লক্ষ্য করলেন কোরানের প্রথম আয়াত আবৃত্তি করছেন তিনি:

> আবৃত্তি করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,
> সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে।
> আবৃত্তি করো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত,
> যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
> শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[২০]

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সংবিৎ ফিরে পান মুহাম্মদ (স:)। তাঁর ধারণা হয়েছিল সম্ভবত: ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি *জিনের* আসর অলা *কাহিনে* পরিণত হয়েছেন, ফলে এমনই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, ঐতিহাসিক তাবারি বলছেন, বেঁচে থাকার ইচ্ছাই হারিয়ে ফেললেন তিনি। গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে পর্বতচূড়ার দিকে ধেয়ে গেছেন, লাফিয়ে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন বলে। কিন্তু পাহাড়চূড়ায় আবার এক সত্তার দেখা পান যাঁকে তিনি পরে জিব্রাইল হিসাবে শনাক্ত করেছেন :

আমি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌছে গেছি, আকাশ থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম : 'হে মুহাম্মদ! আপনি ঈশ্বরের পয়গম্বর আর আমি জিব্রাইল।' আকাশের দিকে তাকালাম আমি কে কথা বলছে দেখার জন্যে। আর, অদ্ভুত ব্যাপার, মানুষের রূপ ধরে দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছেন জিব্রাইল... তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, সামনেও যেতে পারছিলাম না, পেছনেও না, এবার তাঁর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু আকাশের যেদিকেই তাকাই, দেখি তিনি আগের মতই দাঁড়িয়ে আছেন।[21]

এই ফেরেশতা ক্রিশ্চানদের শিল্পকর্মে যেমন দেখা যায় সুদর্শন স্বাভাবিক কোনও সত্তা নয়। ইসলামে জিব্রাইল 'সত্যের আত্মা' যার মাধ্যমে ঈশ্বর স্বয়ং মানুষের কাছে নিজেকে উন্মোচিত করেন। ব্যাপারটি ছিল এক বিমোহিতকারী বিশাল সত্তার মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা, যা গোটা দিগন্তকে ঢেকে ফেলেছিল এবং যার কাছ থেকে পালানো ছিল অসম্ভব। অধিকাংশ সংস্কৃতিতে পয়গম্বর আর সত্যদ্রষ্টারা যে অলৌকিক অস্তিত্বের স্পর্শে দিশাহারা হয়েছেন সেই একই সর্বগ্রাসী শঙ্কার মুখোমুখি হয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)। খৃস্টধর্মে একে বর্ণনা করা হয়েছে *mysterium terrible et fascinans* বলে আর ইহুদী শাস্ত্রে একে বলা হয় '*কাদ্দোশ*' বা 'পবিত্রতা', ঈশ্বরের প্রবল অনন্যতা।

বিভিন্ন বিবরণে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদি প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বর্ণনা পাওয়া যায়, কেউ কেউ বলেন এতে কেবল গুহার দৃশ্য ছিল; অন্যদের মতে দিগন্তে ফেরেশতার আবির্ভাবের কথাই বলা হয় কেবল। তবে প্রত্যেকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভয় আর আতঙ্কের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। হিব্রু পয়গম্বরগণও পবিত্র সত্তার দর্শনে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন এই আশঙ্কায় যে তাঁদের মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে : 'কি করুণ অবস্থায় পড়েছি আমি!' টেম্পলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ইসায়াহ, 'আমি হারিয়ে গেছি!' স্বর্গীয় সত্তার কাছ থেকে এমনকি ফেরেশতারাও ডানা দিয়ে নিজেদের আড়াল করে রাখে, অথচ তিনি কিনা আপন অপবিত্র চোখে পরম ঈশ্বরের দিকে তাকিয়েছেন![22] জেরিমিয়াহর ঈশ্বরের নৈকট্যের অভিজ্ঞতা হয়েছে গোটা শরীরে ব্যথার অনুভূতি হিসাবে, জিব্রাইলের আলিঙ্গনে আবদ্ধ মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত তাঁর প্রত্যাদেশের অভিজ্ঞতা ছিল অনেকটা স্বর্গীয় বলাৎকারের মত।[23] ভীতিকর এক শক্তি নিয়ে এটা তাঁর অস্তিত্বের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাঁর স্বাভাবিক সত্তাকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে গেছে যা এরকম স্বর্গীয় প্রভাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এসব পয়গম্বরদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অতিপ্রাকৃত, এমন এক ধারণাতীত বাস্তবতা যাকে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো ঈশ্বর নামে অভিহিত করে। অভিজ্ঞতাটি ভয়ঙ্কর (*terrible*), কারণ এতে করে পয়গম্বরগণ একেবারে অজানা এক জগতে পৌছে গিয়েছিলেন, যা স্বাভাবিকতার নির্ভরতা থেকে দূরবর্তী, যেখানে সবকিছু বিশাল এক ধাক্কার মত। তবে এটা আবার *fescinans*-ও,

এক অদম্য আকর্ষণের সৃষ্টি করে, এক অর্থে এটা মনে করিয়ে দেয় জ্ঞাত কিছুই যা অন্তরের অন্তস্তলে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু ইসায়াহ ও জেরিমিয়াহ'র বিপরীতে মুহাম্মদের (সঃ) কাছে তাঁকে সমর্থন জোগানোর জন্যে প্রতিষ্ঠিত কোনও ধর্মের সান্ত্বনা বা আশ্বাস ছিল না। ছিল না আপন অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার উপায়। যেন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কাছে হাজির হয়েছিল এটা এবং তাঁকে বিপর্যস্ত এবং প্রাণঘাতী অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। এমন একটা স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে যা তাঁর কল্পনায়ও ছিল না এবং কোনওভাবে নিজেকেই এর ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। নৈঃসঙ্গ ও আতঙ্কের মাঝে সহজাত প্রবৃত্তির বশে তিনি সোজা স্ত্রীর কাছে চলে এসেছিলেন।

গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছিল,, হামাগুড়ি দিয়ে স্ত্রীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মুহাম্মদ (সঃ)। 'ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও!' প্রবল সত্তা থেকে তাঁকে আড়াল করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি স্ত্রীর কাছে। *কাহিনদের* প্রতি বিরাগ থাকলেও ওরা যেমন আবৃত্তির সময় চাদরে গা ঢেকে রাখত, মুহাম্মদ (সঃ)ও নিজের অজান্তেই একই ভঙ্গি গ্রহণ করলেন। কম্পিত দেহে তিনি শঙ্কা কমার অপেক্ষা করতে লাগলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন খাদিজা, অভয় দিলেন, আতঙ্ক দূর করার প্রয়াস পেলেন। সঙ্কটকালে খাদিজার ওপর মুহাম্মদের (সঃ) গভীর নির্ভরতার উল্লেখ সকল সূত্রেই রয়েছে। পরে পাহাড়ের পাদদেশে আরও আবির্ভাব দেখেছিলেন তিনি এবং প্রতিবারই সোজা খাদিজার কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাদরে ঢেকে ফেলার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু খাদিজা কেবল সান্ত্বনা দানকারী নারী ছিলেন না, মুহাম্মদের (সঃ) আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরমর্শকও ছিলেন। অন্যান্য পয়গম্বর ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা যে সমর্থন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম থেকে পেয়েছেন, খাদিজা সেই সমর্থনটুকু মুহাম্মদ (সঃ)কে যোগান দিয়েছিলেন। প্রথম বার তাঁর ভয় কেটে যাবার পর মুহাম্মদ (সঃ) খাদিজাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি *কাহিনে* পরিণত হয়েছেন কিনা; এটাই তাঁর পরিচিত আধাত্মিকতার একমাত্র রূপ ছিল এবং আপন অভিজ্ঞতার বিশাল ভিন্নতা সত্ত্বেও তা অস্বস্তিজনকভাবে আরবের *জিনের* আসর সম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞতার মতই মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ইয়াথরিবের কবি হাসান ইবন থাবিত বলেছিলেন তিনি যখন কবিত্ব লাভ করেন, তার *জিন* এসে তাঁকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেছিল এবং তাঁর মুখ দিয়ে কবিতা উচ্চারণ করিয়েছিল।[২৪] জিনের প্রতি তেমন একটা ভক্তি মুহাম্মদের (সঃ) ছিল না, এরা খেয়ালি হয় এবং ভুল করে। এখন যদি সাধনার বিনিময়ে আল্-লাহ তাঁকে এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। সারা জীবন, কোরানে দেখা যায়, তিনি কেবল একজন '*মজনুন*'– যার ওপর *জিনের* আসর আছে এরকম যেকোনও ধারণার প্রতি কতটা স্পর্শকাতর ছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রচলিত আরবি কবিতা থেকে কোরানের আয়াতসমূহকে আলাদা করে রেখেছেন।

দ্রুত তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন খাদিজা। ঈশ্বর এত নিষ্ঠুর আর খেয়ালি আচরণ করেন না। ঈশ্বর যেভাবে চান ঠিক সেভাবে জীবন যাপনের প্রয়াস পেয়েছেন মুহাম্মদ (স:) এবং প্রতিদানে ঈশ্বর কখনও তাঁকে হতাশ হতে দেবেন না : 'আত্মীয় স্বজনের প্রতি আপনি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। দরিদ্রকে আপনি সাহায্য করেন, তাদের ভার লাঘব করেন। আপনার জাতির হৃত নৈতিক গুণাবলী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন আপনি। আপনি অতিথিবৎসল, দুর্গতদের সাহায্যে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এমন হতে পারে না, প্রিয়তম।'[২৫] স্বামীকে আরও আশ্বাস দেয়ার জন্যে খাদিজা তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকার সঙ্গে পরামর্শ করার প্রস্তাব দেন। ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল ওয়ারাকার, অভিজ্ঞ মতামত দিতে পারবেন তিনি। ওয়ারাকার অবশ্য কোনও সংশয়ই ছিল না। 'সুসংবাদ!' চট করে বলে উঠেছেন তিনি : 'তুমি যদি আমাকে সত্যি বলে থাক, হে খাদিজা, ওর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ *নামুসের* আগমন ঘটেছে, বহু আগে মোজেসের কাছে যার আবির্ভাব ঘটেছিল, আর হ্যাঁ, তিনি তাঁর জাতির পয়গম্বর।'[২৬] পরে, কা'বায় মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এই ক্রিশ্চান পণ্ডিত একমাত্র ঈশ্বরের নতুন পয়গম্বরের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর কপালে চুমু খেয়েছিলেন।

এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বোঝার জন্যে আমাদের একটু বিরতি দিতে হবে। আমরা এখন আর এধরনের সকল অভিজ্ঞতাকে সরাসরি হিস্টেরিয়া বা ভুল বিশ্বাস বলে বাতিল করে দিই না। সকল ধর্মীয় সংস্কৃতিতেই অনুপ্রেরণাকে শুভ ক্ষমতা হিসাবে দেখা হয়– শিল্প ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই। কবিতা বা বাণী যেন এর রচয়িতার সঙ্গে আদেশের সুরে কথা বলে এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। বরাবর একজন সৃজনশীল চিন্তাবিদ এও অনুভব করেন যে তিনি এভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন : তিনি কোনও না কোনওভাবে এক অনির্মিত বাস্তবতাকে স্পর্শ বা আবিষ্কার করেছেন যার স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ আর্কিমিডিস, তাঁর সুবিখ্যাত সূত্র আবিষ্কারের পর 'ইউরেকা! আমি পেয়ে গেছি!' বলে চৌবাচ্চা থেকে লাফিয়ে উঠেছিলেন তিনি। স্থির হয়ে ভাবুক অবস্থায় ডুব দিয়েছিলেন তিনি, সমাধানটা যেন অজান্তে ঢুকে পড়ছিল তাঁর মনে, যেন তার স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। সকল সৃজনশীল চিন্তাই কোনও না কোনওভাবে স্বজ্ঞামূলক; অনির্মিত বাস্তবতার অন্ধকার জগতে ঝাঁপ দেয়ার প্রয়োজন হয়। এভাবে দেখলে স্বজ্ঞা যুক্তি ত্যাগ করা নয় বরং যুক্তি আরও বেগবান হয়ে উঠে এক মুহূর্তের পরিসরে ধরা পড়ে যার ফলে পরিশ্রমসাধ্য যৌক্তিক প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই সমাধান এসে ধরা দেয় হাতে। যে কোনও সৃজনী প্রতিভা সম্পন্ন মহামানব এরকম অনাবিষ্কৃত অঞ্চল থেকে প্রাচীনকালের বীরের মত ফিরে আসেন– যিনি দেবতার কাছ থেকে একটা কিছু ছিনিয়ে এনে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাকেও হয়ত একইভাবে দেখা সম্ভব।

আপন অস্তিত্বের বাইরে বলে বোধ হওয়া কবিতার 'শ্রোতা' যে কবি তিনি অবশ্যই তাঁর অবচেতন মনের কথা শোনেন। তিনি পরিণত হন দেবতা বা দেবী

বলে পরিচিত কারও কাছ আগত বার্তা বা উপহারের বাহকে। মক্কার মত এক সীমিত সমাজে জনগণের অবচেতন মন সমরূপ ছিল। একেবারে সেক্যুলার দৃষ্টিকোণে মুহাম্মদ (স:) তাঁর সমসাময়িকরা যে সমস্যার মোকাবিলা করছিলেন তার গভীর স্তরে পৌছতে সফল হয়েছিলেন এবং তাদের জন্যে এমন কিছু তুলে এনেছিলেন যা শোনার জন্যে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তি প্রস্তুত ছিল। আমরা দেখব যে, তিনি কোরানকে আয়াতের পর আয়াত, সুরার পর সুরা, এভাবে আলোর মুখ দেখিয়েছেন, মানুষকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন যারা একে গভীর স্তরে স্বীকৃতি দিয়েছে। ওদের কুসংস্কার উদ্বেগ এবং আদর্শজাত বাধা ভেদ করে একটা কল্পনাময়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সমাধানে পৌছে দেয়ার ক্ষমতা ছিল এর যা এর আগে আর কেউ চিন্তা করেনি, কিন্তু ওদের গভীরতম প্রত্যাশা আর আকাঙ্ক্ষার জবাব দিয়েছে তা। প্রত্যেক ধর্মে ঈশ্বর বা পরম সত্তার ধারণা সাংস্কৃতিকভাবে সীমাবদ্ধ। হিজাজের আরবরা যেন নতুন এক ধর্মের অনুসন্ধানে ছিল যা তাদের বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই। উদাহরণ স্বরূপ, তারা ঈশ্বর সংক্রান্ত ক্রিশ্চান ধারণা গ্রহণ করতে চায়নি, যা কিনা প্রাচীন গ্রিসের যুক্তিভিত্তিক দর্শন ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মুহাম্মদ(স:) সহজাত প্রবৃত্তির বশে মহান হিব্রু পয়গম্বরদের সেমেটিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন-যা মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের জন্যে অনেক বেশি উপযোগি ছিল। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইরান ও উত্তর আফ্রিকার জনগণের মাঝে গ্রিক অনুপ্রাণিত ঈশ্বরের ধারণার প্রত্যাখ্যান হিসাবে ইসলামের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করার মত। গ্রিক অনুপ্রাণিত ঈশ্বরের ধারণা তাদের প্রয়োজন উপযোগি ছিল না, তাই তারা অধিকতর সেমেটিক রূপে ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু মুহাম্মদ (স:) কখনও কল্পনা করেননি যে তিনি একটা নতুন বিশ্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করছেন। এটা আরবদের ধর্ম হওয়ার কথা ছিল, যারা ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার আওতার বাইরে পড়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল। ঈশ্বর ইহুদী এবং ক্রিশ্চানদের ঐশী গ্রন্থ পাঠিয়েছেন–কোরানে তাদের *আহ্‌ল আল-কিতাব*, বা ঐশী গ্রন্থের অনুসারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে-কিন্তু আরবদের জন্যে বিশেষ কোনও প্রত্যাদেশ পাঠাননি। স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় হিরা পর্বতে মুহাম্মদ(স:)-এর আবৃত্তি করা প্রত্যাদেশ ছিল আরবী ভাষার কোরান, যা আরবদের গভীর প্রয়োজনের সাড়া দিয়েছিল : যেভাবেই হোক, মুহাম্মদ (স:) কোনওভাবে চেতনার একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করেছিলেন যার ফলে তিনি আপন সমাজের বিচ্যুতি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আস্তে আস্তে আরবদের জন্যে বিশেষ সমাধান জুগিয়েছেন।

আমরা প্রায়শই: 'প্রত্যাদেশ' (*revelation*) দিয়ে একেবারে মৌলিক চিন্তা বা দর্শন বোঝানোর প্রয়াস পেয়ে থাকি। কিন্তু শব্দের উৎপত্তি সংক্রান্ত শাস্ত্র আমাদের দেখায় যে এটা আসলে কোনও কিছুর 'উন্মোচন', 'আবিষ্কার'। প্রকৃতিগতভাবেই কোনও ধর্মীয় দর্শন বা ধারণা মৌলিক হতে পারে না, কারণ এটা মৌলিক পূর্ব-বিদ্যমান সত্তা বা বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে। মুহাম্মদ (স:) এই সত্যটি অন্য অনেক ধর্মীয় নেতার তুলনায় অনেক পরিষ্কারভাবে বুঝতে এবং প্রকাশ করতে

পেরেছিলেন। হিরা পর্বতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশে নতুন কিছু ছিল না। এটা ঈশ্বরের আদি ধর্ম মাত্র– বারবার যার প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু আরবদের কাছে তাকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ)। অচিরেই আল্-ল্লাহর যে ধর্ম মক্কায় প্রচার শুরু করেছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) তা হিরা পর্বতে সূচিত হয়নি, হয়েছে সৃষ্টির মুহূর্তে। ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর *খলিফা* বা প্রতিনিধি হিসাবে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির কাছে একের পর এক পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন।[২৭] ঐশী বাণী সব সময় একই ছিল, সুতরাং সকল ধর্ম অত্যাবশ্যকীয়ভাবে একই ধর্ম। কোরান কখনওই পূর্বেকার প্রত্যাদেশ বাতিল বা নাকচ করে দেয়নি, বরং নীতিগতভাবে কোনও প্রথা, সংস্কার বা ঐশীগ্রন্থ অপরটির মতই।[২৮] গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হল ঈশ্বরের কাছে কারও আত্মসমর্পণের গুণ, তাঁর ইচ্ছার মানবিক অভিব্যক্তির কাছে নয়। 'ঈশ্বরের ধর্ম বাদে অন্য কোনও ধর্ম আকাঙ্ক্ষা'[২৯] করার কোনও প্রয়োজন মানুষের নেই। পয়গম্বরগণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন তার প্রকাশ। এভাবে জেসাস 'প্যারাক্লিটে'র [আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কোনও কোনও আরব এর অনুবাদ করেছে 'আহমেদ' হিসাবে যা মুহাম্মদ (সঃ)-এর অপর নাম] আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন–ওই বিশ্বাসের প্রসঙ্গে কোরান বলছে :

> স্মরণ করো, মরিয়ম পুত্র ঈসা বলেছিল,
> 'হে বনি-ইসরাইল। আল্লাহ আমাকে তোমাদের
> কাছে পাঠিয়েছেন, আমার আগে থেকে তোমাদের
> কাছে যে তাওরাত আছে আমি সমর্থক, আর পরে
> আহমেদ নামে যে রাসুল আসবে আমি তারও
> সুসংবাদদাতা।'...[৩০]

মুহাম্মদের (সঃ)-এর প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ একটা কারণেই আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তা হচ্ছে ঈশ্বর প্রথমবারের মত কুরাইশদের কাছে একজন বার্তাবাহক এবং তাদের মাতৃভাষায় একখানা ঐশীগ্রন্থ প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং এখানে প্রত্যাদেশের ঐতিহাসিক ধরনের প্রতি অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব রয়েছে। এ বিষয়টির প্রতি জোর দেয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ বর্তমান পাশ্চাত্যের লোকেরা ইসলামের সঙ্গে সহিষ্ণুতাকে মেলাতে চায় না। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে ইঙ্গিত দেয়া হবে, ইসলামের অসহিষ্ণুতার উৎস ক্রিশ্চানদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ার পেছনে ক্রিয়াশীল মতবিরোধ নয়, বরং এর মূল একেবারে আলাদা। মুহাম্মদ(সঃ) এর পরলোকগমনের পর ইহুদী ও ক্রিশ্চানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ছিল না। বরং ইসলামি বিশ্বে স্বাধীনভাবে তারা ধর্ম পালনের অধিকার লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে যরোস্ট্রিয়, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং শিখরা *আহল আল কিতাবের* অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়েছে। অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীদের সঙ্গে

সহাবস্থানে মুসলিমদের কখনও সমস্যা হয়নি। শত শত বছর ধরে ইসলামি রাজ্য ক্রিশ্চান ও ইহুদীদের আশ্রয় দিতে পেরেছে; কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপ ইহুদী ও ক্রিশ্চান এলাকায় মুসলিমদের অবস্থান মেনে নিতে পারেনি।

ইসলামের ইতিহাসে ৬১০ খৃস্টাব্দের হিরা পর্বতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তবে সেটা ছিল সূচনামাত্র। আজকের মুসলিমদের দৃষ্টিকোণে মক্কার হিরা পর্বতে এবং পরে মদীনায় প্রত্যাদেশের প্রকৃতি নয় বরং সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে জীবনের মূল্য ও অর্থ বোঝানোর ক্ষমতার মাঝেই কোরানের অলৌকিকত্ব নিহিত। পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রয়োজনের স্বার্থে ইসলাম ধর্মকে আদি দর্শনের ক্রমাগত পরিবর্তন ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হয়েছে : প্রত্যেক প্রজন্মের ক্ষেত্রে একে অন্য যেকোনও বিশ্বাসের মত আধুনিকতার প্রতি সাড়া দিতে হয়েছে।

কোরানে মুহাম্মদকে (সঃ) প্রায়ই *উম্মী* বা নিরক্ষর পয়গম্বর বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং নিরক্ষরতার ধারণা তাঁর অনুপ্রেরণার অলৌকিক প্রকৃতির দিকে জোর দিয়েছে। তবে কিছু কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত দাবী করেছেন যে '*উম্মী*' খেতাব 'নিরক্ষর' হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং একজন ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি হয়ত প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস তিনি নিজেকে 'অক্ষর বিহীনদের পয়গম্বর' বলে দাবী করেছেন–যারা ঈশ্বরের তরফ থেকে কোনও গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়নি। অন্য কথায়, '*উম্মী*' মানে আপন গোত্রের পয়গম্বর। অন্য লেখকগণ এই ধারণা থেকে আরও অগ্রসর হয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে '*উম্মী*' শব্দ '*উম্মা*' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত যার অর্থ সমাজ এবং সেই মোতাবেক ওই খেতাবের অর্থ, 'সমাজের পয়গম্বর' (Prophet of the People)। প্রকৃতপক্ষে, *উম্মী* ও *উম্মার* ভেতরে আসলে কোনও সম্পর্ক নেই। মুসলিমরা এই ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত অপমানকর বলে গ্রহণ করেছে। আমরা দেখেছি প্রায় হাজার বছর ধরে পশ্চিমবাসী মুহাম্মদের(সঃ) পয়গম্বরত্বের নির্ভেজালত্ব বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটাও তেমনি ব্যাখ্যা প্রদানের একটা দিক বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে '*উম্মী*'র প্রচলিত মুসলিম ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করা বিকৃতির পরিচায়ক বলে মনে হয়। মুহাম্মদ (সঃ)-এর লেখা-পড়া সম্পর্কে প্রাথমিক সূত্রে কোনও উল্লেখ মেলে না। চিঠি লেখার প্রয়োজন হলে তিনি তা শ্রুতিলিখন করাতেন এবং আলীর মত সাক্ষর কেউ তা লিপিবদ্ধ করতেন। পড়া শোনা জানার ক্ষমতা সারাজীবন গোপন রাখতে এক বিরাট প্রতারণার প্রয়োজন হত। এটা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী; তাছাড়া, এরকম একটা ব্যাপার চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল, কেননা আপন গোত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জীবন যাপন করেছেন তিনি। নিরক্ষর হিসাবে '*উম্মী*'র অনুবাদ আসলেই বেশ আগের : এবং মুসলিমদের কাছে যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণও বটে। জেসাসের 'ভার্জিন বার্থ' ধারণার মতই এর প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে : মানুষের কাছে ঈশ্বরের বার্তাবাহকের জন্যে প্রয়োজনীয় পবিত্রতার ওপর জোর দেয় : কেবল মানবিক উপাদান দিয়ে প্রত্যাদেশ লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না।

তথাপি, মুহাম্মদ (স:) নিষ্ক্রিয়ভাবে ঈশ্বর ও মানবজাতির মাঝখানে অনেকটা টেলিফোনের মত ভূমিকা পালন করেছেন—এমনটি কল্পনা করা ভুল হবে। অপরাপর পয়গম্বরের মত তাঁকে মাঝে মাঝে প্রত্যাদেশের অর্থ বোঝার জন্যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, যা সব সময় স্পষ্ট বাণী আকারে আসত না। অনেক সময় বাণীর পরিবর্তে দৃশ্যাকারে প্রত্যাদেশ আসত।[৩১] আমরা দেখেছি মুহাম্মদের শেষ সময়ের স্ত্রী আয়েশা দাবী করেছেন যে মুহাম্মদের (স:) প্রথমদিকের প্রত্যাদেশগুলো দৃশ্যমান ছিল। সেগুলোর একেবারে আবছা অদম্য এবং মহিমাকর অর্থের মিশেল ছিল : 'পয়গম্বরকে প্রদত্ত পয়গম্বরত্বের প্রথম চিহ্ন ছিল বাস্তবদৃশ্য, ভোরের আলোর মত ছিল যার ঔজ্জ্বল্য [*ফালাক্ আস্-সুবহ্*]'[৩২]। এ বাকধারা এই অঞ্চলে সূর্য ওঠার সময় পুবের গোটা প্রকৃতির আকস্মিক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে। মুহাম্মদ (স:) স্পষ্ট বাণী নয় বরং বিহ্বলকারী আশার এক আভাস পেয়েছিলেন।

মুসলিমদের প্রচলিত বিবরণ থেকে দেখা যায় এই বার্তা ভাষায় প্রকাশ করা মোটেই সহজ ছিল না। একবার মুহাম্মদ (স:) বলেছেন : 'প্রতিবারই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমার মনে হয়েছে বুঝি মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।'[৩৩] ওটা ছিল যন্ত্রণাদায়ক সৃষ্টির এক প্রক্রিয়া। অনেক সময় তিনি বলেছেন : মৌখিক বার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট : তিনি যেন মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছেন, তাঁর বক্তব্য শুনেছেন। কিন্তু অন্যান্য সময়ে ব্যাপারটা ছিল অনেক বেশি কষ্টদায়ক ও সামঞ্জস্যহীন : 'অনেক সময় এমনভাবে আমার কাছে প্রত্যাদেশ আসে যেন ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি-তখনই সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় আমার : ওগুলোর অর্থ সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে ওঠার পর ঘণ্টাধ্বনি কমে আসে।'[৩৪] আমরা দেখব কবি যেমন ধীরে ধীরে আলোর দিকে টেনে আনা কবিতা শ্রবণ করেন তেমনি তিনিও কোনও সমস্যার সমাধানের খোঁজ নিজের দিকে ফিরে মনের ভেতর অনুসন্ধান চালাতেন। কোরান তাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অসংলগ্ন অর্থ শ্রবণ করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে—সেই সঙ্গে ওয়ার্ডসওঅর্থ যাকে বলতেন 'বিচক্ষণ নিষ্ক্রিয়তা' (Wise Passiveness)-র সঙ্গেও- যথাসময়ে আপন অর্থ নিয়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠার আগে তিনি যেন তাড়াহুড়ো করে কোনও অর্থ না করে বসেন :

> 'এ সংরক্ষণ ও আবৃত্তি করানোর (ভার) আমারই।
> সুতরাং যখন আমি পড়ি, তুমি সেই পাঠের
> অনুসরণ করো। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার
> (দায়িত্ব) আমারই।'[৩৫]

আকাশ থেকে গমগম করে 'স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর' শোনা যায়নি; ঈশ্বর 'মহাশূন্যে' স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার মত কোনও অস্তিত্ব নন। তাঁকে শুনতে হলে নিজের দিকেই চোখ ফেরাতে হবে। পরবর্তীকালে ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদী সুফিগণ

ঈশ্বরকে আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি বিশ্বাস করে ধারণা গড়ে তুলেছেন। কেউ কেউ অদৃশ্য কণ্ঠস্বরকে বলতে শুনেছেন : 'তুমি ছাড়া আর ঈশ্বর নেই।'

আবার গোড়ার দিকে মুহাম্মদ (স:) কতসংখ্যক প্রত্যাদেশ পেয়েছেন আমরা জানি না। তবে আমরা এটা জানি যে মুহাম্মদ (স:), খাদিজা এবং ওয়ারাকা তা গোপন রেখেছিলেন। পাশ্চাত্যের শত্রুরা যেমন বর্ণনা করেছে আসলে তিনি আদৌ আত্মপ্রচারে উন্মুখ ছিলেন না। তবে প্রথম কয়েকটি প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পর প্রায় দুবছর নীরবতার অভিজ্ঞতা হয়েছে মুহাম্মদের (স:)। প্রচণ্ড হতাশার ছিল এ সময়টি, কোনও কোনও মুসলিম লেখক তাঁর আত্মহত্যার মত মানসিক অবস্থার জন্যে এই সময়কে দায়ী করেছেন। তিনি কি ভ্রান্তির কবলেই পড়েছিলেন? নাকি ঈশ্বর তাঁকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য দেখে পরিত্যাগ করেছেন? নীরবতা ছিল ভয়াবহ, কিন্তু তারপর অবতীর্ণ হয় ৯৩ নম্বর সুরা-সুরা দোহা-উজ্জ্বল আশ্বাসের বাণী নিয়ে :

> শপথ দিনের প্রথম প্রহরের।
> আর শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে!
> তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যাননি এবং
> তোমার ওপর তিনি অসন্তুষ্টও নন।
> তোমার জন্যে পরকাল ইহকালের চেয়ে ভাল।
> তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ করবেনই,
> আর তুমিও সন্তুষ্ট হবে।
> তিনি কি তোমাকে অনাথ অবস্থায় পাননি, আর আশ্রয় দেননি?
> তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেননি?
> তিনি কি তোমাকে অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেননি?
> সুতরাং তুমি অনাথদের প্রতি কঠোর হয়ো না।
> আর যে সাহায্য চায় তাকে ভর্ৎসনা করো না।
> আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করো।[৩৬]

মুহাম্মদ (স:) তাঁর মিশন শুরু করার জন্যে এখন প্রস্তুত। আপন অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রাখতে শিখেছেন তিনি, এখন তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে এই বাণী সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত। তিনি পথভ্রান্ত *কাহিন* নন। এই বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে সাহস প্রয়োজন, কিন্তু এবার এমন এক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন যার জন্যে দৃঢ় সংকল্পের চেয়েও বাড়তি কিছু প্রয়োজন হবে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা হিসাবে ওয়ারাকার মতামতকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁকে 'কুরাইশদের পয়গম্বর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবার তিনি নিজেকে আপন গোত্রের সামনে উপস্থাপন করবেন। কাজটি সহজ হবে না বলে ওয়ারাকা তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বয়স হয়েছে, আর বেশি দিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই, মুহাম্মদকে (স:) বলেছিলেন

তিনি, কিন্তু মুহাম্মদকে (সঃ) কখন তাঁর জাতি প্রত্যাখ্যান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করেন। এ কথায় মুহাম্মদ (সঃ) আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সত্যি কি ওরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে, হতাশার সঙ্গে জানতে চেয়েছেন তিনি। ওয়ারাকা দুঃখের সঙ্গে বলেছেন পয়গম্বররা সব সময় তাঁর আপনদেশে নিগৃহীত হন। আমরা দেখব, প্রথম বাণী প্রচার শুরু করার সময় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)। জানতেন, তাঁর দাবীকে উপহাস, ব্যঙ্গ করা হবে। লোকে তাঁকে ক্রিশ্চান *হানিফ* উসমান ইবন আল-হুয়ারিথের মত বাইযানটাইনদের চর ভেবে বসতে পারে বা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও অপবিত্রতা আরোপের অভিযোগ তুলতে পারে। তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বিপদজনক দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন, যা তাঁকে এমন এক পথে নিয়ে গিয়েছে যা কখনও কল্পনা করা হয়নি।

৫. সতর্ককারী

জ্যাকব যেমন তাঁর ফেরেশতার সঙ্গে জাপটাজাপটি করেছিলেন তেমনি যেন হিরা পর্বতে এক ভয়ঙ্কর অথচ চূড়ান্ত বিচারে উজ্জ্বল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)। এবার স্বর্গীয় এলাকা থেকে ছিনিয়ে আনা বাণী আপন জাতির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সুরা দোহা এক স্পষ্ট সামাজিক নির্দেশ জারি করেছিল : নারী-পুরুষকে অবশ্যই গোত্রের দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এখানে নতুনত্ব কিছু নেই। প্রাচীন *মুরুব্বাহ* আদর্শে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু কুরাইশরা যেন তা বিস্মৃত হয়েছিল। কোরান বলে এই বাণীটি সারা পৃথিবী জুড়ে অতীতের প্রত্যেক পয়গম্বরের নিকট আগত প্রত্যাদেশের মূল বিষয়। মুসলিমদের প্রচলিত বর্ণনায় দাবী করা হয় : এ ধরনের ১,২৪,০০০ পয়গম্বর রয়েছেন, সীমাহীনতা বোঝাতে এই প্রতীকী সংখ্যার ব্যবহার। মানুষ যদিও আবাধ্য হয়ে স্বর্গীয় বাণী বিস্মৃত হয়ে যায়, কিন্তু ঈশ্বর কখনও মানবজাতিকে জীবন ধারণের সঠিক পথের জ্ঞান না দিয়ে ছেড়ে দেননি। তবে এবার, অবশেষে কুরাইশদের কাছে একজন পয়গম্বর পাঠিয়েছেন তিনি, যাদের এর আগে কখনওই এমন একজন দূত ছিল না। ৬১২ খৃস্টাব্দে, মিশনের সূচনায় নিজের ভূমিকা সম্পর্কে ক্ষীণ ধারণা ছিল মুহাম্মদের (স:)। তিনি উদ্ধারকর্তা বা মেসিয়াহ্ নন; তাঁর মিশনটি বিশ্বজনীন নয়– তখন পর্যন্ত এমনকি তিনি একথাও ভাবেননি যে পেনিনসুলার অন্যান্য আরবদের মাঝেও ধর্ম প্রচার করতে হবে। পয়গম্বরদের দীর্ঘ সারিতে তিনি কেবল মক্কা এবং এর আশপাশে একটা বাণী পৌঁছে দেবেন, ব্যস।[১] তাঁর কোনও রাজনৈতিক ভূমিকা থাকবে না।[২] তিনি '*নাজির*'–সতর্ককারী মাত্র। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে মুহাম্মদের (স:) ধারণা পরে বদলে গিয়েছিল, কিন্তু শুরুর সময় তিনি কেবল বিশ্বাস করতেন যে তাঁকে পাঠানো হয়েছে কুরাইশরা সম্প্রতি যে পথ বেছে নিয়েছে তার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে :

> ওহে, তুমি যে কিনা নিজেকে কাপড়ে ঢেকে রেখেছ।
> ওঠো, সাবধানবাণী প্রচার করো! ও তোমার
> প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।
> পবিত্র করো তোমার কাপড়।
> আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো![৩]

কিন্তু তার মানে এই নয় যে মুহাম্মদ (স:) শাস্তির বাণী নিয়ে শুরু করেছিলেন। প্রথমদিকের সুরাসমূহের ভেতর শেষ বিচারের প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোরানের গোড়ার দিকের বাণী অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন মক্কার প্রত্যেক নারী-পুরুষ ঈশ্বরের মহানুভবতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠুক, প্রতিদিনের জীবন যাপনে যা তারা দেখতে পায়। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, পথের দিশা দিয়েছেন এবং তাদের সুবিধার জন্যে গোটা বিশ্বজগতের নিয়মশৃঙ্খলা নিশ্চিত করেছেন। আল্-ল্লাহর 'নিদর্শন সমূহ' (*আয়াত*) যা কুরাইশগণ তাঁর সৃষ্টি বলে মেনে নিয়েছে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করার ভেতর দিয়ে তারা তাঁর অপার দয়া এবং নিজেদের বিকৃত কৃতজ্ঞতাহীনতা উপলব্ধি করতে পারবে :

মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!
তিনি তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন?
তিনি তাকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেন,
তারপর তার বিকাশ সাধনের জন্যে
নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী গঠন করেন,
তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন,
তারপর তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন।
এরপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।
না, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন
সে তা পালন করেনি।
মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক;
(কেমন করে) আমি প্রচুর বারি বর্ষণ করি,
তারপর ভূমিকে বিদীর্ণ করি,
এবং তার মধ্যে উৎপন্ন করি,
শস্য, আঙুর, শাকসবজি,
জয়তুন, খেজুর,
গাছগাছালির বাগান,
ফল ও গবাদি খাদ্য।
এ তোমাদের ও তোমাদের আনআমের ভোগের জন্য।[৪]

কিন্তু তারপরেও মানুষ ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

মুহাম্মদ (স:) অবশ্য চাহিদার বিরাট তালিকা জারি করেননি। প্রধানতঃ তিনি কুরাইশদের পরিচিত প্রাচীন আরবদের মর্যাদার আচরণবিধির সংস্কার নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কোরানের দাবী ছিল নারী-পুরুষ প্রত্যেকে একটা ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবে যেখানে অসহায়েরা সদাচরণ পাবে। কোরানের বাণীর মর্মবস্তু

ছিল এটাই। আজ যদি আমাদের কাছে মুসলিমদের অসহিষ্ণু মনে হয়, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের মত তারা কিন্তু সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনের প্রতি অসহিষ্ণু ছিল না। বরং তারা অন্যায় অবিচারের প্রতি অসহিষ্ণু-সেটা তাদের নিজস্ব কোনও শাসক যেমন ইরানের শাহ্ মুহাম্মদ রেজা পাহলভী, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাত কিংবা শক্তিশালী পশ্চিমা কোনও দেশের কারণেই ঘটে থাকুক না কেন। কোরানের শুরুর দিকের বাণী ছিল সহজ : সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার জন্যে সঞ্চয় ঠিক নয়, কিন্তু দান করা ভাল, এবং সমাজের সম্পদের বিতরণও সৎকাজ।

পশ্চিমের পণ্ডিতগণ আমাদের বলেন যে মুহাম্মদকে (স:) একজন সমাজতন্ত্রী হিসাবে দেখা ঠিক নয়। তাঁরা বলেন, তিনি কখনও পুঁজিবাদের সমালোচনা করেননি, যা কুরাইশদের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল এবং তিনি পুরোপুরি দারিদ্র বিমোচনেরও কোনও পদক্ষেপ নেননি, সপ্তম শতকের আরবে তা হত একটা অসম্ভব কাজ। মুহাম্মদ (স:) হয়ত সমাজতন্ত্রের আধুনিক সকল ধারণা অনুসরণ করেননি—যেভাবে পাশ্চাত্যে তার বিকাশ ঘটেছে– কিন্তু গভীরভাবে ভাবতে গেলে তিনি নিঃসন্দেহে একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যের ওপর তা অনেপনীয় প্রভাব রেখে গেছে। একথা ঠিক যে তিনি জেসাসের মত সম্পদের নিন্দা করেননি : মুসলিমদের সকল সম্পত্তি বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং তাদেরকে দানশীল হতে বলা হয়েছে এবং তাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদের মাঝে বণ্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভিক্ষাপ্রদান (*যাকাত*) ইসলামের পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভ বা *রুকন*-এর অংশে পরিণত হয়।[৫] প্রাথমিক ইসলামি নীতি অনুযায়ী এক ধরনের দানখয়রাতের আবশ্যকীয়তা ছিল।[৬] মুসলিমরা অর্থের ব্যাপক সঞ্চয় গড়ে তুলতে বা অন্যের চেয়ে বেশি সম্পদ আহরণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারবে না।[৭] তাদেরকে অবশ্যই দরিদ্রদের দেখাশোনা করতে হবে এবং অবশ্যই এতীমদের তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে না যখন তাদের সম্পদের দেখাশোনার দায়িত্ব পাবে—যেমনটি বহু কুরাইশ করে আসছিল।[৮] মুসলিমরা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তিতে পরিণত হওয়ার পরেও, যখন অনেকেই বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছে, তখনও এই মৌলনীতি অক্ষয় রয়ে গেছে। ইসলামের সাম্যবাদ বোঝায় যে 'পবিত্র আইন' যেকোনও *খলিফাকে* রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে ক্রমশঃ বঞ্চিত করে এবং তিনি তখন একক সত্তার এক প্রতীকে পরিণত হন মাত্র। রাজদরবার সম্পদশালী ছিল হয়তবা, কিন্তু ইসলামি বিশ্বের ধর্মীয় জীবনের সকল স্তরের মুসলিমরা-বিচারক এবং সাধক উভয়ই–দাবী করেছেন যে এরকম জাঁকাল সম্পদ ইসলাম-বিরোধী ছিল। স্থানীয় কোনও শাসক নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিতে চাইলে তাকে সবার আগে সহজ সরল জীবন যাপন করে সমতার আদর্শ অনুসরণের প্রমাণ রাখতে হত। একারণেই ক্রুসেডের সময় মুসলিমদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা নূর আদ-দীন এবং সালাদীন তাঁদের সম্পত্তির বিরাট অংশ

দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সতীর্থদের মত সহজ সাধারণ জীবন যাপন করেছিলেন। এভাবে তাঁরা জনগণের কাছে আবেদন রাখতে পেরেছেন, নিকট প্রাচ্যে অন্য যে কোনও শাসকের চেয়ে নিজেদের মুসলিম হিসাবে উন্নততর প্রমাণ করেছেন। এই জনপ্রিয় খ্যাতির ভিত্তিতেই তাঁরা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন এবং জনগণ তাঁদের খাঁটি বলে ভাবত, কেননা তাঁদের জীবনযাত্রা পয়গম্বরের অনুরূপ ছিল।

আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী *'সায়ীদ'* হওয়ার পরেও মুহাম্মদ (স:) খুব সহজ ও মিতাচারী জীবন কাটিয়েছেন। বিলাসিতাকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং প্রায়ই দেখা যেত তাঁর বাড়িতে খাওয়ার মত কিছু নেই। তাঁর কখনওই এক সেটের বেশি পোশাক থাকত না, সঙ্গীরা তাঁকে উৎসবের পোশাক পরার অনুরোধ জানালেও সবসময়ই প্রত্যাখ্যান করেছেন, অধিকাংশ মানুষের পরিধেয় ভারি কর্কশ কাপড়ই বেছে নিতেন। উপহার সামগ্রী পেলে তা গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং জেসাসের মত মুসলিমদের তিনি বলতেন দরিদ্ররা ধনীদের আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এটা দুর্ঘটনা নয় যে, প্রথম যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের ভেতর অনেকেই ছিল মক্কার দুস্থ মানুষ : দাস এবং নারী উভয়ই স্বীকার গেছে যে এই ধর্ম তাদের আশার বাণী শুনিয়েছে। আমরা দেখব যে তিনি ধনী গোত্র থেকেও নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষমতাবান ও অভিজাত কুরাইশদের অধিকাংশই সাড়া দেয়নি : মুসলিমরা যখনই কা'বায় জমায়েত হত নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণকে তারা ভর্ৎসনা করত যাদের সঙ্গে মহান আব্দ আল-মুত্তালিবের পৌত্র আনন্দের সঙ্গে মেলামেশা করছিলেন। ইসলাম আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলে কুরাইশদের দরিদ্র সাধারণ নবদীক্ষিতরাই পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হয়েছিল, উচ্চ শ্রেণীর ধনী মুসলিমরা নয়। এগুলোর কোনওটাই নিছক ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার ছিল না। মুহাম্মদ (স:) জানতেন প্রথমদিকের মুসলিমদের সামনে তাঁকে একটা উদাহরণ দেখাতে হবে, আল-লাহ যে অবিচার আর শোষণ ঘৃণা করেন তা বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনও সভ্য সমাজ, যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটছে, তাকে অবশ্যই জীবন ধারায় কঠোরভাবে সাম্য নিশ্চিত করতে হবে।

তো, আধুনিক যেকোনও সেক্যুলারিস্ট প্রশ্ন তুলতে পারেন, তিনি ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলেন কেন? হিরা পর্বতে এত সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে মুহাম্মদ(স:) কেন সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেননি? তিনি জানতেন সমস্যার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত, তেমন কোনও সংস্কার কেবল প্রসাধনে পর্যবসিত হত। কুরাইশরা যদি তাদের জীবনযাত্রার কেন্দ্রে আরেকটি অলৌকিক মূল্য আরোপ না করে তাহলে তা অকার্যকর রয়ে যাবে। সহকর্মীদের চেয়ে অনেক গভীর স্তরে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মক্কার অস্থিরতার মূলে রয়েছে অস্বাস্থ্যকর এবং অবাস্তববাদী অনুমান (*ইয়েতকা*) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার (*ইসতাকা*)'র প্রবণতা। আগেকার দিনে যখন গোত্রের স্বার্থ ছিল সবার আগে, তখন প্রয়োজনের তাগিদে আরবরা উপলব্ধি করেছিল যে প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের ওপর

নির্ভরশীল। আরবীয় উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা সবসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মুখোমুখি থাকত, কিন্তু তাদের সাফল্য আরব বিশ্বের জীবনের অপরিহার্য উপাদান- বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করেছে। পরিণামে এবং বোধ্যগম্য কারণেই তারা অর্থভিত্তিক এক নতুন ধর্ম গড়ে তুলেছিল। নিজেদেরই ভাগ্যবিধাতা বলে বিশ্বাস করত তারা। কোরানে আভাস মেলে যে কেউ কেউ এমনকি বিশ্বাস করত যে অর্থ তাদের এক ধরনের অমরত্ব দিতে পারে,[১০] যা অতীতে একমাত্র গোত্রই দিতে পারত। তাদের সমাজ অবশ্য তখন দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হত। কিন্তু এখন এক গোত্র অপর গোত্রের বিরুদ্ধে হানাহানিতে লিপ্ত, এবং হাশিম গোত্রের মত কোনও কোনও গোত্র অনুভব করছিল যে তাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। আদি গোত্রীয় একতা ভেঙে পড়ছে যার ফলে তারা বিচ্ছিন্ন, বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। মুহাম্মদের (স:) নিজস্ব জীবনে এই আশঙ্কার প্রমাণ মেলে। পরবর্তীকালে, প্রায় বিশ বছর পর, কুরাইশদের পরাজিত করেছিলেন তিনি সেটা কেবল তাঁর দক্ষতা বলে নয় যদিও তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ– বরং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অক্ষম হয়েছিল বলে। মুহাম্মদ(স:) যখন তাঁর মিশন শুরু করেন তখন এক ধরনের নিষ্ঠুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ গোত্রীয় মূল্যবোধ বা নীতিমালাকে হটিয়ে দিচ্ছিল : শেষ বিচারের দিনে শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সকল নিকটাত্মীয়কে বিসর্জন দিতে চাইবে এমন এক ব্যক্তির ভয়ঙ্কর উদাহরণের সাহায্যে কোরান এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে[১১] –এমন একটা ব্যাপার রক্তের বাঁধন যখন পবিত্র বলে বিবেচিত হত সেই সময় চিন্তার অতীত ছিল।

এসব ভ্রান্তি দূর করার জন্যে কুরাইশদের নিজেদের মাঝে এক নতুন চেতনা জাগরিত করার প্রয়োজন ছিল। এই সময়ের অধিকাংশ রাজনৈতিক সমাধানই ছিল ধর্ম ভিত্তিক। মুহাম্মদ (স:) যখন কুরাইশদের আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্-লাহর ওপর বিশ্বাসের তাৎপর্য চিন্তা করতে বলেন, তিনি কিন্তু নতুন কোনও কিছুর প্রস্তাব রাখেননি। অষ্টাদশ শতকের আগে নাস্তিক্যবাদের আধুনিক ধারণা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব ছিল, তাও সেটা ছিল পশ্চিমে। কুরাইশরা সবাই গভীরভাবে পরম ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তাদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে আল্-লাহই ক্রিশ্চান ও ইহুদীদের উপাস্য ঈশ্বর। এখন মুহাম্মদ(স:) তাদের কাছে এমন বিশ্বাসের পরিণাম উপলব্ধি করতে বলছেন।

তাঁকে আল্-লাহ'র অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হয়নি, কিন্তু তিনি নির্দেশ করেছেন যে কুরাইশরা যদি তারা যা বলে তা বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে তাদের আরও কিছু ভাববার প্রয়োজন আছে। ইহুদী এবং ক্রিশ্চানরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর শেষ দিবসে মানুষকে আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন– আরব অদৃষ্টবাদ এই ধারণাকে অস্বীকার করেছিল যদিও প্রত্যেক আত্মার ওপর এর মারাত্মক প্রভাব রয়েছে : এমনকি গোত্রের দুর্বলতম সদস্যটিরও একটি অনন্ত গন্তব্য রয়েছে এবং রয়েছে তার পবিত্র গুরুত্ব। কুরাইশরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকে যে আল্-লাহ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তাদের বোধ হয় উচিত নতুন দৃষ্টিতে তাঁর সৃষ্টিকে দেখা।

মিশনের প্রাথমিক অবস্থায়, মুহাম্মদ(সঃ) যখন কেবল সযত্নে বাছাইকৃত লোকদের মাঝে প্রচারণা চালাচ্ছেন, তখন কুরাইশদের বহু প্রাচীন বিশ্বাসের কথা স্মরণ করতে বলেছেন এবং তাকে চলমান পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা ও প্রয়োগের কথা বলেছেন। ওদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার নতুন প্রথা কিভাবে সেই হস্তী বর্ষের গৌরব স্মৃতির সঙ্গে খাপ খায়, যখন কিনা ঈশ্বর নাটকীয় অলৌকিক ঘটনার দ্বারা নগরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন আর বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওদের মর্যাদা? এটা আরকেটি নির্দশন, যা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাদের বিবেচনা করা উচিত :

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন?
তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি?
ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি পাঠিয়েছিলেন,
যারা ওদের ওপর কঙ্কর ফেলেছিল।
তারপর তিনি ওদেরকে (জন্তু জানোয়ারের) খাওয়া ভূসির মত করে ফেলেন।[১২]

এই ঘটনা সম্পর্কে গর্ব প্রকাশ করে কুরাইশরা স্বীকার করে নিয়েছিল যে স্রেফ নিজেদের প্রচেষ্টার কারণে তারা ক্ষমতা আর সাফল্যের মুখ দেখেনি। কোরান অভিনব কিছুর উন্মোচন করছিল না : একে 'স্মরণ কারক' বলে দাবী করা হয়েছে—যা আগে থেকেই সবার জানা। অতীতের ঘটনাবলীই কেবল আবার পরিষ্কার করে দিচ্ছিল, স্থাপন করছিল আরও সাবলীল অর্থময় স্তরে। বারবার 'তুমি কি দেখনি?' বা 'তুমি কি ভেবে দেখনি?' শব্দবন্ধ দিয়ে কোরান নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে। ঈশ্বরের বাণী আকাশ থেকে বজ্রের মত গমগম করে উচ্চারিত হয়নি, বরং কুরাইশদের একটা কথপকথনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে যা অতীতকে নাকচ করে দেয়নি বরং তা গড়ে উঠেছে প্রাচীন আরবের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ : কোরান মনে করিয়ে দিয়েছে যে কা'বা–যাকে নিয়ে কুরাইশদের এত গর্ব, তা আল্-লাহর ঘর ছিল এবং তাদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণও বটে। হস্তীবর্ষে আবিসিনীয় আগ্রাসনের কারণ ছিল ওটাই। আল্-লাহ প্রদত্ত উপাসনাগৃহ ছাড়া তাদের পক্ষে এমন একটা সফল বাজার গড়ে তোলা সম্ভব হত না, তাদের শহর অবিরাম অন্যান্য গোত্রের হামলার আশঙ্কার মধ্যে থাকত, আরবদের ক্ষুধা রোগ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারত না ওরা :

কুরাইশদের সংহতির জন্যে,
শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তাদের সংহতির জন্য,
তাদের উপাসনা করা উচিত এই (কা'বা) গৃহের প্রতিপালকের।
যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দিয়েছেন
আর নিরাপদ করেছেন ভয় থেকে।[১৪]

কোরান তাদের একথা বলেনি যে সব ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে সবকিছু ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিতে হবে বরং ঠিক উল্টো, আমরা তা দেখব। কিন্তু বর্তমান অবস্থার আলোকে তাদের একেবারে মৌলিক কিছু বিশ্বাসকে পুনর্বিবেচনা করার আহবান জানিয়েছে। কুরাইশরা আল্-ল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করতে ভালবাসে, কিন্তু তারা যখন নিজেদের এবং জাগতিক সাফল্যকে আপন জগতের কেন্দ্রে স্থাপন করে তখন যেন প্রাচীন আচারের অর্থ বিস্মৃত হয়। 'সংহতি' (*ইলাফ*), পবিত্র এলাকা ঘিরে কুরাইশদের একতা, প্রাচীন গোত্রীয় আদর্শ বিনষ্টি এবং দুর্বল গোত্র, এতিম, দরিদ্র, বয়স্ক এবং দুস্থদের প্রতি নজর না দেয়ার কারণে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। তারা যদি এমন আচরণ অব্যাহত রাখে তাহলে দুনিয়াতে তারা প্রকৃত অবস্থানের অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে।

এরকম প্রাথমিক পর্যায়ে সাম্প্রতিক সাফল্য ও আপাত নিরাপত্তা বোধ সত্ত্বেও মক্কাবাসীরা যে কতকিছুর জন্যে আল্-ল্লাহর কাছে ঋণী, কোরান সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছে। তাদের উচিত তাঁর দয়ার নিদর্শনসমূহ ও ক্ষমতা লক্ষ্য করা যা স্বাভাবিক পৃথিবীর সর্বত্রই দৃশ্যমান। তারা যদি নিজেদের সমাজে এই মহত্ব পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিজেদেরই তারা বস্তুসামগ্রীর প্রকৃত প্রকৃতির বাইরে স্থাপন করবে :

> পরম করুণাময় আল্লাহ্,
> তিনিই কোরান শিক্ষা দিয়েছেন।
> তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ।
> তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।
> সূর্য ও চন্দ্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে।
> তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই নিয়ম মেনে চলে।
> তিনি আকাশকে সমুন্নত রেখেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন।
> যাতে তোমরা সীমা লঙ্ঘন না কর।
> তোমরা ন্যায্য ওজনের মান রেখো ও ওজনে কম দিয়োনা।
> তিনি সৃষ্ট জীবের জন্যে পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন।
> সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর গাছের নতুন কাঁদি,
> খোসায় ঢাকা শস্যদানা আর সুগন্ধি গাছগাছড়া।
> অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[১৩]

অন্যান্য সকল প্রাণী ঈশ্বরকে স্বীকার করে এবং তাঁর সামনে নত হয়, তাঁকে নিজেদের স্রষ্টা বলে জানে, তিনি তাদের প্রাণের উৎস যা ছাড়া তারা বেঁচে থাকতে পারত না। ঈশ্বরই মূল শক্তি বা বল যা সবকিছুকে চালু রাখে এবং শক্তি জোগায়।

তিনি ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন যা প্রত্যেক জিনিসকে পরস্পরের সাপেক্ষে সঠিক অবস্থানে রাখে এবং কুরাইশরা যদি আপন সমাজে সেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা না করে, যদি পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে সঠিক ওজন ও পরিমাপ প্রদান না করে, তারা প্রকৃতির বাইরে চলে যাবে। প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মাঝে ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্বশীল স্বীকারোক্তির আচরণ গড়ে তোলার জন্যে মুহাম্মদ (সঃ) গাছপালা ও নক্ষত্ররাজির মত দিনে দুবার তাঁর সামনে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় নত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই প্রার্থনা বা *সালাত* ইসলামের আরেকটি স্তম্ভে পরিণত হয়। বাহ্যিক ভঙ্গিমা অন্তরের ভঙ্গিকে আবাদ করবে এবং মৌলিক স্তরে তাদের জীবনকে পুনর্গঠন করবে।

পরে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আল্-ল্লাহ'র ধর্ম *ইসলাম* নামে পরিচিতি পেয়েছে : ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেক ধর্ম গ্রহণকারীর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভূমিকা এটা : '*মুসলিম*' তিনি 'যিনি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন'। অবশ্য গোড়ার দিকে বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মকে '*তাযাক্কা*' বলে অভিহিত করেছিল, মুহাম্মদের (সঃ) নবদীক্ষিত অনুসারীদের দয়া এবং মহানুভবতার আবরণে নিজেদের আবৃত করতে হত। যত্নবান ও দায়িত্ববান অন্তর গঠনে তাদের সচেষ্ট থাকতে হত, যার ফলে তারা তাদের সর্বস্ব ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির কল্যাণে বিলিয়ে দিতে চাইত। সৃষ্টির রহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ভেতর দিয়ে মুসলিমরা দয়ার্দ্র আচরণ শিখত এবং এই মহৎ আচরণের মানে ছিল তারা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে। আল্-ল্লাহ স্বয়ং দয়া আদর্শ। গোটা বিশ্বের প্রতি তাঁর দয়া উপলব্ধি করার জন্যে মুসলিমদের তাঁর 'নিদর্শনসমূহ' নিয়ে ভাবতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাঁর উদার প্রজ্ঞার কারণে বিশৃঙ্খলা ও স্বার্থপর বর্বতার পরিবর্তে শৃঙ্খলা ও সাফল্য বিরাজ করে। তারা যদি তাঁর শাসনে নিজেদের সমর্পণ করে, তাহলে নিজেদের জীবনেও একই রকম পরিশুদ্ধতা লাভ করতে পারবে।

অন্যান্য সকল প্রাণী স্বাভাবিকভাবেই '*মুসলিম*' যাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই, তারা স্বর্গীয় পরিকল্পনার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে।[১৬] কেবল মানুষেরই স্বেচ্ছায় '*ইসলাম*' গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে এবং সে নিজের জীবনকে তার অস্তিত্বের উৎস ও স্থায়ীত্বদানকারীর অনুরূপ করে তুলতে পারে। নিজেকে সে কোনও খেয়ালি একনায়কের কাছে সমর্পণ করছে না, বরং গোটা বিশ্বকে পরিচালনাকারী অনিবার্য আইনের হাতে সঁপে দিচ্ছে।

কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, আইনী লড়াইতে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আমরা 'অ্যাকটস অব গড়' বলে অভিহিত করি সে সম্পর্কে কি বলার আছে? কোরান ঘটনাকে উপেক্ষা করেনি, একটু আগে উদ্ধৃত আয়াতগুলোর পরেই রয়েছে :

> ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের বংশধরগণকে
> এক বোঝাই জাহাজে চড়িয়েছি আর ওদের জন্য

অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা চড়তে পারে।
আমি ইচ্ছা করলে ওদের ডোবাতে পারি; তখন কেউ
ওদের সাহায্য করবে না; আর ওরা নিস্তার পাবেনা।
ওদের ওপর আমার অনুগ্রহ না হলে আর ওদেরকে
কিছু কালের জন্যে জীবন উপভোগ করতে না দিলে (তাই-ই হত)।[১৭]

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কথা আরবদের চেয়ে ভাল জানা ছিল না কারও। পৌত্তলিক ও প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথায় বিভিন্ন দেব-দেবী মৌলিক শক্তির প্রকাশমাত্র, *rerum natura*, যা চূড়ান্ত, দুর্জ্ঞেয় এবং একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক। কোনও কোনও দেবতা এর মহৎ বৈশিষ্ট্যাবলী আর প্রেম, উদারতা, আইন বা প্রজ্ঞা প্রকাশ করে কিন্তু অন্যগুলো প্রকাশ করে জীবনের অন্ধকার দিক যা পৃথিবীর নারী-পুরুষ দেখতে পায়। তারা যুদ্ধ বা বিগ্রহের দেবতা এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈরী প্রকৃতির। হিন্দু ধর্ম বলে অশুভ হচ্ছে ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় সত্তার একটা রূপ। পৌত্তলিক দর্শন এবং যুদ্ধমান দেব-দেবীর সাহায্যে করুণ অথচ সত্যনিষ্ঠভাবে পৃথিবীর সবাই ভেতরে বাইরে যে বিরোধ অনুভব করে তা প্রকাশ করেছে। পৌত্তলিক ধর্মে এই বিরোধের কোনও সম্ভাব্য সমাধান নেই। আরবে প্রাচীন দেবতাদের মূল প্রতীকী অর্থ যাযাবর যুগে হারিয়ে গিয়েছিল আর এই পৌত্তলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করার জন্যে আরব ধর্মের কোনও উন্নত মিথলজি ছিল না। তবে কোরানে এই অন্তর্দৃষ্টির উপাদানসমূহ দেখা সম্ভব, যেখানে ঈশ্বরের 'নিদর্শনসমূহ' তাঁর দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রকাশ, অন্যান্য প্রথায় যা দেবতার মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে।

কোরানে আল্-লাহ ইহুদী ঐশী গ্রন্থের ইয়াহওয়েহ বা জেসাস ক্রাইস্টের দেহে নিজেকে প্রকাশকারী পিতার চেয়ে অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক। হিব্রুদের প্রাথমিক গোত্রীয় ধর্মে ইয়াহ্ওয়েহ অভিব্যক্তির প্রকাশ হিসাবে নারী-পুরুষের ওপর দুর্যোগ বা আশীর্বাদ প্রেরণ করতেন– মাঝে মাঝে খামখেয়ালির মত– নিজের খুশিমত। কিন্তু আল্-লাহ্ যখন কাউকে নিমজ্জিত করেন, উদাহরণ স্বরূপ, তিনি ব্যক্তিগত শত্রুতা দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি *rerum natura* এবং পরবর্তীকালের হিব্রু পয়গম্বরদের ঈশ্বর, উভয়েরই কাছাকাছি, যিনি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির নিখাদ মানবীয় ধারণা পুরোপুরি অতিক্রম করে যান :

আমার ভাবনাসমূহ তোমাদের ভাবনা নয়
আমার পথ তোমাদের পথ নয়—আমি ইয়াহওয়েহ কথা বলছি।
হ্যাঁ, আকাশসমূহ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যেমন অনেক অনেক উঁচুতে
তেমন আমার পথ তোমাদের পথের অনেক উপরে,
আমার ভাবনাসমূহও তোমাদের ভাবনার চেয়ে উপরে।[১৮]

মুহাম্মদের (স:) আধ্যাত্মিক প্রতিভা দেখে কেবল চমকিত হতে হয়, তাঁর সঙ্গে ধর্মাচারী ইহুদী বা ক্রিশ্চানদের কোনও যোগাযোগ ছিল না এবং এসব আদি প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ছিল একেবারে এবং অনিবার্যভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের, কিন্তু তিনি একেশ্বরবাদী চেতনার মর্মমূলে পৌঁছতে পেরেছেন। কোরান জোরের সঙ্গে বলছে যে ঈশ্বর মানুষের চিন্তার অতীত, আমরা কেবল নিদর্শন ও প্রতীকের মাধ্যমেই তাঁর কথা বলতে পারি, যা তাঁর অতির্বচনীয় প্রকৃতিকে অংশতঃ প্রকাশ করে আবার অংশতঃ গোপন রাখে। কোরানের আলোচনার পুরো ধরনটাই প্রতীকাশ্রয়ী; বারবার এতে মুসলিমদের ভাববার জন্যে রাখা অসংখ্য উদাহরণের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের সংজ্ঞাবোধক কোনও মতবাদের অস্তিত্ব নেই, তবে প্রতীকী ধরনের কিছু 'নিদর্শনে' তাঁর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

কোরানের ধর্মতত্ত্বের রূপকাশ্রয়ী প্রকৃতি প্রায়শঃই পাশ্চাত্যবাসীরা ভুল বুঝে থাকে, কারণ বর্তমানে আমরা তথ্য লাভের উদ্দেশ্যে বই পড়তে চাই। কিন্তু মধ্যযুগে ক্রিশ্চানরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠের এক প্রতীকী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, যা মুসলিমদের কোরান পাঠের প্রক্রিয়ার চেয়ে ভিন্ন নয়। বরং কোরানে বর্ণিত কিছু কিছু বিষয়– পয়গম্বরদের জীবন বা অত্যাসন্ন শেষ বিচার– একেবারেই স্বর্গীয় সত্যের প্রতীকী উপস্থাপন, এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। বৌদ্ধরা যেমন বিভিন্ন দেব-দেবীকে নিজেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখে, তেমনি মুসলিমরাও সবসময় তাদের নিজেদের মাঝে অন্তহীন আধ্যাত্মিক নাটকের মত অভিনীত ভাল-মন্দের সংঘাত দেখে। 'মনে প্রাণে মোজেস' বা 'অন্তরের জোসেফ'-এর কথা বলে, কোরানে যার বারবার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং মুসলিমরা যখন কোরান আবৃত্তি করে তখন তারা মুক্তিলাভের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস নয় বরং আপন সত্তার ইতিহাস সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হয়ে উঠে। সৃষ্টির মূলে পৌঁছাতে এবং নিজেদের অন্তস্থ অশুভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অন্তরের অভিজ্ঞতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কল্পনাশ্রয়ী প্রয়াস পায়।

প্রাথমিক সময় থেকেই কোরান নারী এবং পুরুষকে এই কল্পনাশ্রয়ী প্রতীকী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে উৎসাহিত করে এসেছে। প্রকৃতিতে 'নিদর্শনসমূহে'র ব্যাপক বর্ণনায় এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খৃস্ট ধর্মে কখনও কখনও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায় যা কিনা মানবজাতির পাপের কারণে তার আদি শুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ইহুদী ধর্মের মত ইসলামও খৃস্টীয় অর্থে মানবের পতন এবং 'আদি পাপে' বিশ্বাস করে না : মৃত্যু, বেদনা আর দুঃখ মানুষের আদিম ব্যর্থতার শাস্তি নয়, বরং তা সবসময় দুর্জ্ঞেয় এক স্বর্গীয় পরিকল্পনার অংশ। বস্তুজগতের পতন ঘটেনি বরং তা একটি এপিফ্যানিব মত যা স্বাভাবিক মানবীয় ভাষা বা চিন্তা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না তেমন এক পরমসত্তার অনুভূতির প্রকাশ। বিচ্ছিন্ন এই জগতের ভেতর দিয়ে পরম সত্তার পূর্ণ ক্ষমতা *দেখা* কল্পনার মূল কাজ—শিল্প ও ধর্ম-উভয়ের। কোরান মুসলিমদের প্রতীকী উপায়ে চারপাশের জগতের দিকে কল্পনাপ্রবণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রায়াসের মাধ্যমে তাকানোর তাগিদ দেয় :

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে,
মানুষের উপকারে যা লাগে তা নিয়ে সমুদ্রযাত্রায়,
সেই বৃষ্টিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন,
যার দ্বারা তিনি মৃত পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও
সেখানে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান আর সেই
বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর
সেবায় নিয়োজিত সেই মেঘমালায় তো জ্ঞানী
লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।[১৯]

মুসলিম ট্র্যাডিশন কল্পনার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে : মহান সুফি দার্শনিক মুঈদ আদ্-দীন আল্-আরাবী (মৃত্যু : ১২৪০) কল্পনাকে ব্যক্তিগত থিওফ্যানি সৃষ্টি বা আমাদের চারপাশে ঈশ্বরের প্রকাশের ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণ বলে অভিহিত করেছেন। অসাধারণ এই মানবীয় ক্ষমতা নারী এবং পুরুষকে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দুঃখ-বেদনা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করে তোলে। কিন্তু কোরান মুসলিমদের যুক্তি বিসর্জন দিতে বলে না। নির্দশনসমূহ '*চিন্তাশীল* লোকদের জন্যে', 'যে *জানে* তার জন্যে' : মুসলিমদের প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা 'নিদর্শনসমূহ' '*পর্যবেক্ষণের*' তাগিদ দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে সযত্নে খতিয়ে দেখার জন্যে।[২০] এই প্রবণতা মুসলিমদের বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহল গড়ে তুলতেও সাহায্য করে যা তাদের প্রকৃতিবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলেছিল। ইসলামি ট্র্যাডিশনে যুক্তিভিত্তিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং ধর্মের মাঝে কখনওই বিরোধ দেখা যায়নি, যেমনটি উনিশ শতকে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল যখন ক্রিশ্চানদের মনে হয়েছে লাইয়েল এবং ডারউইনের আবিষ্কার অপরিবর্তনীয়ভাবে তাদের বিশ্বাসকে অপদস্থ করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উগ্রপন্থী শিয়া মতবাদের অনুসারী কোনও কোনও সাধু বা দরবেশ গভীর ধ্যানের ভূমিকা হিসাবে বিজ্ঞান ও গণিতের ব্যবহার পর্যন্ত করেছেন।

তাই মুহাম্মদ (স:) যখন কুরাইশদের প্রতি তাঁর প্রাপ্ত প্রত্যাদেশকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত বলে মেনে নেয়ার আহবান জানান তখন কিন্তু তিনি কোনও ধর্ম বিশ্বাস বা কিছু ধর্মীয় মতামতে সায় দেয়ার দাবী তোলেননি। জুডাইজমের মত ইসলামে কাল্ট বা অর্থডক্সির অস্তিত্ব নেই, এখানে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা বা ভাবনা একেবারে ব্যক্তিগত বিষয়। আসলে কোরান থিওলজিক্যাল স্পেকুলেশন সম্পর্কে দারুণভাবে সন্দিহান, যাকে স্রেফ মানুষের কল্পনা ও ইচছাপূরণ হিসাবে দেখা হয়। আল্-লাহ'র অলৌকিক সত্তার ক্ষেত্রে এমন মতবাদ ভিত্তিক চিন্তাভাবনা 'আন্দাজ' (*যান্না*) ছাড়া আর কিছুই নয় : অতিপ্রাকৃত বিষয়দি সম্পর্কে এমনি অলস চিন্তা ভাবনার অভ্যাস *আহ্ল আল-কিতাবদের* বিবদমান দলে ভাগ করেছে।[২১] অর্থডক্সি বা সঠিক শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে ইসলাম ও জুডাইজম উভয়ই

অর্থপ্র্যাক্সির–একটি সাধারণ স্বভাবসিদ্ধ পরিপালন-ওপর জোর দেয়। সুতরাং কোরানে একজন 'বিশ্বাসী' বিভিন্ন ক্রিড বা থার্টিনাইন আর্টিকেলসের মত কিছু প্রস্তাবনায় সম্মতি প্রদানকারী কেউ নয়; সে স্বর্গীয় সত্তাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে, যাঁর কাছে তার আত্মসমর্পণ, সে আপন ইসলামকে প্রার্থনা (*সালাত*) এবং দানের মত যৌথ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করে :

> বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময়
> কাঁপে ও যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয়
> তখন তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
> আর তারা তো তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।
> যারা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে
> দান করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।[22]

বিপরীতক্রমে 'অবিশ্বাসী' (*কাফির বি না'মাত আল্-ল্লাহ*) আল্-ল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করছে যে সে নয় বা যে ভুল ধর্মমত গ্রহণ করেছে, বরং সে যে কিনা 'ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ'। মূলশব্দ 'কুফর' (*KFR*) ব্যবহারের মাধ্যমে কোরান স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে এইরকম মানসিকতা ইচ্ছাকৃত বিকৃতি : মক্কার *কাফিররা* জানত 'নিদর্শনসমূহে'র তাৎপর্য তবু আপন জীবন শুধরে নেয়ার পরিবর্তে তারা উদ্ধতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছে।[23]

যদিও প্রথম বছরগুলোয় মুহাম্মদ(স:) কা'বার মত মৌলিক কুরাইশ উদ্দীপনার প্রতি আবেদন সৃষ্টির জন্যে স্বভাবের বাইরে আচরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সহজাত প্রবৃত্তির বশেই জানতেন যে তাঁর বাণী গভীর বিরোধের জন্ম দেবে। আসলে তিনি অত্যন্ত সাবধানে লোকজনের কাছে তা প্রচার করেছেন। তাঁর মিশনের প্রথম তিন বছর কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে গেছেন তিনি, কথা ছড়িয়েছে গুজবের আকারে। তবে তিনি প্রবল বিশ্বাসীদের একটা ছোট দল গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন যারা তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব দ্রুত অনুধাবন করেছিল। প্রতিদিন ভোর ও সন্ধ্যায় তারা আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় মিলিত হত এবং '*সালাত*' কুরাইশদের মাঝে গভীর ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল বলে মনে হয়। শত শত বছর যারা প্রবলভাবে স্বাধীন বেদুঈন জীবন যাপন করেছে সেই আরবরা দাসের মত মাটিতে মাথা ঠুকবে, এটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছে তাদের কাছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখায় যে মুহাম্মদ (স:) খুবই স্পর্শকাতর একটা জায়গায় ঘা দিয়েছিলেন : এই গভীর ভক্তি কুরাইশদের নতুন অহঙ্কার এবং উদ্ধত স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি এত জোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল যে মুসলিমদের পক্ষে প্রকাশ্যে *সালাত* আদায় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ফলে তারা শহরের আশপাশের উপত্যকাসমূহে আত্মগোপনে বাধ্য হয়েছিল। তারা সম্ভবত: দানের মত কোনও

কিছুর অনুশীলনও করেছে যাকে নৈতিক শুদ্ধি হিসাবে দেখা হচ্ছিল : তারা প্রার্থনা করার জন্যে রাত জাগত এবং তখন কোরান আবৃত্তি করত।

এই অনুশীলন সম্ভবতঃ সিরিয় মরুভূমির ক্রিশ্চান মঙ্কদের রাতের উপাসনা থেকে গৃহীত, তাঁরা মাঝরাতে উঠে বাইবেলের শ্লোক পাঠ করতেন। কোনও ঐশী গ্রন্থের প্রকৃতি সম্পর্কে আরবদের ধারণার ওপর এর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল : এটা একান্তে পাঠের গ্রন্থ নয় বরং আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় সশব্দে উচ্চারণের জন্যে। যদিও মুসলিমরা বর্তমানে একান্তে কোরান পাঠ করে, কিন্তু এখনও তাদের দাবী এর প্রকৃত প্রভাব বোঝা যায় কেবল বিশেষ সুরে সজোরে পাঠের সময়ই। শব্দের নিজস্ব একটা রহস্যময় অর্থ রয়েছে, কোরানের ভাষাকে যা সঙ্গীতের পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায় এবং অন্য যেকোনও শিল্পকর্মের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ এবং প্রবলভাবে অলৌকিক সত্তাকে অনুভব করতে সাহায্য করে। কোরানই আল্-ল্লাহকে দূরাকাশের সম্পূর্ণ দূরবর্তী ঈশ্বর হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। প্রাথমিক যুগের জীবনীকারগণ বারবার ইসলাম 'তার অন্তরে প্রবেশ করেছে' বলে কারও ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে কোরানের ভূমিকা এবং এই ধর্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিমদের অভিজ্ঞতা আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করব। তবে মনে হয় আরবী আবৃত্তির অসাধারণ সৌন্দর্য গভীরে চাপা পড়ে থাকা কিছুকে স্পর্শ করেছিল এবং অবচেতনে লালিত আকাঙ্ক্ষা আর চাহিদার অনুরণন তুলেছে শ্রোতাদের মনে। কোনও কবিতা বা সঙ্গীত যখন কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের সত্তার বাইরে নিয়ে যায় এবং আরও বৃহৎ কোনও কিছুর সান্নিধ্য দেয় তখন আমরা সবাই একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করি। এই বাণী উচ্চারণ মুহাম্মদের (স:) জন্যে মোটেই সহজ অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকার সময় প্রত্যাদেশ আগমন অব্যাহত থাকত। তিনি প্রবলভাবে ঘামতেন এবং অবসন্ন হয়ে পড়তেন, এমনকি ঠাণ্ডার সময়েও। অন্যান্য সূত্র বলছে যে, নিজেকে তাঁর ভারি বোধ হত, বেদনার মত একটা অনুভূতি জাগত এবং স্বর্গীয় বাণী শোনার সময় তিনি দু হাঁটুর মাঝখানে মাথা দাবিয়ে রাখতেন।

কারা ছিলেন প্রথমদিকের মুসলিম? গোড়াতেই প্রত্যাদেশের সত্যতা মেনে নিয়েছিলেন খাদিজা এবং মুহাম্মদের (স:) পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন : যায়েদ, আলী এবং পয়গম্বরের চার কন্যা। কিন্তু মুহাম্মদকে (স:) গভীরভাবে হতাশ করেন তাঁর চাচা আবু তালিব; আব্বাস এবং হামযাহ্ অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। আবু তালিব তাঁকে বলেছিলেন, পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে মন থেকে সায় পাননি তিনি, আরও অনেক কুরাইশ এরকমই মনোভাব প্রকাশ করেছে। মুহাম্মদ (স:) সচেতন ছিলেন যে, প্রাচীন পৌত্তলিক প্রথায় শেকড় প্রোথিত থাকলেও আল্-ল্লাহ'র কাছ থেকে প্রাপ্ত তাঁর প্রত্যাদেশ রক্ষণশীল কুরাইশদের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, শুরুর তিনটি বছর তাঁর নিভৃতে কাজ করার এটাও একটা কারণ ছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মদের (স:) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল আবু তালিবের, এমনকি যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে দাঁড়ানোর পরেও তিনি তাঁর আইনসঙ্গত

অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। হাশিম গোত্রের প্রধান হিসাবে আবু তালিবের সমর্থন মুহাম্মদ (স:)-এর জন্যে অত্যন্ত জরুরি ছিল : গোত্রীয় পুরনো নীতিমালা ভেঙে পড়ছিল হয়ত কিন্তু তারপরও পরিবারের সমর্থন ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের টিকে থাকা তখনও অসম্ভব ছিল।

তবে আবু তালিবের অপর ছেলে জা'ফর, তাঁর বিশেষ বন্ধু এবং চাচাত ভাই আব্দাল্লাহ ইবন জাহ্শ, বোন যায়নাব এবং ভাই উবায়দাল্লাহসহ মুহাম্মদের (স:) পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে নতুন পয়গম্বর হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। উবায়দাল্লাহ একেশ্বরবাদের বিকল্প ধরনের অনুসন্ধানী *হানিফদের* অন্যতম ছিলেন। অবশ্য আব্বাস এবং হামযাহ-দুজনের স্ত্রীরই তাদের স্বামীদের ভীরুতা পছন্দ ছিল না : উম্ম ফায্ল এবং সালামাহ-উভয়ই জা'ফরের স্ত্রী আসমা এবং মুহাম্মদের (স:) চাচী সুরাইয়াহ্ বিনত আব্দ আল-মুত্তালিবের মত মুসলিম হয়েছিলেন। মুহাম্মদের (স:) মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী উম্ম আয়মানও যোগ দিয়েছিলেন এ দলে : তাঁকেই ছোট বেলায় মুহাম্মদের (স:) পিতা আব্দাল্লাহ পাঁচটি উটের সঙ্গে মাতা আমিনাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুহাম্মদ (স:) একবার বলেছেন : 'কেউ যদি বেহেশতের হুরকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে সে যেন উম্ম আয়মনকে বেছে নেয়।'[২৪] একথা শোনার পর যায়েদ দারুণভাবে অভিভূত হয়ে আয়মান বয়সে তাঁর চেয়ে বড় হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদের(স:) কাছে তাঁকে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। উম্ম আয়মান এ বিয়েতে সম্মতি দেন এবং তাঁদের সংসারে মুহাম্মদের (স:) প্রথম পৌত্র এবং ইসলাম ধর্মে প্রথম শিশু উসামাহ্‌র জন্ম হয়েছিল।

তবে একেবারে গোড়ার দিকে যখন বন্ধু আতিক ইবন উসমান– যিনি সবসময় তার '*কুনিয়া*' আবু বকর নামে পরিচিত ছিলেন– ইসলাম গ্রহণ করেন তখনই পরিবারের বাইরে প্রথমবারের মত গুরুত্বপূর্ণ একজন নবদীক্ষিত পেয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (স:) নাকি বলেছেন : 'আমি কখনও এমন কাউকে ইসলামে আহবান জানাইনি যে অনিচ্ছা, সন্দেহ আর দ্বিধার ছাপ দেখায়নি, কেবল আবু বকর ছাড়া। যখন তাঁকে আহবান জানালাম, তিনি দ্বিধা বা ইতস্তত করেননি।'[২৫] ইবন ইসহাক বলছেন আবু বকর ছাড়া নবদীক্ষিত অল্প সংখ্যকেরই মক্কায় বিশেষ প্রভাব ছিল :

> সমাজের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, সবার পছন্দনীয় এবং সদাচারী। কুরাইশদের বংশবৃত্তান্ত অন্য যে কারও চেয়ে বেশি জানতেন তিনি, জানতেন তাদের দোষ-গুণ সম্পর্কেও। তিনি মর্যাদা সম্পন্ন এবং দয়ালু ব্যবসায়ী ছিলেন। জ্ঞানের সুবাদে বহু লোক তাঁর কাছে আসত এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর, তিনি ছিলেন সামাজিক। যারা তাঁর কাছে আসত তাদের সবাইকে তিনি ঈশ্বর এবং ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতে শুরু করেছিলেন।[২৫]

বেশ শক্তিশালী গোত্রের সদস্যসহ মক্কার অনেক তরুণকে আল্-লাহ'র ধর্মে দীক্ষিত করে তোলেন আবু বকর। তিনি স্বপ্নের অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাকার হিসাবে খ্যাত ছিলেন। একদিন বিশিষ্ট পুঁজিপতি আব্দ শামসের ছেলে খালিদ ইবন সা'ইদ বিপদে পড়ে তাঁর কাছে এলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন এক অতল গহ্বরের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, গহ্বরটা আগুনে পরিপূর্ণ এবং তাঁর বাবা তাঁকে সেই গহ্বরে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করছেন। এরপর তাঁর কোমর ধরে তাকে উদ্ধারকারী একজোড়া হাত সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠেন তিনি, ঘুম ভাঙার আগমুহূর্তে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছেন তাঁর উদ্ধারকর্তা মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং। এই স্বপ্ন আমরা যেভাবে পাচ্ছি, তরুণ প্রজন্মের অনেকেরই ব্যক্তিগত বিপদের অস্পষ্ট কিন্তু জরুরি একটা ভাব প্রকাশ করছে। মরু প্রান্তরের রুক্ষতা এখন দূরের বাস্তবতা এবং তারা তাদের পিতাদের তুলনায় নতুন পুঁজিবাদের প্রতি কম অনুরক্ত, যার সঙ্গে তাদের অব্যক্ত কিন্তু গভীর বিরোধ রয়েছে। মুহাম্মদ (স:) এইসব তরুণের গোপন এবং তাজা আবেগে টোকা দিচ্ছিলেন, মক্কার অস্থিরতা প্রবলভাবে অনুভব করছিল তারা। খালিদ মুসলিম হয়েছিলেন, কিন্তু আপন ধর্মকে যতদিন পেরেছেন বাবার কাছে গোপন রেখেছেন।

এরকম আরেকটা দীক্ষা-স্বপ্ন কোরানের প্রভাবের আরও ইতিবাচক প্রভাব বোঝায়। তরুণ-অভিজাত ব্যবসায়ী উসমান ইবন আফফান, তিনি আব্দ শামস গোত্রের সদস্য ছিলেন, সিরিয়া থেকে এক বাণিজ্য সফর শেষে ফিরে আসছিলেন, সেই সময় স্বপ্নে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পান, জনহীন প্রান্তরে চিৎকার করে কেবল বলছে : 'নিদ্রামগ্নরা জেগে ওঠ! কারণ নিঃসন্দেহে মক্কায় আহমেদের আগমন ঘটেছে।'[২৭] উসমান কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হলেও বিস্মিত বোধ করেছিলেন, তাঁর মনের কোথাও যেন বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল তা, যদিও কথাগুলোর তাৎপর্য কি হতে পারে তার কোনওরকম ধারণা তাঁর ছিল না : ইসলামের অভিজ্ঞতা মুসলিমদের মাঝে বারবার দীর্ঘ জড়তা থেকে বেরিয়ে আসার অনুভূতি জাগিয়েছে, যাহোক, পরদিন আরেক তরুণ ব্যসায়ী, আবু বকরের চাচাত ভাই তাঈমের তালহা ইবন উবায়দাল্লাহর সঙ্গে পথে উসমানের সাক্ষাৎ হয়। তালহাও সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন, উসমানকে তিনি জানালেন তাঁর সঙ্গে এক মঙ্কের পরিচয় হয়েছে যে পয়গম্বর আহমেদের কথা জানিয়েছেন তাঁকে, শিগগিরই হিজাজে যাঁর আবির্ভাব ঘটবে, তবে সেই সঙ্গে বিস্ময়কর সংবাদ যোগ করেছিলেন যে 'আহমেদ' আসলে হাশিম গোত্রের 'মুহাম্মদ' ইবন আব্দাল্লাহ। দুই তরুণ যত দ্রুত সম্ভব মক্কায় ফিরে সোজা আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মুহাম্মদ (স:)-এর পরলোকগমনের প্রায় চাল্লিশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন মক্কার ঐতিহাসিক ইবন শিহাব আল-যুহরি, মুসলিমদের গোড়ার দিকের ইতিহাস গবেষণায় গোটা জীবন নিবেদন করেছেন, তিনি বলছেন, অচিরেই অত্যন্ত সফলতা অর্জন করেছিলেন মুহাম্মদ (স:) :

ঈশ্বরের বার্তাবাহক (ঈশ্বর তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করুন) গোপনে এবং প্রকাশ্যে ইসলামে আহবান জানিয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছায় তরুণ (*আর-দাস আর-রিজাল*) এবং দুর্বলজনেরা (*দু'ফার আর-নাস*) সাড়া দিয়েছিল ফলে তাঁকে বিশ্বাসকারীরা ছিল অসংখ্য এবং অবিশ্বাসী কুরাইশরা তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেনি। ওরা দলবদ্ধ অবস্থায় বসে থাকার সময় তিনি যখন পাশ দিয়ে যেতেন তখন তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলত, 'ওই যে আব্দ আল-মুত্তালিবের পরিবারের ছেলে যাচ্ছেন যিনি স্বর্গের কথা বলেন।'[২৮]

ইবন ইসহাকও এই প্রাথমিক সাফল্য নিশ্চিত করেছেন,[২৯] তবে আল-যুহরি এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে গোড়ার দিকের নব-মুসলিমরা দুটি বিশেষ অংশ থেকে এসেছিল : 'তরুণ' এবং 'দুর্বল'। নতুন দলে কিছু চরম সুবিধাবঞ্চিত লোক ছিল যারা এর সামাজিক শিক্ষায় খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এদের মাঝে আব্দাল্লাহ ইবন মা'সুদ নামের একজন রাখালও ছিলেন, প্রত্যাদেশ মুখস্থ করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি, যার ফলে কোরানের আদি আবৃত্তিকারদের অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন; তরবারি নির্মাতা এবং কামার খাবাব ইবন আল-আরাত, দুজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সুহাইব ইবন সিনান এবং আম্মার ইবন ইয়াসির, যাদের শক্তিশালী মাখযুম গোত্র কনফেডারেট হিসাবে দত্তক নিয়েছিল; এবং একদল দাস-নারী এবং পুরুষ-যাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন আবিসিনীয় বিলাল–যিনি ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হয়ে বিশ্বাসীদের প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু দুর্বলের সবাই যে পরাজিত ছিল তা নয়। এটা একটা কৌশলগত গোত্রীয় বাকধারা যা বিভিন্ন গোত্রের অবস্থান বর্ণনা করে। মুহাম্মদ (সঃ) যখন তাঁর মিশন শুরু করেন, কুরাইশদের গোত্রগুলো একাধিক দলে বিভক্ত ছিল। ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট এভাবে তাদের তালিকা প্রণয়ন করেছেন :

ক	খ	গ
হাশিম	আব্দ শামস্	মাখযুম
আল-মুত্তালিব	নওফল	সাহ্‌ম
যুহরা	আসাদ	জুমাহ্‌
তাঈম	আমির	আব্দ আদ-দার
আল-হারিস ইবন ফিহ্‌র		
আদি		

ক দলের গোত্রগুলো পুরনো হিলফ আল-ফুযুলের অন্তর্গত ছিল, এবং নগরীর দুর্বল অংশ ছিল তারা; ব্যতিক্রম ছিল আদি, সাম্প্রতিক সময়ে যার অবস্থার অবনতি ঘটেছে, এবং আসাদ (খাদিজার গোত্র) যেটি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ক দল

থেকেই মুহাম্মদ (স:)-এর নব মুসলিমদের অধিকাংশ এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ, আবু বকর এবং তালহাহ, এঁরা দুজনেই তাঈম গোত্রের সদস্য ছিলেন; প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ব্যবসায়ী আব্দ আল-কা'বা (যার নাম আব্দ আল-রাহমান হয়েছিল) ছিলেন যুহরা গোত্রের সদস্য। এসব 'দুর্বল' গোত্রের সদস্যরা হয়ত ব্যক্তিপর্যায়ে সফল ছিলেন– যেমন আবু বকর ছিলেন অত্যন্ত ধনী-কিন্তু গোত্রের ক্ষীয়মাণ ক্ষমতা নগরীতে তাদের অবস্থান প্রান্তিক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। মুহাম্মদের (স:) অধিকাংশ চরম শত্রু, আমরা দেখব, এসেছে শক্তিশালী খ ও গ দল থেকে : তারা স্থিতাবস্থায় অনেক বেশি সন্তুষ্ট ছিল। তবে গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের কয়েকজন সদস্যও নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন– যেমন খালিদ এবং উসমান– তাঁরা হয়ত মনে করেছেন যে গোত্রের শীর্ষে তাঁদের জন্যে কোনও স্থান নেই তাই সবচেয়ে সফল এবং দ্বিতীয় সরির মাঝখানে সৃষ্ট পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এরকম উঁচু-নীচু, বৈষম্য আর বিভাজন আরব চেতনার অপরিচিত ছিল, তাঁরা মুহাম্মদের (স:) বাণীকে স্বাগত জানান। সুতরাং গোড়ার দিকে ইসলাম ছিল তরুণ আর ওইসব মানুষের আন্দোলন যারা মক্কা নগরীতে নিজেদের অবস্থান নাজুক হয়ে গেছে বলে ভাবছিল।

এর অর্থ একটা বিরোধ ছিল অনিবার্য এবং অচিরেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইসলাম বিভিন্ন পরিবারকে সরাসরি বিভক্ত করে দিচ্ছে। কুরাইশদের অনৈক্য দূর করার বদলে এটা যেন পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলছিল। মুহাম্মদ (স:) প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারটি আরও নাটকীয়ভাবে পরিষ্কার হয়ে আসে। তাঁর মিশন শুরুর প্রায় তিনবছর পর, ৬১৫ সালে এক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তিনি আপন গোত্রের কাছে নিজেকে প্রকাশ এবং তাদের ইসলামের আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশ লাভ করেন।[৩৩] এ কাজটি তাঁর শক্তির অতীত বলে প্রথমে ভেবেছিলেন তিনি, তবু দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হন এবং হাশিম গোত্রের চল্লিশ জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে এক ভোজে আমন্ত্রণ জানান। অত্যন্ত অল্প খাবারের আয়োজনের মাঝেই একটা পরিষ্কার বাণী ছিল : ক্ষমতা আর আস্থার প্রকাশ হিসাবে আরবদের মাঝে ঐতিহ্যে পরিণত জাঁকাল আপ্যায়ণের রীতি সম্পর্কে খুবই সমলোচনামুখর হয়ে উঠেছিলেন মুহাম্মদ (স:)। তিনি অনুভব করেছিলেন এটা প্রাচীন রীতির পরিপন্থী। বহু বছর পর আলী, সেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন, পাঁচটি রুটি আর মাছের অলৌকিক ঘটনার মত বর্ণনা দিয়েছেন : যদিও একজনের খাওয়ার মত যথেষ্ট খাবার ছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পেয়েছিলেন।

আহার পর্ব শেষে মুহাম্মদ (স:) তাঁর প্রত্যাদেশের নীতিমালা ব্যাখ্যা করেন, তখন আবু তালিবের বৈমাত্রেয় ভাই আবু লাহাব কর্কশভাবে বাদ সাধে এবং জমায়েত ভেঙে দেয়। পরদিন আবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হন মুহাম্মদ (স:)। আবার তাদের কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যোগদানের আকূল আহবান জানান।

হে আব্দ আল-মুত্তালিবের সন্তানগণ, আমার মত এত চমৎকার বাণী নিয়ে আর কোনও আরব তোমাদের কাছে এসেছিল কিনা আমি জানি না। আমি তোমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের শ্রেষ্ঠ বার্তা নিয়ে এসেছি। ঈশ্বর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের তাঁর দিকে আহবান জানাতে। তো তোমাদের মাঝে কে আমাকে আমার এ দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে? তোমাদের মাঝেই রয়েছে আমার ভাই, আমার কর্মী এবং আমার উত্তরাধিকারী।'

এরপর অস্বস্তিকর এক নীরবতা নেমে এসেছিল, এমনকি আবু তালিব বা মুহাম্মদের (স:) সমবয়সী আব্বাস বা হামযাহ্ পর্যন্ত একটা শব্দ উচ্চারণ করেননি। অবশেষে আলী, যদিও তখন বিব্রত কিশোর ছিলেন, আর নীরবতা সহ্য করতে না পেরে কথা বলে উঠেছিলেন সবার সামনে :

যদিও আমি এখানে সবার ছোট, আমার চোখ ঝপসা, পা সরু আর স্থূল শরীর, তবু আমি বলছি : হে ঈশ্বরের পয়গম্বর, আমি এ কাজে আপনার সাহায্যকারী হব।' তিনি আমার পিঠ আর ঘাড়ে হাত রেখে বললেন : 'এ আমার ভাই, আমার কর্মী, আমার উত্তরাধিকারী, তোমাদের মাঝে। এর কথা শুনবে এবং ওকে মান্য করবে।'

এটা ছিল সহ্যের অতীত। মেহমানরা বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালেন, হাসতে হাসতে আবু তালিবের উদ্দেশে তাঁরা বললেন : 'ও তোমাকে নিজের ছেলের কথা শুনতে আর মান্য করার নির্দেশ দিচ্ছে।'[৩২]

যদিও লোকজন সাধারণভাবে মুহাম্মদের (স:) দিকে ঝুঁকছিল, তবে পরিবারে ভাঙন ধরাচ্ছিলেন তিনি। খাদিজার ভাতুষ্পুত্র আবু আল-আস ইবন রাবি, আব্দ শামস গোত্রের সদস্য, বিয়ে করেছিলেন মুহাম্মদের (স:) জ্যেষ্ঠা কন্যা যায়নাবকে, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি ; তাঁর গোত্র তাঁকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু আবু আল-আস এবং যায়নাব পরস্পরকে ভালবাসতেন; আবু আল আস তাঁর গোত্রের লোকদের দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দেন যে যায়নাবের সঙ্গে তাঁর নতুন বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও তাঁকে প্রত্যাখ্যান কর্‌বার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। খাদিজার পরিবারে ইসলাম আরও তিক্ত বিভাজন সৃষ্টি করে : তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নওফল ইবন খুওয়ালিদ ইসলামের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ছেলে আসওয়াদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন : তাঁর ভাতুষ্পুত্র হাকিম ইবন হিযাম খাদিজাকে পছন্দ করলেও ইসলাম গ্রহণ করেননি, যদিও তাঁর অপর ভাই মুসলিম হয়েছিলেন। আবু বকরেরও একই ধরনের সমস্যা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী উম্ম রুমান দুই সন্তান আব্দাল্লাহ ও আসমাকে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ছেলে আব্দ আল-কা'বা এর তীব্র বিরোধী ছিলেন। জেসাসের মত মুহাম্মদ (স:)ও যেন বাবার

বিরুদ্ধে ছেলে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে দাঁড় করিয়ে পারিবারিক জীবনের জোরাল বাঁধন, দায়িত্ব এবং শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিচ্ছিলেন। অচিরেই এই সমস্যা আরও প্রকট রূপ ধারণ করে।

শুরুর বছর গুলোয় মুহাম্মদের (সঃ) বাণীর মাঝে আপত্তিকর কী পেয়েছিল লোকে? কেউ তাঁর সামাজিক শিক্ষার সমালোচনা করেছিল এমন নয়, যদিও অত্যন্ত সফল গোত্রগুলো তাঁর বাণীর বিরোধিতা করেছে। স্বার্থপর এবং অর্থলোলুপ হওয়া এককথা আর স্বার্থপরতা এবং বস্তুবাদিতাকে সমর্থন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কোরান থেকে এটা মনে হয় যে গোড়ার দিকে সমালোচনার মূল কেন্দ্র ছিল শেষ বিচারের ধারণা, মুহাম্মদ (সঃ) যা ইহুদী-ক্রিশ্চান ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমশঃ তা প্রত্যাদেশের মূল প্রসঙ্গে পরিণত হচ্ছিল এবং ব্যক্তির অনন্ত নিয়তির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছিল, যার কর্মসমূহের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিচারের প্রতীক গোত্রীয় দায়িত্বের বিপরীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আরও জোরাল করেছিল, আরবদের নতুন চেতনা লাভ ও তার পালনের লক্ষ্য ও প্রেরণা দিয়েছিল। কুরাইশদের সতর্ক করে দিয়ে কোরান বলছে শেষ বিচারের দিনে তাদের সম্পদ এবং গোত্রের ক্ষমতা, যার ওপর অনেকেই নির্ভর করে থাকে, কোনওই উপকারে আসবে না। বরং প্রত্যেকের কাছে জানতে চাওয়া হবে কেন সে এতীমদের দেখাশোনা করেনি বা গরীবদের সাহায্যে এগিয়ে যায়নি। কেন তারা স্বার্থপরের মত সম্পদ গড়ে তুলেছে এবং গোত্রের অসহায় সদস্যদের সঙ্গে তা ভোগ করেনি? ধনী কুরাইশদের জন্যে অবশ্যই ভীতিজনক ধারণা ছিল এটা, যারা সাম্যতার আদর্শ গ্রহণে খুব একটা আগ্রহী ছিল না, যদিও অবচেতন মনে অস্বস্তিকরভাবে তারা সচেতন ছিল যে, তাদের আচার আচরণ পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। শেষ বিচারের পুরো ধারণাটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ছিল সহজ : এসব স্রেফ 'রূপকথা, আগের দিনের'[৩৩] কিংবা 'স্পষ্ট জাদু'।[৩৪] পচে মাটিতে মিশে যাওয়া শরীর আবার জীবিত হয়ে উঠবে কি করে? মুহাম্মদ (সঃ) কি তাহলে এটাও বলতে চান যে বহু আগে মারা যাওয়া তাদের পূর্বপুরুষরাও আবার কবর ছেড়ে উঠে আসবে?[৩৫] মৃত্যুর পর আর কোনও জীবন নেই, আরবদের এই পুরনো বিশ্বাস আঁকড়ে ছিল তারা, কিন্তু কোরান স্পষ্ট বলে দিচ্ছে ওরা এটা প্রমাণ করতে পারবে না : এটা কেবল মানুষের আন্দাজ (*যান্না*)।[৩৬]

কোরান এও বলছে যে এসব আপত্তির পেছনে রয়েছে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়া অপরাধ ও বস্তুবাদ। শেষ বিচারের দিনকে তারাই অস্বীকার করে যারা জানে যে তাদের সামাজিক আচরণ ভ্রান্ত।[৩৭] 'নিদর্শনসমূহে'র বর্ণনা সমৃদ্ধ বহু অনুচ্ছেদ সম্ভবতঃ এসব আপত্তির জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত: ঈশ্বর যদি এক বিন্দু শুক্র থেকে মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন– এ এক বিস্ময় যে কোরান খুব বেশি প্রশংসা করতে পারেনি– সৃষ্টি করতে পারেন বিশ্বের অন্য সকল বিস্ময়কে, তাহলে কেন তিনি মৃতকে আবার জীবিত করতে পারবেন না?

মানুষ কি দেখে না, আমি আমি তাকে শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি?
অথচ সে পরে প্রকাশ্যে তর্ক করে।
মানুষ আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অদ্ভুত কথা বলে,
অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় এবং বলে,
'হাড়ে আবার প্রাণ দেবে কে যখন তা পচেগলে যাবে?'
বলো : 'ওর মধ্যে প্রাণ দেবেন তিনিই যিনি প্রথম সৃষ্টি
করেছেন আর সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে ভাল করেই জানেন।'
তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন
ও তোমরা তা দিয়ে আগুন জ্বাল।
যিনি নিজের ক্ষমতায় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন,
তিনি কি ওগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না?
হ্যাঁ, তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।
তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল বলেন
'হও,' আর তা হয়ে যায়।
তাই তো তিনি পবিত্র ও মহান, যিনি সকল বিষয়ে
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী;
আর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।[৩৮]

শেষ বিচারের দিন চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের এক শক্তিশালী ইমেজে পরিণত হয়েছিল, প্রত্যেক বস্তুকে যেদিন তাদের ঈশ্বর, স্রষ্টা, রক্ষাকারী এবং উৎসের দিকে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু আপত্তি সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর মিশনের প্রাথমিক বছরগুলোয় বেশ সফল হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে মনে হয়েছে মুহাম্মদ (সঃ) বুঝি তাঁর গোত্রের সকলকে আল-লাহ'র সংস্কৃত ধর্মে আনতে সফল হয়েছেন। কিন্তু ৬১৬ খৃস্টাব্দে একটা সঙ্কট দেখা দেয়। এ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সঃ) অন্যান্য আরব দেব-দেবী সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কোনও উল্লেখ করেননি। কুরাইশদের অনেকেই সম্ভবতঃ ধরে নিয়েছিল যে তারা আগের মতই আল-লাত, আল-উযযা এবং মানাতের উপাসনা করতে পারবে। মুহাম্মদ (সঃ) যেন তাঁর প্রত্যাদেশের একেশ্বরবাদী উপাদানের ওপর জোর দিচ্ছেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে হয়েছে তাঁকে। যখন তিনি নবদীক্ষিতদের *বানাত আল্-ল্লাহ'র* উপাসনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, তখন আবিষ্কার করলেন রাতারাতি অধিকাংশ সমর্থক হারিয়ে ফেলেছেন এবং কোরান যেন কুরাইশ গোত্রকে বিভক্ত করে দিতে যাচ্ছে।

৬. স্যাটানিক ভার্সেস

একেবারে আকস্মিকভাবেই ঝামেলার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কুরাইশদের একটা দল মুসলিমদের অনুসরণ করে মক্কার উপত্যকায় গিয়ে সেখানে *সালাত* আদায়রত অবস্থায় ওদের ওপর আক্রমণ চালায়। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে মুসলিমরা, ইসলামের জন্যে প্রথমবারের মত রক্তপাত ঘটে, মুহাম্মদের (স:) চাচাত ভাই সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে জনৈক হানাদারকে আঘাত করলে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা সম্ভবতঃ সমগ্র মক্কাবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। কুরাইশরা এমনিতে সহিষ্ণু, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) আরবভূমির প্রাচীন দেব-দেবীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল সন্দেহ আর ঘৃণা জেগে উঠেছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কুরাইশ আর মুসলিমদের মাঝে। ইবন ইসহাক যেমন বলেছেন :

> পয়গম্বর প্রকাশ্যে ইসলামকে ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক প্রচার শুরু করার পর তাঁর গোত্রের সদস্যরা নিজেদের সরিয়ে নেয়নি বা বিরোধিতা করেনি, আমি যতদূর শুনেছি যতক্ষণ না তিনি অন্য দেবতাদের সম্পর্কে অবমাননাসূচক বক্তব্য রেখেছেন। তখন তারা নিজেদের প্রচণ্ড আহত বোধ করেছে এবং সর্বসম্মতভাবে তাঁকে শত্রু বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে ঈশ্বর যাদের ইসলামের সাহায্যে এরকম অশুভ কাজ থেকে রক্ষা করেছিলেন তারা ছাড়া, তবে এরা ছিল ঘৃণিত সংখ্যালঘু।[১]

কিন্তু কুরাইশরা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কেন? অনেকেই ইতিমধ্যে জুডাইজম ও খৃস্টধর্মকে প্রাচীন আরবীয় পৌত্তলিকতার চেয়ে উচ্চতর মেনে নিয়ে একেশ্বরবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ঈশ্বরের কন্যার ধর্ম (*বানাত আল-ল্লাহ*) প্রধানতঃ তায়েফ, নাখলাহ্ এবং কুদাইদের উপাসনাগৃহসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল এবং নিঃসন্দেহে মক্কার ধর্মীয় জীবনে প্রান্তিক পর্যায়ে ছিল তার অবস্থান। একথা ঠিক যে কুরাইশদের কেউ কেউ বেদুঈন গোত্রদের আঘাত করার ব্যাপারে সতর্ক ছিল যারা আগেই অপবিত্রতার দোষে কা'বার অভিভাবক গোত্রসমূহকে মক্কা থেকে উচ্ছেদ করেছিল, কিন্তু সমস্যার মূল ছিল আরও গভীরে। কোরান দেখায় যে নগরীর নেতৃস্থানীয় সবাই সহজাত প্রবৃত্তির বশে মুহাম্মদ (স:)-এর বিরুদ্ধে জোট করে এবং তাঁকে গণশত্রু

ঘোষণা করে। ঈশ্বর মাত্র একজন, এ ধারণা অসাধারণ আবিষ্কার বলে দাবি তুলেছিল তারা; *বানাত আল-ল্লাহ*'র উপাসনা আরবের সকল মানুষের জন্যে অবশ্য পালনীয় এক পবিত্র দায়িত্ব ছিল।[২]

মুহাম্মদ (স:) যখন আবু তালিবকে মুসলিম হবার আহবান জানালেন, আবু তালিব বললেন তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারবেন না। অতীতের প্রতি এরকম আন্তরিক ভক্তি আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ আমাদের আধুনিক সমাজ পরিবর্তনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং আমরা চলমান অগ্রগতি প্রত্যাশা করে থাকি। মৌলিকত্বকে সাদরে গ্রহণ করি আমরা এবং আবিষ্কারের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে–যেমন হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)–হতাশ হইনা।[৩] কিন্তু অধিকতর ট্র্যাডিশনাল সমাজে অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পবিত্র মূল্য রয়েছে। আমরা যে ধরনের পরিবর্তন অনিবার্য বা স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করি তার জন্যে উপরিকাঠামোর ক্রমাগত পরিবর্তন প্রয়োজন যা এর আগে কোনও সমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রাক-আধুনিক সমাজে প্রায়শঃই ধর্মের চুক্তির মত দায়বদ্ধতার চরিত্র থাকতে দেখা গেছে। সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে দেখা হয়েছে খুবই ভঙ্গুর সাফল্য হিসাবে; রক্ষাকারী দেবতাদের অসম্মান করার মাধ্যমে যাকে কোনওভাবেই হুমকির মুখে ফেলা যাবে না। ফলে একদল ক্ষুদে অভিজাত শ্রেণীর মাঝে উদ্ভাবনের ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত : খৃস্টপূর্ব ৩৯৯ সালে এথেন্সে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সক্রেটিসের পরিণতি থেকে বোঝা যায় জনতার মাঝে অনুসন্ধিৎসু চেতনা ছড়িয়ে দেয়া বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী এবং যুবসমাজকে নষ্ট করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। মুহাম্মদকেও (স:) একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি অল্পের জন্যে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

তিনি যখন বললেন মক্কাবাসীকে কেবল আল-ল্লাহ'র উপাসনা করতে হবে এবং ছেড়ে দিতে হবে অন্যান্য দেবতার উপাসনা, তখন আসলে সগোত্রীয়দের সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্মীয় চেতনা গ্রহণ করতে বলেছেন তিনি যার জন্যে অনেকেই প্রস্তুত ছিল না। আমরা দেখেছি যে একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতিই যথেষ্ট নয়, চেতনার পরিবর্তনেরও আবশ্যকতা রয়েছে। পয়গম্বরের চাহিদা গভীর শঙ্কার জন্ম দিয়েছিল, কেননা এর ফলে সমাজের অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভরশীল সেই ধর্ম হুমকির সম্মুখীন বলে ভাবা হয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যে প্রাথমিক যুগের ক্রিশ্চানরাও একই রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, যেখানে 'প্রগতিকে' সামনের দিকে নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এক আদর্শ অতীতে প্রত্যাবর্তন বোঝাত। রোমের মূর্তি দেবতাদের রাষ্ট্রের অভিভাবক বলে বিশ্বাস করা হত : তাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করা হলে দেবতারা তাদের রক্ষাবর্ম সরিয়ে নেবে। তার মানে এই নয় যে রোমান পৌত্তলিকতা উৎপত্তিগতভাবে অসহিষ্ণু ধর্মবিশ্বাস ছিল : নতুন দেবতারা রোমানদের আদি দেবতাদের স্থান গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তাদের উপাসকদের পূর্ণ ধর্মীয়

স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। নতুন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণের দরজা সবসময় খোলা ছিল এবং প্রায়ই দেখা যেত একই ব্যক্তি বিভিন্ন গোত্রের সদস্য হয়েছে। পরিপূর্ণভাবে কোনও একটি ধর্ম গ্রহণ করে অন্য সব ধর্মকে প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটি ছিল অশ্রুতপূর্ব। একথা সত্যি যে, ইহুদীরা মাত্র একজন ঈশ্বরের উপাসনা করত এবং তারা মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল, কিন্তু সবাই জানে জুডাইজম একটা প্রাচীন এবং সেকারণে শ্রদ্ধেয় ধর্ম। ক্রিশ্চানদের যতদিন সাইনাগগের সদস্য মনে করা হয়েছে ততদিন তারা ইহুদীদের মত সহিষ্ণুতা ভোগ করেছে, কিন্তু যখন তারা পরিষ্কার করে দিল যে প্রাচীন ইহুদী আইন তারা মানে না, তাদের বিরুদ্ধে আবিত্রতার অভিযোগ আনা হল– আদি ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা– এবং নাস্তিক্যের, কারণ তারা রোমের দেবতাদের উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। পৌত্তলিক দেবতাদের তাদের প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে ক্রিশ্চানরা একটা টাবু লঙ্ঘন করেছিল : লোকে বিশ্বাস করে বসেছিল যে তারা বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং এই বিপর্যয় ঠেকাতে সম্রাটরা তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর নির্দেশ দিয়ে চলছিলেন। আত্মত্যাগী ক্রিশ্চানদের ভয়ানক অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় তারা কত গভীরভাবে রোমান বিশ্বাসকে হুমকি দিয়েছিল; তাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়– গোটা জাতি 'নাস্তিক্যবাদ' সমর্থন করে না প্রমাণ করার জন্যে।

শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যে যদি এমন ঘটে থাকে, এটা সহজেই বোঝা যায় যে মুহাম্মদের (স:) 'নাস্তিকতা'র কারণেও কুরাইশরা গভীর শোক বোধ করেছিল–তিনি যখন প্রাচীন দেবীদের তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনে অস্বীকার করেছেন। অনিশ্চয়তার কারণেই যাযাবর জীবন রক্ষণশীল মানসিকতার ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কেউই প্রাচীন কুয়োগুলোর কাছে যাবার উদ্দেশ্যে প্রচলিত পথ বাদ দিয়ে নতুন কোনও রাস্তা খোঁজার কথা চিন্তাও করত না। কুরাইশরা মরুপ্রান্তর ছেড়ে আসার পর মাত্র দুই প্রজন্ম কাল পেরিয়েছিল, নিঃসন্দেহে নিজেদের বাণিজ্য-সাফল্যেকে ভঙুর বলে ভাবত তারা, যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিশ্বাস নিয়ে অহঙ্কারের সীমা ছিল না। রোমানদের মত অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষাকে মূল্য দিত এবং বিশ্বাস করত পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর তাদের সাফল্য নির্ভরশীল। কোরান এবং প্রাথমিক সূত্রগুলোয় সমাজের প্রতি হুমকি বলে, পূর্বপুরুষের ধর্মকে অবজ্ঞা আর নাস্তিক্যবাদের জন্যে শত্রুরা মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল বলে দেখা যায়; রোমের স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে দর্শকরা ক্রোধ আর আতঙ্কে যেভাবে ফুঁসে উঠত এটাও ঠিক সেরকম আবেগের জটিল এক মিশেল ছিল।

শুরু দিকে কোনও কোনও ক্রিশ্চান অ্যাপোলজিস্ট তাঁদের ধর্ম যে ঈশ্বর বিরোধী কোনও উদ্ভাবন নয় তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পৌত্তলিকদের কাছাকাছি যাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন : প্যালেস্টাইনের সুবিখ্যাত থিওলজিয়ান দুটি অ্যাপোলোজিয়াক (১৫০ ও ১৫৫) লিখেছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্যে যে ক্রিশ্চানরা প্লেটোর পথ এবং অন্য

দার্শনিকদের পথ অনুসরণ করছে যারা মাত্র একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। কোরানেও একটা মুহূর্তের উল্লেখ আছে যখন, এটা মনে হয়, মুহাম্মদ (সঃ) কুরাইশদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের ভয় দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঈশ্বর মুহাম্মদকে(সঃ) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন :

> আমি তোমার কাছে যে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি তার থেকে
> তোমার বিচ্যুতি ঘটানোর জন্যে ওরা চেষ্টা করবে যাতে
> তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা কথা বানাও, তাহলে
> ওরা অবশ্যই বন্ধু হিসাবে তোমাকে গ্রহণ করবে।
> আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের
> দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।[৪]

পশ্চিমে কোনও কোনও পণ্ডিত ধারণা করেছেন যে এখানে বর্তমানে তথাকথিত '*স্যাটানিক ভার্সেস*' নামে পরিচিত সেই নিন্দিত ঘটনার ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন, তাঁদের মতে, মুহাম্মদ(সঃ) বহু-ঈশ্বরবাদের প্রতি সাময়িক ছাড় দিয়েছিলেন।

ইবন সা'দ এবং তাবারি লিখিত ইতিহাসে ঘটনাটি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে দেখা যায় একবার শয়তান (স্যাটান) ঐশী প্রেরণালাভের সময় হস্তক্ষেপ করেছিল। মুহাম্মদ (সঃ) সুরা ৫৩ অবতীর্ণ হওয়ার সময় এমন দুটি আয়াত উচ্চারণের প্রেরণা লাভ করেছিলেন যেখানে আল-লাত, আল্-উয্যা এবং মানাতকে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মাধ্যম হিসাবে শ্রদ্ধা করা যাবে বলে ঘোষণা ছিল। কিন্তু কুরাইশরা যেহেতু *বানাত আল্-ল্লাহকে* স্বর্গীয় সত্তা বলে বিচেনা করত, তারা ভুলবশতঃ বিশ্বাস করে বসেছিল যে কোরান তাদের ঈশ্বরের সমমর্যাদায় স্থান দিয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) তাদের দেবীত্রয়কে আল-ল্লাহর সমমর্যাদায় মেনে নিয়েছেন ভেবে পৌত্তলিক কুরাইশরা মুসলিমদের সঙ্গে *সালাত* আদায়ে নত হয়েছিল এবং তিক্ত বিরোধের অবসান ঘটেছে বলে ধারণা জন্মে ছিল। কারণ কোরান তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মানুরাগকে সমথর্ন করেছে বলে মনে হয়েছে, এবং একেশ্বরবাদী বাণী পরিত্যাগ করেছিল, ফলে ইসলামকে আর মক্কাবাসীদের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনার মত ধর্মের প্রতি হুমকি বলে প্রতীয়মান হয়নি। যাহোক, গল্পটা ছিল এমন যে, মুহাম্মদ (সঃ) পরে আবার এক প্রত্যাদেশ লাভ করেন, যাতে এমন ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যে *বানাত আল-ল্লাহ'র* বিশ্বাসকে মেনে নেয়ার ব্যাপারটি শয়তানের (স্যাটান) অনুপ্রেরণায় ঘটেছে। এর পরিণামে কোরান থেকে দুটি আয়াত এক্সপাঞ্জ করা হয় এবং তার স্থানে অন্য আয়াত প্রতিস্থাপিত হয় যেখানে ঘোষিত হয় : তিন দেবী আরবদের কল্পনামাত্র এবং তারা উপাসনার কোনও যোগ্যতাই রাখে না।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করে দেয়া জরুরি যে, মুসলিমরা এ গল্পকে অপ্রামাণিক বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাদের মতে কোরানে এধরনের স্পষ্ট

কোনও ইঙ্গিত নেই, গোড়ার দিকে ইবন ইসহাকের বর্ণনাতেও এর উল্লেখ দেখা যায় না যা মুহাম্মদ (স:)-এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনী, এমনকি মুহাম্মদ(স:) সম্পর্কিত *হাদিসের* ব্যাপক সংকলনের কোথাও এর কোনও আভাস নেই। ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, কেবল একারণেই মুসলিমরা কোনও *হাদিসকে* প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করে না, বরং গ্রহণযোগ্য প্রমাণের অভাবই তার কারণ। তবে ইসলামের পশ্চিমা প্রতিপক্ষ এ বিষয়টি লুফে নিয়ে মুহাম্মদের(স:) সততা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে : আপন প্রয়োজনে যেই ব্যক্তি স্বর্গীয় বাণী বদলে ফেলেন তিনি সত্যিকারের পয়গম্বর হন কী করে? যেকোনও খাঁটি পয়গম্বর নিশ্চয়ই স্বর্গীয় ও শয়তানী অনুপ্রেরণার তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা রাখেন? কোনও ব্যক্তি কি স্রেফ অন্যদের ধর্মান্তরিত করার স্বার্থেই প্রত্যাদেশ বদল করতে পারেন? সাম্প্রতিককালে অবশ্য ম্যাক্সিম রডিনসন এবং ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট কাহিনীটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এর মাঝে নেতিবাচক কোনও ব্যাখ্যা নেই বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তারপরেও ইসলামি জগতের তুলনায় পাশ্চাত্য জগতে ঘটনাটা অনেক গুরুত্ববহ রয়ে গিয়েছিল : অন্তত ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত।

ওই বছর প্রকাশিত সালমান রুশদীর উপন্যাস '*দ্য স্যাটানিক ভার্সেসে'র* কারণে সৃষ্ট বিরোধের ফলে কাহিনীটি নতুন তাৎপর্য পেয়েছিল। মুসলিমরা প্রতিবাদ জানিয়েছে যে ওই উপন্যাসে মুহাম্মদের (স:) জীবন বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে : এখানে পয়গম্বর সম্পর্কে প্রচলিত পুরনো পশ্চিমা কিংবদন্তীরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং তাঁকে একজন প্রতারকে রূপান্তরের প্রয়াস নেয়া হয়েছে যাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষও ছিল, যিনি ইচ্ছামত নারীদের গ্রহণ করার স্বার্থে প্রত্যাদেশকে লাইসেন্স হিসাবে ব্যবহারকারী একজন লম্পট; দেখান হয়েছে, তাঁর প্রথমদিকের সঙ্গীরা মূল্যহীন ছিল, মানবেতর ছিল তাদের অবস্থা। তাঁরা মনে করেন স্যাটানিক ভার্সেসের ঘটনাটি, যেখান থেকে উন্যাসটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে দেখানোর প্রয়াস পাওয়া হয় যে মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থটি ভাল মন্দের পার্থক্য করতে অপারগ এবং পশ্চিমা সমালোচকরা সবসময় যেটা বলে এসেছেন, এটা একেবারে মানবীয় বা এমনকি অসৎ প্রেরণাকেও ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে দাবী করে।

রুশদীর বাক্যবাগীশ সমর্থকদের অনেকেই ইসলামকে জ্ঞানার্জন ও শিল্পকর্মের স্বাধীনতা বিরোধী ধর্ম বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যদিও মুসলিমরাই গোড়ার দিকে এক অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল যুক্তি ভিত্তিক দার্শনিক ঐতিহ্য যা মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। পয়গম্বর এবং তাঁর গোড়ার দিকের সঙ্গীদের কাল্পনিক যে বিবরণ রুশদী দিয়েছেন তা অবশ্যই সত্যি হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি, বরং মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত এক চরিত্রের স্বপ্নদৃশ্য হিসাবে দেখান হয়েছে, জিব্রাইল ফারিশতা নামের একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র তারকা উন্মূল হওয়ার ফলে আপন সংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়ে ফেলে, সে-ই হাজার বছর ধরে পশ্চিমের লালিত ঘৃণা আর অসন্তোষকে আত্মস্থ করে আপন কল্পনা বিস্তার করে, যার সঙ্গে সে আপোস করার প্রয়াস পেয়েছিল।

যেহেতু এই সাম্প্রতিক ঘটনা পশ্চিম ও মুসলিম জগতের মাঝে পুরনো ক্ষতকে আবার জাগিয়ে তুলেছে, তাই *স্যাটানিক ভার্সেসের* ঘটনায় আসলে কী কী বিষয় জড়িত ছিল তা পরিষ্কার করে নেয়া অত্যন্ত জরুরি : যদি আদৌ তেমন কিছু ঘটে থাকে। মুহাম্মদ (স:) কি সত্যি আরও অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করার জন্যে একেশ্বরবাদী বাণীতে ছাড় দিয়েছিলেন? কোরান কি মুহূর্তের জন্যে হলেও চরম অশুভের প্রভাবে দুষিত হয়েছে? এখানে আমরা দেখতে পাই, রডিনসন এবং ওয়াট যেভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন, কাহিনীটি মুহাম্মদ (স:)-কে প্রতারক হিসাবে উপস্থাপন করে না। আমরা যখন তাবারির শরণ নিই, যিনি তাঁর ইতিহাস এবং কোরানের আলোচনায় ঘটনার দুটি আলাদা বিবরণ রেখেছেন, আমরা তাঁকে কুরাইশদের সঙ্গে চূড়ান্ত ভাঙনের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে দেখি। ইবন ইসহাকের মত তিনিও বলেন, গোড়াতে কুরাইশরা মুহাম্মদের(স:) বাণী মেনে নিতে সম্মত ছিল। মুহাম্মদের (স:) দূর সম্পর্কের আত্মীয় উরওয়াহ বিন আল-যুআয়ের পয়গম্বরের পরলোকগমনের সত্তর বছর পর যে বিবরণ লিখেছিলেন সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে মুহাম্মদের (স:) প্রাথমিক সাফল্যের উল্লেখ রয়েছে। গোড়াতে, উরওয়াহ বলেছেন, কুরাইশরা মুহাম্মদের (স:) কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়নি, 'বরং তাঁকে প্রায় মেনেই নিয়েছিল।' তিনি যতক্ষণ দরিদ্র এবং অভাবীদের জন্যে দরদ মেশান আল্-লাহর ধর্ম প্রচার করেছেন, মক্কার প্রত্যেকে প্রাচীন পরম ঈশ্বরের পরিবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যেই তিনি ঘোষণা দিলেন যে আল্-লাহর উপাসনা করার পূর্বশর্ত হিসাবে অন্যান্য প্রাচীন দেবতার অর্চনা বাদ দিতে হবে, উরওয়াহ বলছেন, কুরাইশরা 'প্রবলভাবে তাঁকে প্রতিহত করে, তাঁর বক্তব্যকে অস্বীকার করে এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কেবল ঈশ্বর যাদের নিরাপদে রেখেছিলেন তারা ছাড়া, তবে তাদের সংখ্যা ছিল কম।' ইসলাম রাতারাতি ঘৃণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। উরওয়াহ একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা যোগ করেছেন : মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধিতা দেখিয়েছিল আল্-লাত দেবতার শহর তায়েফে যাদের সম্পত্তি ছিল সেই কুরাইশরা।[৫]

মক্কার তীব্র গরম থেকে রক্ষা পেতে কুরাইশদের অনেকেই তায়েফে যেতে পছন্দ করত, আল-লাতের শহরে তাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল, হিজাজের অপেক্ষাকৃত শীতল এবং উর্বর এলাকায় ছিল এর অবস্থান। দেবীর উপাসনালয় নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের কাছে, কারণ কা'বা থেকে দূরে অবস্থানের সময় সেখানেই তারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করত। মুহাম্মদ (স:) যখন তাঁর গোত্রের উপর আল-লাতের উপাসনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, তারা তায়েফে তাদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবার আশঙ্কা করে ভীত বোধ করেছে। আবু আল-আলিয়াহর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে তাবারি বোঝাতে চেয়েছেন যে কুরাইশরা এতই উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল যে তারা মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে রফায় পর্যন্ত আসতে চেয়েছে : তিনি যদি তিন *বানাত আল-লাহ* সম্পর্কে কিছু ভাল মন্তব্য করেন, বিবরণে উল্লেখ আছে,

কুরাইশরা তবে তাঁকে মক্কার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ঢোকার অনুমতি দেবে। সে অনুযায়ী, বলা হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদ (স:) আল-লাত, আল-উযযা এবং মানাতের প্রশংসাসূচক দুটো আয়াত আবৃত্তি করেছিলেন, তাদের বৈধ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন ওই বাণী শয়তানের (স্যাটান) প্ররোচণায় উচ্চারিত হয়েছে।[৬] কিন্তু অন্যান্য বিবরণ এমনকি কোরানের সঙ্গেও এই কাহিনীর বিরোধ রয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাবারির মত একজন মুসলিম ঐতিহাসিক তাঁর লিখিত সকল বিবরণের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এমন নয় : তিনি প্রত্যাশা করেছেন পাঠক অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে এর তুলনা করে নিজেই বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। পয়গম্বরত্বের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় মুহাম্মদ (স:)-এর উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। সুতরাং আবু আল-আলিয়াহ বর্ণিত এই গল্প সত্যি হতে পারে না। আমরা দেখেছি এই পর্যায়ে মুহাম্মদ (স:)-এর কোনও রাজনৈতিক ভূমিকা থাকা উচিত বলে কোরান মনে করেনি এবং পরবর্তীকালে কোনও রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়াই পয়গম্বর একই ধরনের অনেক প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাবারি তাঁর রচিত ইতিহাসে অন্য একটি বিবরণের স্থান দিয়েছেন যেখানে একাহিনীর সম্পূর্ণ আলাদা একটা রূপ দেখা যায়। মুহাম্মদ(স:) এখানে কুরাইশদের সঙ্গে বিরোধের একটা সমাধান খুঁজে ফিরছেন বলে দেখান হয়েছে। জাগতিক সুবিধা আদায়ের জন্যেই কেবল তিনি *বানাত আল-লাহ'র* প্রশংসাসূচক বাণী উচ্চারণ করছেন না, গল্পের অন্য বিবরণে যেমন দেখা যায়। তাবারি দেখাচ্ছেন যে মুহাম্মদ (স:) একটা সত্যিকার সৃজনশীল সমাধানের জন্যে কান পেতে ছিলেন যাতে তাঁর একেশ্বরবাদী বাণীর সঙ্গে কুরাইশরা সমন্বয় সাধন করতে পারে :

> পয়গম্বর যখন দেখলেন লোকজন তাঁকে ত্যাগ করেছে এবং তিনি যখন ঈশ্বরের কাছে থেকে প্রাপ্ত বাণীর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদের বেদনা বোধ করছিলেন, তখন তাঁর কামনা ছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন কোনও বাণী আসুক যা তাঁর সঙ্গে গোত্রের সমন্বয় সাধন করবে। স্বগোত্রীয়দের জন্যে তাঁর দরদ এবং উদ্বেগের কারণে তাঁর কাজকে কঠিন করে দেয়া বাধাটুকু অপসারিত হলে খুশি হতেন তিনি; তাই সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন, কামনা করেছেন এবং এটা খুবই কাঙ্ক্ষিত ছিল তাঁর।[৭]

একদিন, তাবারি বলছেন, কা'বায় ধ্যানরত অবস্থায় এক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জবাব এসেছে বলে ধারণা হল, যা তাঁর একেশ্বরবাদী দর্শনের সঙ্গে আপোস ব্যাতীতই তিন দেবীকে একটা স্থান দিয়েছে। সুরা ৫৩ অবতীর্ণ হওয়ার সময় বহু কুরাইশ কা'বাগৃহে উপস্থিত ছিল। মুহাম্মদ (স:) আবৃত্তি শুরু করামাত্র তারা সোজা হয়ে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে :

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্বন্ধে,
আর তৃতীয়টি মানাত সম্বন্ধে?[৮]

বানাত আল-ল্লাহ সম্পর্কে মুহাম্মদের (সঃ) যেকোনও বক্তব্য সুদূরপ্রসারি প্রভাব বিস্তার করার কথা। কোরান তাদের বিশ্বাস একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে নাকি মুহাম্মদ (সঃ) তাদের সম্পর্কে আরও ইতিবাচক কোনও মন্তব্য করতে যাচ্ছেন? এই রকম একটা মুহূর্তে, তাবারি বলছেন, শয়তান এরকম দুটো আয়াত তাঁর দ্বারা উচ্চারণ করিয়েছিল :

এরা মহিমান্বিত পাখী (*ঘারানিক*)
যাদের মধ্যস্থতা স্বীকৃত।

ঘটনার এই বিবরণ অনুযায়ী, নতুন প্রত্যাদেশে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিল কুরাইশরা। *ঘারানিক* সম্ভবত ঐশ্বরিক পাখি যেগুলো অন্যান্য পাখির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতায় যেতে পারে বলে ভাবা হত। মুহাম্মদ (সঃ) হয়ত ফেরেশতা ও *জিনের* অস্তিত্বে বিশ্বাসের মত *বানাত আল-ল্লাহর* অস্তিত্বেও বিশ্বাস করছেন, নিজের বাণীকে অসম্মান করা ছাড়াই দেবীদের উদ্দেশ্যে জটিল প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে বসেছেন তাই। *ঘারানিকরা* আল-ল্লাহ'র সমপর্যায়ের ছিল না-কেউ তেমন কিছু বলেওনি-কিন্তু, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে উড়ে বেড়ায় বলে তারা ফেরেশতার মত ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে- ফেরেশতাদের এই ভূমিকার অনুমোদন কোরানের ৫৩ নম্বর সুরার ঠিক এর পরের অংশেই রয়েছে।[৯] শুভ সংবাদটি কুরাইশরা সারা শহরে রটিয়ে দিল : 'মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের দেবতা সম্পর্কে চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি তাঁর আবৃত্তিতে উল্লেখ করেছেন তারা মহিমান্বিত *ঘারানিক*, এবং তাদের মধ্যস্থতার অনুমোদন আছে'।[১০]

ক্রিশ্চান জগতে যারা বড় হয়েছে 'শয়তান' শব্দটি বুঝতে তাদের ভুল হতে পারে, এ ঘটনায় যেভাবে তার উল্লেখ আছে। খৃস্ট জগতে শয়তান এক ভয়াবহ অপশক্তিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু কোরানে—ইহুদী ধর্মপুস্তকেও—সে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণযোগ্য চরিত্র। শয়তানের উচ্চ আসন থেকে পতনের কাহিনীতে, কোরান উল্লেখ করছে যে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করার পর সকল ফেরেশতাকে আদেশ করলেন আদমকে সেজদা করার জন্যে, কিন্তু শয়তান (বা *ইবলিস*, গ্রিক শব্দ '*ডায়াবলোস*' এর আরবীকরণে প্রায়শঃই এনামে ডাকা হয় তাকে) অস্বীকার করে এবং স্বর্গীয় অবস্থান থেকে বহিষ্কৃত হয়। কোরান একে আদি, চরম পাপ হিসাবে দেখে না, বরং শেষ বিচারের দিনে শয়তানকে ক্ষমা করা হবে বলে ইঙ্গিত প্রদান করে।[১১] কোনও কোনও সুফি এমনকি এমন দাবীও করেছেন যে শয়তান অন্যান্য ফেরেশতার চেয়ে

ঈশ্বরকে বেশি ভালবাসত, কারণ সে এক তুচ্ছ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের প্রাপ্য পদ্ধতিতে সম্মান দেখাতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং *স্যাটানিক ভার্সেসের* বিতর্কিত ঘটনাটি একথা বোঝায় না যে কোরান মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রকৃত অশুভ শক্তি দ্বারা দূষিত হয়েছিল। ইসলাম খৃস্টীয় অর্থে 'পতন'-এ বিশ্বাস করে না। এটা আমাদেরকে বলে যে আদম শয়তানের প্ররোচনায় ভুল পথে গিয়েছিলেন, কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার এই অস্তিত্ব অধিকাংশ ইহুদীদের মত মুসলিমরাও মানুষের উন্নতির একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসাবে দেখে। পাপ সত্ত্বেও আদম প্রথম পয়গম্বর হয়েছিলেন, যদিও তিনি 'শয়তানি' ভুলের অপরাধী, এবং শয়তান কখনওই মানবজাতির ধ্বংসকারীতে পরিণত হতে পারেনি। বর্তমান বিশ্বে যখন কোনও কোনও মুসলিম আমেরিকাকে 'মহাশয়তান' বলে অভিহিত করে তখন এই ভাষাগত পার্থক্যের বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে। জনপ্রিয় শিইজমে শয়তানকে ক্ষুদ্র তুচ্ছ জীব হিসাবে দেখা হয় যে কিনা আত্মার প্রকৃত গুণের বদলে নগণ্য বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে। শাহ্‌র আমলে ইরানিদের অনেকে আমেরিকাকে 'গ্রেটট্রিভিয়ালাইজার' হিসাবে দেখত, যে তাদের দেশের মানুষকে অধঃপতিত ইহজাগতিকতার প্রলোভনে বেপথু করতে চাইছে।[১২]

পরে আমরা দেখব, কুরাইশরা মুহাম্মদের (স:) কাছে মনোলেট্রাস আপোস রফার জন্য বলছে : তিনি কেবল আল্-লাহর উপাসনা করবেন এবং তারা পরম ঈশ্বরের পাশাপাশি তাদের পিতৃপুরুষের দেবতাদেরও উপাসনা করে যাবে। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) সবসময় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাবারি কর্তৃক সংরক্ষিত কাহিনীটিতে তিনি তথাকথিত *স্যাটানিক ভার্সেসকে* দেবীদের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকারকারী দুটো বাক্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছেন। বিবরণ অনুযায়ী এক রাতে জিব্রাইল পয়গম্বরের কাছে এসে জানতে চাইলেন : 'আপনি কী করলেন, মুহাম্মদ (স:)? আপনি ওইসব লোকের সামনে এমন কিছু আবৃত্তি করেছেন যা আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে আনিনি এবং তিনি যা বলেননি তাই আপনি উচ্চারণ করেছেন।'[১৩] নতুন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যা *বানাত আল্-লাহকে* 'কেবল কতগুলো নাম' হিসাবে বাতিল করে দিয়েছে। দেবীরা মানব মনের কল্পনামাত্র এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে কোনও প্রত্যাদেশ আসেনি :

> এগুলো তো কেবল কতকগুলো নাম যা তোমাদের
> পূর্বপুরুষেরা ও তোমরা রেখেছ। আর এর সমর্থনে আল্লাহ
> কোনও দলিল প্রেরণ করেননি।
> তোমরা তো অনুমান ও নিজেদের স্বভাবেরই অনুসরণ কর...[১৪]

দেবীদের অস্বীকার করার কোরানে এটাই সবচেয়ে চরম উচ্চারণ, কোরানে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্তির পর কুরাইশদের সঙ্গে আপোসের আর কোনও অবকাশ ছিল না।

তারাবির ইতিহাসে যেভাবে কাহিনী বিবৃত হয়েছে সেখানে একথা বোঝায় না যে মুহাম্মদ (সঃ) অসঙ্গত আপোস করছেন। বলা হয়েছে মুহাম্মদ (সঃ) যখন শুনলেন তাঁর উচ্চারিত আয়াতগুলো শয়তানের প্ররোচনা ছিল, তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, তাবারি বলছেন, ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রত্যাদেশ পাঠানোর মাধ্যমে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন– যেখানে বলা হয়েছে অন্য পয়গম্বরগণও একই রকম 'শয়তানি ভ্রান্তি'র শিকার হয়েছিলেন। এটা কোনও বিপর্যয় নয়, কারণ ঈশ্বর সবসময়ই বাতিলযোগ্য আয়াতের চেয়ে অনেক উন্নত মানের আয়াতের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি ঘটান। এখানে কোরান 'প্রত্যাদেশের' ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি স্বীকার করে নিচ্ছে :

> আমি তোমার পূর্বে যেসব নবী ও রসুল পাঠিয়েছিলাম
> তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করত
> তখনই শয়তান তাদের
> আবৃত্তিতে বাইরে থেকে কিছু ছুড়ে ফেলত। কিন্তু শয়তান যা
> বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহ তা দূর করে দেন। তারপর
> আল্লাহ্ তার আয়াতগুলোকে সুসংবদ্ধ করেন।[১৫]

আমরা দেখেছি প্রথম পয়গম্বর আদম শয়তানের প্ররোচনায় সাড়া দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালের বার্তাবাহকগণও আপন আপন জাতির কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেয়ার সময় '*স্যাটানিক ভার্সেস*' যোগ করেছেন। তার মানে এই নয় যে তাঁদের ঐশীগ্রন্থসমূহ অশুভ প্রভাব দ্বারা দূষিত হয়ে গিয়েছিল। আরবরা একেবারে মানবীয় মেজাজ প্রকাশ করার জন্যে বারবার '*শয়তান*' শব্দটি উচ্চারণ করে থাকে। আমরা দেখেছি যে প্রত্যাদেশ ব্যাখ্যা করা মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্যে কত অসুবিধাজনক ছিল: ব্যক্তির ধারণা দিয়ে কোনও প্রেরণার গূঢ় অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হতেই পারে কিংবা ভুল শব্দে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু এতে করে অবশ্যই মুহাম্মদ (সঃ) আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কোরানকে পরিবর্তন করার অবকাশ পাননি। কোরান পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে কোনও মরণশীলের পক্ষে স্বর্গীয় বাণী পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং মুহাম্মদ (সঃ) যদি কখনও তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার পরিণাম হবে ভয়াবহ।[১৬] এই সময়ে একজন বিশেষ পয়গম্বরের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল যে ঈশ্বর ঐশী গ্রন্থসমূহ সংশোধন করতে পারেন। মানবীয় বুদ্ধিতে আমরা বলতে পারি আরবদের কাছে কোরান পৌঁছে দেয়ার সময় মুহাম্মদ (সঃ) অবিরাম অনুপ্রাণিত বোধ করছিলেন। এটা ছিল অগ্রগামী প্রত্যাদেশ, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বাণীতে এক নতুন তাৎপর্য লক্ষ্য করতেন মাঝে মাঝে যা নির্দিষ্ট কিছু অতীত ধারণাকে উন্নত করত। এ সময় মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রাপ্ত বাণীতে এক নতুন জোর আরোপিত হতে দেখা যায়, স্বর্গীয় একত্বকে প্রত্যাদেশে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। এ পর্যায়ে তিনি একজন সতর্ক একেশ্বরবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন।

অতি সম্প্রতি আমরা প্রচলিত পৌত্তলিকতার সৌন্দর্য অনুধাবন করতে শুরু করেছি : এর অসংখ্য দেব-দেবী, দুঃখ ও বেদনার মোকাবিলা করার সত্য ও সাহসী কায়দা এবং চরম সমাধানের বিলাসিতা প্রত্যাখ্যানের বৈশিষ্ট্যে। বিপরীতক্রমে একেশ্বরবাদকে এক স্তম্ভ বিশিষ্ট হিসাবে দেখা যায় যা সব ধরনের দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পৌত্তলিক ধর্মের দেবতারা যেখানে পরম ঈশ্বরের কাছে যাবার অসংখ্য পথ দেখায় সেখানে একেশ্বরবাদী মাত্র একজন ঈশ্বরের ওপর জোর দেয় এবং মানবীয় পার্থক্যের জন্যে কোনওরকম ছাড় দেয়ার ব্যাপারে অসহিষ্ণু বলে মনে হয়। তবে মনে হয় বহুঈশ্বরবাদ মানবজাতির বিবর্তনের একটা পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যখন মানুষ পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠেনি, আর পৃথিবী এবং মহাবিশ্বে এমন কতগুলো উপাদান ছিল যা সব সময় নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। নারী-পুরুষ যখন নিজেদের অখণ্ড একক হিসাবে আবিষ্কার করল, মহাবিশ্বকে একটি একক সত্তা বলে বোধ হতে থাকল, তখন মানুষ একেশ্বর ভিত্তিক সমাধানের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। প্রাচীন দেবতারা চরম সত্তা বা অস্তিত্বের একেকটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হল–প্রচলিত ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী–ঈশ্বরের গুণাবলী মাত্র হয়ে দাঁড়াল।

রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এমনটা দেখতে পাই আমরা। এক ব্যাপক রাজনৈতিক অস্তিত্বে বসবাসের অভিজ্ঞতা মানুষকে চেনা পৃথিবীকে একটি মাত্র বস্তু হিসাবে দেখতে সাহায্য করেছিল : কোনও বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবতা আর ধর্মবিশ্বাস অপর্যাপ্ত মনে হচ্ছিল তখন। ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোক বুঝতে শুরু করেছিল ঈশ্বর কোনও না কোনওভাবে একজন—গ্রিক দার্শনিকেরা যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু, আমরা যেমন দেখেছি, এই পরিবর্তনটা ছিল বেদনাদায়ক। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একেশ্বরবাদী ধর্মে পরিবর্তনের জন্যে অন্যদের তুলনায় বেশি আগ্রহী ছিল, আর চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে খৃস্ট ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হবার পর পৌত্তলিক ধর্ম দীর্ঘদিন ধরে বিকশিত হয়েছিল। একেশ্বরবাদের বিশেষ ধরনের সমাধানের অর্থ হচ্ছে মানুষকে তার অতীত দৃঢ়তার সঙ্গে ভুলে যেতে হবে, ফলে কেউ কেউ ধারাবাহিকতার এই ছেদকে গভীর বেদনার সঙ্গে দেখেছিল। সপ্তম শতকের শুরুর দিকে আরবে একই রকম সঙ্কট ছিল। রাজনৈতিক প্রেক্ষিত আরবদের আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। বিরাট সব সাম্রাজ্যের ঘেরাওয়ের মধ্যে ছিল তারা আর আরবের মরু প্রান্তরের বাইরের ঐক্যবদ্ধ পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন ছিল। অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে নিজেদের দেখতে শুরু করেছিল তারা। অর্থাৎ চেতনা স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন একটা একক হিসাবে বিবেচিত হতে যাচ্ছিল। প্রাচীন গোত্রীয় ব্যবস্থা–যার মানে ছিল, প্রত্যেক গোত্র তার আপন পথে চলবে—আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে মারাত্মকভাবে অপর্যাপ্ত মনে হচ্ছিল। *হানিফদের* কাহিনী কিছু কিছু আরবের একেশ্বরবাদ গ্রহণের প্রস্তুতির কথা বর্ণনা করে, কিন্তু অন্যরা অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার মূলে যে ধারাবাহিকতা সেটা হারাতে তৈরি ছিল না।

একথা যদি সত্যি হয়ে থাকে যে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে মুহাম্মদ (স:)-এর ধারণা মাত্র প্রসারিত হতে শুরু করেছিল, সেক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই আরবদের একটা সাধারণ কেন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও অনেক বেশি সজাগ ছিলেন। একেশ্বরবাদ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গোত্রীয় প্রথার সঙ্গে বৈরী ভাবাপন্ন : এখানে মানুষকে একটা একক সমাজে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত আরবদের ঐক্যের গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন মুহাম্মদ (স:), কিন্তু ৬১৬ খৃস্টাব্দে কুরাইশদের সঙ্গে মারাত্মক বিরোধের সময়ে প্রকৃতির নানান নিদর্শনের নেপথ্যে এক একক অতিপ্রাকৃত সত্তা খুঁজে পাওয়ার ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেই অধিকতর সচেতন ছিলেন। *স্যাটানিক ভার্সেস*কে প্রতিস্থাপনকারী আয়াতগুলো ইঙ্গিত দেয় যে প্রাচীন দেবীসমূহ স্রেফ মানুষের কল্পনা, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতিলৌকিক আল্-লাহর সমকক্ষ নয়, যিনি মানুষের সীমিত চিন্তাভাবনার অতীত এক সত্তা। কিন্তু আল্-লাহর 'অংশী'দের বিরুদ্ধে কোরানের অধিকাংশ যুক্তি পৌত্তলিক দেবতাদের অক্ষমতার ওপর বেশি জোর দেয়, অনেকটা ইহুদীদের ঐশীগ্রন্থের কিছু যুক্তির মত। ওদের জগতের কেন্দ্রে বসিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ ওরা তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবে না। উপাসকদের খাদ্য ও রসদ[১৭] দিয়ে সাহায্য করতে পারে না ওরা; ওরা এমনকি অকেজো মাধ্যম : শেষ বিচারের দিন তারা নারী-পুরুষকে সাহায্য করতে পারবে না—যারা ওদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।[১৮] দেবতারা নারী, পুরুষ, ফেরেশতা আর *জিনের* মত তুচ্ছ সৃষ্টি মাত্র যাদের বড় কোনও সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। এখানে কোরানের বক্তব্য কোনও কোনও হিব্রু শ্লোকের মত, যা হয়ত মুহাম্মদ (স:) পড়েননি, তবে সেখানেও একই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে :

স্রষ্টা ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকো,
ওরা তোমাদের মতই দাসমাত্র;
যদি সত্যি বলে থাকো, তাহলে ওদের ডেকে
জিজ্ঞেস করো, ওদের কি পা আছে,
যা দিয়ে ওরা হাঁটে,
কিংবা ওদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ওরা ধরে,
কিংবা ওদের কি চোখ আছে,
যা দিয়ে ওরা দেখে,
অথবা ওদের কি কান আছে যা দিয়ে ওরা শ্রবণ করে?
বলো : 'তাহলে তোমরা তোমাদের সহযোগিদের [*শারুকা*]
আহবান করো; তারপর আমার সঙ্গে ছলনার চেষ্টা করো,
এবং আমাকে কোনও অবকাশ দিয়ো না।
আল্-লাহ্ আমার রক্ষক
যিনি গ্রন্থ পাঠিয়েছেন, এবং তিনি সত্য ন্যায়পরায়ণকে

রক্ষা করেন।
আর তোমরা যাদের আহবান কর, স্রষ্টা ছাড়া,
তোমাদের সাহায্য করার কোনও ক্ষমতা নেই তাদের,
তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।'[১৯]

কোরান দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে পুরোপুরি আরবীয় ধারণায় কল্পনা করেছে : গোত্রীয় ধারণায় তাঁকে কার্যকর প্রধান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি নিরাপত্তা (*আউলিয়া*) এবং সাহায্য (*নস্‌র*) দিতে পারেন, যেখানে প্রাচীন দেবীগণ মারাত্মক রকম দুর্বল সর্দারের মত যারা গোত্রীয় সদস্যদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম।

মুসলিমদের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে স্বর্গীয় একত্ব ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় যা একক ব্যক্তির জীবন ও সমাজে এই একত্ব ফুটিয়ে তোলার পদক্ষেপে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত শুদ্ধতা অর্জনের এটা ছিল এক অব্যাহত প্রয়াস যা প্রকৃত পরিশুদ্ধ সত্তায় একটি একক কেন্দ্র ও লক্ষ্য অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতায় একক ঈশ্বরের সংবাদ দেয়। বিশ্বাসের মুসলিম শপথ *শাহাদার* প্রথম অংশ প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সারসংক্ষেপ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্-লাহ ছাড়া আর কোনও প্রভু নেই।' চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা মুসলিমদের আল্-লাত, আল্-উয্যা এবং মানাতের মত দেবীদের সম্মান প্রদর্শন—একেবারে সীমিত পর্যায়েও নয়–কেবল নিষিদ্ধ করা হয়নি বরং আল্-লাহর প্রতি অঙ্গীকার থেকে যাতে অন্যান্য দেবতা তাদের বিচ্যুত করতে না পারে সেটাও নিশ্চিত করেছে। মানুষের মতাদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দীপনা একধরনের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো হতাশ করতে বাধ্য। এতে অবশ্যই অর্থ, সাফল্য বা জাগতিক বিলাসিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আবার অন্যান্য সেক্যুলার উদ্দীপনার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যেগুলো আকর্ষণীয় মনে হয় কিন্তু মানুষের মৌলিক অস্থিরতা ও অসন্তোষ কমাতে পারে না, যার ফলে অসংখ্য মানুষ শিল্পকলা ও ধর্মের সান্ত্বনার খোঁজ করতে বাধ্য হয়। আমাদের বর্তমানকালেও কিছু কিছু মুসলিম যখন জাতীয়তাবাদ বা সেক্যুলারিজমের মত বিদেশী আদর্শের দিকে আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে, সংস্কারবাদীরা তাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে এগুলো প্রতিশ্রুত সন্তুষ্টি বয়ে আনবে না। এগুলো অশুভ নয়, তবে অপর্যাপ্ত, সুতরাং চূড়ান্ত 'নিরাপত্তা' বা 'সাহায্য' কিংবা সন্তুষ্টির কোনটিই দিতে পারবে না–সেটা ব্যক্তি বা সামাজিক বা রাজনৈতিক যে পরিমণ্ডলেই হোক না কেন। *শিরক* (সামান্য বা তুচ্ছ প্রাণীকে সর্বমহান আল্-লাহ'র অংশী করা)-এর পাপ মুসলিমদের এভাবে সতর্ক করে দেয় তারা যেন একেবারে মানবীয় আদর্শ—যত ভালই হোক না কেন—কে বৃহৎ গুরুত্বে সঙ্গে যেন গ্রহণ না করে, তাহলে তারা বহুঈশ্বরবাদী হয়ে যাবে।

কুরাইশদের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের ঠিক পরপর সুরা ১১২–সুরা ইখলাস–অবতীর্ণ হয়। মুসলিমরা প্রতিদিনের প্রার্থনায় মসজিদে এ সুরা আবৃত্তি

করে, যা তাদের বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত করে গভীর অগ্রাধিকার খোঁজ করার মাধ্যমে নিজ নিজ জীবনে ঐশ্বরিক একত্বের অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াস চালিয়ে সত্তাকে পরিশুদ্ধ করে তোলার কথা মনে করিয়ে দেয় :

বলো, 'তিনি আল্লাহ্ (যিনি) অদ্বিতীয়।
আল্লাহ সবার নির্ভরস্থল।
তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।
আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'

কিন্তু খুব বেশি সংখ্যক কুরাইশ অতীতের সঙ্গে এই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, ধর্ম ত্যাগ করতে চায়নি তারা। মুহাম্মদের (সঃ) ধর্মে দীক্ষিতদের অনেকেই পক্ষ ত্যাগ করেছিল এবং প্রভাবশালী কুরাইশরা তাঁকে শেষ করে দেয়ার জন্যে সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছিল। তাঁকে ওরা ধর্মদ্রোহী নাস্তিক হিসাবে দেখেছে যে কিনা তাদের সমাজের পবিত্রতম অমূল্য প্রথার শত্রু। মুহাম্মদের (সঃ) গোত্রের প্রধান আবু তালিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল এক প্রতিনিধিদল, মুহাম্মদের (সঃ) ওপর থেকে নিরাপত্তা (*আউলিয়া*) প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায় তারা। একজন রক্ষক ছাড়া আরবে কারও পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না : গোত্রীয় ব্যবস্থা হয়ত ভেঙে পড়ছিল কিন্তু গোত্র বা পরিবার সমাজের মৌলিক এককই ছিল, এমন গ্রুপের বাইরে জীবনযাপন আক্ষরিক অর্থেই ছিল অসম্ভব। অরক্ষিত কাউকে অনায়াসে হত্যা করা যায়। কিন্তু প্রতিনিধি দলটি কুরাইশদের গোটা গোত্রের প্রতি আবু তালিবের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল : 'হে আবু তালিব, আপনার ভাতুষ্পুত্র আমাদের দেবতাদের গালি দিয়েছেন, আমাদের ধর্মের অপমান করেছেন, আমাদের জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্তির দোষে অভিযুক্ত করেছেন; হয় আপনি তাঁকে বিরত রাখুন নয়ত আমাদের তাঁর ব্যবস্থা করতে দিন... আমরা আপনাকে তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য করব।'[২৩] পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। আবু তালিব মুহাম্মদকে (সঃ) স্নেহ করতেন, কিন্তু সকল গোত্রের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি হোক এটাও তিনি চাননি। তিনি মুসলিম ছিলেন না, পুরাতন ধর্মের প্রতি মুহাম্মদের(সঃ) নিন্দার কারণে বিব্রতও ছিলেন, কিন্তু হত্যা করার জন্যে সোজাসুজি ভাতুষ্পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করলে গোত্র প্রধান হিসাবে ব্যর্থতার পরিচয় হত সেটা, কারণ তিনি যাথাযথ নিরাপত্তা দেননি বলে প্রমাণ হত। হাশিম গোত্রের প্রতি বিরাট আঘাত হয়ে দাঁড়াত সেটা, যা ইতিমধ্যে বেশ সংকটে নিপতিত হয়েছিল। অল্প সময়ের জন্যে কোনও অঙ্গীকার থেকে বিরত থাকলেন আবু তালিব। অন্যান্য গোত্র প্রধানকে দ্ব্যর্থক জবাব দিলেন তিনি এবং তাঁর আশ্রয়ে প্রচারণা অব্যাহত রাখলেন মুহাম্মদ (সঃ)।

কিন্তু অল্পদিন বাদেই কুরাইশরা আবার আবু তালিবকে হুমকি দিতে এল। 'দোহাই ঈশ্বরের, অমাদের পিতৃ-পুরুষকে গালাগালি করা হবে, আমাদের

রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করবে, অপমান করা হবে আমাদের দেবতাদের, এটা আমরা মানতে পারব না', জোর গলায় বলল তারা, 'আপনি যতক্ষণ তাঁকে বহিষ্কার না করছেন ততক্ষণ আপনাদের দুজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আমরা যতক্ষণ না একপক্ষ ধ্বংস হচ্ছে।' কুরাইশরা ভেবেছিল যে আপোসরফার আর সম্ভাবনা নেই এবং যে কোনও একটা পক্ষ জিততে পারে। আবু তালিব শঙ্কিত হয়েছিলেন। মুহাম্মদকে (স:) ডেকে পাঠালেন তিনি। 'নিজেকে আর আমাকে রক্ষা কর,' আবেদন জানালেন, 'আমার ওপর বহনের অতীত কোনও ভার দিয়ো না।' আবু তালিব তাঁকে পরিত্যাগ করতে যাচ্ছেন ভেবে মুহাম্মদ (স:) অশ্রুসজল চোখে জবাব দিয়েছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করে নিতে প্রস্তুত আছেন : 'হে আমার চাচা, আল্লাহর কসম, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয় আমার পথ পরিত্যাগ করার শর্তে, আল্লাহ্ যতক্ষণ না আমাকে বিজয় এনে দিচ্ছেন বা আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, আমি তা পরিত্যাগ করব না।' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি, কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু আবু তালিব সঙ্গে সঙ্গে আবার ডেকে পাঠান তাঁকে : 'তোমার যা খুশি প্রচার কর, ঈশ্বরের শপথ, আমি তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করব না।'[২১] সাময়িকভাবে নিরাপত্তা পেলেন মুহাম্মদ (স:)। আবু তালিব যতদিন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছেন এবং তা কার্যকর করতে পারছেন, ততদিন মক্কার কেউই তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আবু তালিব ছিলেন মক্কার অন্যতম প্রতিভাবান কবি, তিনি এবার যেসব গোত্র ঐতিহ্যগতভাবে হাশিমের মিত্র ছিল কিন্তু এখন মুহাম্মদের (স:) কারণে তাদের বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছে তাদের নিন্দা করে আবেগঘন কবিতা রচনা শুরু করলেন। আল-মুত্তালিবের গোত্র হাশিমের সঙ্গে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করেছিল, এদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, কিন্তু এই সুসংবাদের পরপরই দুঃখজনক এক পক্ষত্যাগের ঘটনা ঘটে। শুরু থেকেই মুহাম্মদের (স:) প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল আবু লাহাব, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রয়াসে সে মুহাম্মদের (স:) দুই মেয়ে রুকাইয়াহ্ ও উম্ম কুলসুমের সঙ্গে তার দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) শেষ পর্যন্ত *বানাত আল্-ল্লাহকে* স্বীকার করে না নেয়ায় সে আব্দ শামস গোত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়–তার স্ত্রীর গোত্র ছিল সেটা–এবং ছেলেদের বাধ্য করে দুই মহিলাকে পরিত্যাগ করার জন্যে। তরুণ অভিজাত নব-মুসলিম উসমান ইবন আফফান অবশ্য অনেক আগে থেকেই রুকাইয়াহ্‌র গুণমুগ্ধ ছিলেন, মুহাম্মদের (স:) মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলেন রুকাইয়াহ্, ফলে এবার তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থী হতে সক্ষম হলেন।

এদিকে মুহাম্মদের (স:) শত্রুদের সঙ্গে যথাসম্ভব নৈকট্য অর্জন করেছে আবু লাহাব। এসব গোত্রের প্রধান ছিলেন ওয়ালিদের ভ্রাতুষ্পুত্র আবু আল্-হাকিম–মাখযুম গোত্রের বৃদ্ধ সর্দার ছিলেন ওয়ালিদ। তিনি মুহাম্মদ (স:) বিরোধীদের প্রধান নেতায় পরিণত হন, মুসলিমরা তাঁর নতুন নাম রেখেছিল 'আবু জাহ্ল'–অজ্ঞতার পিতা। ব্যক্তিগতভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি, সম্ভবতঃ

মুহাম্মদের (স:) রাজনৈতিক দক্ষতার কারণে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, আবার মুহাম্মদের (স:) ধর্মীয় বক্তব্যের কারণে গভীরভাবে বিব্রতও। অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ গোত্রপ্রধানগণ আব্দ শামস্ গোত্রের আবু সুফিয়ানসহ, তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, অত্যন্ত মেধাবী পুরুষ ছিলেন আবু সুফিয়ান, এবং এক সময় মুহাম্মদের (স:) ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। তাঁর শ্বশুর উতবা ইবন রাবি'য়া এবং ভাই শায়বাও প্রথমসারির প্রতিপক্ষ ছিল, জুমা গোত্রের স্থূলকায় বয়স্ক প্রধান উমাইয়াহ্ ইবন খালাফের মত। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেন আমির গোত্রের প্রধান সুহায়েল ইবন আমির–নিবেদিতপ্রাণ পৌত্তলিক ছিলেন তিনি, মুহাম্মদের (স:) মত আধ্যাত্মিক ধ্যানে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে তখন পর্যন্ত সুহায়েল মনস্থির করেন নি, সম্ভবতঃ মুহাম্মদের (স:) বাণীতে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয়ভাব শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউও তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল : আমর ইবন আল্-আস, তৎপর ও দক্ষ যোদ্ধা এবং কূটনীতিক: খালিদ ইবন ওয়ালিদ, আর সাফওয়ান ইবন উমাইয়াহ্। তবে মুহাম্মদের(স:) তরুণ প্রতিপক্ষদের মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী ছিলেন উমর ইবন আল-খাত্তাব, তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক পঁচিশ বছর, যখন কুরাইশদের সঙ্গে মুহাম্মদের (স:) বিচ্ছেদ ঘটেছিল। অত্যুৎসাহী পৌত্তলিক খাত্তাবের পুত্র ছিলেন উমর, খাত্তাব তার আপন বৈমাত্রেয় ভাই এবং *হানিফ* যায়েদকে প্রাচীন ধর্মের অসম্মান করায় শহর-ছাড়া করেছিল। উমর সেখানে সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্যে সদাপ্রস্তুত থাকতেন।

এরা প্রত্যেকে মুসলিম শিবিরের কাছে নিকটাত্মীয়দের হারিয়েছিল। কোরান পরিবারের মাঝে তিক্ত ভাঙন সৃষ্টি করে চলছিল। যেমন সুহায়েল ইবন আমির তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দাল্লাহ্, দুই মেয়ে ও তাদের স্বামী, তিনজন ভাই, চাচাত ভাই, শ্যালিকা সওদাহকে হারিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল পুরনো পরিবারের প্রতি আনুগত্য ত্যাগকারী একদল বিদ্রোহী তরুণ নিয়ে মুহাম্মদ (স:)-এর কোনও রাজনৈতিক ভূমিকা নেই, কিন্তু যিনি আল্-লাহ্'র কাছ থেকে বাণী প্রাপ্তির দাবী করছেন আর কতদিন তাদের মত সাধারণ মরণশীলদের নেতৃত্ব দিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন? তাঁর চরম শত্রুদের কেউ কেউ যেন এটাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে আপোসের কোনওই আশা নেই। এরকম গুরুত্বপূর্ণ এক লড়াইতে এক পক্ষই জিততে পারে এবং আবু জাহ্ল এবং তরুণ উমরের– যিনি আবার তাঁর ভাতুষ্পুত্র ছিলেন– মত লোকেরা, শান্তিপূর্ণ সমাধানেরও কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাননি।

কিন্তু তারপরেও তাদের পক্ষে বেশি কিছু করার ছিল না। মুহাম্মদ (স:) যতক্ষণ আবু তালিবের সমর্থন পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত হাশিম এবং আল-মুত্তালিবের গোটা গোত্রকে প্রতিহিংসায় না জড়িয়ে কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না, যা তাঁর পরিবারকেও আহত করবে। সুতরাং, শুরুতে প্রতিপক্ষ অবরোধ আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পথ বেছে নিয়েছিল। কোনওরকম শাস্তির আশঙ্কা ছাড়াই তারা দাস ও দুর্বল মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারত, কিন্তু মুহাম্মদের (স:) মত যাদের

যথাযথ প্রতিরক্ষা ছিল তাদের বেলায় সূক্ষ্ম পদ্ধতির আশ্রয় নিত। ইবন ইসহাক আমাদের আবু জাহলের সাধারণ নীতির কথা বলছেন :

> যখন কারও মুসলিম হওয়ার সংবাদ পেতেন তিনি, যদি সেই ব্যক্তির সমাজে কোনওরকম সামাজিক প্রভাব বা তাকে রক্ষা করার মত আত্মীয়-স্বজন থাকত তাহলে তাকে ভর্ৎসনা করতেন, ঘৃণার সঙ্গে তাকে বলতেন : 'তুমি তোমার বাবার ধর্ম ত্যাগ করেছ, যে তোমার চেয়ে ভাল মানুষ ছিল। আমরা তোমাকে জড়বুদ্ধি ঘোষণা করব, বোকা হিসাবে আখ্যায়িত করব, তোমার সুনাম নষ্ট করে দেব।' কোনও ব্যবসায়ীর বেলায় তিনি বলতেন, 'আমরা তোমার পণ্য বর্জন করব, ভিক্ষুকে পরিণত করব তোমাকে।' আর সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিহীন কেউ হলে তিনি তাকে প্রহার করতেন আর লোকজনকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দিতেন।[22]

সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার হয় ক্রীতদাসেরা, যাদের কোনও গোত্রীয় রক্ষাকবচ ছিল না। জুমা গোত্রের প্রধান উমাইয়াহ্ তার আবিসিনীয় মুসলিম দাস বিলালকে দিনের সবচেয়ে উত্তপ্ত সময়ে বাইরে এনে বুকে বিরাট এক পাথর চাপা দিয়ে খালি গায়ে প্রখর রোদে বেঁধে রাখত। কিন্তু বিলাল দমিত হতেন না, চিৎকার করে ঈশ্বরের একত্বের ঘোষণা দিয়ে চলতেন, 'এক! এক!' তাঁর অসাধারণ দরাজ কণ্ঠস্বর গোটা এলাকায় প্রতিধ্বনি তুলত। কাছাকাছিই বাস করতেন আবু বকর, তিনি বিলালের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে উমাইয়াহ'র কাছ থেকে তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্তিদান করেছিলেন। এভাবে তিনি আরও সাতজন দাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তবে কোনও কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিমরা আপন পরিবারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল : অগ্নিগহ্বরের স্বপ্ন দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী খালিদ ইবন সা'ইদকে তাঁর বাবা আটকে রেখে খাদ্য ও পানি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। মুক্তপুরুষ আম্মার ইবন ইয়াসিরের ওপর মাখযুম গোত্র এত নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁর মা মৃত্যু বরণ করেন।

সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার মুসলিমদের জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)। ক্রিশ্চান আবিসিনিয়ার নেজাসকে তিনি তাদের আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। যদিও হস্তীবর্ষ থেকেই মক্কার কুরাইশরা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল, তবু নেজাস সম্মত হন এবং ৬১৬ খৃস্টাব্দে তিরাশি জন মুসলিম সময়িকভাবে মক্কা নগরী ত্যাগ করে, তাদের নেতৃত্বে ছিলেন উসমান ইবন মা'যুম, তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং ধ্যানী পুরুষ, মুসলিম হওয়ার আগে থেকেই। আবু তালিবের পুত্র জা'ফর, মুহাম্মদের (স:) কন্যা রুকাইয়াহ, তাঁর স্বামী উসমান ইবন আফফানসহ পয়গম্বরের পরিবারের সদস্যরাও গিয়েছিলেন। আধুনিক পশ্চিমা পণ্ডিতরা মত প্রকাশ করেছেন যে নিরাপদ আশ্রয় নয়, এই অভিবাসনের পেছনে ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। আবু জাহলের অবরোধের কারণে যেসব মুসলিম ভোগান্তির শিকার হয়েছিল তাদের জন্যে দক্ষিণমুখী কোনও স্বাধীন

বাণিজ্য পথ প্রতিষ্ঠা করা হয়ত মুহাম্মদের (সঃ) প্রয়াস ছিল। এমনও মতপ্রকাশ করা হয়েছে যে অভিবাসীদের তালিকা থেকে দেখা যায় মুসলিম সমাজের মাঝে কোনওরকম মতানৈক্যও থেকে থাকতে পারে। অভিবাসীদের কেউ কেউ, যেমন উসমান ইবন মা'যুম এবং উবায়দাল্লাহ্ ইবন জাহ্শের মত ব্যক্তিরা আগেই একেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, তাঁরা হয়ত আবু বকরের মত নবাগতদের সঙ্গে মুহাম্মদের (সঃ) ঘনিষ্ঠতার জন্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তবে এ ধরনের মতবিরোধ কোনও কারণ যদি হয়েও থাকে তা মোটেও মারাত্মক ছিল না : আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে উবায়দাল্লাহ খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, তবে যখন পেরেছেন আবার মক্কায় ফিরে এসেছেন উসমান, মুহাম্মদ (সঃ) ও আবু বকরের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছিলেন তিনি।

মুসলিমরা সেখানে পৌছার পর পরই কুরাইশরা দুটি প্রতিনিধিদল পাঠায় নেজাসকে অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানাতে : ব্যাপক দেশত্যাগ সবদিক থেকে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিনিধিদল নেজাসকে জানায় মুসলিমরা মক্কার জনগণের বিরুদ্ধে ব্লাসফেম করেছে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে। সুতরাং ওরা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ওদের বিশ্বাস করা যায় না। মুসলিম অভিবাসীদের ডেকে পাঠালেন নেজাস, ওদের বক্তব্য জানতে চাইলেন। জা'ফর ব্যাখ্যা দিলেন যে মুহাম্মদ (সঃ) প্রকৃত ঈশ্বরের পয়গম্বর যিনি জেসাসের কাছে তাঁর প্রত্যাদেশ নিশ্চিত করেছেন। যুক্তির সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে তিনি কুমারি মেরির গর্ভে জেসাসের জন্ম গ্রহণের কুরানিক বিবরণ আবৃত্তি করেছিলেন :

> বর্ণনা করো, এ কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা,
> যখন সে তার পরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে
> নিভৃতে পূর্বদিকে এক জায়গায় আশ্রয় নিল
> এবং ওদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে
> পর্দা করল তখন আমি তার কাছে আমার রুহ্ (জিব্রাইল)কে
> পাঠালাম। সে তার কাছে পুরো মানুষের বেশে
> আত্মপ্রকাশ করল। মরিয়ম বলল, 'আমি তোমার থেকে
> করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে
> কাছে এস না'। সে বলল, 'তোমার প্রতিপালক তো আমাকে
> পাঠিয়েছে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।'
> মরিয়ম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ
> স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যভিচারিণীও নই।'
> সে বলল, 'এভাবেই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'এ আমার
> জন্যে সহজ আর আমি তাকে সৃষ্টি করব মানুষের জন্যে এক
> নিদর্শন ও আমার তরফ থেকে এক আশীর্বাদ হিসাবে।
> এতো এক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত।'[২১]

জা'ফর আবৃত্তি শেষ করার পর কোরানের সৌন্দর্য যথারীতি প্রভাব বিস্তার করল। নেজাস এমনভাবে কাঁদতে শুরু করেছিলেন যে তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল, তাঁর বিশপ আর পরামর্শকদের গাল বেয়েও এমন অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল যে হাতের পুঁথি পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছিল।

প্রতিনিধিদল কোরান জেসাসের স্বর্গীয় মর্যাদা গ্রহণ করেনি বলে নেজাসের কাছে যুক্তি দেখিয়ে ঝামেলা বাধানোর প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু তবু তিনি মুসলিমদের বহিষ্কার করে মক্কায় ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেছিলেন। ধর্মদ্রোহীদের প্রতি নেজাসের সমর্থন আবিসিনিয়ার ক্রিশ্চানদের হতাশ করে, ফলে ব্যাপারটাকে বৈধ করার জন্যে তাঁকে কিছু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। তবে আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে মুসলিমরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য আমরা যতদূর জানতে পেরেছি : আবিসিনিয়ার উদ্যোগটি শেষ হয়নি বা অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদের (স:) হয়ত কোনও অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল যা কার্যকর হয়নি, যার ফলে ইবন ইসহাকের মত ঐতিহাসিকগণ যখন লেখালেখি শুরু করেছেন, ততদিনে সেসব পরিকল্পনা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। প্রতিনিধিদল নেজাসকে হয়ত বোঝাতে পেরেছিল যে মুসলিমদের যতটা শক্তিশালী ভেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ওরা আসলে ততটা শক্তিশালী গ্রুপ নয়, যার ফলে তিনি হয়ত মুসলিমদের প্রত্যাশিত সমর্থন প্রদান করেননি।

এদিকে মক্কায় তখন আবু জাহল এবং তাঁর সহযোগিরা পয়গম্বর এবং তাঁর সঙ্গীদের হয়রানি করে চলছিলেন। আপত্তির নতুন বিষয় পেয়েছিল তারা : আল্-লাহ আল্-ওয়ালিদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করার বদলে মুহাম্মদকে (স:) বেছে নিতে গেলেন কেন? মুহাম্মদ (স:) কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখাননি কেন? আল্-লাহ কেন ভেঙে ভেঙে কোরান অবতীর্ণ করছেন, সিনাই পর্বত চূড়ায় মোজেস যেভাবে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তেমনি একসঙ্গে কেন পাঠাচ্ছেন না? আল্-লাহ বার্তাবাহক হিসাবে একজন ফেরেশতাকে না পাঠিয়ে সাধারণ একজন মানুষকে ব্যবহার করছেন কেন? কুরাইশদের কেউ কেউ ভেবেছিল স্বয়ং আল্-লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ লাভের বদলে আসলে কোনও ইহুদী বা ক্রিশ্চানের কাছে শিক্ষা নিচ্ছিলেন মুহাম্মদ (স:)। কিন্তু অভিযোগ তোলা ছাড়া কুরাইশরা তেমন কিছু করতে পারছিল না। নিরীহ মুসলিমরা আবিসিনিয়ায় চলে যাবার পর থেকে নিপীড়ন মূলতঃ বাণিজ্য অবরোধ আর মৌখিক গালিগালাজের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। স্বয়ং মুহাম্মদ (স:)ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন। নেজাসের কাছে কুরাইশদের প্রেরিত দুজন প্রতিনিধির অন্যতম আমর ইবন আল্-আস, যিনি, আমরা দেখব, অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কা'বায় মুহাম্মদ (স:)-কে অপদস্থ করার একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি যখন প্রদক্ষিণ করছিলেন, কুরাইশ নেতারা কাছাকাছি বসে তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করছিল, 'ওরা এ লোকের কাছ থেকে যেমন ঝামেলার মুখোমুখি হচ্ছে আর কখনও এমনটি ঘটেনি বলে জানাচ্ছিল: ওদের জীবন

ধারাকে তিনি নিবুর্দ্ধিতা বলে ঘোষণা করেছেন, অপমান করেছেন পূর্বপুরুষদের, ওদের ধর্মকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন, সমাজে ভাঙন ধরিয়েছেন এবং ওদের দেবতাদের গালমন্দ করেছেন। ওরা যা সহ্য করেছে তা সকল সহ্য ক্ষমতার অতীত, ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়।' মুহাম্মদ (সঃ) তৃতীয় চক্কর শেষ করার পর, এই রকম সমবেত অভিযোগে চোখ-মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল তাঁর, হঠাৎ থমকে দাঁড়ান তিনি, সমালোচকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন : 'হে কুরাইশগণ, আমার কথা কি তোমরা শুনবে? যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু (জাভ) নিয়ে এসেছি।' একথায় দর্শকরা হতভম্ব হয়ে যায়, মুখ দিয়ে কথা সরছিল না কারও; কিন্তু পরদিন তারা আবার সাহস সঞ্চয় করে উঠল। মুহাম্মদ (সঃ) কা'বায় উপস্থিত হতেই ঝাপিয়ে পড়ল ওরা, তাঁকে ঘিরে হিংস্রভাবে চক্কর দিতে লাগল, তাঁর পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করল। এই সময় বাধা দিয়েছেন আবু বকর, কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেছেন : 'আল্-লাহকে প্রভু বলায় কি কাউকে হত্যা করবে তোমরা?' তখন ওরা তাঁকে রেহাই দিয়েছে। 'তাঁর প্রতি,' উপসংহার টেনেছেন আমর, 'আমার দেখা কুরাইশদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ ছিল এটা।'[২৪] ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হতাশাব্যাঞ্জক ও বিব্রতকর ছিল, কিন্তু হয়রানি অবশ্যই চরম পর্যায়ের ছিল না। কুরাইশরা সহজেই কুণ্ঠিত হয়েছিল, ফলে সহিংসতা প্রতিরোধ করা গেছে।

প্রকৃতপক্ষে এধরনের আচরণ হিতে বিপরীত বলে প্রমাণিত হচ্ছিল, কারণ অনেকেই মুহাম্মদের (সঃ) পক্ষে যোগ দিচ্ছিল। যেমন, আবু জহ্‌ল একদিন বিশেষভাবে মুহাম্মদকে (সঃ) অপমান করলেন, কিন্তু পয়গম্বর তাঁর কথার জবাব দেয়ারও প্রয়োজন মনে না করে বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু সেদিনই, পরে, তাঁর চাচা বীর হামযাহ্ শিকার থেকে ফিরে কা'বায় আসেন, তাঁর পিঠে ধনুক ঝুলছিল। তিনি ছিলেন, ইবন ইসহাক বলছেন, 'কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং একরোখা স্বভাবের।'[২৫] প্রতিদিনের কাজ শেষে একবার কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করা ছিল তাঁর অভ্যাস এবং তারপর কা'বায় উপস্থিত কারও সঙ্গে গল্প করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু ওইদিন একজন মহিলা তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে আবু জাহ্‌ল কিভাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেছে তা জানিয়ে দেন। হামযাহ্ মুসলিম ছিলেন না, কিন্তু একথা কানে যেতেই নিখাদ ক্রোধে চোখজোড়া জ্বলে ওঠে তাঁর। আবু জাহ্‌লের খোঁজে ছুটে গেলেন তিনি, দেখা পেয়েই পিঠে ঝোলানো ধনুক দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন তাঁকে : 'আমি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলেও কি তাঁকে অপমান করবে তুমি?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন। 'পারলে আমাকে পাল্টা আঘাত কর!' আবু জাহ্‌ল তাড়াতাড়ি সঙ্গীসাথীদের নিরস্ত করলেন, হামযাহ্‌কে না ঘাটানোর নির্দেশ দিলেন তাদের। 'কারণ, আল্-লাহর কসম, আমি ওর ভাতুষ্পুত্রকে চরম অপমান করে ফেলেছি,' স্বীকার গেলেন তিনি।[২৬] হামযাহ্‌র ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের প্রভাবিত করেছে, সঙ্গত কারণেই তারা পয়গম্বরকে উত্যক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

তবে কুরানই ইসলাম গ্রহণের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল। ৬১৬ খৃষ্টাব্দে কা'বায় তীর্থযাত্রার সময় গোটা আরব থেকে তীর্থযাত্রীরা যখন মক্কায় উপস্থিত হয় আবু জাহল তখন নগরীর প্রত্যেক প্রবেশ পথে তার সহযোগিদের পাহারায় নিয়োজিত করেছিলেন যাতে মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে দেয়া যায়। আল-তুফায়েল ইবন আমর নামে পশ্চিমের 'দাউস' গোত্রের একজন কবি এবং তীর্থযাত্রী তার শোনা কথায় এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে মুহাম্মদের (স:) বক্তব্য যাতে শুনতে না হয় সেজন্যে কানে তুলা ঠেসে দিয়েছিল। কিন্তু কা'বায় পৌঁছে সে দেখল উপাসনাগৃহের সামনে প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে আছেন মুহাম্মদ (স:), ফলে নিজেকে তার বোকা বোকা ঠেকল। 'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন,' বলেছিল সে, 'আমি একজন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, কবি, ভাল-মন্দের পার্থক্য ঠিকই বুঝি, তাহলে লোকটা কি বলছে শুনলে অসুবিধে কোথায়? যদি ভাল হয় গ্রহণ করব, আর যদি মন্দ হয় প্রত্যাখ্যান করব।' মুহাম্মদকে (স:) অনুসরণ করল সে, পয়গম্বর তার কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা দিলেন তারপর কোরানের কিছু আয়াত আবৃত্তি করলেন। অভিভূত হয়ে পড়ল তুফায়েল : 'আল-ল্লাহর কসম, এমন সুন্দর আর যথাযথ কথা আর কখনও শুনিনি আমি!' চেচিয়ে বলেছে সে।[২৭] আপন গোত্রের কাছে ফিরে গিয়েছিল সে, এবং পরবর্তী কয়েক বছরে নিজ গোত্রের প্রায় সত্তরটি পরিবারকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল।

কোরানের অপরিসীম সৌন্দর্য যেন মানুষের গাম্ভীর্য ভেদ করে ঢুকে পড়ছিল। কান থেকে তুলো সরিয়ে ফেলে স্বেচ্ছায় ভয়ের বাধা দূর করে দিয়েছিল তুফায়েল। অবশ্য অন্যরা দূরে থাকতে পেরেছিল, বাধা রয়ে গিয়েছিল যথাস্থানেই। একদিন কুরাইশরা নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আব্দ শামস্ গোত্রের উত্বা ইবন রাব'ইয়াকে মুহাম্মদ (স:)-এর সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্যে পাঠায়। মুখ বন্ধ রাখতে সম্মত হলে তিনি যা চান : অর্থ, সম্মান-এমনকি ক্ষমতা-সবই দেয়া হবে তাঁকে। এটা সত্যি হয়ে থাকলে বলতে হবে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল : বহু কুরাইশের কাছেই অর্থের পবিত্র মূল্য ছিল এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং রাজার মত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি তাদের ছিল চরম ঘৃণাবোধ। উতবার বক্তব্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন মুহাম্মদ (স:) তারপর বললেন, 'এবার আমার কথা শোন'। ঘাড়ের পেছনে হাত রেখে আরাম করে বসে মুহাম্মদ (স:)-এর মুখে সুরা-৪১ এর আবৃত্তি শুনতে থাকলো উত্বা, যেখানে স্বর্গীয় বাণীর হৃদয়ে প্রবেশ রোধ করতে কোনও কোনও কুরাইশের গড়ে তোলা বাধার বর্ণনা রয়েছে :

> কিন্তু অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে ওরা শুনতে পায়না।
> ওরা বলে, 'তুমি যার দিকে আমাদেরকে ডাকছ সে-সম্পর্কে
> আমাদের হৃদয় আবৃত, কান বন্ধ আর তোমার ও আমাদের মধ্যে এক
> পর্দা রয়েছে...'[২৮]

কোরানে প্রায়ই পর্দার উল্লেখ রয়েছে যা কোরানের আদেশমূলক বাণীর বিরুদ্ধে হৃদয়কে কঠিন করে রাখে। উতবা তখনও আপন গাম্ভীর্য ত্যাগে প্রস্তুত ছিল না। আবৃত্তি শেষ করার পর মুহাম্মদ (স:) যখন সেজদায় অবনত হলেন, যোগ দিল না সে, বরং সিনেটের বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল, বন্ধুরা চট করে বুঝে গেল যে দারুণ এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে উতবা। নিজের কি হয়েছে ব্যাখ্যা করতে কষ্ট হচ্ছিল উতবার, যখন সে বাণীর সৌন্দর্য শ্রবণ করেছে। ব্যাপারটা কেমন যে নয় তাই কেবল বলতে পারছিল সে। আরবদের জানা যেকোনও প্রেরণার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু : কবিতার মত নয়, কোনও যাদুশিল্পীর মন্ত্র-উচ্চারণও নয়, নয় কোনও *কাহিনের* অসংলগ্ন প্রলাপ। এটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক যে মুহাম্মদের (স:) প্রতিপক্ষের কেউ প্রত্যাদেশ নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ তোলেনি : নিশ্চয়ই তাদের ব্যাখ্যার অতীত আশ্চর্যজনক একটা কিছু ঘটছিল। অবশেষে কুরাইশদের সতর্ক করে দিয়ে উত্‌বা বলেছে : 'আমার পরামর্শ শোন, আর আমাকে অনুসরণ করো, ঈশ্বরের দোহাই, এ লোককে একেবারেই ঘাটাতে যেয়োনা, আমি যা শুনেছি তা আগুনের মত চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে।'[২৯]

একটা পর্যায়ে কেউ হয়ত বলতে পারে : মুহাম্মদ (স:) একেবারে নতুন এক সাহিত্য-ধরণ আবিষ্কার করেছিলেন, যার জন্যে কারও কারও প্রস্তুতি ছিল, কিন্তু অন্যরা যাকে অস্বস্তিকর ও বিহ্বলকারী ভেবেছে। এটা এমন নতুন আর এর প্রভাব এত শক্তিশালী ছিল যে এর অস্তিত্বকেই অলৌকিকের মত মনে হয়েছে, মানুষের স্বাভাবিক অর্জনের অতীত কিছু। মুহাম্মদের (স:) শত্রুদের এর মত আরেকটি শব্দ সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, এর অনন্য চরিত্রই অলৌকিক উৎসের প্রমাণ এবং এর আয়াতসমূহ হল 'নিদর্শন' যা ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়।[৩০] এখনও কোরান আবৃত্তির সময় বা মসজিদে রাখা পবিত্র গ্রন্থের সামনে বসলে মুসলিমরা এর রহস্যময় সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। আমরা দেখেছি যে ক্রিশ্চানদের কাছে জেসাস যেমন ঈশ্বরের বাণী তেমনি মুসলিম আধ্যাত্মিকতার বেলায় কোরান মূল বিষয়। পরবর্তীকালে কোনও কোনও মুসলিম দাবী করেছে যে এটা স্বাভাবিক মানবীয় উচ্চারণে 'অনির্মিত বাণী', সেইন্ট জনের গসপেলের ভূমিকার *লগোসের* মত। সুতরাং কোরান গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বর্ণনার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু, এটা তোরাহ্ বা জেসাসের অবতার, বা স্যাক্রামেন্টের প্রতীকের মত একটি প্রতীক, যা অন্য সংস্কৃতির জনগণ আমাদের মাঝে স্বর্গীয় 'নিদর্শনসমূহ' হিসাবে গড়ে তুলেছে।

লিখিত কোনও বিষয়, শিল্পকলা বা কোনও সঙ্গীতের 'প্রকৃত উপস্থিতি' বা দুর্জ্ঞেয়র অনুভূতি সৃষ্টির ধারণাটি সাম্প্রতিক কালে জর্জ স্টেইনার এবং পিটার ফুলারের মত সমালোচকগণকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। ইবন ইসহাক এবং অন্যান্য প্রাথমিক জীবনীকারগণ যখন বলেন যে মনোযোগের সঙ্গে কোরান শুনেছে, তার সংস্কার বা ভয়ের বাধ ভেঙে ইসলাম তার 'হৃদয়ে প্রবেশ করছে' সম্ভবতঃ তখন

বোঝাতে চান, যেমন অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার কথা স্টেইনার তাঁর গ্রন্থ *'রিয়েল প্রেজেন্স : ইজ দেয়ার এনিথিং ইন হোয়াট উই সে?'* -এ বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা যারা কোরানে সৌন্দর্য খুঁজে পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হই, তারা হয়ত বা আমাদের ট্র্যাডিশনের, স্টেইনার যেমন বলেছেন, 'সিরিয়াস শিল্পকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের একাত্মতার' এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যা আমাদের 'অস্তিত্বের গভীর অভ্যন্তরে অনুসন্ধান চালায়।' এমন শিল্পকলা, যুক্তি দেখিয়েছেন স্টেইনার, 'কার্যতঃ আমাদের বলতে চায় : 'তোমার জীবন বদলাও'। এটা দুর্জ্ঞেয় এক মাত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ যা 'আমাদের সতর্ক অস্তিত্বের ছোট কুটিরে' প্রবেশ করে। আমরা যখন একবার এধরনের শিল্পকলার আহবান শুনি, তখন আর এই কুটিরখানা 'আগে যেমন ছিল ঠিক তেমন বসবাসযোগ্য থাকে না'।[৩১] স্টেইনার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, তিনি মনে করেন, এই সন্দেহবাদী বিশ্বে অনেকের কাছেই শিল্পকলাই সম্ভাব্য অতিলৌকিক অভিজ্ঞতার একমাত্র সম্ভাব্যতা প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে তাঁর মতবাদ এবং যেসব মুসলিম মনে করে কোরানের সৌন্দর্যের প্রভাবে তাদের জীবন চিরদিনের জন্যে বদলে গেছে তাদের অভিজ্ঞতার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের মুখোমুখি হবার এইসব বিবরণ একই ধরনের বিপর্যস্ত অনুভূতি, এক ধরনের সজাগতা আর ঋদ্ধ হয়ে ওঠার একটা বিহ্বলতার আভাস দেয় যা সতর্কতার প্রাচীর অতিক্রম করে যায়। স্টেইনারের গ্রন্থটি প্রকাশের পর সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে, যার মানে বইটি বহু পাঠকের অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব ছিল এবং তাঁর মতবাদ আরবীয় এই সাহিত্যকর্মের অসাধারণ প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে সক্ষম। কবি এবং পয়গম্বর হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ) এবং সহিত্যকর্ম ও ধর্মগ্রন্থ হিসাবে কোরান ধর্মীয় ও শিল্পকলার অভিজ্ঞতার নৈকট্যের নিঃসন্দেহে এক অনন্য উদাহরণ।

এই আগ্রাসন বা 'উচ্চারণ', স্টেইনার যেমন বলেছেন, ছাড়া প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের পক্ষে অতীতের সঙ্গে ভীতিকর বিচ্ছেদ ঘটানো, গভীর বিশ্বাস লঙ্ঘন এবং জন্মগত সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। কোরানের সৌন্দর্য তাদের অন্তরের অন্তস্তলের কোনও কিছুর সঙ্গে অনুরণিত হয়েছে এবং এতে বর্ণিত 'নিদর্শনসমূহে'র মত আরও গভীর কিছুর দিকে নির্দেশ করেছে। মুসলিমদের মনের গভীর কুঠুরিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে তা এবং তাদেরকে যুক্তির চেয়েও অনেক গভীর এক স্তরে জীবনকে পরিবর্তিত করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমান কালের মুসলিমরা দাবী করবে আজকের মানুষের ওপর, এমনকি যাদের ভাষা আরবী নয়, তাদের ওপরও এই প্রভাব অব্যাহত রাখার ক্ষমতাই কোরানের অলৌকিকত্বের পরিচায়ক। এভাবে বিশিষ্ট ইরানী পণ্ডিত সাইয়ীদ হোসেইন নসর দেখিয়েছেন যে কোরান আজও মুসলিমদের জীবন পরিবর্তনের আহবান জানায়। বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যহীন আয়াতসমূহ-বিশেষ করে প্রথমদিকের সুরাসমূহ-ঐশ্বরিক বাণীর ভারে মানবীয় ভাষার নিষ্পেষিত হওয়া দেখায় : এবং কোনও ব্যক্তির মাঝের

সামঞ্জস্যহীনতাও প্রকাশ করে। কোরানের অভ্যন্তরীন প্রতীকী অর্থ আবিষ্কার করার জন্যে মুসলিমকে তার জীবনকে সুসংবদ্ধ করতে হয়। কোরান পাঠ বা শোনা তথ্য প্রাপ্তি বা স্পষ্ট নির্দেশনা লাভের মৌখিক অভিজ্ঞতা নয়, বরং এক আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা। অভ্যন্তরীণ অর্থ অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া *তা'উইল* (প্রতীকী ব্যাখ্যা) দাবী করে যে ব্যক্তিকে তার আপন সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আক্ষরিক অর্থে *তা'উইলের* মানে কোনও কিছুকে তার সূচনা বা মূলে নিয়ে যাওয়া এবং কোরান দাবী করে যে মুসলিমরা যখন পবিত্র বাণীর মুখোমুখি হয় তখন তারাও যেন তাদের সত্তার বাইরে (*যাহির*) থেকে গোপন অভ্যন্তরে (*বাতিন*) প্রবেশ করে মূল আবিষ্কার করে।[৩২]

স্বভাবতই পশ্চিমের কোনও ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে। অনুবাদে আরবী ভাষার সৌন্দর্যে প্রবেশ দুঃসাধ্যই কেবল নয়, এই ভাষা এমন এক আবেদন প্রত্যাশা করে যা আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। আরবী ভাষার গুণে আলোড়িত না হয়ে ভাষার অতীত অলৌকিকের সন্ধানে কেবল মৌখিক পাঠে নিজেকে আবদ্ধ রাখাটা হবে হতাশাব্যঞ্জক এক অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে যদি বৈরী চেতনা বা কল্পিত উচ্চাবস্থান-যেমন গিবনের মাঝে আমরা পেয়েছি-থেকে পাঠ করা হয় : এটা সুবিমল অভিজ্ঞতা দেয়ার মত সৃজনশীল, তৈরি মানসিকতা নয়।

৬১৬ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে কোরান সবচেয়ে বিস্ময়কর ধর্মান্তকরনে সক্ষম হয়। মুহাম্মদকে (সঃ) হত্যার উপযুক্ত সময় এসেছে-মনে করে উমর ইবন আল-খাত্তাব তরবারি হাতে মক্কার রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সাফা পর্বতের পাদদেশের এক বাড়ির উদ্দেশে, তিনি জানতেন পয়গম্বর সেখানে বিকেলে অবস্থান করছেন। তাঁর জানা ছিল না যে তাঁর বোন ফাতিমা এবং ফাতিমার স্বামী সাইদ (*হানিফ* যায়েদের পুত্র) ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা উমর আশপাশে নেই ভেবে মুসলিম কামার খাবাব ইবন আল-আরাতকে কোরানের সাম্প্রতিকতম সুরা আবৃত্তি করে শোনানোর জন্যে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনিয়েছেন। কিন্তু সাফা পর্বতের দিকে যাওয়ার সময় একই গোত্রের এক গোপন মুসলিম উমরকে বাধা দেয় এবং তাঁকে বিরত রাখার জন্যে নিজের ঘরে কি ঘটছে দেখার জন্যে ফিরে যেতে বলে। দৌড়ে বাড়ির পথ ধরেন উমর, বাড়ির রাস্তায় পৌঁছে জানালা দিয়ে ভেসে আসা কোরানের বাণী শুনতে পান। 'এসব কি বাজে আলাপ?' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গর্জে উঠেন তিনি। দ্রুত দোতলার একটা ঘরে চলে যান খাবাব, আর এদিকে ফাতিমা ও সা'ইদের ওপর চড়াও হলেন উমর, বোনকে আঘাত করে মেঝেয় ফেলে দিলেন। কিন্তু বোনের রক্ত দেখামাত্র নিশ্চয়ই লজ্জিত বোধ করেছেন তিনি, সে যাহোক, তাঁর চেহারা বদলে গিয়েছিল। তাড়াহুড়োয় খাবাবের ফেলে যাওয়া পাণ্ডুলিপি তুলে নিয়ে সুরা-২০'র সূচনা আয়াতগুলো পড়তে শুরু করেন তিনি, মুষ্টিমেয় যে কজন কুরাইশ লেখাপড়া জানত উমর ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। 'কত সুন্দর আর মহৎ বক্তব্য!' বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন তিনি, এবং তাঁর

হৃদয় জেসাসের উপস্থিতি নয়, বরং কোরানের সৌন্দর্যে তীব্র ঘৃণা আর সংস্কার ভেদ করে ভরে উঠেছিল যা তাঁর অজানা অভ্যন্তরীণ গ্রহণযন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। অবিলম্বে আবার তরবারি হাতে তুলে নিয়েছিলেন উমর, তারপর মক্কার রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে ছুটে গেছেন সাফা পর্বতের দিকে। মুহাম্মদ (স:) যে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন সেখানে সবেগে প্রবেশ করেছেন। আক্রমণই সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিরক্ষা ভেবে মুহাম্মদ (স:) তাঁর চাদর জাপ্টে ধরেছেন 'খাত্তাবের পুত্র, কেন এসেছ তুমি?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। জবাবে উমর বললেন : 'হে ঈশ্বরের পয়গম্বর, আমি আপনার কাছে ঈশ্বর ও তাঁর প্রেরিতপুরুষ এবং তিনি যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এনেছেন তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে এসেছি।'[৩৩] মুহাম্মদ (স:)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এত জোরাল ছিল যে, বিশাল বাড়ির সবাই (যারা আগুয়ান উমরের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন) কি ঘটেছে বুঝে ফেলেছিলেন।

কিন্তু ইবন ইসহাক উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ভিন্ন বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যা উল্লেখের দাবী রাখে। উমর তখন মদ্যপ ছিলেন এবং বাজার এলাকায় বন্ধুদের নিয়ে মদপানে দারুণ উৎসাহী ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় পানের সঙ্গীরা কেউ না আসায় উমর ভাবলেন কা'বাকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করে সময় কাটাবেন। কা'বাগৃহে পৌঁছে দেখলেন মুহাম্মদ (স:) উপাসনালয়ের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে আপনমনে কোরান থেকে আবৃত্তি করছেন। কোরানের বাণী শোনার মনস্থ করলেন তিনি। তো বিশাল গ্রানিট কিউবকে ঢেকে রাখা দামাস্ক-কাপড়ের আড়ালে আড়ালে মুহাম্মদ (স:)-এর অবস্থানের কাছে চলে এলেন। তিনি যেমন বলেছেন : 'কা'বার আচ্ছাদনটুকু ছাড়া আমাদের মাঝখানে আর কিছুই ছিল না'–একটি ছাড়া আর সব প্রতিরক্ষা ধসে পড়েছিল তাঁর। আরবী ভাষার যাদু তার প্রভাব দেখিয়েছে : 'কোরান শোনার পর আমার হৃদয় নরম হয়ে গিয়েছে, আমি কেঁদেছি আর ইসলাম আমার মাঝে প্রবেশ করেছে।'[৩৪]

উমর কখনও কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখার পাত্র ছিলেন না। পরদিন সকালে তিনি চাচার কাছে সংবাদটি পৌঁছে দেয়ার কথা স্থির করেছিলেন–সোজা আবু জাহ্‌লের বাড়ি অর্থাৎ সিংহের আস্তানায় গিয়ে হাজির হন তিনি। 'স্বাগতম, ভাতিজা!' দরজা খুলে আমোদিত সুরে বলে উঠেছিলেন আবু জাহ্‌ল, 'কি উদ্দেশ্যে আগমন?' উমর আমাদের জানাচ্ছেন : 'আমি জবাবে তাঁকে বললাম আমি জানাতে এসেছি যে আমি ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ এবং তিনি যা এনেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি আমার মুখের ওপর দরজা আটকে দিয়ে বলে উঠেছিলেন, "তোমার ওপর, তোমার কথার ওপর অভিশাপ"।'[৩৫] এটা ভাবা কঠিন নয় যে, উমরের ধর্ম পরিবর্তন ছিল সহ্যের অতীত, বিশেষ করে তিনি যেহেতু গোপনে *সালাত* আদায়ে মোটেই সম্মত ছিলেন না বরং সবার সামনে কা'বাগৃহেই নিজেকে উপস্থাপন শুরু করেছিলেন। আবু জাহ্‌ল এবং আবু সুফিয়ান উমরের কর্মকাণ্ড সহ্য করতে পারছিলেন না, কিন্তু কিছু করারও ছিল না তাঁদের, কেননা 'আদি' গোত্রের প্রতিরক্ষা কবচ ছিল তাঁর।

আবু জাহল এবার খাদ্যাভাবে ফেলে মুহাম্মদকে (স:) বশ মানানোর প্রয়াস পেলেন, মুসলিম হুমকির বিরুদ্ধে অন্য সকল গোত্রকে একটা চুক্তিতে উপনীত করে হাশিম ও আল-মুত্তালিব গোত্রের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করলেন তিনি। এদুটো বেআইনী ঘোষিত গোত্রের সঙ্গে কেউ ব্যবসা করতে বা বিবাহ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে না, যার মানে ওদের কাছে কেউ খাদ্যও বিক্রি করতে পারবে না। নিরাপত্তার খাতিরে হাশিম ও আল-মুত্তালিব গোত্রের মুসলিম, অমুসলিম সকল সদস্য আবু তালিবের সড়কে উঠে আসে যার ফলে জায়গাটা একটা ছোটখাট ঘেটোতে পরিণত হয়। মুহাম্মদ (স:) খাদিজা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হলে আবু লাহাব এবং তার পরিবার আব্দ শামসের এলাকার একটি বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। দুবছর স্থায়ী হয়েছিল অবরোধ। আবু তালিব এবং হাশিম ও আল-মুত্তালিব গোত্রের যেসব সদস্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি তারা গোত্রীয় নীতিমালার অংশ হিসাবে তাদের স্বজনদের পরিত্যাগে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু অবরোধ জনপ্রিয় ছিল না, বিশেষ করে যেসব গোত্রের সঙ্গে হাশিম ও আল-মুত্তালিব গোত্রের আত্মীয়তা ছিল তাদের কাছে, তাদের অনাহারে মৃত্যু হোক এটা মেনে নিতে পারছিল না তারা। আবু বকর এবং উমরের মত মুসলিমরা (যাঁরা অবশ্যই ভিন্ন গোত্রের সদস্য ছিলেন) নিয়মিতভাবে ঘেটোতে খাবার ও রসদ পাঠাতেন, যেমনটি পাঠাতেন অন্য আত্মীয় ও বন্ধুরা। হিশাম ইবন আমর নামে একজনের হাশিম গোত্রে বেশ কয়েকজন আত্মীয় ছিল, তিনি রাতের অন্ধকারে একটা উট বোঝাই করে আবু তালিবের সড়কে এনে পশুর পেছনে আঘাত করে উপত্যকার দিকে পাঠিয়ে দিতেন। একবার খাদজির ভাতুষ্পুত্র হাকিম ইবন হিযামকে এক ব্যাগ ময়দাসহ ঘেটোতে যাওয়ার পথে আবু জাহল আটক করেন। অচিরেই দুজনের মাঝে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, দর্শকরা তাতে যোগ দেয়, হাকিমের পক্ষে : আবু জাহল কি কাউকে তার আপন ফুফুর কাছে খাবার নিতে সত্যি সত্যি বাদ সাধবে? তবু আবু জাহল হাকিমকে অগ্রসর হতে দিতে না চাওয়ায় একজন ক্ষিপ্ত পথচারী উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে তাঁকে এত জোরে আঘাত করেছিল যে তিনি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন।

পবিত্র চারমাসের সময় যখন মক্কায় সহিংসতার ওপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকত, তখন মুহাম্মদ (স:) ও মুসলিমরা ঘেটো ছেড়ে বেরিয়ে নিয়মিত কা'বাগৃহে যেতে পারতেন। সেখানে আবার নতুন করে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শিকার হতে হত তাঁকে। আবু লাহাবের স্ত্রী নিজেকে কবি ভাবত, মুহাম্মদ (স:) যখনই তার পাশ দিয়ে যেতেন তখনই চড়া গলায় সে অপমানসূচক কবিতা আবৃত্তি করত। একবার পয়গম্বরের চলার পথে সে কাঁটাঅলা লাকড়ি ছুড়ে দিয়েছিল। সম্ভবতঃ এই সময় সুরা ১১১-সুরা লাহাব–অবতীর্ণ হয় :

> ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত! আর সে নিজে।
> তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনও কাজে আসবে না।

সে জ্বলবে অগ্নি শিখায়, আর তার জ্বালানিভারাক্রান্ত স্ত্রীও,
যার গলায় থাকবে কড়া আঁশের দড়ি।

যারা সারমন অন দ্য মাউন্ট জেনে বেড়ে উঠেছে তাদের কাছে মুহাম্মদের (স:) অপর গাল পেতে না দেয়ার ব্যাপারটা বিসদৃশ ঠেকবে। কিন্তু গসপেলে জেসাস স্বয়ং প্রায়শঃই শত্রুদের বকাঝকা করেছেন। তিনি তাঁর বাণী শুনতে অস্বীকারকারী বেদসেইড ও কোরোযাঈম শহরের ভয়ঙ্কর পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ম্যাথু লিখিত গসপেলে তিনি ফ্যারেসি ও স্যাডুসিসদের বেশ কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন।

কোরানেও এ পর্যায়ে কিছুটা নিরাপোস ভঙ্গির আবির্ভাব ঘটেছিল। ক্রমাগত ঈশ্বরের বাণী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় এখানে মক্কা নগরীর জন্যে বিপর্যয়ের আভাস দিয়ে যাচ্ছিল। দুর্যোগের সময় ইহুদীদের ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল বলে মনে হয়। মুসিলমদের সান্ত্বনা দিতে অতীতের পয়গম্বরদের সম্পর্কে নতুন কাহিনী বর্ণনা শুরু করে যাতে আবিষ্কারের উত্তেজনার ছাপ রয়েছে : এসব কাহিনী 'মোজেসের কাহিনী কি তোমরা শুনেছ?' বা 'তোমরা কি ফেরাউনের কাহিনী জানতে পেরেছ?' ধরনের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অবরোধের সময় মোজেস ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় পয়গম্বর : কোরান বারবার উল্লেখ করেছে যে মোজেস ফেরাউনকে ঈশ্বরের আদেশ মেনে নেয়ার জন্যে সতর্ক করে দিয়েছিলেন কিন্তু মিশরীয়রা শুনতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেজন্যে তারা শাস্তিও পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর–জোসেফ, নোয়াহ, জোনাহ, জ্যাকব, জেসাস–গণও মানুষকে সঠিক পথে চলার জন্যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, একটা ন্যায়বিচার ভিত্তিক দরদী সমাজ গঠন করতে বলেছেন, যদি আসন্ন মহাবিপর্যয় এড়াতে চায়। বাইবেলে উল্লেখ নেই এমন এমন পয়গম্বরদের কথাও কোরানে উল্লেখ আছে : হুদ, শুয়েইব এবং সালিহ্‌কে ঈশ্বর একই রকম বাণী দিয়ে আদ, সিদিয়ান ও তাহমুদের প্রাচীন আরব জনগণের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য তখনও ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে মুহাম্মদ (স:)-এর ধারণা সীমিত। আরবদের সম্মানীয় পয়গম্বর সুলভ ব্যক্তিত্বদের নাম বাইবেলে উল্লিখিত পয়গম্বরদের নামের পাশে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন তাঁরা সমপর্যায়ের। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যেমন দেখেছি, কোরান ন্যায়ভিত্তিক সকল ধর্মকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত মনে করে। ঐশীগ্রন্থধারী পয়গম্বরদের আগমনের ক্রম জানা ছিল না মুহাম্মদ (স:)-এর : তিনি বোধ হয়, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জেসাসের মাতা মরিয়ম এবং মোজেসের বোন মরিয়মকে একই নারী ধরে নিয়েছিলেন। পয়গম্বরদের কাহিনীতে আদি বাইবেলীয় সংস্করণের চেয়ে বরং মুহাম্মদ (স:) এবং মুসলিমদের অবস্থারই প্রতিফলন ছিল বেশি, এভাবে নোয়াহ্‌র কাহিনী আমাদের অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে মক্কার শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে মুহাম্মদের (স:) মতবিরোধ এবং তাঁর পয়গম্বরত্বের ব্যাপারে তাদের উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে :

আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম।
সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়। আল্লাহর উপাসনা করো।
তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই,
তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না!'
তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল
তারা লোকদের বলত, 'এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ,
তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চাচ্ছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে
ফেরেশতাই পাঠাতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে
এমন ঘটেছে আমরা তো তা শুনিনি। এতো এক পাগল,
সুতরাং এর ব্যাপারে কিছু কাল অপেক্ষা করো।'[৩৬]

কিন্তু আমরা যেমন দেখেছি, কোরান এসব কাহিনীকে 'নিদর্শন' হিসাবে দেখে, প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণের অতীত মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের আচরণের বর্ণনা এবং আরবদের চেনাজানা কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে বাণীর মূল কথা বুঝিয়ে দিতে চায়।

নোয়াহকে তাঁর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করার পর আল-লাহ তাঁকে একটা আর্ক তৈরির নির্দেশ দিলেন এবং যারা সতর্ক উচ্চারণে কান দেয়নি তাদের সবাইকে পানিতে নিমজ্জিত করলেন। এ পর্যায়ে শেষ বিচারের দিন কোরানের এক ভীতিকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সত্য পৃথক হয়ে গিয়েছিল অসত্য থেকে এক বিশাল প্রতীকী দৃশ্যপটে, যা 'যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে নিশ্চয় তার জন্যে এর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে নিদর্শন রয়েছে।'[৩৭] কিন্তু কোরান এটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে এই শাস্তি চাপিয়ে দেয়া নয় : যেসব নগরী এবং জাতি পয়গম্বরদের সতর্ক বাণী শোনেনি তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে।[৩৮] মক্কা নগরীও এবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে কেননা কুরাইশরা প্রকৃত আইন অনুযায়ী দরদী সমাজ গঠনের জন্যে তাদের জীবন সংশোধনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

কিন্তু এই সময়ের কোরানের সকল বাণী প্রলয় আর ধ্বংসের কথায় পরিপূর্ণ ছিল না। ক্রমাগত এখানে মুসলিমদের ধৈর্য ধারণ এবং আত্মমর্যাদা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে চলমান দুঃখকষ্ট সহ্য করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত হবে না। অতীতের পয়গম্বরদের কাহিনীগুলো তাদের বিশ্বাস ভয়াবহ কোনও উদ্ভাবন নয় বোঝানোর মাধ্যমে তাদের সান্ত্বনার ব্যবস্থাও করেছে, যদিও তারা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাদের নিজস্ব একটা আধ্যাত্মিক যোগসূত্র রয়েছে যার গোড়াতে রয়েছেন আদি পয়গম্বর আদম, যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। ততদিনে মুহাম্মদের (স:) কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে : তিনি কুরাইশদের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন, এমনকি

যারা আবু জাহলের তুলনায় উন্মাদনায় কম তাদের থেকেও। অবরোধ শুরুর কয়েক দিন পর একটা ছোট প্রতিনিধি দল মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল এই আশায় যে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছা যাবে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন মাখযুম গোত্রের সম্মানীয় ওয়ালিদ, যিনি মৃত্যুর এত নিকটবর্তী ছিলেন যে মুহাম্মদের (স:) হুমকিতে ভয় পাবার কথা ছিল না তাঁর ; দলের অপর তিন সদস্য ছিলেন সাহ্‌ম, আসাদ এবং জুমাহ্‌ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। এই গোত্রগুলো সেই পুরনো হিলফ আল-ফুযুল-এর সদস্য ছিল এবং তারা হয়ত ভেবেছিল অবরোধের ফলে মক্কায় আবু জাহলের ক্ষমতা সুসংহত হয়ে যেতে পারে। তারা সম্ভবত মুহাম্মদের (স:) সুপ্ত ক্ষমতা টের পেয়েছিল্‌ এবং মনে করেছিল যে তিনি হয়ত দুর্বল গোত্রগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবেন।

প্রতিনিধি দল একটা আপোসরফার প্রস্তাব দেয় : মুসলিমরা তাদের ধর্মানুযায়ী আল-ল্লাহ'র উপাসনা করতে পারবে এবং অন্যরা আল-লাত, আল-উয্‌যা এবং মানাতের উপাসনা অব্যাহত রাখতে পারবে। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) আগেই চিন্তাভাবনা করে রেখেছিলেন। তিনি সুরা-১০৯-সুরা কাফিরূনের সাহায্য প্রতিনিধিদলকে জবাব দেন যেখানে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে :

> বলো, 'হে অবিশ্বাসীরা!
> আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর,
> আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও যাঁর উপাসনা আমি করি।
> আর আমি উপাসনাকারী হব না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ;
> আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি।
> তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার!'

দুবছর অব্যাহত অবরোধ চলার পর আকস্মিকভাবে পরিস্থিতি যেন মুহাম্মদ (স:)-এর অনুকূলে আসছে বলে মনে হয়; যেন তাঁর দৃঢ়তা ফলপ্রসু হয়েছে। অবরোধ ক্রমবর্ধমান হারে অজনপ্রিয় হয়ে উঠছিল; রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিতদের মৃত্যুর প্রহর গোণা আরবদের ঐতিহ্যবিরোধী ছিল, ফলে নিয়মিত অবৈধভাবে খাদ্য ও রসদ পাঠানো চলছিল। অবশেষে হাশিম ও আল-মুত্তালিব গোত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত চারজন কুরাইশ অবরোধের অবসান ঘটানোর জন্যে প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আবু তালিবের সড়কে ঘনঘন খাবার বোঝাই উট প্রেরণকারী হাশিম ইবন আমর সমমতাবলম্বী আরও চারজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবু জাহলের ওপর চাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা নিলেন। এঁদের তিনজন– আল-মুতিম ইবন আদি, আবু আল-বখতার ইবন হিশাম এবং সামা ইবন আল-আরওয়াদ– পুরনো হিলফ গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁরা অবরোধের সময়ে মাখযুম, আবু জাহলের গোত্রের মক্কায় প্রভাব বিস্তারের কারণে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

তবে চতুর্থজন—আল-যুহায়ের ইবন আবি উমাঈয়া, আবু তালিবের আত্মীয় ছিলেন ইনি—নিজে মাখযুমাইট থাকায় আলোচনা শুরুর দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁকেই।

নির্দিষ্ট দিনে যুহায়ের একটা লম্বা শাদা জোব্বা গায়ে চাপিয়ে নীরবে কা'বাগৃহকে প্রদক্ষিণ শুরু করলেন। শেষের দিকে সামনে এগিয়ে গিয়ে নগরীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। কেমন করে হাশিম ও আল-মুত্তালিবের এরকম ভোগান্তি বসে বসে দেখছে ওরা? রাগত চেহারায় প্রতিবাদ করেছিলেন আবু জাহল, কিন্তু অন্য তিন সদস্য যুহায়েরের প্রস্তাবের সমর্থনে কথা বলে ওঠেন। অবশেষে মু'তিম অবরোধ শুরুর সময় বিভিন্ন গোত্র স্বাক্ষরিত দলিলটার খোঁজে কা'বাগৃহের দিকে ছুটে যান, এবং কথিত আছে যে সেই পার্চমেন্ট পোকায় খেয়ে ফেলেছে দেখে উপস্থিত জনতা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল—কেবল 'হে আল-লাহ, তোমার নামে!' লেখা অংশটুকুই অক্ষত ছিল। ওরা অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্যে চাপ দিলেন তখন।

মুসলিম সমাজে নিঃসন্দেহে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছে; শুভদিনের সূচনা ঘটেছে বলে মনে হয়েছে সবার। আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত মুসলিমরা এ সংবাদ পেল এবং উসমান ইবন মা'যুম প্রায় তিরিশটি পরিবারসহ মক্কায় ফিরে আসেন, বাকিদের আবু তালিবের ছেলে জা'ফরের দায়িত্বে রেখে আসেন তিনি। কন্যা রুকাইয়াহ্ এবং তাঁর স্বামী উসমান ইবন আফফানের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:) এবং খাদিজা। কিন্তু অভিবাসীরা বেশী আগে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। খাদ্যদ্রব্যের অবৈধ প্রবাহ সত্ত্বেও অবরোধ অনিবার্যভাবে কিছুটা সংকটের জন্ম দিয়েছিল এবং ৬১৯ খৃস্টাব্দের গোড়ায় একটি মৃত্যু মক্কায় মুহাম্মদের (স:) অবস্থান অসম্ভব করে তোলে।

৭. হিজরা : এক নতুন দিক নির্দেশনা

জীবনীকারগণ অনেক সময় ৬১৯ খৃস্টাব্দকে মুহাম্মদ (স:)-এর দুঃখের বছর হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অবরোধের অল্প কিছুদিন পরেই পরলোকগমন করেন খাদিজা : ষাটের কোঠায় ছিল তাঁর বয়স, খাদ্যাভাবে তাঁর স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছিল। তিনি ছিলেন মুহাম্মদের (স:) সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং তাঁর মৃত্যুর পর কেউ সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেননি। এমনকি বিশ্বস্ত আবু বকর বা সুহৃদ উমর পর্যন্ত মুহাম্মদকে (স:) তাঁর মত করে আন্তরিক সমর্থন যোগাতে পারেননি, এই বিয়োগব্যথা নিঃসন্দেহে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আরও একটি মৃত্যু আরও কঠিন পরিণাম ডেকে আনে। আবু তালিব অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে তিনি আর সেরে উঠবেন না। তাঁর মৃত্যুর আগে কুরাইশরা শান্তি প্রতিষ্ঠার শেষ প্রয়াস পায়। যদিও প্রবল চাপ দিয়েছে ওরা, কিন্তু এও জানত যে গোত্রের লোকদের প্রতি অবিচল সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে আসলে একজন প্রকৃত *সায়ীদের* মতই ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি; এবার আবু জাহল একদল প্রতিনিধি নিয়ে তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হলেন সমন্বয় কার্যকর করার অনুরোধ নিয়ে। মুহাম্মদ (স:) যদি ওদের ধর্মকে স্বীকৃতি দেন তাহলে আর তাঁকে ঘাঁটানো হবে না। কিন্তু দুবছর আগেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:) এবং কুরাইশদের জানিয়ে দিয়েছিলেন আল-লাহই একমাত্র ঈশ্বর। মহাক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন আবু জাহলরা, উদ্ধত স্বরে আল-লাহ স্বয়ং মুহাম্মদ (স:) এবং ওঁদের পার্থক্য বিচার করবেন বলতে বলতে বিদায় নেন।

ওঁদের বিদায়ের পর আবু তালিব যখন বললেন যে আপোস প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে ঠিক কাজ করেছেন খুবই অবাক হলেন মুহাম্মদ (স:)। তিনি চাচাকে আরেকটু অগ্রসর হয়ে আল-লাহর কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে আকুল আবেদন জানালেন। কিন্তু আবু তালিব অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন যে এমন একটা ঘোষণা যদি তিনি দেনও তা হবে কেবল মুহাম্মদকে (স:) খুশি করার জন্যে। যেভাবে জীবন যাপন করেছেন সেভাবেই তিনি মরতে চান-পিতৃপুরুষের ধর্ম মেনে। একেবারে শেষ মুহূর্তে অবশ্য আব্বাস লক্ষ্য করেছিলেন মৃত্যুপথযাত্রীর ঠোঁটজোড়া নড়ছে; তখন তিনি মুহাম্মদকে (স:) বলেছেন আবু তালিব সম্ভবত শাহাদা আবৃত্তি করছেন।

কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) মাথা নেড়ে বলেছেন : তিনি জানেন আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি।

হাশিম গোত্রের নতুন প্রধান হয় আবু লাহাব, যা নিঃসন্দেহে মুহাম্মদের (সঃ) পক্ষে প্রতিকূল ছিল, তবে গোড়াতে আবু লাহাব তাঁকে খানিকটা প্রতিরক্ষা দিয়েছিল। এমনটাই তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল, যেহেতু সে-ই এখন গোত্র অধিপতি, তবে সেটা আবু তালিবের প্রতিরক্ষার মত অত কার্যকর ছিল না, কেননা সবাই জানত এর পেছনে আক্রোশ ক্রিয়াশীল ছিল ফলে তারা মুহাম্মদের (সঃ) নতুন অসহায়ত্বের সুযোগ লুফে নেয়। পাড়াপ্রতিবেশীরা একটা ভেড়ার জরায়ু নিয়ে অত্যন্ত বাজে রসিকতা শুরু করেছিল। মুহাম্মদ (সঃ) যখন প্রার্থনারত থাকতেন তখন জঘন্য জিনিসটা দিয়ে তাঁকে আঘাত করত, একজন তো জিনিসটাকে পারিবারিক রান্নার হাড়িতে পর্যন্ত ছুড়ে দিয়েছে। একদিন নগরীতে হাঁটছিলেন মুহাম্মদ (সঃ), এক তরুণ কুরাইশ তাঁর সারা দেহে আবর্জনা ফেলে দিয়েছিল। এ অবস্থায় তিনি বাড়ি ফিরে গেলে তাঁর মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন, কান্নারত অবস্থাতেই ধুয়ে দিয়েছেন তা। 'কেঁদো না, আদরের মেয়ে আমার,' তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন মুহাম্মদ (সঃ), 'কারণ আল-লাহই তোমার বাবাকে রক্ষা করবেন।' কিন্তু তারপরই আবার স্বগত উচ্চারণ করেছেন : 'আবু তালিব বেঁচে থাকতে কুরাইশরা কখনও আমার সঙ্গে এরকম আচরণ করেনি।'[১]

মুহাম্মদের (সঃ) নতুন দুর্বলতা হয়ত অন্যান্য মুসলিমকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন, আবু বকর আক্ষরিক অর্থেই অবরোধের ফলে নিঃস্ব হয়ে যান : তাঁর পুঁজি ৪০,০০০ দিরহাম থেকে মাত্র ৫,০০০ দিরাহামে নেমে আসে। তিনি জুমাহ্ গোত্রের এলাকায় বাস করতেন, এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে তাঁর সঙ্গে গোত্র প্রধান স্থূলকায় উমাঈয়াহ্ ইবন খালাফের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। উমাঈয়াহ তার দাস বিলালকে খালি গায়ে প্রখর রোদে শুইয়ে রাখত-নির্যাতনের গোড়ার দিকে, কিন্তু এবার সেই একই আচরণ আবু বকরের প্রতিও করার ক্ষমতা আছে বলে ভাবতে শুরু করেছিল, অথচ আবু বকর ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যবসায়ী। আবু বকর এবং তাঁর চাচাত ভাই তরুণ তালহাকে ওরকম অপমানজনক ভঙ্গিতে প্রখর তাপে একসঙ্গে বেঁধে ফেলে রাখতে শুরু করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ওদের গোত্র তাঈমের আর আবু বকরকে রক্ষা করার ইচ্ছা নেই, ফলে তিনি বুঝে ফেলেন মক্কায় তাঁর আগামীদিনগুলো সুবিধার হবে না। মুহাম্মদ (সঃ)-এর আশীর্বাদ নিয়ে তিনি মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুসলিমদের সঙ্গে যোগ দিতে রওনা হয়ে যান। কিন্তু পথে ছোট যাযাবর গোত্রের (আহাবিশ নামে পরিচিত) প্রধান ইবন দাঘুমার সামান-সামনি পড়ে যান তিনি, এই গোত্রটি কুরাইশদের মিত্র ছিল। আবু বকরকে আক্ষরিক অর্থে মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে জানতে পেরে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে দাঘুমা, সে আবার প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি স্বয়ং আবু বকরের নিরাপত্তা দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। খুশি মনে সায় দেন আবু বকর,

ইবন দাঘুমাকে খেপানোর বিরোধী কুরাইশরা পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, তবে তারা বেদুঈন সর্দারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল যে আবু বকর যেন প্রকাশ্যে প্রার্থনা বা কোরান আবৃত্তি না করেন সেটা নিশ্চিত করার জন্যে। তিনি ক্যারিশম্যাটিক মানুষ, ব্যাখ্যা করেছে তারা, ফলে তরুণ প্রজন্মকে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগে প্রলুব্ধ করে ফেলতে পারবেন। এসব শর্ত মানতে সম্মত হয় ইবন দাঘুমা, আবু বকর নিজ বাড়িতে একান্তে প্রার্থনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু অন্যরা মাথা নত করতে অস্বীকার করেন। সাধু উসমান ইবন মা'যুম ছিলেন মাখযুম গোত্রের সদস্য, ওয়ালিদের শক্তিশালী ও কার্যকর নিরাপত্তা ভোগ করছিলেন তিনি, কিন্তু অন্যরা যখন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে তখন নিজে নিরাপদে থাকাটা সহ্য করতে পারছিলেন না, সুতরাং তিনি ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বৃদ্ধকে স্পষ্ট অবাক করে দিয়ে তার নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। একে পাপের প্রায়শ্চিত্তের চমৎকার একটা সুযোগ মনে হয়েছিল, তবে মুসলিম ধর্মানুরাগের চেয়ে বরং অধিকতর খৃস্টীয় ব্যাপার ছিল এটা। রোমান নির্যাতনের সময় কোনও কোনও ক্রিশ্চান শহীদী মর্যাদা পারার আশায় স্বেচ্ছায় কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে দিত, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) এধরনের কার্যক্রমে অনুমোদন দেননি। আরব ঐতিহ্যেরও পরিপন্থী ছিল এটা : অতিরিক্ত ঝুঁকি এবং দুর্ভোগ ছাড়াই আরব বিশ্বে জীবন ধারণ খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। অল্প কিছু দিন পরে সে কালের শ্রেষ্ঠ আরব কবি লাবিদ ইবন রাবিআর উদ্যোগে আয়োজিত এক কবিতা পাঠের আসরে যোগ দিতে যান উসমান। লাবিদ মক্কানগরী সফরে আসায় অত্যন্ত খুশি হয়েছিল কুরাইশরা, কিন্তু উসমান তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলতে শুরু করলে তারা হতবিহবল হয়ে যায়। লাবিদ যখন আবৃত্তি করলেন : 'আল্-লাহ ছাড়া আর সবই অর্থহীন,' উসমান চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক!' কিন্তু লাবিদ যখন খেই ধরলেন, 'এবং সুন্দর সবকিছুই অনিবার্যভাবে শেষ হয়ে যাবে,' উসমান চিৎকার করে উঠলেন, 'মিথ্যা কথা! বেহেশতের আনন্দ কখনও শেষ হবার নয়।' সম্মানিত অতিথির প্রতি এ আচরণ সহ্যের অতীত ছিল, গভীর অসম্মানবোধ করলেন লাবিদ। 'হে কুরাইশগণ,' বললেন তিনি, 'তোমাদের বন্ধুকে আগে কখনও এভাবে খেপে উঠতে দেখা যায়নি। কবে থেকে তোমাদের মাঝে এরকম ঘটতে শুরু করেছে?' 'ওর কথায় কান দেবেন না,' দর্শকদের মাঝে কেউ একজন জোর গলায় বলে উঠেছিল তখন। 'ওই লোক মুহাম্মদের (স:) একজন অসভ্য সঙ্গী। ওরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে।' কিন্তু উসমান তখন এতই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন যে সেই একই লোক উঠে তাঁকে চোখের ওপর একটা ঘুসি মেরে বসেছিল। প্রবীন সজ্জন ওয়ালিদ এমন একটা দৃশ্য দেখে নিঃসন্দেহে হতাশ হয়েছিলেন, তিনি ডেকে বলেছিলেন, 'আমার ভাতুষ্পুত্র, আমার হেফাযতে যদি থাকতে তাহলে আজ তোমার চোখে আঘাতটা লাগত না।' কিন্তু উসমান আগ্রাসী চেহারায় অপর গাল পেতে দিয়ে অন্য চোখে আঘাত হানার

জন্যে চ্যালেঞ্জ করলেন।[2] এই অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)। এ ধরনের অসৌজন্যতা তাঁর অনুমোদন পাওয়ার কথা নয়, এবং নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন যে আর যাহোক এধরনের উস্কানি প্রদানের প্রয়োজন তাঁর নেই।

কিন্তু সঙ্কট তৈরি হল এরপর। আবু জাহলের কুপ্ররোচনায় আবু লাহাব মুহাম্মদ (স:)-এর কাছে জানতে চাইল তাঁর বাবা আব্দ আল-মুত্তালিব যিনি মুহাম্মদকে (স:) ভালবাসতেন এবং ছোটকাল থেকেই তাঁকে নিয়ে গর্ব করতেন, তাঁর নরকবাস হয়েছে কিনা। কৌশলী প্রশ্ন ছিল এটা। সত্য ধর্মাম্বলীরাই রক্ষা পাবে, এই ইহুদী-ক্রিশ্চান ভাবধারা গ্রহণ করেছিলেন মুহাম্মদ (স:)। এ ধরনের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাবার জন্যে ইদানীংকালের একেশ্বরবাদীরা যেসব চমৎকার উদার উত্তর খাড়া করেছে সেগুলোর কোনওটাই তখন তাঁর নখদর্পনে ছিল না। যদি তিনি বলতেন যে প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম আব্দ আল-মুত্তালিবের মত ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে পারবে, কুরাইশরা স্বভাবতঃই জবাব দিত তাহলে এ ধর্মের বিনাশ ঘটানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আবার যদি বলতেন যে আব্দ আল-মুত্তালিব উদ্ধার পাননি, তাহলে আবু লাহাব একজন শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষের স্মৃতির প্রতি অসম্মান জানানোর কারণে প্রটেকশন প্রত্যাহার করে নিতে পারত।

একটা নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), এবং আল-লাতের নগরীর তায়েফে সেই সন্ধান তাঁর মরিয়া অবস্থার প্রকাশ করে। মক্কার মত তায়েফও ব্যাবসা-বাণিজ্য নগরী ছিল, যদিও অতটা সফল নয়। তবে আরবের অধিকতর উর্বর অঞ্চলে ছিল এর অবস্থান। মুহাম্মদ (স:) যখন পাহাড়ের গায়ে দেয়াল ঘেরা নগরীর দিকে যাচ্ছিলেন তখন হয়ত মনোলোভা বাগান, আঙুর খেত আর ভুট্টার খেতের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হয়েছে তাঁকে। আব্দ শামস এবং হাশিম, তাঁর আপন গোত্রের বেশ কিছু সদস্যের তায়েফে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ ভিলা ছিল, ফলে মুহাম্মদের (স:) হয়ত সেখানে যোগাযোগ করার মত লোক ছিল। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ছিল গোটা ব্যাপারটা, কেননা প্রাচীন উপাসনাগৃহের হেফাযতকারী সাকিফরা আল্-লাতের ধর্মকে অস্বীকার করায় মুহাম্মদের (স:)-এর ওপর অসন্তুষ্ট ছিল বোধ হয়। তিনি তিন সাকিফ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে আপন ধর্ম গ্রহণের আহবান জানানোর পাশাপাশি তাঁকে নিরাপত্তা দেয়ার আহবান জানালেন। কিন্তু সাড়া তো পেলেনই না বরং অপমানিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে তিন সাকিফ এমন একটা প্রস্তাব উত্থাপনে মুহাম্মদের (স:) ধৃষ্ঠতায় এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে তাঁকে দাসদের দিয়ে রাস্তায় ধাওয়া করিয়েছিল তারা।

মবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে একটা ফলের বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুহাম্মদ (স:), বাগানের মালিক ছিল উতবা ইবন রাবিআ এবং তার ভাই শায়বা; তখন ওরা দুজনেই বাগানে বসেছিল এবং গোটা ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করে। মক্কায় মোহাম্মদের (স:) বিরোধিতার ক্ষেত্রে প্রথম কাতারে থাকলেও ওরা দুজনেই

সুবিবেচক মানুষ ছিল বলে একজন কুরাইশের এমন অমর্যাদাকর পলায়নে হতাশ বোধ করেছে। এক দাস কিশোরকে এক প্লেট আঙুরসহ মুহাম্মদের (স:) কাছে পাঠায় তারা। বাগানে আত্মগোপনরত অবস্থায় মুহাম্মদের (স:) মনে হয়েছিল তাঁর সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। ওই মুহূর্তে খাদিজার অভাব গভীরভাবে অনুভব করলেন তিনি : এধরনের দুঃখ ভুলিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ছিল খাদিজার, তাঁর পরামর্শের অভাবও প্রবলভাবে বোধ করেছেন মুহাম্মদ (স:)। বিপদের সময় কোনও দেবতা বা *জিনের* কাছে আশ্রয় নেয়ার রীতি ছিল আরব বিশ্বে, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) আশ্রয় নিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে :

> হে আল্-লাহ্, তোমার কাছে আমি আমার দুর্বলতার কথা বলছি এবং মানুষের নিকট আমি যে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছি তার অভিযোগ আনছি। হে মহান দয়ালু প্রভু, সকল দুর্বলের প্রতিপালক তুমি এবং আমারও প্রতিপালক। হে প্রভু, তুমি কাদের হাতে আমাকে সমর্পণ করেছ? এমন কোন নিষ্ঠুরের হাতে যে আমাকে নিষ্পেষণ করবে অথবা এমন কোন নিষ্ঠুরের হাতে যে আমাকে নির্যাতন করবার অধিকার পেয়েছে? এতে আমি মোটেই বিচলিত নই। তুমি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ো না। তোমার সহায়তা, তোমার শান্তি এবং তোমার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে আমি আশ্রয় পেতে চাই যেন পৃথিবীর সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়। তোমার পবিত্র যে আলো যে আলোতে ইহকাল ও পরকাল আলোকিত হচ্ছে সেই আলোর দোহাই আমি তোমাকে দিচ্ছি, তুমি আমার ওপর তোমার অসন্তুষ্টি অবতরণ করো না। একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি সাধন করাই আমার কর্তব্য। তোমার সাহায্য ব্যতীত পাপ এবং অপরাধ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং তোমার ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করার কোন শক্তি আমার নেই।[৪]

মুহাম্মদের (স:) মানসিক অবস্থার এমন ঘনিষ্ঠ বিবরণ প্রদান ইবন ইসহাকের বেলায় কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা সঙ্কট মুহূর্তের আভাস পাওয়া যায়। তিনি আর মানুষের সাহচর্যে আস্থা রাখতে পারছেন না এবং উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন যে আল্-লাহ্ ছাড়া আর কোনও প্রভু, নিরাপত্তা বা প্রকৃত 'রক্ষকর্তা' নেই।

ঈশ্বর যেন অবিলম্বে একটা নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন : কিশোর দাস আদ্দাস যখন আঙুরের প্লেট নিয়ে এল। বর্তমান ইরাকের নিনেভেহ্র ক্রিশ্চান ছিল আদ্দাস, এই আরবকে খাদ্য গ্রহণের আগে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে। আদ্দাস নিনেভেহ্ থেকে এসেছে জানতে পেরে যুগপৎ বিস্মিত ও খুশি হলেন মুহাম্মদ (স:)। নিনেভেহ্ ছিল পয়গম্বর জোনাহ্র শহর। আদ্দাসের কাছে পয়গম্বর হিসাবে পরিচয় দিলেন তিনি, বললেন তিনি জোনাহ্র ভাইও বটে। আদ্দাস এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে পয়গম্বরের কপাল,

হাত আর পায়ে চুম্বন করেছে সে, পুরো ঘটনাটা দেখছিল উতবা এবং শায়বা, অত্যন্ত রুষ্ট হয় তারা : তরুণদের ওপর মুহাম্মদের (স:) অসাধারণ প্রভাবের আরেকটা নজীর এটা। *আহল আল্-কিতাবের* এক সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে মুহাম্মদের (স:) বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি কমে এসেছিল; নিজের পয়গম্বরত্বের দাবী আরব জগতের বাইরের সকলে অনুধাবন করতে পারবে এটাও আবার বুঝতে পেরেছেন তিনি– হিজাজের আরবরা যদি বুঝতে নাও পারে। বাড়ি ফেরার পথে, কথিত আছে, তাঁর কণ্ঠে কোরান আবৃত্তি শুনে এর সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল একদল *জিন*।[৫]

কিন্তু 'আল্-লাহ'র কাছে আশ্রয় নেয়ার মানে এই নয় যে মুহাম্মদ (স:) মানুষের দেয়া আশ্রয় অবজ্ঞা করতে পারেন। কোরান পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে প্রত্যেক মুসলিম নিজেকে রক্ষা করার সবরকম প্রয়াস পাবে, এটাই প্রত্যাশিত; অলসভাবে ঈশ্বরের হাতে সব কিছু ছেড়ে দেয়া যাবে না : 'আল্লাহ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে'[৬] এই আয়াতটি আজকাল রাজনৈতিক সংগ্রামরত মুসলিমরা উদ্ধৃত করতে পছন্দ করে। নগরীতে প্রবেশ করার আগে মুহাম্মদ (স:) অপর তিনটি গোত্রের প্রধানদের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁকে একজন কনফেডারেট হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে। তিনি পালিয়ে তায়েফে যাবার চেষ্টা করেছেন, এখবর কুরাইশরা একবার জেনে ফেললে নগরীতে তাঁর অবস্থান আরও নাজুক হয়ে পড়ত। যে তিন প্রধানের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন তাদের মধ্যে দুজন–যুহরা গোত্রের আখনাস ইবন শারিক এবং আমির গোত্রের সুহায়েল ইবন আমির–গোত্রীয় নীতিমালার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,[৭] কিন্তু তৃতীয় জন নওফল গোত্রের মু'তিম, যিনি অবরোধ প্রত্যাহারের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন মুহাম্মদকে (স:) নিরাপত্তা দান করেন এবং তিনি নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

এটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী কোনও সমাধান ছিল না, এবং এসময়ে বাৎসরিক হজ্জ অনুষ্ঠানে আগত বেদুঈনদের মাঝে ধর্ম প্রচার শুরু করেন মুহাম্মদ (স:), ওদের মাঝে অধিকতর স্থায়ী একজন আশ্রয়দাতার সন্ধান লাভের আশা করছিলেন। কিন্তু শুরুতে বেদুঈনরা বৈরী ভাবাপন্ন ছিল, অপমান করেছে তাঁকে এবং মুহাম্মদের (স:) ধর্মে তাদের কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। সময়টা ছিল খুবই হতাশাব্যাঞ্জক, কিন্তু যেহেতু মুহাম্মদ (স:) তাঁর আদি ধারণা থেকে অনেকখানি সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নিজস্ব স্বাভাবিক ক্ষমতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃই সেকারণেই ৬২০ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

আলী এবং জা'ফরের বোন, মুহাম্মদের (স:) চাচাত বোন উম্ম হানির বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি, কা'বাগৃহের কাছেই ছিল তাঁর বাড়ি, তো মাঝরাতে ঘুম

থেকে উঠে কোরান আবৃত্তি করবেন বলে সেখানে চলে গেলেন তিনি। পরে উপাসনাগৃহের উত্তর-পশ্চিমের একটা ঘেরাও দেয়া জায়গা *হিজর-এ* ঘুমোনোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তাঁর মনে হল জিব্রাইল তাঁকে ডেকে তুলেছেন, বুরাক নামের এক স্বর্গীয় বাহনে চড়িয়ে অলৌকিকভাবে রাতের অন্ধকারে জেরুজালেমে নিয়ে গেছেন, কোরানে যাকে বলা হচ্ছে *আল-মসজিদুল-আকসা* : দূরের মসজিদ।[৮] এই রাত্রিযাত্রার (*ইসরা*) পর, মুহাম্মদ (স:) এবং জিব্রাইল টেম্পল মাউন্টে অবতরণ করেন, অব্রাহাম, মোজেস, জেসাসসহ অন্য পয়গম্বরগণ স্বাগত জানান তাঁদের। একসঙ্গে প্রার্থনা করেন তাঁরা এবং মুহাম্মদ (স:)-এর কাছে পানি, দুধ ও মদভর্তি তিনটি পাত্র নিয়ে আসা হয়। দুধ ভর্তি পাত্র বেছে নেন মুহাম্মদ (স:)। মুহাম্মদের (স:) কঠোর সাধনা আর চরম ভাববাদীতার মাঝামাঝি একটা পথ গ্রহণ করার ইসলামি প্রয়াসের প্রতীক ছিল এটা। এরপর একটা মই (*মিরাজ*) আনা হয় এবং মুহাম্মদ (স:) ও জিব্রাইল সাত আকাশের প্রথমটিতে আরোহন করেন এবং তারপর ঈশ্বরের আসনের দিকে উর্ধ্বারোহন শুরু করেন। একেক স্তরে একেকজন মহান পয়গম্বরের দেখা পান তিনি : প্রথম আকাশের দায়িত্ব ছিলেন আদম, এখানে নরকের একটা দৃশ্য দেখান হয় মুহাম্মদকে (স:); দ্বিতীয় আকাশে ছিলেন জেসাস এবং ব্যাপ্টিস্ট জন; তৃতীয়টিতে জোসেফ ; চার নম্বরে ইনখ: আরন আর মোজেস পঞ্চম ও ষষ্ঠে এবং সবশেষে সপ্তম আকাশে ছিলেন অব্রাহাম, স্বর্গীয় স্তরের দোরগোড়া সেটা।

এই পরম অবলোকনের ঘটনাটিকে ইবন ইসহাক শ্রদ্ধার সঙ্গে অস্পষ্ট রেখেছেন, তবে এই অভিজ্ঞতার পেছনে প্রকৃত কারণ বর্ণনাকারী একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তিনি, যদিও মনে হয় যে এটা মুহাম্মদের (স:) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, কারণ কোরানে অর্ন্তভুক্তির জন্যে এখানে কোনও প্রত্যাদেশ নেই। ঈশ্বরের আসনের কাছাকাছি পৌছার পর ঈশ্বর মুহাম্মদকে (স:) বলেন মুসলিমদের প্রতিদিন অবশ্যই পঞ্চাশবার *সালাত* আদায় করতে হবে, কিন্তু তিনি যখন ফিরে আসছেন, মোজেস তাঁকে *সালাতের* সংখ্যা কমিয়ে আনতে বললেন। মোজেস বারবার মুহাম্মদকে (স:) ফেরত পাঠাতে লাগলেন, এভাবে *সালাতের* নির্দিষ্ট সংখ্যা পাঁচে হ্রাস পেল, এই সংখ্যাও তাঁর কাছে বেশি বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু আরও কমানোর আবেদন জানাতে সঙ্কোচ বোধ করলেন মুহাম্মদ (স:)। মুহাম্মদ (স:)-এর পরলোকগমনের পর মুসলিমরা ঠিকই দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করছে এবং এই বিবরণে বোঝা যায় মানুষের ওপর বোঝা হতে চায়নি এ ধর্ম, বরং এটা একটি সহনীয় আইন যা সবার পক্ষে পালন করা সম্ভব।[৯]

ইসলামের আধ্যাত্মিকতার বিবর্তনে এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রতি বছর ২৭ রজব তারিখে, চান্দ্র মাসের সপ্তম মাস, এ রাতটি পালন করা হয় এবং শত শত বছর ধরে সাধক, দার্শনিক এবং কবিগণ এর তাৎপর্য নিয়ে বহু চিন্তাভাবনা করে আসছেন। এমনকি পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যে এর প্রবেশ ঘটেছে, কারণ

মুহাম্মদের (স:) উর্ধ্বাকাশে আরোহনের *মিরাজের* মুসলিম বিবরণ *দ্য ডিভাইন কমেডিতে* দান্তের দেয়া স্বর্গ, নরক এবং এর মধ্যবর্তী জায়গায় তাঁর কাল্পনিক যাত্রার বর্ণনাকে প্রভাবিত করেছে, যদিও আমরা দেখেছি, প্রচলিত পাশ্চাত্য বিকারসহ, তিনি পয়গম্বরকে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে দেখিয়েছেন। সুফিগণ বিশেষভাবে এই অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহী, তারা বিশ্বাস করেন কোরানের ৫৩ নম্বর সুরায় মুহাম্মদ (স:)-এর পরম অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে :

> নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,
> শেষ সীমান্তে অবস্থিত সিদরা গাছের নিকট;
> যার কাছেই ছিল জান্নাতুল মাওয়া (আশ্রয়-উদ্যান)।
> তখন সিদরা গাছ ছেয়েছিল যা দিয়ে ছেয়ে থাকে।
> তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি বা দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।
> সে তার মহান প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো নিশ্চয় দেখেছিল।[১০]

হিন্দু বিশ্বাস মতে লোত গাছ মানবীয় জ্ঞানের সীমারেখা নির্দেশ করে। কোরান স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে মুহাম্মদ (স:) ঈশ্বরের নির্দশনসমূহের একটিকে দেখেছিলেন, স্বয়ং ঈশ্বরকে নয়; এবং পরে এই অভিজ্ঞতার বৈপরীত্যের প্রতি জোর দিয়েছেন, যেখানে মুহাম্মদ (স:) একাধারে স্বর্গীয় সত্তাকে দেখেছেন আবার দেখেননি ।[১১]

সুফিগণ এই ঘটনায় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছার এক নতুন পথনির্মাণের নায়ক হিসাবে মুহাম্মদকে (স:) বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মের সাধকদের অভিজ্ঞতার খুব কাছাকাছি একটা অভিজ্ঞতা। ত্রয়োদশ শতকের পারস্যের মহাকবি ফরিদ উদ-দীন আত্তারের বর্ণনায় আমরা জন অব দ্য ক্রসের চেতনার সাদৃশ্য-খুঁজে পাই, যিনি আমাদের সকল মানবীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতা পেছনে ফেলে, কোরানে উল্লিখিত সিদরা গাছ, সাধারণ মানুষের জাগতিক জ্ঞানের সীমার বাইরে যাবার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন : এমনকি জিব্রাইলও ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গী হতে পারেননি। স্বাভাবিক ধারণা, যুক্তি এবং যৌক্তিকতার অতীতে যাওয়ার ফলে মুহাম্মদ (স:) অভিজ্ঞতার এক নতুন জগতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও আপনাকে পেছনে ফেলে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে তাঁকে।

> এক আহবান শুনেছিলেন তিনি, বন্ধুর কাছ থেকে এক বাণী।
> সর্ব সত্তার মূল থেকে এসেছিল এক আহবান :
> 'নশ্বর দেহ এবং আত্মা পেছনে ফেলে এস!
> তুমি, আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এবার প্রবেশ করো
> এবং প্রত্যক্ষ করো সামনাসামনি আমার অস্তিত্ব, বন্ধু আমার!'

মহা বিস্ময়ে বাকরহিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, বিস্মৃত হয়েছিলেন নিজেকে–
মুহাম্মদ জানতেন না যে মুহাম্মদ এখানে,
নিজেকে দেখননি তিনি–দেখেছেন আত্মাসমূহের আত্মাকে,
বিশ্বজগতের স্রষ্টার পবিত্র মুখমণ্ডল দেখেছেন তিনি।[১২]

এই অভিজ্ঞতার উদাহরণ রয়েছে সকল প্রধান অতীন্দ্রিয় ট্র্যাডিশনে : ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখার পর কারও পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়–এই বিশ্বাসের এক প্রকাশ। কিন্তু নিজের মাঝে মৃত্যু বরণ করে এবং বিনাশের অভিজ্ঞতার অর্জনের মাধ্যমে মুহাম্মদ (স:) এক বর্ধিত সত্তায় স্থাপিত হয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ফিরিয়ে এনেছেন এবং স্বর্গের জন্যে মানবীয় ক্ষমতাকে প্রসারিত করেছেন। ইসলামের অতীন্দ্রিয় দিকের একটি উদাহরণে পরিণত হয়েছে *মিরাজ* : সুফিগণ সবসময় ঈশ্বরের মাঝে বিলোপ (*ফানা*)-এর কথা বলেন যার পরবর্তী ধাপে রয়েছে এর পুনরুত্থান (*বাকা*) এবং বর্ধিত আত্ম-উপলব্ধি।

কিছু কিছু মুসলিম সবসময় দাবী করে আসছে যে ঈশ্বরের আসন অভিমুখে মুহাম্মদ (স:)-এর যাত্রা শারীরিক ছিল, কিন্তু ইবন ইসহাক আয়েশার একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যেখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে রাত্রি-ভ্রমণ এবং উর্ধ্বারোহন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। আমরা একে যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনেরই একটা অংশ এবং বেশির ভাগ ধর্মের ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্যভাবে একই রকম। বৌদ্ধরা পরমসত্তার নৈকট্য এবং চেতনার প্রসার লাভকে অলৌকিক না বলে একেবারে স্বাভাবিক একটা অবস্থা বলে দাবী করে। মনে হয় চরম অবস্থায় পতিত হলে মানুষের চেতনাবোধ এই সঙ্কটকে বর্ণনার জন্যে একটা বিশেষ পরিস্থিতি বা আধ্যাত্মিক/কাল্পনিক দৃশ্যপট তৈরি করে নেয়–একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষিতে, মানুষ যখন শারীরিকভাবে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়, তখন সবাই যেন এই অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়ার ক্ষেত্রে একই বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করে : দীর্ঘ একটা পথ পাড়ি দেয়ার পর কোনও এক প্রবেশ পথে এমন একজনের দেখা মেলে যে তাদেরকে ফিরে আসতে বলছে, ইত্যাদি। সকল ধর্মে কিছু কিছু নারী-পুরুষের কাছে এধরনের বিশেষ ক্ষমতা থাকে এবং তারা বিশেষ কিছু নিয়মকানুন ও কৌশলের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা সমূহ– কৌশলসমূহ কিন্তু সমরূপ-রূপ্ত করে থাকে। মুসলিম লেখকদের বর্ণিত মুহাম্মদের (স:) *মিরাজ* ইহুদী ধর্ম বিশ্বাসের থ্রোন মিস্টিসিজম-এর অভিজ্ঞতার খুব কাছাকাছি যা খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে দশম শতক পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। একাজে দক্ষ ব্যক্তিরা বিশেষ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ও ঈশ্বরের সিংহাসনের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করে নিত। তারা উপবাস করত, বিশেষ ধরনের ধর্মীয় সংগীত পাঠ করত যা মনের একাগ্রতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিশেষ শারীরিক কৌশল প্রয়োগ

করত। প্রায়ই যেন তারা হাঁটু দিয়ে মাথা চেপে ধরত যেমন কোনও কোনও মুসলিম বিবরণে মুহাম্মদ (স:) করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে : অন্যান্য ধর্মমতে শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তারা মুসলিমদের মত ঈশ্বরের আসন অভিমুখে আরোহনের অভিজ্ঞতা অর্জন করত, এমন এক পরম দৃশ্যের বর্ণনা দিত যাতে এর অবিচ্ছেদ্য অলৌকিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হত। এই ধর্ম বিশ্বাসের সাধুগণও তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের মহামানব হিসাবে বিবেচনা করে যাঁরা ঈশ্বরের কাছে পৌছার নতুন পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিপদের ঝুকি বহন করেছেন।

ইসরা এবং *মিরাজের* কিছু কিছু বিষয় মানুষের এক ধরনের জীবনধারা থেকে ভিন্ন জীবন ধারায় কষ্টকর পরিবর্তনের অলৌকিক অভিজ্ঞতার বেশ কাছাকাছি। এটা, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২০৩ সালে সেভেরাসের নির্যাতনের সময় কার্থেজে মৃত্যুবরণকারী ক্রিশ্চান শহীদ তরুণী মেট্রন পারপেচুয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর জনৈক রিডাক্টর কর্তৃক সম্পাদিত *দ্য অ্যাকটস অব পারপেচুয়া অ্যান্ড ফেলিসিটাসকে* অধিকাংশ পণ্ডিতগণ সত্যি বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা আমাদের বলছেন পারপেচুয়া যখন কারোগারে বিচারের অপেক্ষা করছেন তখন তাঁর সঙ্গীরা তাকে অনুরোধ জানান ঈশ্বরের কাছে কোনও আদেশ প্রার্থনা করার যাতে তাঁরা সত্যিই মৃত্যুবরণ করবেন কিনা বোঝা যায়। পারপেচুয়াকে অনুরোধ জানানোর কারণ তাঁর বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রতিভার সুনাম সুবিদিত ছিল। তিনি পরদিন একটা জবাব জানানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি অবচেতন মনে মনের একাগ্রতা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন, অনেকটা আজকাল যেমন অ্যানালিস্যান্ডরা তাদের থেরাপিস্টদের জন্যে ভবিষ্যৎসূচক স্বপ্নের যোগান দেন।[১৩] নিঃসঙ্গ সেরাতে পারপেচুয়া স্বপ্নে দেখলেন একটা মই আকাশের দিকে উঠে গেছে [মুহাম্মদের (স:) *মিরাজের* মত] ; উর্ধ্বারোহন ছিল খুবই বিপজনক, একবার তাঁর মনে হয়েছে বুঝি ওপরে উঠতে পারবেন না, কিন্তু সঙ্গীদের অনুপ্রেরণায় প্রানান্ত প্রয়াস চালালেন তিনি এবং নিজেকে এক অপরূপ বিশাল বাগানে আবিষ্কার করলেন। এক রাখাল সেখানে ভেড়ার দুধ দোহাচ্ছিল, তাঁকে খানিকটা দই দিয়েছিল সে: ঘুম ভাঙার পর পারপেচুয়া দেখলেন তখনও তিনি 'দুর্বোধ্য মিষ্টি কিছু চাবাচ্ছেন'। তখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি নির্ঘাৎ মারা যাবেন, কারাগারে আটক তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে তিনি তখন বললেন, 'এ জগতে আর তার আশা নেই।'[১৪] আরও কয়েকবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি যা সঙ্গীদের জানিয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় তিনি অবচেতন মনে আসন্ন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং নিজেকে কেবল অনন্ত জীবন নয়, বরং শহীদ হওয়ার জন্যে তৈরি করে নিচ্ছিলেন, যাকে খৃস্টধর্মে চরম ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মুহাম্মদ (স:) মৃত্যু বরণ করবেন না বরং একটা নতুন পর্যায়ে মিশন শুরু করবেন যার জন্যে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ প্রয়োজন যা আবার একধরনের মৃত্যুও বটে। অলৌকিক

দৃশ্য অবশ্য সান্ত্বনাদায়ক ছিল : তিনি পারপেচুয়ার মত সাধু রাখালের কাছ থেকে দুধ গ্রহণ করেননি, নিয়েছেন অতীতের মহান পয়গম্বরের হাত থেকে যা থেকে অতীতের প্রত্যাদেশসমূহের সঙ্গে তাঁর ধারাবাহিকতার অনুভূতি প্রকাশ পায়।

খোদ *মিরাজের* সঙ্গে কোনও শামানের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা মিলে যায়। আমেরিকার প্রয়াত পণ্ডিত জোসেফ ক্যাম্পবেলের মতে 'যা এখনও সাইবেরিয়া থেকে শুরু করে গোটা আমেরিকা হয়ে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো' পর্যন্ত ঘটতে দেখা যায়। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে তরুণ বয়সে শামানের 'এক অভূতপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা হয় যা তাকে পুরোপুরি অন্তর্মুখী করে দেয়। এটা অনেকটা সিজোফ্রেনিক ক্র্যাক-আপ। গোটা অবচেতন মন উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং শামান তাতে নিমজ্জিত হয়।'[১৫] যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বুশম্যানরা এক দীর্ঘস্থায়ী নাচের ভেতর দিয়ে এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায় : ঘোরে পড়ার পর লুটিয়ে পড়ার সময় আপন অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছে জনৈক শামান :

> যখন বেরিয়ে এলাম, দেখলাম আগে থেকেই ওপরে উঠছি, সুতো বেয়ে, সুতোটা চলে গেছে সোজা দক্ষিণে। আমি একটা সুতো বেয়ে উঠে তারপর ওটা ছেড়ে দিলাম, তারপর আরেকটা সুতো বেয়ে উঠলাম। তারপর ওটাও ছেড়ে দিয়ে আরেকটা বেয়ে উঠলাম...এবং যখন ঈশ্বরের ভুবনে গিয়ে উপস্থিত হলে তুমি, একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে গেলে। ক্ষুদ্রতে পরিণত হয়েছে তুমি। ক্ষুদ্র অবস্থায় ঈশ্বরের এলাকায় আসতে হয় তোমাকে। ওখানে যা করার তাই করতে হয় তোমাকে। তারপর সবাই যেখানে আছে সেখানে ফিরে আসতে হয়...এবং সবশেষে আবার দেহে প্রবেশ করতে হয়।[১৬]

এক ধরনের ব্যক্তিগত বিলোপের ভেতর দিয়ে অন্যদের অগম্য এক জগতে প্রবেশ করেছেন তিনি এবং ক্ষমতার সিংহাসন থেকে, কিংবদন্তীর কল্পনার রাজ্য থেকে সংবাদ বয়ে এনেছেন।

আমরা যেমন জানি, রাত্রির যাত্রা থেকে দেখা যায় যে মুহাম্মদ (স:) সবে বুঝতে শুরু করেছিলেন যে তিনি সম্ভবতঃ কুরাইশদের সতর্ককারীর চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু তখনও তিনি একজন মানুষের আশ্রয়ের সন্ধানে ছিলেন। *হজ্জের* সময় তিনি নিয়মিতভাবে তীর্থযাত্রীদের মিনায় বাধ্যতামূলকভাবে তিনদিন অবস্থান কালে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন, এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবেই ৬২০ খৃস্টাব্দের *হজ্জের* সময় ইয়াথরিব থেকে আগত ছয়জন *হজ্জ*যাত্রীর একটা দলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। একদলটি মক্কার খুব কাছাকাছি 'আকাবা উপত্যকায় তাঁবু ফেলেছিল। মুহাম্মদ (স:) তাদের সঙ্গে বসে নিজের মিশনের বিষয় তুললেন, কোরান আবৃত্তি করলেন, কিন্তু এবার প্রত্যাখ্যান ও বৈরিতার মুখোমুখি হবার বদলে দেখলেন আরবরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে এবং তারা কিছুটা উত্তেজিতও। তাঁর

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তীর্থযাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল এবং বলল যে, ইনি নিশ্চয়ই সেই পয়গম্বর ইয়াথরিবের ইহুদীরা সব সময় যাঁর কথা বলে থাকে। বছরের পর বছর তারা তাদের পৌত্তলিক পড়শীকে উপহাস করেছে আর বলেছে একজন পয়গম্বরের আবির্ভাবের কথা যিনি তাদের ধ্বংস করবেন, ঠিক যেভাবে আদ ও ইরাম নামের আরব গোত্র দুটো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদই (স:) যদি সেই পয়গম্বর হয়ে থাকেন, তাহলে ইহুদীরা যাতে আগেই তাঁর খোঁজ না পায় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তারা এটাও চট করে বুঝে ফেলেছিল যে মুহাম্মদ (স:) ইয়াথরিবের আপাতঃ অনতিক্রম্য সমস্যাসমূহের সমাধান করতে পারবেন।

এই সময় ইয়াথরিব মক্কার মত কোনও নগরী ছিল না। ওটা ছিল একটা মরুদ্যান, আগ্নেয়পাহাড়, পাথর আর আবাদ অযোগ্য জমিনে ঘেরা আনুমানিক বিশ বর্গমাইল এলাকার এক উর্বর ভূখণ্ডমাত্র। বাণিজ্যিক কেন্দ্র নয় বরং কৃষি বসতি ছিল ওখানে, বিভিন্ন উপজাতি বা গোত্র অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশে যার যার কুঁড়ে আর খামারে বাস করত। আদিতে ইহুদী বসতি স্থাপনকারীরাই এখানে প্রথম আবাদ করেছিল। এই ইহুদীদের আদি নিবাস আমাদের জানা নেই। এরা হয়ত প্যালেস্টাইন থেকে আগত শরণার্থী যারা ১৩৫ খৃস্টাব্দে রোমানদের হাতে বিদ্রোহ দমনের পর পালিয়ে এসেছিল কিংবা ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব গোত্রও হয়ে থাকতে পারে। তৃতীয় একটা সম্ভাবনা হচ্ছে বিভিন্ন সম্পর্করহিত আরব এক হিব্রু গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে ইয়াথরিবে তিনটি প্রধান ইহুদী গোত্র ছিল–বনি কুরাইযাহ, বনি নাদির এবং ক্ষুদ্র এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বনি কায়নুকা। ইহুদীরা আলাদা ধর্মীয় পরিচয় বহন করলেও অন্যান্য দিক থেকে তাদের সঙ্গে পৌত্তলিক আরব প্রতিবেশীদের তেমন পার্থক্য ছিল না। হিব্রু নয় আরব নাম ছিল তাদের, গোত্রীয় ব্যবস্থার রীতিনীতি রেওয়াজ অনুসরণ করত এবং আরব গোত্রগুলোর মতই লাগাতার পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হত। ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণ আরব থেকে এসেছিল বনি কাঈলাহ, ইহুদীদের পাশাপাশি মরুদ্যানে বসিত করেছিল তারা। এই নবাগত গোত্রটি আবার দুটো সম্পর্কিত শাখায় বিভক্ত হয়েছিল–আউস এবং খাসরাজ–পরে আলাদা দুটো গোত্রে পরিণত হয় তারা, প্রত্যেক গোত্রে আবার বেশ কয়েকটি পরিবার ছিল। গোড়াতে আউস এবং খাসরাজরা ইহুদীদের তুলনায় দুর্বল ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা নিজস্ব জমি অর্জন করে, গড়ে তোলে নিজস্ব দুর্গ এবং তাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। সপ্তম শতকের শুরুর দিকে আউস ও খাসরাজ গোত্র দুটির অবস্থান ইহুদীর চেয়ে খানিকটা বেশি সংহত হয়ে উঠেছিল এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপনের পরিবর্তনের ধারায় ইয়াথরিবে এমন এক সঙ্কট জন্ম নিয়েছিল যা মক্কার অস্থিরতার চেয়েও প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছিল। যেসব উপজাতীয় রীতি-নীতি মরুপ্রান্তরে চমৎকারভাবে কার্যকর ছিল সেগুলো আর

পর্যাপ্ত বা যথাযথ বলে বিবেচিত হচ্ছিল না। মরুভূমিতে যাযাবররা তাদের পূর্বপুরুষের জমি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রক্ষা করেছে, ব্যাপক দূরত্বে অবস্থানের কারণে তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু একটা ক্ষুদ্র মরুদ্যানে আটকা পড়ে যাওয়ায় প্রত্যেক গোত্র তাদের সামান্য কয়েক একর জমি পাহারা দিয়ে রাখতে শুরু করেছিল, ফলে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। একটা গ্রুপ সে সময়ের রেওয়াজ মেনে শত্রু এলাকায় হামলা (*ঘাযু*) চালাত, এবং এর বদলা নেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ত। আস্তে আস্তে ইয়াথরিবের বিভিন্ন গোত্র সহিংসতার এক ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে পড়ে। লাগাতার যুদ্ধ বিগ্রহে জমির বিনাশ ঘটছিল, নষ্ট হচ্ছিল খেতের ফসল এবং ইয়াথরিবের সম্পদ ও ক্ষমতার উৎসকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। ইহুদী গোত্রগুলো এ বিরোধে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং আউস ও খাসরাজ গোত্রদুটো যে কোনওটির সঙ্গে বিভিন্নভাবে মৈত্রী গড়ে তোলে। ৬১৭ খৃস্টাব্দ নাগাদ একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। কোনও দলই সুবিধা করতে পারছিল না এবং উভয়পক্ষ ও তাদের মিত্ররা সংঘাতের ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। সেবছর গৃহযুদ্ধ বু'আদের লড়াইতে রূপ নেয় যা আউস ও তাদের ইহুদী মিত্র বনি নাদিরকে স্বাভাবিক জয় এনে দিয়েছিল; কিন্তু তারা এ বিজয়কে সংহত করে কার্যকর করার যোগ্য ছিল না। প্রত্যেকে বুঝতে শুরু করেছিল, রাজতন্ত্রের প্রতি তীব্র বিরাগ সত্ত্বেও, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কেউই ইয়াথরিবের জন্যে শেষ আশার স্থল। খাসরাজ গোত্রের অন্যতম এক সর্দার আব্দাল্লাহ ইবন উব্বাঈ বু'আদের লড়াইতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, এর অর্থহীনতা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। এক ধরনের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি অর্জন করেছিলেন তিনি এবং সবাই তাঁকেই সম্ভাব্য সর্বময় ক্ষমতাধর রাজা হিসাবে ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু অনেকেই এরকম একটা সমাধানের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। প্রত্যাশিতভাবেই আউস গোত্র খাসরাজের কোনও সদস্যের হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দিতে অনিচ্ছুক ছিল ; আবার খাসরাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরিবারগুলোও ইবন উব্বাঈয়ের ক্ষমতারোহনের ব্যাপারে সমানভাবে অনীহ ছিল।

৬২০ খৃস্টাব্দের *হজ্জের* সময় ইয়াথরিব থেকে আগত ছয় তীর্থযাত্রীর কাছে মুহাম্মদ (সঃ) যখন উপস্থিত হলেন, অচিরেই তারা বুঝতে পারল যে আল্-লাহর পয়গম্বর হিসাবে তিনি উব্বাঈয়ের চেয়ে অনেক বেশি নিরপেক্ষ নেতা হতে পারবেন। তাঁর একেশ্বরবাদী বক্তব্যে বিস্মিত হয়নি তারা। ইহুদীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে মাত্র একজন ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিল তারা এবং প্রাচীন দেবীদের *জিন* ও ফেরেশতার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে একেবারেই প্রস্তুত ছিল। নিজস্ব কোনও ঐশীগ্রন্থ না থাকায় দীর্ঘদিন নিজেদের ইহুদীদের তুলনায় হীন ভেবে এসেছে তারা, ভেবেছে তারা 'অজ্ঞ জাতি ছিল'[১৭] ; তো আরবদের পয়গম্বর হিসাবে মুহাম্মদের দাবী শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছে তারা– যিনি তাদের জন্যে কোরান নিয়ে এসেছেন। ইয়াথরিবের জন্যে বিরাট আশায় বুক বেঁধে দ্রুত ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করল তীর্থযাত্রীরা 'আমরা আমাদের জাতিকে ছেড়ে এসেছি, কেননা আর কোনও গোত্র ওদের মত ঘৃণা আর হিংসার কারণে বিভক্ত হয়ে

নেই। হয়ত ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে তাদের আবার ঐক্যবদ্ধ করবেন। চলুন ওদের কাছে ফিরে চাই, এবং ওদের আপনার ধর্মে আহবান জানাই, যদি ঈশ্বর ওদের এর মাঝে একত্রিত করে দেন তাহলে আপনিই হয়ে উঠবেন সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ।'[১৮] বছর খানেকের মধ্যেই আবার মুহাম্মদের (স:) কাছে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেয় তারা। সসঙ্গী মরুদ্যানে যেতে হলে সেখানে ব্যাপক সমর্থন আদায় ছিল মুহাম্মদের (স:) জন্য খুব জরুরি। ইহুদীদের দিক থেকে কোনও বিপদ আশা করেননি তিনি, কেননা তাঁর বরাবরের বিশ্বাস ছিল তিনি যে বাণী প্রচার করছেন তা ইহুদীদের বিশ্বাসের সমরূপ, কিন্তু তীর্থযাত্রীরা ছিল খাসরাজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোত্রের সদস্য। মুহাম্মদ (স:) যদি ইয়াথরিবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে যান তাহলে আউস গোত্রের কিছু সদস্যকেও তাঁর ধর্মে দীক্ষা দিতে হবে।

কয়েক বছর ধরে মুসলিমদের আদর্শ যেন একই বিন্দুতে আটকা পড়েছিল, কিন্তু এটা ছিল পরিস্থিতির অনুকূল পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী একটা লক্ষণ। সেবছর আপন গৃহেও কিছু পরিবর্তন ঘটান মুহাম্মদ (স:)। একজন স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল তাঁর, জীবনে নারীর উপস্থিতি কামনা করছিলেন, তো চাচাত বোন ও আমির গোত্র প্রধান সুহায়েলের শ্যালিকা সওদাহকে বিয়ের প্রস্তাব উঠল। সওদাহ এবং সুহায়েলের ভাই সাকরান ৬১৬ খৃস্টাব্দে আবিসিনিয়ায় অভিবাসী হয়েছিলেন, ওরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার অল্প কিছু দিন পরেই পরলোকগমন করেছিলেন স্যাকরান। বিয়েতে সম্মত হলেন সওদাহ এবং সুহায়েলের অপর এক ভাই হাতিব ইবন আমর তাঁকে পয়গম্বরের হাতে তুলে দেয়।

আবু বকরও মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন, বছরের পর বছর ব্যক্তিগত ক্ষতি শিকার করে বিশ্বস্তভাবে যাঁর সেবা করে এসেছেন তিনি। ৬২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর ছোট মেয়ে আয়েশার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর, নওফল গোত্র প্রধান মুহাম্মদ (স:)-এর নতুন আশ্রয়দাতা মু'তিমের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়েছিল। কিন্তু ছেলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করবে, স্ত্রীর এই আশঙ্কার কারণে মু'তিম বিয়ে ভেঙে দিতে আপত্তি করেননি। আয়েশার অনুপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আয়েশা বলেছেন, মা যখন তাঁকে অন্য বাচ্চাদের মত আর রাস্তায় খেলাধুলা করা যাবে না বললেন তখনই কেবল নতুন অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তিনি, তবে বন্ধুদের বাড়িতে এনে তাদের সঙ্গে খেলার অনুমতি ছিল।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছি, মুহাম্মদকে (স:) যখন বারবার কামুক হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে, আমি দেখিয়েছি মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীগণের হারেম পশ্চিমে বিশ্রী এবং বিকৃত গুঞ্জনের জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে কোরান রায় দিয়েছে যে একজন মুসলিম মাত্র চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে কিন্তু পয়গম্বর হিসাবে মুহাম্মদ (স:) বহু বিবাহের অনুমোদনপ্রাপ্ত। সেই কালে নগণ্য সংখ্যক আরবই একগামীতাকে বিশেষ কোনও কাঙ্ক্ষিত রীতি হিসাবে দেখত, এবং পরবর্তী সময়ে

মুহাম্মদ (স:) যখন মহান আরব *সাইয়ীদ* হয়ে উঠছেন, বিরাট হারেম তাঁর মর্যাদার পরিচায়ক ছিল। গোত্রীয় সমাজে বহুগামীতাই রীতিতে পরিণত হয়। রাজা ডেভিডের যৌন অভিজ্ঞতা বা সলোমনের বিরাট হারেমের ব্যাপারে বাইবেলের খুঁতখুঁতানি দেখা যায় না, যাঁদের তুলনায় মুহাম্মদ (স:) বরং একেবারেই সাধারণ। মুহাম্মদের (স:) মত তাঁরা দুজনও এমন একসময়ের মানুষ ছিলেন যখন মানুষ গোত্রীয় ব্যবস্থা থেকে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করছিল। পার্থিব আনন্দ কাননে মুহাম্মদ (স:) লাম্পট্য করে বেড়িয়েছেন ভাবাটা মারাত্মক ভুল হবে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর একাধিক স্ত্রী বরং কখনও কখনও, আমরা দেখব, মিশ্র আশীর্বাদের মত ছিল। আমাদের স্রেফ দুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমত : সওদাহ বা আয়েশার কাউকেই তাঁদের যৌন আবেদনের জন্যে বেছে নেয়া হয়নি, আয়েশা ছিলেন খুবই ছোট এবং ত্রিশ বছর বয়স্কা সওদাহ তারুণ্য হারিয়ে স্থূলকায়া হয়ে উঠছিলেন। আমরা তাঁর সম্পর্কে এর বেশি কিছু শুনতে পাই না এবং এতে বোঝা যায় প্রেম নয় বরং বৈষয়িক একটা ব্যবস্থা ছিল ওই বিয়ে। তিনি মুহাম্মদের (স:) সংসার দেখাশোনা করবেন এবং অন্ততঃ মুসলিম সমাজে মর্যাদা অর্জন করেছিলেন–পয়গম্বরের স্ত্রী হবার সুবাদে। দ্বিতীয়ত : দুটো বিয়েরই রাজনৈতিক দিক ছিল : মুহাম্মদ (স:) আত্মীয়তার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলছিলেন। তখনও সুহায়েলের কাছ থেকে নির্ভরতা পাচ্ছিলেন–গভীর ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন সুহায়েল এবং সওদাহর সঙ্গে বিয়ের সুবাদে তিনি তাঁর আত্মীয়ে রূপান্তরিত হন। আবু বকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল : আত্মীয়তা নয়, বরং আদর্শ ভিত্তিক ভিন্ন ধরনের বিকল্প গোত্র গড়ে তুলতে যাচ্ছিলেন মুহাম্মদ (স:)। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক তখনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভূত হচ্ছিল।

মুহাম্মদ (স:)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরে আবু বকর নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন, কারণ সেই সময় মক্কায় আবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিজের বাড়ির পাশে একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তিনি, যার কারণে জুমাহ্ পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন, বলেছেন ইবন ইসহাক, 'কোমলহৃদয় পুরুষ, কোরান পাঠ করার সময় আবেগে কাঁদতেন। তাঁর কোরান আবৃত্তির সময় তরুণ, দাস এবং নারীরা পাশে দাঁড়িয়ে থাকত এবং তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে যেত।'[১৯] তিনি যখন ইবন আল-দাঘুমার আশ্রয় লাভ করেছিলেন, কুরাইশরা ভেবেছিল আর তাঁর প্রকাশ্য প্রার্থনা দেখা যাবে না, সেজন্যে বেদুঈন সর্দারের কাছে একদল প্রতিনিধিদল হাজির হয়ে রুক্ষ ভঙ্গিতে জানতে চাইল :

> আমাদের আঘাত করার জন্যেই কি ওই লোককে আশ্রয়দান করেছেন আপনি? হায়, সে প্রার্থনা করে আর মুহাম্মদের রচনা থেকে আবৃত্তি করে, তাঁর হৃদয় ভিজে ওঠে, সে কাঁদে। তাঁর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর বলে আমাদের ভয় জাগে সে হয়ত আমাদের তরুণ, নারী আর দুর্বলদের কব্জা করে ফেলবে। আপনি তাকে গিয়ে বলুন নিজের বাড়ি ফিরে যেতে, যা করার যেন সেখানেই করে।[২০]

মসজিদ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন আবু বকর : হয়ত ভেবেছিলেন তাঁর দ্বারা আর আপোস করা সম্ভব নয়, যথেষ্ট হয়েছে। তো আবারও অপমানের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হলেন তিনি : লোকে রাস্তায় তাঁকে লক্ষ্য করে নোংরা-আবর্জনা ছুড়ে মারত আর কুরাইশদের সর্দার অসন্তোষের সঙ্গে বলত নিজের দোষেই এই আবর্জনার শিকার হতে হয়েছে তাঁকে।

৬২১ খৃস্টাব্দের হজ্জের সময় নবদীক্ষিত সেই ছয়জন ইয়াথরিববাসী আবার মক্কায় ফিরে আসে, এবং আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী, সঙ্গে আরও সত্তরজনকে নিয়ে এসেছিল তারা যাদের ভেতর দুজন ছিল আউস গোত্রের। 'আকাবার গিরিসংকটে আবার মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে মিলিত হয় তারা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কেবল আল্লাহর উপাসনা এবং অন্যান্য নির্দেশ পালনের অঙ্গীকার করে। পরে তাদের একজন বলে :

> আমরা পয়গম্বরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি, ঈশ্বরের সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, চুরি না করা, ব্যাভিচার না করা, সন্তান-সন্ততিদের হত্যা না করা, প্রতিবেশীদের ওপর নির্যাতন না চালানোর অঙ্গীকার করি, আমরা মুহাম্মদের ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাব না, যদি আমরা আমাদের শপথ রক্ষা করি তাহলে বিনিময়ে স্বর্গ আমাদের হবে, আর যদি এসব পাপাচারের কোনওটিতে লিপ্ত হই, আমাদের শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে।[২১]

প্রথম 'আকাবা নামে খ্যাত এই সাক্ষাতে রাজনীতির চেয়ে ধর্মের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। প্রাচীন পৌত্তলিকতা ইয়াথরিবের সমস্যাদির সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে, ওখানকার মানুষ নতুন আদর্শ গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল। মুহাম্মদের (স:) ধর্মীয় চাহিদাসমূহ মুসলিমদের অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের নির্দিষ্ট কিছু অপরিহার্য অধিকার বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিল। নতুন এই নৈতিকতা গোত্রের প্রাচীন যৌথ আদর্শের স্থান দখল করে, যা ব্যক্তির চেয়ে গ্রুপকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করত। নতুন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এক নয়া সমাজের সম্ভাব্য ভিত্তিতে পরিণত হয়, কেননা ইয়াথরিববাসীদের একথা বোঝাতে সাহায্য করে যে একজনের প্রাপ্তি মানেই আরেকজনের হ্রাস নয়, মরুভূমিতে যেমন ছিল– যেখানে চালিয়ে নেয়ার মত পর্যাপ্ত রসদের ব্যাপক ঘাটতি ছিল।

তীর্থযাত্রীরা ইয়াথরিবে ফিরে যাবার সময় মুহাম্মদ (স:) মু'সাব ইবন উমায়ের নামে একজন অত্যন্ত সক্ষম মুসলিমকে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করলেন মরুদ্যানের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান ও কোরান আবৃত্তি শেখানোর জন্যে–অল্পদিন আগেই আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন মু'সাব। গোত্রীয় ঘৃণা তখন এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আউস বা খাসরাজ গোত্রের কেউই প্রতিপক্ষ

গোত্রের কোনও সদস্য পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করবে বা প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেবে এটা মানার মত অবস্থায় ছিল না, সেজন্যেই একজন নিরপেক্ষ বহিরাগতকে দিয়ে আবৃত্তি করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। প্রথম দিকে আউস গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা নতুন ধর্মের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন ছিল, একবার নেতৃস্থানীয় এক গোত্রপ্রধান সা'দ ইবন মুয়াধ মু'সাব তাঁর এক বাগানে প্রকাশ্যে বসে আছেন জানতে পেরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, গোত্রের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন মু'সাব। এদিকে মু'সাব আবার তাঁর আপন চাচাত ভাই আসাদ ইবন যুরারার, প্রথম ছয়জন ইসলাম ধর্মগ্রহণকারীদের একজন, অতিথি ছিলেন, ফলে মক্কা থেকে আগত অতিথির অসম্মান করা ঠিক হবে না বলে বুঝতে পারলেন তিনি। তো তিনি তাঁর সহকারী উসায়েদ ইবন আল-হুদাঈরকে পাঠালেন মু'সাবকে এলাকা ছাড়া করার জন্যে। উসাঈদ বর্শা বাগিয়ে ধরে সোজা বাগানের উদ্দেশ্যে ছুটলেন। মু'সাবকে ঘিরে বসে থাকা মনোযোগি শ্রোতাদের দলটাকে দেখার পর ওদের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইলেন দুর্বল সঙ্গীদের প্রতারণা করে মুসলিমরা কি বোঝাতে চায়? মু'সাব জবাব দিলেন : 'একটু বসে শুনবে? শোনার পর যদি ভাল লাগে গ্রহণ করবে আর যদি না লাগে তাহলে বাদ দেবে।' প্রস্তাবটা উসাঈদের কাছে যুক্তিযুক্ত ঠেকে, তো তিনি বর্শাটা মাটিতে গেঁথে কোরান আবৃত্তি শোনার জন্যে বসে পড়েন। যথারীতি ভাষার সৌন্দর্য তাঁর মনের গভীরতম তলদেশ স্পর্শ করে এবং তাঁর গোত্রীয় সদস্যরা লক্ষ্য করে যে উসাঈদের চেহারা একেবারে বদলে গেছে সেখানে দ্যুতিময় শান্তির ছাপ। আবৃত্তি শেষে তিনি চড়া গলায় বলে উঠেছিলেন : 'ওহ, কী সুন্দর আর চমৎকার কথা! এই ধর্মে প্রবেশ করার জন্যে কী করতে হয়?' মু'সাব তাঁকে পোশাক পবিত্র করে এক আল্-ল্লাহয় বিশ্বাস ঘোষণা এবং প্রার্থনায় বসার কথা বললেন। উসাঈদ এইসব চাহিদা পূরণ করার পরপরই আবার ছুটলেন সা'দের উদ্দেশ্যে।

সা'দ তাঁকে দেখে তাঁর চেহারার অভিব্যক্তি থেকেই বুঝে গেলেন যে উসাঈদ তাঁকে হতাশ করেছেন। তিনি খপ করে বর্শা আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন : 'আল-ল্লাহর কসম, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুমি কোনও কাজেই লাগোনি!' এবং ছুটে যান বাগানের দিকে। আবার একই ঘটনার পুনরাভিনয় হল : মু'সাব তাঁকে বসে শোনার আমন্ত্রণ জানালেন, সা'দ বর্শা মাটিতে গেঁথে বসলেন এবং কোরানের সৌন্দর্যের কাছে পরাভব মানলেন। এদুটো ঘটনা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সা'দ তাঁর আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কী কারণে তাঁরা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, জবাবে তারা বলেছিল : '[আপনি] আমাদের সর্দার, আমাদের স্বার্থরক্ষায় সদা সচেষ্ট, আপনি ন্যায় বিচারক, এবং আপনার নেতৃত্বের কোনও তুলনা হয় না।' সা'দ তখন বলেছিলেন এব্যাপারেও তাঁর ওপর একই রকম আস্থা রাখার জন্যে, এবং যোগ করেছিলেন তোমরা 'ঈশ্বর এবং তাঁর পয়গম্বরে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের কারও সঙ্গে কথা বলব না।'[22] ফলে

গোটা গোত্রটি সমবেতভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। একাহিনী অবশ্যই কালক্রমে একটা বিশেষ রূপ পেয়েছে, কিন্তু সা'দ পরবর্তীকালে ইয়াথরিবের অন্যতম সেরা মুসলিমে পরিণত হন এবং তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্ভবতঃ একটা শক্তিশালী নতুন নেতৃত্ব এবং আপাতঃ অনতিক্রম্য সমস্যার সমাধানের আশায় অপেক্ষমান জাতির মনে জোরাল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অল্প দিনেই মরুদ্যানের প্রায় প্রতিটি পরিবারে মুসলিম সদস্য থাকতে দেখা গিয়েছিল। আউস গোত্রে পৌত্তলিকদের পক্ষে একটা ছোটখাট প্রতিরোধের ঘটনা ঘটেছিল যার পেছনে ছিলেন কবি এবং গোত্র প্রধান আবু কায়েস ইবন আল্-আসলাত। কবি সম্প্রদায় সবসময়ই গোত্রের পরিচয় নির্ধারন ও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এরা বর্তমান কালের গণমাধ্যমের মতই কোনও ব্যক্তির চরিত্র হননে সিদ্ধহস্ত ছিল। আরবে বৈরী কাব্যিক প্রচারণা সামরিক পরাজয়ের মতই বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াতে পারে; এবং যেসব কবি মুহাম্মদ (স:)-কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিল তাদের প্রতি তাঁর বৈরিতার বিষয়টি বিবেচনায় আনার সময় আমাদের এ দিকটার দিকে মনোযোগ রাখতে হবে। ইয়াথরিবে সে বছর বিচারের সময় আবু কায়েস তাঁর স্বগোত্রীয়দের একেশ্বরবাদের আরব ধারার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আহবান জানিয়ে বিদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত কোরান প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন। ইয়াথরিবের জনগণের স্বীকৃত একেশ্বর আল্-লাহকে উদ্দেশ্য করে তিনি রচনা করেন :

> হে মানবজাতির প্রভু, ভয়নক ব্যাপারের অবতারণা ঘটেছে।
> কঠিন আর নিরীহরা জড়িয়ে পড়েছে।
> মানবজাতির প্রভু, আমাদের ভুল হয়ে থাকে যদি
> সঠিক পথ দেখিয়ে দাও।
> হে প্রভু, তোমার করুণা না থাকত যদি আমরা হতাম ইহুদী
> কিন্তু ইহুদীদের ধর্ম সুবিধাজনক নয়।
> হে প্রভু, তোমার করুণা না থাকত যদি আমরা হতাম ক্রিশ্চান,
> জালিল (গ্যালিলি) পর্বতের সন্তদের সঙ্গে।
> আমাদের যখন সৃষ্টি করেছিলে, সৃষ্টি করেছিলে
> হানিফ হিসাবে, আমাদের ধর্ম প্রজন্মান্তরে বিস্তৃত
> আমরা বলি দেয়ার জন্যে পায়ে বেড়ি পরান উট নিয়ে আসি
> তাদের কাঁধ ছাড়া গোটা শরীর থাকে কাপড়ে আবৃত।[২৩]

মক্কার নতুন ধর্মটিকে যে আবু কায়েস আহল আল্-কিতাবের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখতে পেয়েছেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ প্রথম 'আকাবার পর থেকে মুহাম্মদ (স:) উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইহুদী রেওয়াজের প্রচলন করেন। নিঃসন্দেহে

মরুদ্যানের ইহুদীদের দিকে আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলেন তিনি এবং আশা করেছিলেন দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত জনগণের সঙ্গে কাজ করার ও প্রার্থনায় অংশ নেয়ার। মু'সাবকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন শুক্রবার দুপুরের পর মুসলিমদের একটা বিশেষ জমায়েতের ব্যবস্থা করার জন্য– সে সময়ে ইহুদীরা সাবাথের প্রস্তুতি নেয়, এতে করে কৌশলে একটা দূরত্ব বজায় রেখেও এই নতুন প্রার্থনাকে ইহুদী উৎসবের সঙ্গে মেলানো গিয়েছিল। এরপর তিনি ইহুদীদের ইয়োম কিপ্পুর (প্রায়শ্চিত্ত দিবস) উপলক্ষ্যে মুসলিমদের উপবাস পালনের নির্দেশ দেন, ইহুদী মাস তিশরির ১০ তারিখে পালিত হত এ দিবসটি : মুসলিমদের উপবাসকে যথারীতি 'আশুরা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, যা আরবীয়-সিরিয় ভাষায় 'দশম' বোঝায়। ইহুদীদের মত মুসলিমদেরও এখন দিনের মধ্যভাগে প্রার্থনা করতে হচ্ছিল; এর আগ পর্যন্ত কেবল সকাল আর সন্ধ্যায় '*সালাত*' আদায় করছিল তারা; আবার মাঝরাতে উঠে পাহারাও দিচ্ছিল। মুসলিমদের জানিয়ে দেয়া হল যে তারা ইহুদী নারীকে বিয়ে করতে পারবে এবং ইহুদী খাদ্য গ্রহণেও কোনও বাধা নেই। অবশ্য তারা ইহুদীদের সকল খাদ্য আইন অনুসরণ করেনি, তবে কিছুটা বদলে নেয়া হয়েছিল যার সঙ্গে খৃস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে অ্যাকটস অব দ্য অ্যাপসলস'এ প্রদান করা নিয়ম-নীতির অসাধারণ সাযুজ্য রয়েছে।[২৪] সর্বোপরি মুসলিমদের জেরুজালেমের দিকে ফিরে প্রার্থনা করারও নির্দেশ দেয়া হয়, ইহুদী আর ক্রিশ্চানরা যেমন করত। জেরুজালেমে মুহাম্মদের(সঃ) রাত্রি-ভ্রমণ দেখিয়েছে যে প্রাচীন এই শহর মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ এবং জেরুজালেমকে *কিবলা* বা প্রার্থনার দিক হিসাবে গ্রহণ করার ফলে তা প্রাচীন প্রত্যাদেশগুলোর সঙ্গে নতুন ধর্মটির সম্পর্কের অবিরাম প্রকাশ ও স্মারকে পরিণত হয়েছিল। প্রার্থনার সময় মুসলিমরা দিনে তিনবার জেরুজালেমমুখী হচ্ছিল, তাদের শারীরিক ভঙ্গিমা এক নতুন আধ্যাত্মিক চেতনা শিক্ষা দিচ্ছিল এবং অন্তস্তলে জানিয়ে দিচ্ছিল যে আহল আল-কিতাবের মতই তাদের লক্ষ্যও এক।

কোরান ইহুদীদের দেয়া ইয়াথরিবের সিরিয় নাম 'মেদিনতা'ও গ্রহণ করে, যার আক্ষরিক অর্থ স্রেফ 'নগরী'। আরবীতে তা পরিণত হয় 'আল-মাদিনাত'এ, যা থেকে আমরা পেয়েছি মদিনা। এর পাঁচ বছর আগে, মুহাম্মদ (সঃ) যখন তাঁর সঙ্গীদের কারও কারও নতুন আবাসভূমির সন্ধান করছিলেন, তখন আবিসিনিয়ার মনোফিসাইট ক্রিশ্চানদের কাছে আবেদন রাখেন, কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত কোনও কারণে সেই প্রয়াস কার্যকর হয়নি বলেই ধারণা জন্মে। এখন মুহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং উপলব্ধি করেছেন তাঁর পক্ষে আর মক্কায় অবস্থান সম্ভব নয়, কিন্তু আরবের পয়গম্বরের পক্ষে আরব ত্যাগের চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। এবার গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনি নতুন নামকৃত মরুদ্যান মদিনায় তাঁর সঙ্গে অভিবাসী হওয়ার আহবান জানালেন, ওখানকার ইহুদী গোত্রগুলোর কাছে সাহায্য ও সমর্থন চাইলেন তিনি।

৬২২ সালে *হজ্জের* সময় তীর্থযাত্রীদের বড়সড় একটা দল মক্কার উদ্দেশে মদিনা ত্যাগ করে। এদের অনেকেই তখনও পৌত্তলিক ছিল, কিন্তু পুরুষদের তিয়াত্তর জন এবং নারীদের ভেতর দুজন ছিল মুসলিম এবং তারা ছিল মদিনার সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য। পথে আশ্চর্য তাৎপর্যময় একটা ঘটনা ঘটে। খাসরাজ গোত্রের একজন প্রধান আল-বারা ইবন মা'রার অন্যান্য মুসলিমদের কাছে *হজ্জের* সময় তাদের *কিবলা* পরিবর্তন করতে হবে বলে প্রস্তাব রাখেন। আগ্রহের সঙ্গে মক্কা, যেখানে আল-লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাসনাগৃহের অবস্থান, সেদিকে এগিয়ে চলছিল তারা, ওখানে জীবনে প্রথমবারের মত তারা পয়গম্বরের সঙ্গে মিলিত হবে। জেরুজালেমের দিকে ফিরে প্রার্থনা করার সময় মক্কার দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা তাদের কাছে শোভন মনে হয়নি। অন্যরা মনে করল বা'রা ঠিক বলছেন না, কারণ তারা যতক্ষণ মানছে মুহাম্মদের (সঃ) *কিবলা হচ্ছে জেরুজালেম* ততক্ষণ অন্য কিছু ভাবতে আগ্রহী নয়। বা'রা সশস্ত্র অবস্থায় রইলেন এবং যাত্রাকালীন মক্কাকে *কিবলায়* পরিণত করে নিলেন। তবে এ ব্যাপারে অস্বস্তিতে ভুগছিলেন তিনি, তো মক্কায় পৌঁছেই মুহাম্মদের (সঃ) খোঁজে কা'বায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মদের (সঃ) জবাব ছিল দ্ব্যর্থবোধক : 'তোমার একটা *কিবলা* ছিল, যদি থাকে তবে সেদিকেই বহাল থাক।'[২৫] তবে তখনও জেরুজালেমের দিকে ফিরে প্রার্থনা করছিলেন তিনি এবং বা'রাও অনুগতের তাঁকে অনুসরণ করেন। পরে তাঁর স্বগোত্রীয়রা বা'রার কথা স্মরণ করেন। মদিনায় প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই মারা যান বা'রা, এটা বিশ্বাস করা হয় যে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া ব্যক্তিদের আঁচ-অনুমানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া উচিত।

মিনা উপত্যকায় আচারিক বিশ্রামের সময় 'আকাবা গিরিখাতে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, তবে এবার রাতের অন্ধকারকে বেছে নেয়া হয়েছিল সভা উপলক্ষ্যে। এবছর গৃহীত শপথ 'যুদ্ধের শপথ' নামে পরিচিতি পায় : 'পয়গম্বরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করে আমরা যুদ্ধের শপথে আবদ্ধ হচ্ছি, সুখ-দুঃখ, সুদিন-দুর্দিন এবং দুঃসময়েও এই আনুগত্য অটুট থাকবে; আমরা কারও প্রতি অন্যায় করব না; আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব, এবং ঈশ্বরের উপাসনায় আমরা কারও নিন্দার ভয় করব না।'[২৬] যুদ্ধের শপথের মানে এই নয় যে ইসলাম আকস্মিকভাবে আক্রমণাত্মক এবং সামরিক ধর্মে পরিণত হয়েছে; মুহাম্মদ (সঃ) যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিলেন তার জন্যে এর প্রয়োজন ছিল। তিনি সহকর্মীদের মক্কা থেকে মদিনায় '*হিজরা*' বা অভিবাসনের তাগিদ দিচ্ছিলেন, কিন্তু *হিজরা* মানে কেবল ভৌগলিক অবস্থানগত পরিবর্তন ছিল না। মক্কার মুসলিমরা কুরাইশদের ত্যাগ করে রক্ত সম্পর্ক রহিত একটা গোত্রের স্থায়ী আশ্রয়ে যাচ্ছিল। [২৭] এটা ছিল এক নজীরবিহীন পদক্ষেপ এবং পৌত্তলিক দেবীদের মর্যাদা হানির ফলে আরব অনুভূতির প্রতি প্রকৃতগত ভাবেই আক্রমণাত্মক একটা ব্যাপার ছিল। 'কনফেডারেশনে'র একটা প্রথা সবসময় ছিল যার আওতায় যে কেউ বা গোটা একটা গোত্র অপর কোনও গোত্রের সম্মানিয় সদস্য

হতে পারত এবং ফলে তাদের আশ্রয় লাভ করত। কিন্তু সেটা কখনও চিরস্থায়ী সম্পর্কচ্ছেদ ছিল না; রক্তের সম্পর্ক আরবে অত্যন্ত মূল্যবান এবং সমাজের ভিত্তি ছিল। '*হিজরা*' শব্দ থেকেই বোঝা যায় মদিনায় পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মনের একেবারে ওপরে ছিল এই বেদনাদায়ক বিচ্ছেদের ব্যাপারটি। মূলশব্দ **হিজ্‌র** (*HJR*)এর প্রথম অংশ, *হাজারা-হু'র* অনুবাদ করা হয়েছে 'বন্ধুত্বপূর্ণ বা প্রেমময় গোষ্ঠী বা সঙ্গীদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে যে... সে... ওদের সঙ্গে অবস্থান বন্ধ করেছে।'[২৮] মদীনাবাসী মুসলিমদের দিক থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল তারা স্থায়ী ভিত্তিতে নিরাপত্তা (*আউলিয়া*) ও সাহায্য (*নস্‌র*) দেবে অনাত্মীয়দের প্রতি। এরপর থেকে তারাই আনসার– যারা পয়গম্বর এবং তাঁর সঙ্গীদের সাহায্য (*নস্‌র*) দেয়–, হিসাবে পরিচিত হয়। 'আনসার' শব্দটিকে সাধারণতঃ 'সাহায্যকারী' হিসাবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু তাতে শব্দটার পুরো অভিব্যক্তি বোঝা যায় না, *নস্‌র* মানে হল প্রয়োজনে আপনাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার 'সাহায্য' ও সমর্থন প্রদানের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। একারণেই মদিনার মুসলিমরা যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করেছিল। শপথ গৃহীত হয়েছিল গোপনে। কেবল যে মুহাম্মদ (স:) নিজের এবং মক্কার সঙ্গীদের ব্যাপারে একটা অশ্রুতপূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তাই নয়, মারাত্মক বিপদের আশঙ্কাও ছিল। ইবন ইসহাক *হিজরার* ইতিবাচক দিকগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন এবং একে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হিসাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু কোরানে মুসলিমরা মক্কা হতে 'বহিষ্কার' বা 'বিতাড়িত'[২৯] হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (স:) সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে।[৩০] সম্ভবতঃ মু'তিম তাঁকে তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপ্রচার থেকে বিরত থাকার শর্তে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কোরান কখনওই *হিজরার* সুবিধার বিষয়ে উল্লেখ করে না বরং এ কথা বোঝায় যে মুসলিমরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। ৬২২ খৃস্টাব্দের *হজ্জের* ওই সভার সময় বিপদের একটা আবহ বিরাজ করছিল, বিভিন্ন সেতু মেরামতের অতীত-এমনভাবে পোড়ানো হচ্ছিল। আলোচনা গোপন রাখা ছাড়া উপায় ছিল না, *আনসাররা* এমনকি তীর্থযাত্রার সময় তাদের পৌত্তলিক সহযাত্রীদেরও বিষয়টি অবহিত করেনি, তারা মক্কায় পরিকল্পিত *হিজরা* প্রসঙ্গে আলোচনা করে কী ঘটতে যাচ্ছে সেসম্পর্কে কুরাইশদের একটা ধারণা দিয়ে বসতে পারে–এই আশঙ্কায়।

শপথ অনুষ্ঠানের রাতে সাহায্যকারীরা তাদের পৌত্তলিক সঙ্গীদের তাঁবুতে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে 'স্যান্ড গ্রাউসের মত নীরবে' চুরি করে 'আকাবার গিরিখাতে উপস্থিত হয়, ওখানে আব্বাসের উপস্থিতিতে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।[৩১] আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি তবে ভাতুষ্পুত্রকে তিনি খুব স্নেহ করতেন এবং প্রাথমিক সূত্র থেকে দেখা যায় তিনি মদিনায় মুহাম্মদের (স:) পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি কুরাইশদের হাত থেকে মুসলিমদের 'সাহায্য' ও

নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার আগে সাহায্যকারীদের গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে বলেছিলেন : 'যদি মনে করেন নিজেদের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারবেন এবং ওকে প্রতিপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন তাহলেই এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করুন। কিন্তু যদি মনে হয় আপনারা ওর সঙ্গে ওয়াদা খেলাপ করে ওকে পরিত্যাগ করবেন–আপনাদের সঙ্গে যাওয়ার পর–তাহলে বরং এখনই ওকে নিস্তার দিন।'[৩২] কিন্তু সাহায্যকারীগণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে প্রস্তুত ছিল। আউস ও খাসরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে বা'রা মুহাম্মদ (স:)-এর হাত ধরে শপথ উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে মুসলিমরা পয়গম্বরকে তেমন নিরাপত্তা দেবে যেমন তারা তাদের নারী ও শিশুদের দিয়ে থাকে। কিন্তু বা'রা বক্তব্য রাখার সময় অপর এক সাহায্যকারী বাধা দেয় : মদিনাবাসীর অন্যান্য মৈত্রী ও চুক্তি আছে, মক্কার মুসলিমদের রক্ষা করতে হলে সেগুলোর কোনও কোনওটির ভঙ্গ করার প্রয়োজন হতে পারে। তো মুহাম্মদ (স:) যদি পরে মদিনা ত্যাগ করে সাবেক মিত্রপক্ষকে আক্রমণের মুখে ফেলে আসেন তখন কে তাদের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? হেসে মুহাম্মদ (স:) জবাব দিয়েছেন 'আমি আপনাদের আর আপনারা আমার। আপনাদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরবে আমি তাদের সঙ্গে লড়ব আর যারা শান্তি বজায় রাখবে আমিও তাদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখব।'[৩৩] এরপর, উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলে, সাহায্যকারীরা 'যুদ্ধের শপথ' গ্রহণ করে।

তারা মদিনায় ফিরে যাবার পর মুহাম্মদ (স:) মক্কার মুসলিমদের *হিজরার* জন্য অনুপ্রাণিত করার কাজে নামেন। অপরিবর্তনীয় এবং ভীতিকর এক পদক্ষেপ ছিল এটা। ফলাফল কী হতে পারে জানা ছিল না কারও, কারণ আরবে আর কখনও এধরনের কোনও ব্যাপার ঘটার নজীর নেই। মুহাম্মদ (স:) মুসলিমদের দেশত্যাগের নির্দেশ দেননি। অনিচ্ছুক বা সাধ্যের অতীত বোধ করলে যে কারও রয়ে যাবার অনুমতি ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন মুসলিম মক্কায় রয়ে যান কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহ বা কাপুরুষতার অভিযোগ ওঠেনি কখনও। তবে ৬২২ খৃস্টাব্দের জুলাই এবং আগস্ট মাসে আনুমানিক সত্তর জন মুসলিম সপরিবারে মদিনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে, নিজস্ব ঘরবাড়ি তৈরির আগ পর্যন্ত সেখানে তারা সাহায্যকারীদের বাড়িতে অবস্থান করেছে। ওদের বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে কুরাইশরা খুব একটা সচেষ্ট ছিল বলে মনে হয় না, যদিও কিছু নারী-শিশুকে জোর করে আটক করে উটের পিঠে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। মুসলিমরা অবশ্য কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করত; প্রায়ই শহরের বাইরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হত তারা। ছোট ছোট চোখে না পড়ার মত দলে ভ্রমণ করত। উমর সপরিবারে রয়ে গিয়েছিলেন, স্ত্রী রুকাইয়াহ্‌সহ উসমান ইবন আফফান এবং পয়গম্বরের পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দ যায়েদ এবং হামযাহ্‌র সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। মুহাম্মদ (স:) এবং আবু বকর অন্য সবাই বিদায় নেয়া পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপক দেশত্যাগ অচিরেই শহরে এক অস্বস্তিকর শূন্যতার জন্ম দিয়েছিল, কুরাইশ গোত্রের

যারা মাত্র দশবছর আগে সমৃদ্ধ আর ঐক্যবদ্ধ ছিল, তাদের মাঝে মুহাম্মদ (স:) কর্তৃক সৃষ্ট স্পষ্ট ক্ষতেরই যেন প্রতীকায়ন ঘটছিল। মুহাম্মদের (স:) চাচাত ভাই আব্দাল্লাহ ইবন জাহ্শ পরিবার এবং বোনদের নিয়ে *হিজরা* করেন : তাঁরা বিদায় নেয়ার পর মক্কার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত বাড়িখানা একেবারে খালি হয়ে যায়। 'এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকা খোলা দরজা আর নির্জন বাড়িটাকে'[৩৪] উতবা ইবন রাবি'আর চোখে অলুক্ষণে আর নির্জন দেখাচ্ছিল।

এরপর আগস্ট মাসে মুহাম্মদের(স:) নিরাপত্তা প্রদানকারী মু'তিম পরলোকগমন করেন। আবারও বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে পয়গম্বরের জীবন। সিনেটে তাঁকে নিয়ে একটা বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সতর্কতার সঙ্গে সভায় অনুপস্থিত থাকে আবু লাহাব। গোত্র প্রধানদের কেউ কেউ কেবল মুহাম্মদ (স:) শহর ছেড়ে চলে যান, এটাই চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যদের ধারণা জন্মেছিল মুহাম্মদকে (স:) অভিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হতে দিলে বিপদ হতে পারে। যারা *হিজরা* করেছে তারা সবাই বেপরোয়া এবং আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধন ছিন্নকারী বিশ্বাসঘাতক। এখন আর কিছুতেই দমবে না তারা, মুহাম্মদের (স:) নেতৃত্বে পেলে তারা মক্কার নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। শেষে আবু জাহ্ল এমন একটা পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন যার দ্বারা কোনওরকম রক্তপাত ছাড়াই মুহাম্মদকে (স:) সরিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে। প্রত্যেক গোত্র একজন করে শক্তিশালী এবং যোগাযোগে দক্ষ তরুণকে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করবে এবং এই তরুণের দল 'একসঙ্গে' মুহাম্মদকে (স:) হত্যা করবে। এতে করে প্রত্যেক গোত্রই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল বোঝাবে, ফলে হাশিম রক্তপণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। সমগ্র কুরাইশ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে না তারা।

অচিরেই তরুণদের নির্বাচিত করা হল। মুহাম্মদের (স:) বাড়ির বাইরে সমবেত হয়েছিল দলটি, কিন্তু জানালা দিয়ে ভেসে আসা সওদাহ এবং পয়গম্বরের মেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করে ওরা। পরিবারের নারী সদস্যদের সামনে কাউকে হত্যা করাটা লজ্জাজনক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত, পয়গম্বর ভোর বেলা যখন বের হবেন তখন পর্যন্ত অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হল তাই। ঘাতকদলের এক সদস্য জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে মুহাম্মদকে (স:) কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে জিব্রাইল ফেরেশতা কর্তৃক সঙ্কেত পেয়ে, যেমন বলা হয়ে থাকে, মুহাম্মদ(স:) পেছন-জানালা পথে সরে পড়েছিলেন এবং মুহাম্মদকে (স:) *হিজরার* প্রস্তুতিতে সাহায্য করার জন্যে রয়ে যাওয়া আলীকে নিজের পোশাক পরিয়ে আপাতঃ নিদ্রামগ্ন রেখে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালে আলী যখন বাইরে আসেন, গায়ে মুহাম্মদের (স:) কম্বল, তরুণরা বুঝতে পারে তাদের বোকা বানানো হয়েছে। মুহাম্মদকে (স:) জীবিত বা মৃত ফিরিয়ে আনার জন্যে কুরাইশরা একশটি মাদি উট পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এদিকে নগরীর বাইরের পাহাড়সারির এক গুহায় তখন আত্মগোপন করেছিলেন মুহাম্মদ (স:) এবং আবু

বকর। ওখানে তাঁরা তিনদিন অবস্থান করেন। সময়ে সময়ে সমর্থকরা লুকিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওদের সংবাদ ও রসদ পৌঁছে দিত। একবার, বর্ণিত আছে, এক অনুসন্ধানীদল গুহার পাশ অতিক্রম করে গেলেও ভেতরে খোঁজার কথা চিন্তাও করেনি : গুহামুখ আবৃত্ত করে ছিল এক বিরাট মাকড়শার জাল এবং তার সামনে রাতারাতি একটা অ্যাকাশে গাছ গজিয়ে উঠেছিল আর গুহামুখের দিকে যাবার জন্যে পা রাখার জায়গাটিতেই বসে ছিল এক পাহাড়ী ঘুঘু, স্পষ্টতঃই দীর্ঘসময় ধরে ডিমে তা দিচ্ছিল। এই তিনদিন সময়কালে গভীর শান্তি আর ঈশ্বরের উপস্থিতির জোরাল অনুভূতির লাভ করেন মুহাম্মদ (সঃ)। কোরান *'সাকিনা'* যার আরবী অর্থ প্রশান্তি-র অনুভূতি কথা বলে, কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে হিব্রু *'শেখিনাহ'* শব্দ দ্বারা প্রভাবিত বলে ধারণা করা হয়, যা দিয়ে পৃথিবীতে স্বর্গীয় উপস্থিতি বোঝান হয়ে থাকে।

> ...আল্লাহ তাকে [মুহাম্মদ (সঃ)] সাহায্য করেছিলেন
> যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।
> সে ছিল দুজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল,
> সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'মন-খারাপ কোরোনা,
> আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছেন।' তারপর
> আল্লাহ তার ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন।
> আর এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাকে শক্তিশালী
> করলেন যা তোমরা দেখনি...[৩৫]

পরিস্থিতি নিরাপদ মনে হবার পর পাহাড়ী ঘুঘুকে বিরক্ত না করে গুহা থেকে নেমে আবু বকরের সরবরাহ করা উটের পিঠে উঠে বসেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং আবু বকর। আবু বকর তাঁর সেরা উটটি মুহাম্মদকে (সঃ) দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পয়গম্বর মূল্য পরিশোধের ওপর জোর দিচ্ছিলেন : এটা তাঁর ব্যক্তিগত *'হিজরা'*, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন, সেজন্যে পুরো কাজটা একেবারে নিজের মত করে সম্পাদন জরুরি। উটটিকে তিনি কাসওয়া বলে ডাকতেন, বাকি জীবন এটা তাঁর প্রিয় বাহন হিসাবে রয়ে গিয়েছিল।

এবার অত্যন্ত বিপজ্জনক এক যাত্রায় পথে নামলেন ওঁরা, কারণ পথিমধ্যে মুহাম্মদের (সঃ) জন্যে কারও আনুষ্ঠানিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না বলা যায়। অত্যন্ত ঘোরা পথে ওদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল পথ প্রদর্শক, ধাওয়াকারীদের হারিয়ে দেয়ার জন্যে এঁকেবেঁকে বারবার আগুপিছু করছিল। ওদিকে মদিনা বাসী মুসিলমগণ অধীর আগ্রহে ওদের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। বেশ কজন অভিবাসী মরুদ্যানের একেবারে দক্ষিণে কুবা নামক স্থানে বাস করত, প্রত্যেকদিন সকালের প্রার্থনা শেষে তারা নিকটবর্তী আগ্নেয়পাহাড়ে উঠে দিগন্ত জরিপ করত। ৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ তারিখে জনৈক ইহুদী আগুয়ান দলটিকে দেখতে পেয়ে সাহায্যকারীদের লক্ষ্য করে

চেঁচিয়ে ওঠে : 'কাঈলাহর সন্তানগণ। তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন!'[৩৬] মুহূর্তে নারী-পুরুষ শিশুদের দল অভিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হতে ছুটে যায় এবং দেখতে পায় অতিথিগণ একটা খেঁজুর গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিন দিন কুবায় অবস্থান করেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং আবু বকর, পরে আলী এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু 'শহরে' (মরুদ্যানের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার নাম) অবস্থানরত মুসলিমরা তাঁকে দেখার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, তাই মুহাম্মদ (সঃ) তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বসবাসের স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন। কাসওয়ার পিঠে আসীন ছিলেন তিনি, প্রাণীটি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় চালিত হচ্ছিল বলে বর্ণিত আছে, ওকে আপন ইচ্ছায় অগ্রসর হতে দিয়েছিলেন। এগোনোর সময় অনেকেই তাঁকে নেমে তাদের বাড়িতে অবস্থানের আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে গেছেন যতক্ষণ না কাসওয়া আপন ইচ্ছায় দুই এতীম-ভাইয়ের খেজুর গুদামের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আর আগে বাড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। উটের পিঠ থেকে নেমে সবচেয়ে কাছের বাড়িতে মালপত্র পাঠিয়ে দুভাইয়ের সঙ্গে ওদের জমি কেনার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন মুহাম্মদ (সঃ)। ওরা যুক্তিসঙ্গত একটা দাম গ্রহণে রাজি হওয়ার পর একটা মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরুর নির্দেশ দেন তিনি, সঙ্গে তাঁর বসত বাড়িও থাকবে, মুসলিমরা সবাই মিলে কাজ শুরু করে দিয়েছিল, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে কাজ করেছে অভিবাসী আর সাহায্যকারীরা। কুরাইশরা সকলে কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল না, মুহাম্মদের (সঃ) অভিজাত মেয়ে জামাই উসমান ইবন আফফান কাজটাকে যেন কষ্টসাপেক্ষ মনে করলেন। কাজ করার সময় মাঝে মাঝে এ উপলক্ষ্যে রচিত গান গাইত তারা :

> হে খোদা, পরলোকের মত সুখ আর কোথাও নেই
> সুতরাং সাহায্যকারী আর অভিবাসীদের সাহায্য কর।[৩৭]

মুহাম্মদ (সঃ) শেষ পাঙক্তিকে 'সুতরাং অভিবাসী আর সাহায্যকারীদের সাহায্য কর' বলে গাইতেন। এই সংশোধন কবিতাংশের ছন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল : এটা অনেকটা মুহাম্মদের (সঃ) 'নিরক্ষর' থাকার চমৎকার একটা প্রকাশ; তিনি স্বভাবকবি ছিলেন না এবং তাঁর স্পষ্ট অদক্ষতা থেকেই বোঝা যায় কোরান কতখানি অলৌকিক একটা ব্যাপার।

কিন্তু গান আর ঐক্যবদ্ধ কাজের চেয়েও বড় কোনও বন্ধনের প্রয়োজন ছিল সাহায্যকারী ও অভিবাসীদের। একটা সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল যা ভাগ্যক্রমে পুরাতন সূত্রগুলো সংরক্ষণ করেছে যার ফলে প্রথম ইসলামি সমাজের নীলনকশা দেখতে পাই আমরা। এখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ (সঃ) মদিনাবাসী আরব ও ইহুদী গোত্রসমূহের সঙ্গে একটা চুক্তিতে উপনীত হচ্ছেন। মরুদ্যানের সকল গোত্র তাদের পুরনো শত্রুতা ভুলে, যেমন উল্লেখ রয়েছে, একটা নতুন মহাগোত্র গঠন

করবে। মুসলিম এবং ইহুদীরা মদিনার পৌত্তলিকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে, যতক্ষণ না তাঁরা পয়গম্বরকে বহিষ্কার করার জন্যে মক্কার সঙ্গে আলাদা কোনও চুক্তি করছে। চুক্তির ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, 'কোনও পৌত্তলিক কুরাইশদের কাউকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে পারবে না, যেটা জান বা মাল যাই হোক না কেন, অথবা কোনও বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে না।'[৩৮] ঈশ্বরই সমাজের বিধাতা এবং নিরাপত্তার (*জিম্মা*) একমাত্র উৎস। আর মুসলিমদের জন্যে একেবারে নতুন ধরনের একটা দল গঠন করেছিল তারা। 'সকল গোত্র একটা মাত্র সমাজ (*উম্মা*), অন্যদের বাদ দিয়ে।'[৪০] এতদিন পর্যন্ত গোত্রই ছিল সমাজের মূল উপাদান; অবশ্য *উম্মা*, রক্তের সম্পর্কের ওপর নয় ধর্মের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত একটা সমাজ ছিল। আরবে এটা ছিল নজীরবিহীন। থিওক্রেসি গঠনের জন্যে মুহাম্মদের (সঃ) মূল পরিকল্পনার অংশ ছিল না এটা– তিনি সম্ভবতঃ থিওক্রেসি কী তাই জানতেন না। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ তাকে তাঁর মূল পরিকল্পনার বাইরে ঠেলে দিয়েছিল, যার ফলে একেবারে নতুন একটা সমাধান গ্রহণ করতে হয়েছে তাঁকে। সমাজে বিভক্তি সৃষ্টিকারী শক্তি ছিল ইসলাম : মুহাম্মদকে (সঃ) পিতা-মাতার কাছ থেকে তাদের সন্তানদের কেড়ে নেয়ার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু *হিজরার* আগে কুরাইশ গোত্র ত্যাগ করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। এবার প্রাচীন গোত্রীয় বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল এবং কুরাইশ, আউস এবং খাসরাজ মিলিত হয়ে একটি মাত্র *উম্মা* গঠন করল। ইসলাম বিভক্তি নয় একতার শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে শুরু করল।

কিন্তু অনিবার্যভাবে গোত্রীয় ধ্যান ধারণা প্রথম দিকের মুসলিমদের *উম্মা* সংক্রান্ত ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। গোত্রীয় প্রথাই নতুন সমাজ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করে দিচ্ছিল। এভাবে কোরানও :

> নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে,
> ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে,
> ও যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে
> তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।
> আর যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু ধর্মের জন্য হিজরত করেনি,
> হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নেই।
> আর ধর্ম সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে
> তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে
> নয় যে-সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।...[৪১]

সদস্য হওয়ার পূর্বশর্ত : আপনাকে *হিজরা* করতে হবে, আপনার গোত্র ত্যাগ করে '*উম্মা*'য় যোগদান করতে হবে। গোত্রের মত '*উম্মা*' ও পৃথক একটা জগত : 'একটা

মাত্র সমাজ অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে,'[৪২] কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এটা অন্যান্য গোত্রের একটা 'কনফেডারেট'ই বোঝাত। '*উম্মা*'র একতার ভেতর দিয়ে স্বর্গীয় একত্বের প্রকাশ ঘটবে, ব্যক্তিজীবনে যার প্রকাশ ঘটানোর তাগিদ রয়েছে মুসলিমদের ওপর। রক্তের সম্পর্ক, গোত্রীয় আনুগত্য কোনওভাবেই *উম্মার* ঐক্যের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, যুদ্ধের কারণে পরিণত হতে দেয়া যাবে না : গোত্র যাই হোক না কেন একজন মুসলিম আরেক জন মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। তখনও *উম্মা*'র সর্বময় কর্তা হননি মুহাম্মদ (স:)। মদিনায় তাঁর অবস্থান ছিল খুবই সাধারণ, গোড়ার দিকে মদিনার গোত্রপতি সা'দ ইবন মুয়াধ বা ইবন উব্বাঈয়ের চেয়ে অনেক নিচে। মুসিলমদের বিরোধ মীমাংসায় নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কেবল বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

বৈপ্লবিক সমাধান ছিল এটা, কিন্তু মদিনার পরিস্থিতি যেহেতু ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, প্রাচীন দুরাময়ে যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে যেকোনও পরিবর্তনই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এবং গোড়ার দিকে প্রত্যেকে এরকম একটা সমাধান মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। পৌত্তলিকদের দিক থেকে কোনওরকম বিরোধিতা আসেনি। আবু আমির নাসের একজন আরব ভাববাদী (কখনও কখনও আল-রাহিব : সন্ত নামে পরিচিত) মুহাম্মদের (স:) আগমনের পর মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এরপর যেসব পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি তারা নিজেদের আড়াল করে রেখেছিল। এমনকি আবু কায়েস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিবেদিত প্রাণ মুসলিমে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। প্রথমে ইহুদীরাও নতুন ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল, কেউ কেউ আরব একেশ্বরবাদের নতুন রূপে দীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। কিন্তু কেউ ধর্মান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ না করলে মুহাম্মদ (স:) কখনও কাউকে তাঁর আল-লাহর ধর্ম গ্রহণের আহবান জানাননি। কোরানে একটা অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে নতুন ধর্ম গ্রহণকারী ইহুদীরা একটা সমান্তরাল সমাজ গড়ে তুলেছিল এবং নিজেদের সবচেয়ে আগে ইহুদী বলেই বিবেচনা করত।[৪৩] তারা একেবারে সত্য নিজস্ব একটা প্রত্যাদেশ পেয়েছিল এবং কোরানের ভাষায়, তাদের ইসলাম গ্রহণের কোনওই প্রয়োজন ছিল না। তো শুরুর দিকে সবকিছুই মনে হয়েছে আশাব্যাঞ্জক, এমনকি আরব নয় এমন এক ব্যক্তি পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মসজিদ নির্মাণ কাজ চলার সময় সালমান নামে একজন পার্সিয় দাস, বনি কুরাইযাহ্‌র এক ইহুদী ছিল তাঁর মনিব, মুহাম্মদের (স:) কাছে এসে নিজের জীবন কাহিনি শোনান। তাঁর জন্ম হয়েছিল ইসফাহানের নিকটবর্তী এক জায়গায়, খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে আরবে আবির্ভূত হবেন এমন এক পয়গম্বরের কাহিনী শোনেন। হিজাজে যাওয়ার পথে অপহৃত হন তিনি এবং তাঁকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীকালে ইসলামের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন সালমান : তাঁকে সাধারণত যেসব অনারব এশিয় ব্যক্তি ইসলামের সেবায় তাঁদের মেধা ও মননের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তাঁদের অগ্রপুরুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৬২৩ সালের এপ্রিল মাসে, *হিজরার* আনুমানিক সাত মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। কাঠামো ছিল ইটের, কিন্তু দক্ষিণের জেরুজালেমমুখী দেয়ালে পাথর ঘেরা একটা জায়গার মাধ্যমে *কিবলার* অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার জন্যে প্রশস্ত একটা উঠোন ছিল। শুরুতে কোনওরকম আহবান ছাড়াই লোকে প্রার্থনায় যোগ দিতে হাজির হত, কিন্তু যেহেতু একেকজন একেক সময় উপস্থিত হত, ব্যাপারটা তাই সন্তোষজনক ছিল না। ইহুদীদের মত ভেড়ার শিঙ ফোঁকার ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভেবেছিলেন মুহাম্মদ (স:), কিংবা এশিয় ক্রিশ্চানদের মত কাঠের ক্ল্যাপার; কিন্তু অভিবাসীদের একজন স্বপ্নে দেখল : সবুজ জোব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি তাকে বলছেন যে লোকজনকে প্রার্থনায় যোগ দেয়ার আহবান জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে দরাজ গলার অধিকারী কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে তিনবার উচ্চস্বরে '*আল-লাহ্ আকবার!*' (আল্লাহ মহান) উচ্চারণ করিয়ে মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেয়া–আল্-লাহর চেয়ে মহান আর কিছু হতে পারে না। এই আহবান এভাবে উচ্চারিত হবে : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল-লাহ ছাড়া কোনও ঈশ্বর নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। প্রার্থনার জন্যে এসো। প্রার্থনার জন্যে এসো! কল্যাণের জন্যে এসো! কল্যাণের জন্য এসো *আল্-লাহ্ আকবার। আল্-লাহ্ আকবার*। আল্-লাহ ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই।' প্রস্তাবটি মুহাম্মদ (স:)-এর পছন্দ হয় এবং তিনি আবু বকরের মুক্তাদাস বিলালকে দায়িত্ব প্রদান করেন, তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। প্রত্যেকদিন ভোরে মসজিদের নিকটবর্তী সবচেয়ে উঁচু বাড়ির ছাদে উঠে সেখানে বসে আলো ফোটার অপেক্ষায় থাকতেন তিনি। আলোর আভাস পেলে দু'হাত প্রসারিত করে আহবান শুরুর আগে বলতেন, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমার প্রশংসা করছি আর কুরাইশরা যাতে তোমার ধর্ম গ্রহণ করে সেজন্যে তোমার সাহায্য কামনা করছি।'[৪৪]

মসজিদে মুহাম্মদের (স:) আলাদা কোনও ঘর ছিল না, তবে পুবদিকে দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন দুটো দালান ছিল, একটি সওদাহ এবং অপরটি আয়েশার জন্যে। পরবর্তীকালে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্যে মসজিদে আলাদা আলাদা ঘর নির্মিত হয় এবং মুহাম্মদ (স:) পালাক্রমে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করেন। মসজিদ নির্মাণ হয়ে গেলে তখনও মক্কায় রয়ে যাওয়া পরিবারের নারী সদস্যদের আনার জন্য যায়েদকে প্রেরণ করেন তিনি। সওদাহ, উম্ম কুলসুম এবং ফাতিমাহকে (যায়নাব পৌত্তলিক স্বামী আবু আল-আসের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিলেন) আর স্ত্রী উম্ম আয়মানকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন যায়েদ। আবু বকরের পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যগণও : ছেলে আব্দাল্লাহ, স্ত্রী উম্ম রুমান এবং দুই মেয়ে আসমা ও আয়েশাও *হিজরা* করার জন্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

মহিলারা এসে পৌছার পর বেশ কয়েকটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ (স:) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে উম্ম আয়মানের তুলনায় বয়সে আরও নিকটবর্তী একজন স্ত্রী প্রয়োজন যায়েদের, তিনি আব্দাল্লাহ ইবন জাহশের কাছে তাঁর অপরূপ সুন্দরী বোন

যায়নাবের নাম প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব যায়নাবের পছন্দ হয়নি। বেঁটে খাট, বোঁচা-নাক যায়েদ আকর্ষণীয় তরুণ ছিলেন না, তাছাড়া আমরা দেখব, যায়নাবের আশা ছিল আরও ওপরে। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) সত্যি এমনটি চান বুঝতে পেরে সম্মতি দিয়েছিলেন তিনি। আবু বকরও তাঁর মেয়ে আসমাকে মুহাম্মদের (স:) চাচাত ভাই যুবায়ের ইবন আল-আওয়ামের সঙ্গে পয়গম্বরের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীরতর করার উদ্দেশ্যে বিয়ে দিয়েছিলেন।

সবশেষে মদিনায় পৌঁছার মাসখানেক পর সিদ্ধান্ত নেয় হয় মুহাম্মদ (স:) সঙ্গে আয়েশার বিয়ে অনুষ্ঠানের সময় হয়েছে। আয়েশার বয়স তখন মাত্র নয় বছর, সেজন্যে কোনও উৎসবের আয়োজন করা হয়নি, সীমিত পরিসরে সারা হয় অনুষ্ঠানটি। প্রকৃতই, সেদিনটি এতটাই শাদামাঠা ছিল স্বয়ং আয়েশাও জানতে পারেননি যে তাঁর বিয়ে হতে যাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে সী-স খেলছিলেন। বাহরাইন থেকে লাল-ডোরাকাটা কাপড় কিনে এনেছিলেন আবু বকর, সেটা দিয়েই আয়েশার বিয়ের পোশাক বানানো হয়। এরপর তাঁকে মসজিদের পাশের তাঁর ছোট ঘরে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। সেখানে মুহাম্মদ (স:) তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। আয়েশাকে অলঙ্কার পরানো আর চুল আঁচড়ানোর সময় হাসাহাসি করেছেন তিনি। পরে একটা বাটিতে করে দুধ আনা হয় এবং মুহাম্মদ (স:) ও আয়েশা উভয়েই তা পান করেন। বিয়ে আয়েশার জীবন খুব একটা পরিবর্তন ঘটায়নি। তাবারি বলছেন যে, তাঁর বয়স এত কম ছিল, তিনি মা-বাবার সঙ্গে তাঁদের বাড়িতেই অবস্থান করতেন, পরে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিয়ে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। মাঝে মাঝে মুহাম্মদ (স:) তাঁকে দেখতে আসতেন, এবং আয়েশা বলেছেন, ছোট মেয়েরা, 'লুকিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যেত আর ওদের ফিরিয়ে আনতে যেতেন তিনি, কারণ ওরা থাকলে তিনি খুশি হতেন।' মেয়েরা ছোট থাকতে মুহাম্মদ (স:) তাঁদের সঙ্গে খেলতেন এবং মাঝে মাঝে আয়েশাও খেলায় যোগ দিয়েছেন। একদিন, আয়েশা স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'আমি পুতুল নিয়ে খেলছি এমন সময় পয়গম্বর এসে বললেন, "হে আয়েশা, এটা কী খেলা?" আমি বললাম, "এটা সালোমনের ঘোড়া", শুনে তিনি হেসে উঠলেন।'[৬৫]

কিন্তু উম্মার মাঝে আকস্মিক এক দুঃখময় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন আয়েশা। একদিন দেখতে পেলেন তাঁর বাবা এবং দুজন মুক্তাদাস আমির ও বিলাল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছেন, ইয়াথরিবে পৌঁছার পর অভিবাসীদের অনেকেরই এই জ্বর হয়েছিল। তিনজনই প্রলাপ বকছিলেন, বিলাল এককোণে পড়ে দরাজ গলায় মক্কার কথা ভেবে গান গাইছিলেন:

> আর কি কখনও ফাখখ্-এ রাত কাটানোর সুযোগ হবে
> সুগন্ধি লতাপাতা আর গুল্মের মাঝে?

সেদিন কি আসবে যেদিন আমি মাজান্নার পানিতে নামতে পারব;
আবার কি কোনও দিন শামা আর তাফিল দেখতে পাব?[৪৬]

দৌড়ে সোজা মুহাম্মদের (স:) কাছে চলে এলেন আয়েশা। অভিবাসীদের বেদনা আর স্থানচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন মুহাম্মদ (স:), তিনি আয়েশাকে আশ্বস্ত করেন, তবে প্রার্থনার এ অংশ যোগ করেছিলেন : 'হে প্রভু, মদিনাকে আমাদের কাছে মক্কার মত বা তারচেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন।'[৪৭] সাহায্যকারীদের মাঝে সৃষ্ট আরও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন তিনি। মদিনার নবদীক্ষিত সব মুসলিম পুরোপুরি আন্তরিক ছিল না, তাঁরা নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, বিশ্বাস থেকে নয়। তাদের কাছে নতুন ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটা অপরিবর্তনীয় একটা ধারা বলে মনে হয়েছে, তাঁরা পিছিয়ে থাকতে চায়নি, তবে একটা সময় পর্যন্ত স্রেফ সীমানায় বসে নতুন পদক্ষেপের ফলাফল কী দাঁড়ায় তা দেখার অপেক্ষা করছিল। অসন্তুষ্ট এই দলটি আব্দাল্লাহ ইবন উব্বাঈয়ের আশপাশে সমবেত হতে শুরু করেছিল–মুহাম্মদ (স:) না এলে উব্বাঈ সম্ভবতঃ মদিনার নৃপতি হতেন। ইবন উব্বাঈ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মোটেই উদ্যমি ছিলেন না, ঝামেলার দিকে গড়ালে আন্দোলন ছিনতাইয়ের আশায় ছিলেন। কোরানের দ্বিতীয় এবং দীর্ঘতম সুরা মদিনায় অবস্থানের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে অবতীর্ণ হয়, এখানে স্রেফ সমস্যা সম্পর্কে মুহাম্মদ (স:)-এর সচেতনতার প্রকাশ রয়েছে।[৪৮] সাময়িকভাবে ইবন উব্বাঈয়ের বেলায় ধৈর্যাধারণ করছিলেন মুহাম্মদ (স:); মসজিদে তাঁকে সম্মানের অবস্থান দিয়েছিলেন তিনি এবং প্রত্যেক শুক্রবারের সাপ্তাহিক প্রার্থনার সময় তাঁকে সমবেতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হত। বিনিময়ে তিনি ওপরে ওপরে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে ভদ্রজনোচিত আচরণ করতেন কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়ত। একটা অপ্রীতিকর ঘটনার পর সাহায্যকারীদের একজন মুহাম্মদকে (স:) একপাশে ডেকে নিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন : 'ওর ওপর রুষ্ট হবেন না, কারণ ঈশ্বর আপনাকে পাঠানোর আগে আমরা তাঁকে রাজা নির্বাচিত করার কথা ভাবছিলাম, ঈশ্বরের শপথ, তাঁর ধারণা হয়েছে আপনি তাঁর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন।'[৪৯]

অসন্তুষ্ট আরবদের মত ইহুদীরাও প্রথমে মুহাম্মদকে (স:) সন্দেহাবসর দিতে রাজি ছিল, বিশেষ করে তিনি যেহেতু জুডাইজমের দিকে দারুণভাবে ঝুঁকে আছেন বলে মনে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ইবন উব্বাঈয়ের সঙ্গে যোগ দেয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। প্রার্থনার সময় তারা মসজিদে সমবেত হয়ে 'মুসলিমদের গল্প শুনত আর তাদের ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত।'[৫০] তাদের জন্যে কাজটা বেশ সহজ ছিল, ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা থাকায় বাইবেলিয় বিবরণের চেয়ে লক্ষ্যণীয়ভাবে আলাদা কোরানে উল্লিখিত বিভিন্ন পয়গম্বরের গল্প সম্পর্কে অনায়াসে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারত তারা। মুহাম্মদকে(স:) সত্য পয়গম্বর

হিসাবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে জোরাল আপত্তি তুলেছিল এবং বিদ্রূপাত্মক সুরে দাবী করছিল : যে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পাওয়ার দাবী করছে সে এমনকি নিজের উট কোথায় হারিয়ে গেল সেটাই বলতে পারে না।[৫১] এসব কটাক্ষপূর্ণ সমালোচনা মুসলিমদের এমন বিপর্যস্ত করে দিত যে প্রায়ই মারপিট লেগে যেত এবং বিশেষ কিছু নির্দয় ব্যঙ্গের পর ইহুদীদের মসজিদ থেকে বের করার মত অপ্রীতিকর ঘটনারও জন্ম হয়েছে। প্রত্যাখ্যানের পক্ষে দৃঢ় ধর্মীয় ভিত্তি ছিল তাদের। একজন মসিহর অপেক্ষায় ছিল তারা, কিন্তু এটাও বিশ্বাস করত যে পয়গম্বরত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এ সময় কোনও ইহুদী বা ক্রিশ্চান নিজেকে ফেরেশতা বা প্যাট্রিয়ার্ক দাবী করার কথা ভাবত না, পয়গম্বর তো দূরের কথা। কিন্তু মুহাম্মদকে (সঃ) গ্রহণ করার জন্যে মদিনার ইহুদীদের জন্যে পূর্ব নজীরও ছিল, কারণ সাইনাগগে 'গডফিয়ারারদের' স্বাগত জানানোর প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল জুডাইজমের। এ ধরনের লোকেরা মোজেসের সকল আইন অনুসরণ করে না তবে তাদের বন্ধু এবং সহযোগী হিসাবে দেখা হয়, মুসলিমদেরও সেরকম বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু মদিনায় মুহাম্মদের (সঃ) আগমনের পর তাদের অবস্থান নাটকীয়ভাবে কতখানি নেমে গেছে টের পাওয়ার পর তারা প্রবলভাবে পয়গম্বরকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইহুদীদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা মুহাম্মদের (সঃ) জীবনের সবচেয়ে বড় হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা, এতে তাঁর ধর্মীয় অবস্থান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মদিনায় বন্ধুসুলভ ইহুদীরাও ছিল যারা তাঁকে ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে তাদের স্বগোত্রীয়দের ভাষায় জবাব দেয়ার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে কোরানের যুক্তি বেশ উন্নত এবং এতেই বোঝা যায় সমালোচনা কতখানি বিব্রতকর ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বর্ধিত জ্ঞানের সাহায্যে তাদের ক্ষতিকর মন্তব্যের উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম হয়েছেন। ইহুদীদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থে তাদের বিশ্বাসহীন জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যখন আবার পৌত্তলিকতায় ফিরে গিয়ে সোনালি বাছুরের [গোল্ডেন কাফ] উপাসনা করেছে তখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি খেলাপ করেছিল; [৫২] তারা 'অরাল-ল'[৫৩] প্রবর্তন করার সময় অন্যায় আবিষ্কার করেছিল; তারা বারবার পয়গম্বরদের সতর্কবাণী শুনতে ব্যর্থ হয়েছে।[৫৪] ইহুদীদের ইতিহাসের সময়-বিস্তার সম্পর্কেও জানতে পেরেছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং জানতে পেরেছিলেন যদিও আগে ইহুদী এবং ক্রিশ্চানদের একই ধর্মের অংশ বলে মনে করেছিলেন তিনি, আসলে তাদের মাঝে গুরুতর মতদ্বৈততা রয়েছে। আরবদের মত বহিরাগতদের কাছে দুটো অবস্থান থেকে বাছাই করার তেমন কিছু ছিল না, দুটো আহল আল-কিতাব নিশ্চয়ই কিছু নতুন, খাঁটি নয় এমন উপাদান আদি মূল প্রত্যাদেশের সঙ্গে যোগ করেছে বলে ধারণা করাটা ছিল স্বাভাবিক। ইহুদীদের সঙ্গে বিবাদের ফলে ক্রিশ্চানদের সঙ্গে মুহাম্মদের (সঃ) সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কখনও কখনও কোরান সত্যিই ইহুদীদের বিরুদ্ধে ক্রিশ্চানদের পক্ষাবলম্বন করেছে যখন ইহুদীদের জেসাসকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার দাবীর জবাব দিতে গিয়ে ডসেটিস্ট জবাবের অনুরূপ জবাব দিচ্ছে যে জেসাস আসলে

মৃত্যুবরণ করেননি : যাকে মৃত্যুবরণ করছে মনে হয়েছে আসলে সে প্রতিমূর্তি মাত্র[৫৫] ; কিন্তু ঈশ্বর কোনও পুত্র জন্মদান করতে পারেন, ক্রিশ্চানদের এমন দাবী মানহানিকর বলে মনে করেছে কোরান : ব্যাপারটা মুহাম্মদের (স:), যিনি ঈশ্বরের কন্যা থাকার ব্যাপারটি অস্বীকার করার কারণে কতই না দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন, পছন্দ না হওয়ারই কথা, এ ধারণার প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকতে পারে না। কোরান বারবার বলছে এই ধরনের বিশ্বাস *যান্নার* উদাহরণ, মানুষের জ্ঞানের অগম্য বিষয়ে অলস বিভক্তি সৃষ্টিকারী অনুমানমাত্র যা আহ্‌ল আল-কিতাবকে দুটো বিবদমান শিবিরে ভাগ করে দিয়েছে।[৫৬]

তারপরও, মুহাম্মদ (স:) তখনও তাঁর প্রত্যাদেশকে পূর্বেকার পয়গম্বরদের প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের সমমতাবলম্বী বলে দাবী করছিলেন। ইহুদীরা সবাই শত্রুভাবাপন্ন ছিল না, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে বর্তমানের সমস্যা সত্ত্বেও মুসলিমদের আহল আল-কিতাবের সঙ্গে যেসব বিষয়ে মিল আছে সেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। এমনও হতে পারে, মুহাম্মদ (স:) বিশ্বাস করতেন যে, সকল ক্রিশ্চান ঈশ্বরের পুত্র থাকার মানহানিকর ধারণায় বিশ্বাসী নয়। যেসব ইহুদী এবং ক্রিশ্চান কোরানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বা যারা খাঁটি ধর্মে অগ্রহণযোগ্য বিষয়াদি যোগ করেছে কেবল তাদের সঙ্গেই মুসলিমদের বিরোধ :

> তোমরা কিতাবীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের
> সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করে তাদের
> সাথে নয়। আর বলো, 'আমাদের ওপর ও তোমাদের ওপর
> যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর
> আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই,
> আর তারই কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।'[৫৭]

যদিও ইয়াথরিবের প্রধান তিনটি ইহুদী গোত্রের সঙ্গে বিরোধ আরও প্রবল রূপ ধারণ করেছিল কিন্তু এটাই মুসলিমদের নীতি রয়ে গেছে।

মদিনায় অব্রাহাম সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে পারেন মুহাম্মদ(স:)। নাজাত বা উদ্ধার প্রাপ্তির কাহিনীর সময়ানুক্রম নতুন জ্ঞানের সাহায্যে তিনি বুঝতে পারেন যে অব্রাহাম যে মোজেস বা জেসাস পূর্ববর্তীকালে জীবিত ছিলেন তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ফলে মোজেস এবং জেসাসের অনুসারীরা অর্থহীন বিতর্কে জড়িত আছে বলে মনে হলেও তারা তোরাহ্ এবং গসপেলের আগের পয়গম্বর অব্রাহামের খাঁটি ধর্মবিশ্বাসে অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি যোগ করেছে ধরে নেয়াটাই যুক্তিযুক্তি ছিল':

> ইব্রাহিম ইহুদীও ছিলনা, খৃস্টানও ছিল না।
> সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের
> দলভুক্ত ছিল না। যারা ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছিল তারা

আর এই নবী ও বিশ্বাসীরাই মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের
ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।[৫৮]

মক্কায় মোজেস ছিলেন মুসলিমদের প্রিয় পয়গম্বর; মদিনায় অব্রাহাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং মুহাম্মদ (স:) ইহুদীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সঠিক জবাব খুঁজে পান। তিনি এবং তাঁর মুসলিমরা প্রথম মুসলিম যিনি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাঁর খাঁটি ধর্মবিশ্বাসে (*হানিফায়াহ*)র চেতনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমরা জানি না অব্রাহামের ধর্মে ফেরার জন্যে মুহাম্মদ (স:) স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপনকারী কিছু আরবের ইচ্ছার কাছে কতদূর নতি স্বীকার করেছিলেন ; কোরানে মক্কার ছোট *হানিফায়াহ* গোত্রের উল্লেখ নেই এবং মাদানী সুরাসমূহের আগে অব্রাহামের প্রতিও তেমন একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়নি। অবশ্য এই পর্যায়ে মুসলিমরা সম্ভবতঃ তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে *হানিফায়াহ*, অব্রাহাম অনুসৃত খাঁটি ধর্মবিশ্বাস হিসাবে অভিহিত করত বলে মনে হয়।

সুতরাং ধর্মবিশ্বাস যে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ, বিশ্বাসের কোনও জাগতিক অভিব্যক্তির কাছে নয়–এমনি মৌলিক বিশ্বাসকে ভাগ না করেই মুহাম্মদ (স:) ইহুদীদের পাল্টা জবাব দেয়ার একটা উপায় পেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অব্রাহামের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর নবমূল্যায়ন তাঁকে এই বিশ্বাস গভীর করতে সাহায্য করেছিল। যেসব ইহুদী এবং ক্রিশ্চান অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে তাদের বিশেষ প্রত্যাদেশ মেনে নেয়ার জন্য মানুষকে আহবান জানিয়েছে তারা আসলে অব্রাহামের কাছে প্রেরিত আদি প্রত্যাদেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছিল অতীতের পয়গম্বরদের পূর্ব বাণী থেকেও যারা একে অন্যের দর্শনের প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন :

তোমরা বলো : 'আমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করি
আর যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল
ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে
এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মুসা ও
অন্যান্য নবীকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না
এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।'[৫৯]

স্বয়ং ঈশ্বরের বদলে বিশ্বাসের মানবীয় প্রকাশকে বেছে নেয়া নিঃসন্দেহে 'অংশীবাদীতা'। প্রত্যাদেশসমূহ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের বাণীকে নাকচ করে না; বরং সেগুলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং তার ধারাবাহিকতা মাত্র।

মহান পয়গম্বরদের তালিকায় অব্রাহামের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাইলের নামোল্লেখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুভাবাপন্ন আরবীয় ইহুদীরা প্রথমবারের মত তাঁকে ইসমাইলের কাহিনী শুনিয়েছিল আর সেই সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিল স্থানীয় চলতি কিছু

কিংবদন্তী।[৬০] জেনেসিস পুস্তকে, মুহাম্মদ (স:) জানতে পারেন, বর্ণিত আছে: উপপত্নী হ্যাগারের গর্ভে ইসমাইল (যার অর্থ ঈশ্বর শুনেছেন) নামে অব্রাহামের এক ছেলে ছিল কিন্তু সারাহর গর্ভে ইসহাকের জন্ম গ্রহণের পর তিনি হ্যাগার এবং ইসমাইলের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এবং ওদের বিদায় করানোর জন্যে অব্রাহামের ওপর জোর খাটাতে শুরু করেন। অব্রাহাম ছেলেকে ত্যাগ করে দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইসমাইলও এক মহানজাতির আদি পিতা হবেন। তো অব্রাহাম তখন হ্যাগার ও ইসমাইলকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইসমাইল বুনো ও মহান যোদ্ধা হিসাবে বেড়ে ওঠেন।[৬১] আরবীয় ইহুদীরা বিশ্বাস করে ইসমাইলই আরব জাতির পিতা, এবং কথিত আছে, অব্রাহাম হ্যাগার এবং তাঁর ছেলেকে মক্কায় এনে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে, অব্রাহাম মক্কায় ইসমাইলকে দেখতে আসেন এবং যৌথভাবে কা'বাগৃহ, আরবে ঈশ্বরের প্রথম উপাসনালয়, নির্মাণ করেন তাঁরা। সুতরাং আরবরাও ইহুদীদের মতই অব্রাহামের বংশধর। এ কাহিনী নিশ্চয়ই মুহাম্মদের (স:) ভাল লেগেছে। কা'বাগৃহের একটা নতুন তাৎপর্য ধরা পড়েছিল এতে, এটাও বোঝা গেছে যে ঈশ্বর আরবদের বিস্মৃত হননি, বরং তারা বহুদিন আগে থেকেই তাঁর মাহাপরিকল্পনার অংশ। কোরানে দেখা যায় অব্রাহাম এবং ইসমাইল ঈশ্বরের কাছে তাঁর ঘর নির্মাণ শেষ করার পর এই প্রার্থনা করছেন যেন তিনি আরবদের মাঝে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন।[৬২] মুহাম্মদ (স:) আরদের ঐশীগ্রন্থ উপহার দিচ্ছিলেন, এবার তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসের গভীরে স্থাপিত সম্পূর্ণ আলাদা একটি আরব ধর্মবিশ্বাস এনে দেবেন।

অধিকাংশ ইহুদীর শত্রুতা স্থায়ী, এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেলে, নতুন ধর্ম অবশেষে পুরাতন ধর্মের ওপর নিজের নির্ভরতা না থাকার ঘোষণা দেয়। ৬২৪ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে, শাবান মাস চলছে তখন, *হিজরার* আনুমানিক দেড় বছর পরের কথা, মুহাম্মদ (স:) পরলোকগত বারা ইবন মু'রার-এর গোত্রের এলাকায় স্থাপিত এক মসজিদে শুক্রবারের প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন–ব্যাপারটা তাৎপর্যময়–আকস্মাৎ এক বিশেষ প্রত্যাদেশের প্রেরণায় তিনি পুরো জামায়েতটিকে বিপরীত দিকে ঘোরালেন এবং জেরুজালেমের পরিবর্তে মক্কার দিকে ফিরে প্রার্থনা শেষ করলেন। ঈশ্বর মুসলিমদের প্রার্থনার জন্যে একটা নতুন লক্ষ্য আর একটা নুতন দিক (*কিবলা*) দিয়েছিলেন :

আমি লক্ষ্য করি তুমি আকাশের দিকে বারবার তাকাও।
তাই তোমাকে এমন এক কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি
যা তুমি পছন্দ করবে। সুতরাং তুমি মসজিদ-উল-হারামের
দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন,
কা'বার দিকে মুখ ফেরাও।[৬৩]

কিবলার পরিবর্তনকে মুহাম্মদ (স:)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ধর্মীয় অবদান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মক্কার দিকে ফেরার ভেতর দিয়ে মুসলিমরা নীরবে জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা কোনও প্রতিষ্ঠিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা আসলে স্বয়ং ঈশ্বরের দিকে ফিরছে। নিজেদের কা'বার দিকে স্থাপন করার মাধ্যমে, যার সঙ্গে ঈশ্বরের একক ধর্মকে বিবদমান উপদলে বিভক্ত করার জন্যে দায়ী দুটো পুরনো ধর্মের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তারা কা'বাগৃহের নির্মাণকারীর আদি ধর্মবিশ্বাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিল :

> অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে
> বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নয়,
> তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম
> সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।...
>
> বলো : 'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে পরিচালিত করেছেন
> সরল পথে, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মে–একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের সমাজে,
> আর সে তো অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'
>
> বলো : 'আমার নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন
> ও আমার মৃত্যু বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।
> তাঁর কোন শরিক নেই, আর আমাকে এ-ব্যাপারেই
> তো আদেশ করা হয়েছে যেন আত্মসমর্পণকারীদের
> মধ্যে আমি অগ্রণী হই।'
> বলো : 'আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন প্রতিপালক
> খুঁজব, যখন তিনি সবকিছুর প্রতিপালক?'...[১৪]

স্বয়ং ঈশ্বরের পরিবর্তে মানবীয় ব্যবস্থাকে পছন্দ করা আংশীবাদীতা (*শিরক*), এবং মুসলিমদের অবশ্যই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ঐতিহ্য নয়, বরং ঈশ্বরকেই তাদের জীবনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে।

মুসলিমদের জেরুজালেমের বদলে নতুন *কিবলা* পছন্দ হবে বলে যথার্থই উচ্চারণ করেছে কোরান। অভিবাসী ও সাহায্যকারীগণ উভয়ই কা'বার প্রতি অনুরক্ত ছিল–মুহাম্মদ (স:) *হজ্জের* সময় প্রথম সাহায্যকারীদের সাক্ষাৎ পান, এটা কোনও দুর্ঘটনা ছিল না। এখন আর অন্য দুই পুরনো ধর্মের তুলনায় নিজেদের হীন ভাববার কারণ রইল না, তারা আর অন্ধের মত ওদের পথ অনুসরণ করছে না। তাদের নিজস্ব রীতি-পদ্ধতি রয়েছে, যা আরবদের জন্যে দুর্ভাগ্যজনক ঔপনিবেশিক সংস্পর্শ বিজড়িত ধর্মগুলোর চেয়ে পৃথক। মক্কার প্রতি তাদের অনুরাগ আরও একবার সাহায্যকারী ও অভিবাসীদের একটা সাধারণ *উম্মায়* একত্রিত করার ক্ষেত্রে একটি

উপাদান হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল; এবং অভিবাসীদের *হিজরার* স্থানচ্যুতির বেদনাকে প্রশমিত করেছিল।

কিবলার পরিবর্তন গর্বিত এক মুসলিম পরিচয়ের লক্ষণ ছিল। তিনটি আলাদা আলাদা গোত্র থেকে আসা সত্ত্বেও মুসলিমরা একটা সাধারণ পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছিল যা তাদের মাঝে নতুন বন্ধন গড়ে তুলছিল। বিলাল প্রার্থনার আহবান জানানোর সময় তারা সকলে একসঙ্গে ঘুম থেকে জেগে উঠত; মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় সবাই কাজের বিরতি দিত–*সালাত* আদায়ের জন্যে। দানের ব্যাপারটি তাদের দরিদ্রদের প্রতি সাধারণ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। এখন যেখানেই থাকুক না কেন, সবাইকে দিনে তিনবার মক্কার দিকে অবনত হতে হবে, এই রীতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করছিল প্রত্যেকে। কিন্তু এই স্বাধীনতা এমন একটা সময়ে ঘোষিত হয়েছে যখন মুসলিমরা চারপাশে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে ছিল। মদিনার ইহুদীগণ *কিবলার* পরিবর্তনকে অবাধ্যতার পরিচায়ক বলে ব্যাখ্যা করেছে। তারা মুহাম্মদ (স:)-এর অপসারণের জন্য আরও বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছিল; এবং ঠিক একই সময়ে মদিনার অধিবাসীরা শক্তিশালী মক্কা নগরীর হামলার আশঙ্কাও করছিল।

৮. পবিত্র যুদ্ধ

এ যাবত একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন মুহাম্মদ (স:)। বছরের পর বছর নির্যাতন আর পরাজয় সহ্য করার পরও নিজ দেশে পয়গম্বর হিসাবে স্বীকৃতি মেলেনি তাঁর। এটা একটা ভাবমূর্তি যেটা আমরা যারা খৃস্টীয় ভাবধারায় বড় হয়েছি তারা উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা করতে পারি। কিন্তু *হিজরার* পর রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:) এবং ক্রিশ্চানরা তাঁর জীবনের এই দিকটাকে সব সময় অবিশ্বাস করে এসেছে। কারণ তিনি কেবল আরবকে পুরোপুরি বদলে দেয়া উজ্জ্বল এবং ক্যারিশম্যাটিক রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হননি, গোটা দুনিয়ার ইতিহাসও পাল্টে দিয়েছেন; ইয়োরোপে তাঁর সমালোচকগণ তাঁকে ক্ষমতায় আরোহনের জন্যে ধর্মকে ব্যবহারকারী একজন প্রতারক আখ্যায়িত করে নাকচ করে দিয়েছেন। কারণ ক্রিশ্চান জগৎ ক্রুশবিদ্ধ জেসাসের ইমেজ দ্বারা প্রভাবিত, যিনি বলেছিলেন তাঁর রাজত্ব এ দুনিয়ার নয়; আমরা ব্যর্থতা আর অপমানকেই ধর্মীয় নেতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখতে চাই। আমাদের আধ্যাত্মিক নেতারা জাগতিক অর্থে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করবেন, এটা আমরা আশা করি না।[১]

আমরা বিশেষ করে শান্তি, ক্ষমতা ও বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদের (স:) যুদ্ধ করার ব্যাপারটাকে হানিকর এবং এমনকি অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকি। ইসলামকে তরবারির ধর্ম আখ্যা দেয়া হয়েছে, এটা এমন এক ধর্মবিশ্বাস যা নাকি সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতাকে পবিত্র রূপ দিয়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাকে পরিত্যাগ করেছে। ইসলামের ইমেজ মধ্যযুগ থেকে ক্রিশ্চান পশ্চিমকে তাড়া করে ফিরছে, যদিও তখন ক্রিশ্চানরা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের পবিত্র-যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আজকাল বাজার চলতি বই আর টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ঘনঘন 'রেইজ অব ইসলাম', 'সোর্ড অব ইসলাম', 'স্যাকরেড রেইজ' বা 'হলি টেরর' জাতীয় শিরোনাম দেখা যায়। কিন্তু এটা সত্যের অপলাপ। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব মেধা শক্তি রয়েছে, আছে পরম অর্থ আর মূল্যের অনুসন্ধানের জন্যে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি যা তাকে বৈশিষ্টায়িত করে। খৃস্টধর্ম ব্যাপকভাবে দুর্ভোগ আর প্রতিকূলতার ধর্ম, অন্তত পশ্চিমে, দুঃসময়ে ধর্মটি সবসময় চাঙা হয়ে ওঠে। গির্জার প্রাথমিক যুগে শতবছরব্যাপী নির্যাতন ক্রুশবিদ্ধ জেসাসের ভাবমূর্তিকে জোরদার করেছে এবং খৃস্টীয় চেতনায় প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে।

সুতরাং শুরু থেকেই ক্রিশ্চানরা অনুভব করে এসেছে যে তাদের 'এ-জগৎ'[২] প্রত্যাখ্যান করতে হবে, ফলে শহীদদের আমলে রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান বা তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ স্বভাবতঃই একটা সদগুণে পরিণত হয়েছিল। জেসাসের জন্যে নির্যাতন ভোগ ও মৃত্যুবরণ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা ছিল জাগতিক শক্তিগুলোর ক্রিশ্চানদের প্রত্যাখ্যানের স্পষ্ট প্রমাণ। নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে মানুষ দেবতুল্য এবং পরিবর্তিত হতে পারে, ক্রিশ্চানদের এই ধারণা প্রেরণাদায়ী, লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে এ ধারণা সান্ত্বনা জুগিয়েছে। তবে এর অপপ্রয়োগও ঘটেছে : ক্রিশ্চানদের বলা হয়েছে নির্যাতন ও অবিচার সহ্য করার একটা দায়িত্ব রয়েছে তাদের; ঈশ্বর উঁচু-নিচু একটা ব্যবস্থা সমর্থন করেন যেখানে ধনী ব্যক্তি তার প্রাসাদে বসবাস করে আর দরিদ্র ব্যক্তি তার দোরগোড়ায় বসে থাকে; এ জগতের কষ্ট আর দুর্ভোগের বিনিময়ে স্বর্গে পুরস্কার দেয়া হবে। এমনকি বর্তমানকালেও আমেরিকান এস্টাবলিশমেন্টের নির্দিষ্ট কিছু ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা সেন্ট্রাল ও দক্ষিণ আমেরিকায় এ ধরনের গসপেলের প্রচারে উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। তবে ক্রিশ্চানদের মাঝে এমনও আছে যারা মনে করে নির্যাতিত এবং দুস্থদের পাশে থাকা তাদের দায়িত্ব এবং তারা একটা ন্যায়বিচার ভিত্তিক সুশীল সমাজ গঠনে আন্তরিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে চায়। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের ইসলামি '*জিহাদ*'কে বিবেচনা করা উচিত, যাকে পশ্চিমের লোকেরা সাধারণতঃ 'পবিত্র-যুদ্ধ' হিসাবে অনুবাদ করে থাকে।

সুতরাং ক্রিশ্চান ঐতিহ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে ধর্মীয় জীবনের বাইরের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করার জোরাল প্রবণতা রয়েছে : ক্রিশ্চানরা সাধারণভাবে জাগতিক সাফল্যকে আধ্যাত্মিক বিজয় হিসাবে দেখে না।[৩] ইয়োরোপে আমরা আস্তে আস্তে এমন একটা আদর্শ গড়ে তুলেছি যা গির্জা ও রাষ্ট্রকে আলাদা করেছে; এবং আমরা সচরাচর দুটো সম্পূর্ণভাবে পৃথক এলাকাকে 'গুলিয়ে' ফেলার জন্যে ইসলামকে দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু ক্রিশ্চান অভিজ্ঞতা আমাদের ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিকাশ লাভ করা অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিকূল ধারণা গ্রহণ করানোর কথা নয়। মুহাম্মদ (স:) যে সময় তাঁর জাতির কাছে প্রত্যাদেশ পৌঁছে দিচ্ছিলেন সেই সময় আরব বিশ্ব সভ্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এর রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছিল। খৃস্টীয় মতবাদের জন্ম হয়েছিল অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যে, যেখানে নিষ্ঠুরভাবেই এক ধরনের শান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জেসাস এবং সেইন্ট পল-কে সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা নিয়ে ভাবতে হয়নি, কেননা তা তৈরি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, পলের দীর্ঘ মিশনারি ভ্রমণগুলো *প্যাক্স রোমানার* বাইরে অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াত তা না হলে; আরবে একজন অরক্ষিত মানুষকে শাস্তির ভয় ব্যতিরেকেই পথেঘাটে হত্যা করা যেত। শেষ পর্যন্ত খৃস্টধর্ম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়েছিল—চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে. কিন্তু একেবারে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা

অনুভব করেনি ক্রিশ্চান প্রতিষ্ঠান : স্রেফ পুরনো রোমান আইন ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্যাপটাইজ করে নিয়েছিল। ফলে রাজনীতি রয়ে গিয়েছে আলাদা বলয়ে।

কিন্তু জেসাসের বিপরীতে মুহাম্মদ (স:) 'জগৎ-জোড়া শান্তির সময়'[8] জন্ম গ্রহণের বিলাসিতার সুযোগ পাননি। তাঁর জন্ম হয়েছিল সপ্তম শতকের আরবের রক্তস্নানের সময় যখন প্রাচীন মূল্যবোধগুলো চরমভাবে পদদলিত হচ্ছিল কিন্তু তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত উপযুক্ত কিছুর আবির্ভাব ঘটেনি। শুরুতে মুহাম্মদ (স:) তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা না থাকার বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও হিব্রু পয়গম্বরদের মত সামাজিক ন্যায়-বিচারের বাণীও প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাবনার অতীত কিছু ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে মদিনায় আমন্ত্রণ লাভের পর নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বাধ্য করেছে। সম্ভবত: তাঁর মাঝে এমন একটা আরব ঐক্যের ধারণা গড়ে উঠেছিল যেখানে গোত্রগুলোর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে এক নতুন ধরনের গোষ্ঠীতে যোগদান করবে। একটা নতুন রাজনৈতিক সমাধানের জরুরি প্রয়োজন ছিল, সপ্তম শতকে এ ধরনের সমাধান ধর্মীয় হতে বাধ্য। কিন্তু *হিজরার* সময় মুহাম্মদের (স:) কোনও নির্দিষ্ট ধারণা ছিল না, একটা পুরোপুরি সুসমন্বিত উদ্দেশ্য অর্জনের আশা করার মত সংহত কোনও নীতিও ছিল না। কখনও তেমন ব্যাপক কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি তিনি, বরং প্রত্যেকটা ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। ব্যাপারটা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। একেবারে অজ্ঞাত নজীরবিহীন একটা সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, যেকোনও স্পষ্ট সংজ্ঞায়িত আদর্শ বা নীতিমালা কোনও না কোনওভাবে অবশ্যই পচে যাওয়া নিয়মনীতিরই অংশ হত। সর্বোপরি, ঈশ্বর ছিলেন তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার।

মদিনায় *হিজরার* পর মুহাম্মদ(স:) অধিক হারে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু করায় কোরানও বদলে গেছে। সামঞ্জস্যহীন কাব্য, যেসব সুরায় অলৌকিক সত্য প্রকাশ পাচ্ছিল, সেগুলোর স্থান দখল করে নিতে শুরু করে অধিকতর বাস্তবভিত্তিক আয়াত, জারি হয় নতুন বিধান কিংবা চলতি রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর মন্তব্য থাকে তাতে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যেমনটা তাঁর কোনও কোনও পাশ্চাত্য-সমালোচক বোঝাতে চেয়েছেন, মুহাম্মদের (স:) নির্মল দর্শন ক্ষমতার মোহে দুষিত হয়েছে। কোরান যাই আলোচনা করুক না কেন, অলৌকিক আবহ ঠিকই মনের মাঝে বিরাজ করে। বলা হয়ে থাকে যে কোরানে এমন একটি ধারণাও নেই যা থিওসেন্ট্রিক নয় : আশ্চর্যজনকভাবে ঈশ্বর কেন্দ্রিক রয়ে গেছে তা। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোরান মুসলিমদের সামনে একটা ব্যাপক চ্যালেঞ্জ খাড়া করে : তারা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে বিশ্বাসের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করবে নাকি নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কাছে বাঁধা পড়ে থাকবে? ইংরেজি অনুবাদে কোনও কোনও বিবৃতিকে যতটাই জাগতিক মনে হোক না কেন, মূল আরবী ভাষায় মহৎ একটা সুর ঠিকই বজায় থাকছে। সঙ্গীত এবং শব্দের গাঁথুনি এসবই কোনও কোনও একেবারে বাস্তব বিষয়কেও- যেমন ধরা যাক বাজারের বিষয়, যখন কোরান

ঈশ্বরের সঙ্গে দরকষাকষিতে আসার জন্যে বলছে– উচ্চমার্গে তুলে স্বর্গীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলছে। সমন্বয় প্রধান অভিজ্ঞতা হিসেবে রয়ে যাচ্ছে : মুসলিমরা যখন কোনও সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ শোনে, সম্পূর্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তাদের। বারবার উচ্চারিত বাগধারা আর পরোক্ষ উল্লেখ, অনুবাদে যাকে খুব ক্লান্তিকর মনে হতে পারে, অন্যান্য অনুচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে মনোনিবেশে সাহায্য করে। মুহাম্মদ (স:) ক্রমবর্ধমান হারে রাষ্ট্রনায়ক হয়ে উঠতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মনের গভীরে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ধীরে ধীরে এমন একটা সমাধান গড়ে তুলছিলেন যা আরবদের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল।

কিন্তু, যদিও শেষের দিকে তিনি রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সামাজিক বাণীসমূহ ধর্মীয় দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রয়ে গিয়েছে, তা মোটেই দ্বিতীয় চিন্তার মত জুড়ে দেয়া কিছু ছিল না। কোরান যখন প্রকৃতিতে ঈশ্বরের 'নির্দশনসমূহ' নিয়ে ভাববার তাগিদ দেয়, মুসলিমরা তখন স্বর্গীয় নিয়মের একটা অনুভূতি মনের ভেতর গড়ে তোলে। মাছ, পাখি, জন্তু-জানোয়ার, ফুল, পাহাড়,পর্বত, এবং বাতাস– স্বর্গীয় পরিকল্পনার কাছে নতি স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনও স্বাধীনতা নেই এদের : অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটায়। নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকায় তারা '*স্বভাব মুসলিম*' যারা ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর মাধ্যমে তাদের শক্তি অর্জন করেছে। কেবল মানুষকেই স্বাধীন ইচ্ছার বিপজ্জনক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কোরানের এক অসাধারণ অনুচ্ছেদে দেখা যায় ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টিকে স্বাধীনতা দিতে চাইলেও তারা রাজি হয়নি। একমাত্র মানুষই তা গ্রহণ করার মত নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছে :

> নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে
> এ আমানত দিতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে তা বইতে
> অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বইল।
> মানুষ তো নিজের ওপর বড় জুলুম করে থাকে, আর সে বড়ই অজ্ঞ।[৫]

কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে পথপ্রদর্শক ছাড়া ছেড়ে দেননি। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির কাছে অসংখ্য পয়গম্বর পাঠিয়েছেন তিনি, যাতে ওরা তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পারে। কিন্তু প্রথম পয়গম্বর আদমের সময় থেকেই মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ এইসব প্রত্যাদেশে কর্ণপাত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। হয় তারা বাণীর মর্ম উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে আর নয়ত প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারেনি। পরিণামে, বারবার, তাদের সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে, কারণ সেগুলোর গঠন কাঙ্ক্ষিত পথে ছিল না। কোরান বিভিন্ন জাতির তাদের পয়গম্বরদের সাধারণ নির্দেশ অমান্য করছে বলেই দেখিয়েছে।[৬] উল্টে, তারা অন্যায়ভাবে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের

জন্যে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে এবং নিজেদের বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে। তারা মানবীয় আচরণের স্বর্গীয় পরিকল্পনা না মানায় 'প্রাকৃতিক' আইন নষ্ট করে দিয়েছে, সাগর যদি তাঁর নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে যেমন ধ্বংসলীলা আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে ঠিক তেমন। কিন্তু কুরাইশরা তাদের পয়গম্বরের কথা শুনতে অস্বীকার করেছে, সুতরাং তাদের সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। ক্রোধবশতঃ ঈশ্বর মক্কার দিকে আগুন ছুড়ে দিচ্ছেন ভেবে মুহাম্মদ (সঃ) আসন্ন বিপর্যয়ের কথা বলেননি, বরং কুরাইশদের প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা নষ্ট করার অন্যায় জেদই ছিল তার কারণ।

কিন্তু সব আশা শেষ হয়ে যায়নি। ঈশ্বর মদিনাবাসীদের তাদের নিজস্ব আরবী কোরান শ্রবণের সুযোগ দিয়েছেন এবং মরুদ্যানে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন মুহাম্মদ (সঃ)। কোনও কোনও পয়গম্বরের সাফল্য অন্যদের চেয়ে বেশি : অব্রাহাম উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ঈশ্বর মাত্র একজন; এবং মোজেস ও জেসাস, উভয়ই কিতাবিদের তোরাহ ও গসপেল বাস্তবায়নে রাজি করাতে পেরেছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) কেবল মদিনাবাসীদেরই নয়, বরং গোটা আরবের অধিকাংশকে তাঁর নতুন '*উম্মায়*' যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হবেন এবং মুসলিমরা তাঁকে সফলতম পয়গম্বর হিসাবে বিবেচনা করবে। তারা তাদের বৎসর গণনার ভিত্তি হিসাবে মুহাম্মদের (সঃ) জন্ম তারিখ বা প্রথম প্রত্যাদেশের সময়কে (এসবে আসলে নতুনত্ব কিছু নেই) নয়, বরং *হিজরার* সময়কে বেছে নিয়েছে, কারণ এসময়েই মুসলিমরা মানুষের ইতিহাসে স্বর্গীয় পরিকল্পনা যুক্ত করার কাজ শুরু করেছে।

অত্যন্ত বিপজ্জনক এক সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল সেজন্যে। ৬২২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একজন শরণার্থী হিসাবে মদিনায় পৌঁছেছিলেন মুহাম্মদ (সঃ), যিনি কোনওক্রমে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছেন। পরবর্তী পাঁচটি বছর ক্রমাগত জীবনের ঝুঁকি বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে এবং এই সময় *উম্মা* বিলুপ্তির আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েছিল। পশ্চিমে আমরা প্রায়শঃ মুহাম্মদকে (সঃ) একজন যুদ্ধবাজ নেতা হিসাবে কল্পনা করি যিনি অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অনিচ্ছুক বিশ্বকে ধর্মের বশ্যতা স্বীকার করাতে চান। বাস্তবতা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। মুহাম্মদ (সঃ) এবং প্রথম মুসলিমগণ জীবন রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করেছেন এবং এমন একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন তাঁরা যার জন্যে সহিংসতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। রক্তপাত ব্যতিরেকে কোনও ব্যাপক সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জন সম্ভব হয়নি, এবং, যেহেতু মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময়টা ছিল বিভ্রান্তি আর ভাঙনের, তরবারি ছাড়া শান্তি অর্জন সম্ভব ছিল না। মুসলিমরা মদিনায় তাদের পয়গম্বরের অবস্থানকালকে স্বর্ণযুগ হিসাবে দেখে থাকে, কিন্তু সে সময়টি আবার অশ্রু, বেদনা আর রক্তপাতেরও ছিল। কেবল নিষ্ঠুর অবিরাম প্রয়াসের ভেতর দিয়েই *উম্মা* আরব জগতের বিপজ্জক সহিংসতার অবসান ঘটাতে পেরেছিল।

মদিনার মুসলিমদের *জিহাদে* অংশ গ্রহণের তাগিদ জানাতে শুরু করেছিল কোরান। এর ফলে যুদ্ধ ও রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠে, কিন্তু মূল জহদ

(*JIHD*)বলতে 'পবিত্র যুদ্ধে'র চেয়ে বেশি কিছু বুঝিয়ে থাকে। একটা শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস প্রকাশ করে এটা। সশস্ত্র সংঘাত বোঝানোর জন্যে আরবীতে প্রচুর শব্দ রয়েছে, যেমন *হার্ব* (যুদ্ধ), *সিরা'আ* (হাতাহাতি মারপিট), *মা'আরাকা* (লড়াই) কিংবা *কিতাল* (হত্যা): যুদ্ধ যদি এই প্রয়াসে যোগ দেয়ার মূল রাস্তা হত তাহলে কোরান সহজেই এগুলোর কোনও একটা ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু তার বদলে বেছে নেয়া হয়েছে ব্যাপক অর্থবোধক শক্তিশালী অথচ অস্পষ্ট এক শব্দকে। *জিহাদ* ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি নয়। ধর্মের কেন্দ্রীয় অবলম্বনও নয়, যদিও পশ্চিমে সাধারণতঃ তাই মনে করা হয়। কিন্তু মুসলিমদের সকল ক্ষেত্রে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্যে–নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক–ন্যায়বিচার ভিত্তিক ও সুশীল সমাজ গঠনের জন্যে, যেখানে দরিদ্র আর অসহায়জন শোষিত হবে না, ঈশ্বর মানুষকে যেভাবে জীবন যাপন করতে বলেছেন–আগে যেমন ছিল তেমনি এখনও দায়িত্ব রয়ে গেছে। যুদ্ধ এবং লড়াই কখনও কখনও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেটা গোটা *জিহাদ* বা সংগ্রামের তুচ্ছ একটা অংশমাত্র। অত্যন্ত পরিচিত এক বিবরণে (*হাদিস*) উল্লেখ আছে মুহাম্মদ (সঃ) এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেছিলেন, 'আমরা ক্ষুদ্র *জিহাদ* থেকে বৃহত্তর *জিহাদে* ফিরে যাচ্ছি'– যার অর্থ ব্যক্তি এবং ব্যক্তির সমাজে বিরাজিত জীবনের সর্বপর্যায়ে যেসব অশুভ শক্তি আছে সেগুলো জয়ের কঠিন ও গুরুত্বপুর্ণ প্রয়াস।

মুসলিমরা *হিজরা* করার পরপরই জেনে গিয়েছিল যে তাদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। দ্বিতীয় 'আকাবায় সাহায্যকারীরা 'যুদ্ধের শপথ' নিয়েছিল এবং মক্কায় প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই মুহাম্মদ (সঃ) এক প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন যেখানে অভিবাসীদেরও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে :

> যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল,
> কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের
> সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে
> বের করা হয়েছে শুধু এজন্যে যে তারা বলে, 'আমাদের
> প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে
> আর-এক দল দিয়ে বাধা না দিতেন তাহলে বিধ্বস্ত
> হয়ে যেত (খৃস্টানদের) মঠ ও গির্জা, ধ্বংস হয়ে যেত
> (ইহুদীদের) ভজনালয়, আর মসজিদ– যেখানে আল্লাহর
> নাম বেশি করে স্মরণ করা হয়।[৭]

ন্যায়যুদ্ধের একটা থিওলজি গড়ে তুলতে শুরু করেছিল কোরান। উন্নত মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার জন্য কখনও কখনও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। ধর্মবিশ্বাসীরা

যদি মাঝে মাঝে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে প্রস্তুত না থাকত তাহলে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের সকল উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে যেত। ঈশ্বর কেবল তখনই মুসলিমদের বিজয় দেবেন যখন তারা 'প্রার্থনা করবে আর *যাকাত* দেবে', আর ন্যায় ও সম্মানজনক আইন প্রণয়ন করবে ও সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠন করবে।

এই প্রত্যাদেশ কেবল অভিবাসীদের লক্ষ্য করে, যাদের ওপর কুরাইশরা নির্যাতন চালিয়েছিল, যখন তাদের মক্কার নিজ নিজ বাড়ি থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে : সাহায্যকারীদের তখনও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি, কারণ মক্কার সঙ্গে তাদের কোনও প্রকাশ্য বিবাদ ছিল না। কিন্তু প্রত্যাদেশকে এরকম একটা পর্যায়ে মুহাম্মদ (স:) মক্কার সঙ্গে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের কথা ভাবছেন বলে ধরে নেয়া উচিত হবে না। তেমন কিছু পাগলামি হয়ে দাঁড়াত। তাঁর চিন্তায় আরও কোমল আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল : আরবের এক সময়ের জনপ্রিয় ক্রীড়া আর কঠিন সময়ে রসদ সংগ্রহের স্বীকৃত পন্থা *ঘাযু* বা হানা। অভিবাসীদের মদিনায় জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ছিল খুব কম। ওদের অধিকাংশ ছিল ব্যাঙ্কার, অর্থলগ্নিকারী আর ব্যবসায়ী, খেজুর উৎপাদন সম্পর্কে কিছুই তাদের জানা ছিল না, ফলে নিজস্ব কৃষিখেত গড়ে তোলার মত যথেষ্ট জমি পেলেও কোনও লাভ হবার ছিল না। প্রাণ ধারণের জন্যে সাহায্যকারীদের ওপর নির্ভরশীল ছিল তারা; উপার্জনের নিজস্ব একটা উপায় আবিষ্কার করতে না পারলে *উম্মার* জন্যে একটা বোঝায় পরিণত হত। মদিনায় এসেই বুদ্ধিমান তরুণ ব্যবসায়ী আব্দ আল-রাহমান যা করেছিলেন তেমনটি করা সবার সাধ্য ছিল না : তিনি বাজারের পথ চিনে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তারপর সফল বেচাকেনার মাধ্যমে খুব দ্রুত একটা আয়ের পথ সৃষ্টি করে নেন। মদিনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন একটা সুযোগ ছিল না, আর বৃহদায়তন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এক চেটিয়া অধিকার ছিল মক্কার।

যাযাবর যুগে প্রাপ্ত সরবরাহের একটা সুষ্ঠু বন্টনের কর্কশ ও তাৎক্ষণিক উপায় ছিল *ঘাযু*। হানাদাররা শত্রুপক্ষের কোনও গোত্রের এলাকায় হানা দিয়ে তাদের উট, গরু ও অন্যান্য জিনিসপত্র দখল করে নিত, এক্ষেত্রে তারা রক্তপাত এবং তার পরবর্তী প্রতিহিংসা এড়িয়ে যেতে সতর্কতা অবলম্বন করত। মক্কার ক্যারাভান সমূহের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্যে মদিনা ছিল উপযুক্ত জায়গা। এসব ক্যারাভানে বেশিরভাগ সময়েই একজন মাত্র প্রহরী থাকত। সিরিয়ায় যাওয়া আসা করত ওগুলো। তো ৬২৩ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ (স:) অভিবাসীদের দুটো দলকে ক্যারাভানের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্যে পাঠালেন। শুরুতেই তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেননি, অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন হামযাহ্ কিংবা অভিজ্ঞ যোদ্ধা উবাঈদাহ ইবন আল-হারিসের মত ব্যক্তিদের ওপর। এসব আক্রমণে আরবের কেউ বিস্মিত হয়নি, তবে শক্তিশালী আত্মীয়-স্বজনদের ওপর আক্রমণ চালানোর মুসলিমদের এই নির্বুদ্ধিতায় অবাক হয়েছিল হয়ত। ৬২৩ খৃস্টাব্দের প্রথম পর্যায়ের আক্রমণগুলো খুব একটা সফল ছিল না। ক্যারাভানের যাতায়াত সম্পর্কে নির্ভুল

সংবাদ বা তথ্য পাওয়া ছিল কঠিন; কোনও রসদ দখল করা যায়নি, কোনও সংঘাতও বাধেনি। তবে মক্কাবাসীরা সম্ভবতঃ বিরক্ত আর উত্যক্ত বোধ করেছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তারা, আগে কখনও যার প্রয়োজন হয়নি, আর লোহিত সাগর তীরবর্তী বেদুঈন গোষ্ঠীগুলো (প্রচলিত বাণিজ্য পথ ছিল এটা) সম্ভবতঃ মুসলিমদের লুণ্ঠন দেখা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। যদিও প্রথম দিকের আক্রমণকারীরা ক্যারাভানের ওপর হামলা চালাতে ব্যর্থ হয়, তবু ওই পথের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানের গোত্রগুলোর সঙ্গে চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল তারা। ৬২৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং জুমাহ্ গোত্রের উমাঈয়াহর নেতৃত্বাধীন (আবু বকরের পুরনো অত্যাচারী) একটা বিরাট ক্যারাভানে ঘায়ুর নেতৃত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওই ক্যারাভানে ২,৪০০ উট ছিল, লুটের পরিমান অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক মনে হওয়ায় প্রায় ২০০ মুসলিম স্বেচ্ছায় যোগ দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু এবারও ক্যারাভান মুসলিমদের ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, ফলে কোনও লড়াই বাধেনি। শীতকালে কুরাইশরা তাদের ক্যারাভান কেবল দক্ষিণে ইয়েমেনে পাঠাত, ওগুলোর তাই মদিনা অতিক্রম করার প্রয়োজন হত না। কিন্তু ব্যাপারটা হালকা নয় বোঝানোর জন্যে মুহাম্মদ (সঃ) আব্দাল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে নয়জনের একটা ছোট দলকে দক্ষিণমুখী ক্যারাভানের ওপর হামলা চালানোর জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। সেটা ছিল পবিত্র রজব মাসের শেষ (জানুয়ারি ৬২৪), আরব জুড়ে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ থাকে এসময়। মুহাম্মদ (সঃ) আব্দাল্লাহকে মুখবন্ধ নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যেটা যাত্রাপথে দুদিন অতিবাহিত হওয়ার আগে খোলা নিষেধ ছিল আর সঙ্গীদের ওপর কোনও রকম চাপ প্রয়োগ না করার জন্যে তাঁকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়েছিলেন তিনি : আগের যেকোনও অভিযানের তুলনায় মক্কার অনেক কাছাকাছি যাচ্ছিলেন তারা, বিপদের সমূহ আশঙ্কা ছিল।

যথারীতি দুদিন পর চিঠিটা খোলেন আব্দাল্লাহ। বিভিন্ন সূত্রে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। ইবন ইসহাক বলেছেন, মুসলিমদের মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলাহ্য় যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল ক্যারাভানের ওপর নজর রাখতে, ব্যস; কিন্তু নবম শতকের ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদি দাবী করেছেন যে চিঠিতে লেখা ছিল : 'নাখলাহ্ উপত্যকায় গিয়ে কুরাইশদের জন্যে ফাঁদ পাত।'[৮] এর মানে মুসলিম হামলাকারীদের পবিত্র মাস লঙ্ঘন করতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে মুহাম্মদের (সঃ) সম্ভবত সামান্য দ্বিধা ছিল : এসব পবিত্র মাস পৌত্তলিক ব্যবস্থারই অংশ যার থেকে উত্তরণের প্রয়াস পাচ্ছিলেন তিনি। পবিত্র মাস লঙ্ঘন বলতে গেলে দেবীদেরই অপমানিত করা। কিন্তু অভিযাত্রীদের দুজন সম্ভবতঃ নিজেদের অভিযান থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল, কারণ পরবর্তী বিরতি স্থানে উট হারিয়ে বাকি সাতজনকে অগ্রসর হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল তারা। আব্দাল্লাহ ও তাঁর দল নাখলাহ্য় পৌঁছার পর কাছেই একটা ক্যারাভানকে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে দেখতে পান। কী করা উচিত ওদের?

রজব মাসের শেষ দিন ছিল সেটা, কিন্তু ওরা যদি পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যান, তাহলে যুদ্ধে আর বাধা না থাকলেও ক্যারাভান মক্কার নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়বে। হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হল। প্রথম তীরের আঘাতে প্রাণ হারাল তিন ব্যবসায়ীর একজন এবং বাকিরা দ্রুত আত্মসমর্পণ করে। ওই দুজন আর তাদের পণ্যসামগ্রী মদিনায় নিয়ে যান আব্দাল্লাহ।

কিন্তু বিজয়ী বীরের মত স্বাগত জানানোর বদলে মদিনাবাসীরা ওদের পবিত্র মাস লঙ্ঘনের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি, মদিনার আরবরা মুহাম্মদের (স:) দেবীধর্ম প্রত্যাখ্যানে বিচলিত হয়নি। ইহুদীরা তাদের একেশ্বরবাদী দর্শনের জন্যে প্রস্তুত করে দিয়েছিল এবং তারা তাদের পৌত্তলিক ধর্মের এই অংশটুকু ত্যাগ করতে পুরোপুরি তৈরি ছিল। কিন্তু পবিত্র মাসগুলোর বেলায় প্রবল আবেগ ছিল তাদের : ধর্মীয় এই মূল্যবোধ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না তারা। সুতরাং মুহাম্মদ (স:) হামলার নিন্দা জানিয়ে লুণ্ঠিত মাল গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন। ব্যাপারটাকে নিন্দনীয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একে ঠাণ্ডা মাথার সুবিধাবাদিতা বলে মনে হয় না, তবে বাস্তবভিত্তিক ছিল বটে। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে মুহাম্মদ (স:) কোনও রকম আপোস করেননি : তিনি কুরাইশদের সঙ্গে বিরোধের মনোল্যাট্রাস সমাধান প্রত্যাখ্যান করে মক্কাবাসী সকল মুসলিমকে বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন। ঘটনাপ্রবাহ যত গড়াচ্ছিল, তিনিও ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে আল-লাহর পরিবর্তিত ধর্ম গড়ে তুলছিলেন। প্রথম থেকেই ধর্মের পরিষ্কার ব্যাপক চিত্র ছিল না তাঁর সামনে, প্রতিষ্ঠিত কোনও রকম সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের সাহায্য ছাড়া কাজ করতে হচ্ছিল বলে প্রায়শঃই তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে পথ বের করে নিতে হয়েছে। পবিত্র মাস বর্জনে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন তিনি : এগুলোকে তাঁর কাছে অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় মূল্যবোধ বলে মনে হয়নি আর আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান আর উদ্দীপনায় সারা আরব জগতে ব্যাপকভাবে ভিন্নতা ছিল। মদিনাবাসীদের পৌত্তলিক আচারের ব্যাপারে এতটা টান থাকতে পারে এটা তাঁর না জানারই কথা, আক্রমণকারী দলের প্রত্যাবর্তনের পর সাহায্যকারীদের বেদনা দেখে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে না বুঝে ওদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেলেছেন। গোঁয়ারের মত নিজের পথ ধরে থাকার যুক্তি ছিল না কোনও। মানুষ যদি পবিত্র মাস পালন করতে চায়, তাদের সে অনুমতি দেয়া উচিত, কারণ এই রেওয়াজে তাঁর একক ঈশ্বরের ধর্মকে আঘাত করার মত কিছু নেই।

মুহাম্মদ (স:) হামলার নিন্দা জানানোয় গভীরভাবে বেদনার্ত হয়েছিলেন আব্দাল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীরা: যেন সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হয়ে গেছে তাঁদের, কেউ কেউ ভেবে বসল বুঝি তাদের নাজাতই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। ওদের সান্ত্বনা দেয়ার একটা দায়িত্ব ছিল মুহাম্মদের (স:), আর সামনে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে তিনি এই ঘটনাকে তাঁর ন্যায় যুদ্ধের ধর্মতত্ত্বকে আর এক কদম অগ্রসর করার কাজে

লাগালেন। ঠিক, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়, কিন্তু এরচেয়ে গুরুতর অপরাধও আছে। মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো, কুরাইশরা যেমন মুসলিমদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, ওদের আপন গোত্র থেকে বহিষ্কারের মাধ্যমে আরবদের সবচেয়ে পবিত্র মূল্যবোধের লঙ্ঘন করেছে তারা—এ অপরাধ অনেক বেশি গুরুতর। কখনও কখনও ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তির এরকম স্পষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা দায়িত্ব হয়ে পড়ে :

> পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বলো : 'সেই সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অন্যায় আল্লাহ'র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহকে অস্বীকার করা, কা'বা শরীফে (উপাসনায়) বাধা দেওয়া ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। আর ফিৎনা হত্যার চেয়ে আরও ভীষণ অন্যায়।'[৯]

এ প্রত্যাদেশের ফলে পরিস্থিতি সহজ হয়ে আসে : ইহুদীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু হানাদার এবং সাহায্যকারী দল, উভয়ই আশ্বস্ত হয়েছে। মুহাম্মদ (স:) অভিবাসীদের মাঝে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বণ্টন করতে সক্ষম হন এবং বন্দীদের বিনিময়ে দরকষাকষি শুরু করেন তিনি : মক্কার দুজন ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেয়া হবে যদি মক্কায় আটকে পড়া *হিজরায়* আগ্রহী দুজন মুসলিমকে মদিনায় আসার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু মদিনার পরিস্থিতি দেখে মুগ্ধ কুরাইশ বন্দীদের একজন হাকাম ইবন কায়সার রয়ে যায় এবং মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ ঘটনা মুহাম্মদের (স:) কার্যধারার একটা চমৎকার উদাহরণ। বিশ্বাসের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি আছেন তিনি তবে একই সঙ্গে তুচ্ছ বিষয়ে আপোসেও আপত্তি নেই। দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার অনুপস্থিতিতে তিনি ঘটনাপ্রবাহ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে দেখতেন—ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদীতার গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আক্রমণ পরিচালনার ফলে এমন তীব্র প্রতিবাদ আসতে পারে বলে ভাবেননি তিনি, কিন্তু ব্যাপারটা সেদিকে গড়ানোর ফলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে ঈশ্বর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বোঝাতে চাইছেন তাঁকে। এ ঘটনার ফলে তাঁকে একটা নীতি খাড়া করতে হয়েছিল ইসলামে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা জেসাসের শান্তিবাদী বাণীকে সম্মান করে (যদিও কোরান উল্লেখ করছে যে ক্রিশ্চানরা অত্যন্ত রগচটা)[১০], কিন্তু কখনও কখনও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাকেও তারা স্বীকার করে থাকে। স্বৈরাচারী ও ঘৃণ্য শাসকদের সশস্ত্র উপায়ে যদি বাধা না দেয়া যায়, তাহলে গোটা দুনিয়া অপশক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এমনকি পয়গম্বরগণও মাঝে মাঝে যুদ্ধ ও হত্যায় বাধ্য হয়েছেন, যেমন ডেভিড, ঈশ্বরের সাহায্যে গলিয়াথকে হত্যা করেছিলেন :

...আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দিয়ে
দমন না করতেন, তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী ফ্যাসাদে পূর্ণ হয়ে যেত।
কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়।'[১১]

অধিকাংশ ক্রিশ্চানই ন্যায়-যুদ্ধের ধারণার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করবে, তারা স্মরণ করবে যে একজন হিটলার বা চসেস্কুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সশস্ত্র লড়াইই একমাত্র ফলপ্রসু উপায়। সুতরাং শান্তিবাদী ধর্মের মত আঘাত পেয়ে অপর গাল পেতে দেয়ার পরিবর্তে ইসলাম স্বৈরাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দুর্বল ও নির্যাতিতদের প্রতি নিজের একটা দায়িত্ব আছে বলে একজন মুসলিম ভাবতে পারে। আজ মুসলিমরা যখন তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে *জিহাদের* ডাক দেয়, তখন তারা আসলে কোরানের আদর্শের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে।[১২]

কুরাইশরা নখলাহ্‌র হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবেই, ফলে রক্ত-বিবাদ আশঙ্কা করতে লাগল অভিবাসীরা, কিন্তু আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিল তখন মুসলিমরা। কয়েক মাস পর রমযান মাসে (মার্চ ৬২৪), আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে প্রত্যাগত ক্যারাভানকে বাধা দেয়ার জন্যে একটা বড় আকারের বাহিনীর নেতৃত্ব দেন মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং। বছরের অন্যতম বৃহৎ ক্যারাভান ছিল ওটা, ৩৫০ জন মুসলিম স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল, এর মধ্যে ৭০ জন ছিল অভিবাসী আর বাকিরা সাহায্যকারী। লোহিত সাগর নিকটবর্তী বদর কূপের দিকে অগ্রসর হয়েছিল অভিযাত্রীরা। প্রতিবছর আরবের অন্যতম প্রধান একটা মেলা অনুষ্ঠিত হত এখানে। এখানেই ক্যারাভানের অপেক্ষায় ওৎ পাতার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বদর অভিযান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং গঠনমূলক একটা ঘটনায় রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এর গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ছিলনা কারওই। কেবল আরেকটা *ঘাযু* ছিল ওটা, কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম বাড়িতে রয়ে গিয়েছিলেন–যেমন মুহাম্মদের (স:) মেয়ে জামাই উসমান ইবন আফফান, তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াহ্‌ তখন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ক্যারাভান যথারীতি পার পেয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং যোগ্য পুরুষ ছিলেন, তিনি পথে লোকজনের সঙ্গে কথা বলেই মুসলিমদের উদ্দেশ্যে টের পেয়ে যান। ফলে হিজাজ থেকে মক্কায় যাবার প্রচলিত পথে না গিয়ে তিনি সোজা ডানদিকে বাঁক নিয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে যান এবং স্থানীয় গিফার গোত্রের একজন সদস্য দমদমকে সাহায্য আনার জন্যে পূর্ণ গতিতে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। নাটকীয়ভাবে আগমন ঘটে দমদমের। মুহাম্মদের (স:) চাচা আব্বাস মক্কা নগরী কিভাবে আতঙ্কে জমে গিয়েছিল তাঁর স্মরণ করেছেন :

ওয়াদি'র তলদেশ থেকে ভেসে আসছিল দমদমের চিৎকার: উটের পিঠে দাঁড়িয়েছিল সে, জানোয়ারটার নাক ছিল কাটা, জিন ছিল উল্টোদিকে ঘোরানো:

তার পরনের শার্ট ছেঁড়া; সে বলছিল : 'হে কুরাইশগণ, মালবাহী উট! মালবাহী উট! মুহাম্মদ (স:) এবং তার সঙ্গীরা আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তোমাদের যে সম্পত্তি আছে তা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে ওৎ পেতে আছে। আমার মনে হয় না তোমরা ওটাকে পেরিয়ে যেতে পারবে। বাঁচাও! বাঁচাও!'[13]

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কুরাইশরা। মুহাম্মদ (স:) ভেবেছেন কি-নাখলাহ'র ছোট সেই ক্যারাভানটার মত বছরের সর্ববৃহৎ ক্যারাভানকে এত সহজে হাত করতে পারবেন? সকল নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন। এমনকি বয়স্ক এবং স্থূলকায় উমাঈয়াহ ইবন খালাফও বর্ম চাপিয়ে নিল গায়ে। আবু লাহাবকে রয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু তালিব এবং আকিল (আবু তালিবের দুই ছেলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেননি) এবং খাদিজার ভাতুস্পুত্র হাকিম ইবন হিযামকে নিয়ে ভাতুস্পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় প্রায় হাজার খানেক মানুষ মক্কা থেকে বেরিয়ে বদরের পথে নেমেছিল।

এই আশঙ্কাজনক সংবাদ শোনার পর এক যুদ্ধ-সভা আহবান করেন মুহাম্মদ (স:)। তিনি *উম্মার* সমর প্রধান ছিলেন না, তাই অন্যান্য গোত্র প্রধানের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া জরুরি অবস্থা মোকাবিলার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরা *ঘাযুতে* অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছিল, রণক্ষেত্রে মুখোমুখি যুদ্ধে অংশ নিতে নয়। এখন কি সময় থাকতে তারা পশ্চাদপসরণ করবে নাকি কুরাইশদের মোকাবিলা করতে রয়ে যাবে? সেনাবাহিনী এসে পৌঁছার আগেই ক্যারাভান দখল করে নেয়ার কোনও আশা আছে? আবু বকর এবং উমর প্রেরণাদায়ী বক্তব্য রেখেছিলেন, এবং সত্তর জন অভিবাসী, পরিস্থিতি যাই দাঁড়াক, বদরে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যদিও দেখা যাবে তারা নিকটাত্মীয় এবং প্রাক্তন বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে সাহায্যকারীদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মুহাম্মদ (স:)। দ্বিতীয় 'আকাবায় তারা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, মদিনায় আক্রান্ত হলেই কেবল মুহাম্মদকে (স:) সাহায্য করবে; কিন্তু তাদের সবার পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সা'দ ইবন মুয়াধ বলেন :

আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি, আমরা আপনার সত্যকে স্বীকার করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি আপনি আমাদের জন্য যা এনেছেন তা সত্যি, আমরা আপনাকে আমাদের কথা দিয়েছি, আপনার আদেশ শোনার এবং পালনের অঙ্গীকার করেছি; সুতরাং আপনার যেখানে ইচ্ছা আমরা যাব, আপনার সঙ্গেই আমরা আছি; এবং ঈশ্বরের শপথ, আপনি যদি আমাদের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরতে বলেন, আপনি যদি ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব, একজন লোকও বাকি থাকবে না। আমরা আগামীকাল আপনার শত্রুর মুখোমুখি

দাঁড়ানোর ধারণাকে অপছন্দ করছি না। আমরা যুদ্ধে অভিজ্ঞ, লড়াইতে আমরা বিশ্বস্ত।[১৪]

সাহসী বক্তব্য, কিন্তু মুসলিমরা তখনও স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে না বলেই আশা করছিল, মক্কার বাহিনী এসে পৌঁছার আগেই ঈশ্বর ক্যারাভান তাদের হাতে তুলে দেবেন, ফলে সম্মানের সঙ্গে ফিরে যেতে পারবে তারা। বদর কূপে দুজন মক্কাবাসী পানি-বাহককে বন্দী করল তারা, বন্দীরা জানাল তারা ক্যারাভানের সঙ্গী নয়, সেনাবাহিনীর সদস্য। এ সংবাদ মুসলিমদের মাঝে এত ভয় জাগিয়ে দিয়েছিল যে তারা বন্দীদের প্রহার শুরু করে দিয়েছিল, তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল ওরা মিথ্যা বলছে। মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং এতে হস্তক্ষেপ করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ওই দুজনকে। কুরাইশদের কারা কারা তাঁর বিরুদ্ধে কুচকাওয়াজ করে আসছে এতথ্য বন্দীদের কাছে জানতে পেরে তিনি তাদের বলেছেন মক্কাবাসীরা গোত্রের ফুলকে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

এদিকে আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্যারাভানকে মুহাম্মদের (স:) নাগালের বাইরে নিয়ে যাবার পরপরই সেনাবাহিনীর কাছে সংবাদ পাঠান তিনি : ক্যারাভান নিরাপদ, সবার এবার ঘরে ফেরা উচিত। তাঁর হয়ত আশঙ্কা ছিল যে আবু জাহ্‌ল এই অভিযানকে পুঁজি করে মক্কায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে বসতে পারেন। তিনি চতুর এবং হিসাবী মানুষ ছিলেন এবং মুহাম্মদের (স:) মত চূড়ান্ত সমন্বয়ের আশায় ছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু আবু জাহ্‌ল ফিরে যেতে রাজি হলেন না। 'আল্‌-লাহ'র দোহাই,' সঙ্গীদের বলেন তিনি, 'বদর পর্যন্ত না পৌঁছে ফিরব না আমরা। ওখানে তিনদিন থাকব, উট কোরবানি দেব, উৎসব করে মদ পান করব আর মেয়েরা আমাদের মনোরঞ্জন করবে। আরবরা আমাদের আগমনের খবর জানবে আর ভবিষ্যতে আমাদের সমীহ করে চলবে।'[১৫] তবে সবাই এরকম উৎসাহী বা উদগ্রীব ছিল না, কারণ ক্যারাভান বিপদমুক্ত বলে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল। অবিলম্বে সরে দাঁড়িয়েছিল যুহ্‌রা ও আদি গোত্র, মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে সামরিক ও নৈতিক যুদ্ধে জয়লাভ করলে আবু জাহ্‌ল কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন ভেবে শঙ্কিত ছিল তারা। হাশিমদের একটা দলকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান তালিব ইবন আবি তালিব, কারণ গোত্রীয় সদস্যদের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি তারা। তবে আব্বাস ও হাকিম সেনাবাহিনীর সঙ্গে রয়ে গিয়েছিলেন।

বদরে পৌঁছে তাঁবু খাটানোর পরপরই মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের (স:) বাহিনীর ওপর নজর বুলিয়ে আসার জন্য উমায়ের ইবন ওয়াহ্‌বকে পাঠায়, ইনি ছিলেন জুমাহ গোত্রের। একটা বালির পাহাড়ের আড়ালে ছিলেন মুহাম্মদ (স:) তাঁর দল নিয়ে। উমায়েরের দায়িত্ব ছিল বাহিনীর লোকবল গণনা করার। মুসলিমদের চেহারায় দৃঢ় গম্ভীর প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখে আতঙ্কে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের সৈন্য

সংখ্যা মুহাম্মদের (স:) তুলনায় দ্বিগুন হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'মৃত্যুবাহী উট–ইয়াথরিবের উটগুলো নিশ্চিত মৃত্যু বয়ে বেড়াচ্ছে' মক্কাবাসীরা গোটা ব্যাপারটাকে পৌরুষ প্রকাশক খেলা হিসাবে দেখছিল, কিন্তু মুসলিমদের এক নজর দেখেই উমায়ের বুঝে যান যে অন্ততঃ একজন কুরাইশকে হত্যা না করে ওদের কেউই মৃত্যুবরণ করবে না আর, হতাশার সুরে উমায়ের জানতে চেয়েছিলেন, 'ওরা যদি তোমাদের সমানে সমান হত্যা করে, তাহলে এরপর আর বেঁচে থেকে কি হবে?'[১৬] আরবরা যুদ্ধ বিগ্রহে অনাবশ্যক ঝুকি নিত না এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর চেষ্টা করত সবসময় : অবিরাম গোত্রীয় বিবাদ আর আরবের অনিশ্চিত জীবন তাদের যত বেশি সম্ভব মানবসম্পদ বজায় রাখার ব্যাপারে উদগ্রীব করে তুলেছিল। কুরাইশদের অপর সদস্যরাও আপন গোত্র আর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল। যেমন, হাকিম ইবন হিযাম উমায়েরের বক্তব্যে এমনভাবে প্রভাবিত হন যে তিনি অবিলম্বে উতবা ইবন রাবি'আর কাছে গিয়ে যুদ্ধ ঠেকানোর জন্যে তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। নাখলাহয় মুসলিমদের হাতে নিহতদের আশ্রয়দাতা ছিলেন উতবা, হাকিম তাকে প্রতিশোধ নিতে সম্মত করিয়েছিলেন যাতে সম্মান রক্ষা পায়। প্রস্তাবে সারবত্তা আছে উপলব্ধি করে সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে ওঠে উতবা : 'হে কুরাইশজাতি! আল-লাহর দোহাই, মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমাদের কোনও লাভ হবে না। তোমরা যদি ওদের ওপর আক্রমণ চালাও তাহলে তোমরা প্রত্যেকে এরপর চোখে ঘৃণা নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাবে যে মামা বা চাচার ছেলেকে হত্যা করেছে বা মামা বা চাচার কোনও আত্মীয়কে খুন করেছে।'[১৭] কুরাইশরা যুদ্ধবাজ জাতি ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা বা আগ্রহ কোনওটাই তাদের ছিল না; তারা সবসময় উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মিষ্টি আলোচনাই পছন্দ করত, কিন্তু আবু জাহল যুক্তি-জ্ঞান বর্জিত হয়ে পড়েছিলেন। উতবা একজন কাপুরুষ! পাল্টা ধমকে উঠেছেন তিনি। মুহাম্মদের পক্ষে চলে যাওয়া নিজের ছেলেকে হত্যা করে বসার আতঙ্কে ভুগছে সে। কোনও আরবের পক্ষে কাপুরুষ গালি শোনা সম্ভব ছিল না এবং ইবন ইসহাক বলছেন, এরপর 'যুদ্ধ বেধে গেল এবং তছনছ হয়ে গেল সবকিছু আর যার যার ভুল পথে গোঁয়ারের মত এগিয়ে গেল লোকে'।[১৮]

মুসলিমরাও যুদ্ধে আগ্রহী ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর তাদের মনোবল সর্বোচ্চ বিন্দুতে উঠে যায়। মক্কার বাহিনীকে দেখতে পাননি মুহাম্মদ (স:) তাই এর বিশালত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না; তা না হলে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতেন তিনি। কূপের কাছে লোকজনকে অবস্থান গ্রহণ করিয়েছিলেন তিনি, ফলে কুরাইশরা পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল এবং তাদের পুবদিকে সূর্যের মুখোমুখি থাকতে হচ্ছিল। এক পশলা বৃষ্টিতে জমিন শক্ত হয়ে ওঠায় মুসলিমদের পক্ষে নড়াচড়া করা সহজ হয়ে উঠলেও চড়াই বেয়ে উঠতে হচ্ছিল বলে মক্কাবাসীদের জন্যে সেটাই বরং অসুবিধা বাড়িয়ে দেয়।

আরবের রীতি যেমন ছিল, বদরের যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে; যেখানে প্রথম কাতারের তিনজন মুসলিম : হামযাহ, আলী এবং উবাঈদাহ্ ইবন আল-হারিস তিন প্রধান কুরাইশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন : উতবা, শায়বা এবং আল-ওয়ালিদ ইবন উত্‌বা, এরা মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছিল। তিনজন কুরাইশই নিহত হয় এবং মুসলিম উবাঈদাহ্ ইবন আল-হারিস মারাত্মকভাবে আহত হলে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এরপর শুরু হয়েছিল তুমুল যুদ্ধ। সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও অচিরেই কুরাইশরা সবিস্ময়ে নিজেদের পর্যুদস্ত অবস্থা বুঝতে পারে। প্রাচীন আরব কায়দায় সতর্কতাহীন বাহাদুরির সঙ্গে লড়াই করছিল তারা, প্রত্যেক গোত্র প্রধান যার যার বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ায় সেনাবাহিনীর একক নেতৃত্বের অভাব ছিল। কিন্তু মুসলিমরা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং বেপরোয়া; মুহাম্মদ (সঃ) সযত্নে তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলেছিলেন : সহসা চমৎকার সামরিক কৌশলবিদ হিসাবে আবির্ভূত হলেন তিনি। বাহিনীকে নিবিড়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করিয়ে চললেন, একেবারে শেষমুহূর্তে হাতাহাতি লড়াইয়ের সময়ই কেবল তরবারি খাপমুক্ত করছিল তারা। মধ্যাহ্ন নাগাদ কুরাইশরা কেবল তাদের শক্তির প্রদর্শনের আশা করে থাকলেও আতঙ্কিত হয়ে দিকবিদিক পালিয়ে যেতে শুরু করেছিল, আবু জাহ্‌ল স্বয়ংসহ অন্ততঃ পঞ্চাশজন নেতা গোছের লোক রয়ে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে।

আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিল মুসলিমরা। বন্দীদের একত্রিত করে আরবীয় রেওয়াজ অনুযায়ী হত্যা শুরু করেছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) এতে বাধা দেন। যুদ্ধ বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণের নির্দেশ নিয়ে একটা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির ভাগবন্টন নিয়ে মুসলিমদের রেষারেষি বন্ধ করেন তিনি; ১৫০টি উট, দশটি ঘোড়া এবং বর্ম আর যন্ত্রপাতি সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। তারপর বিজয়ী বাহিনী আমির গোত্রের প্রধান সুহায়েল, আব্বাস এবং মুহাম্মদের (সঃ) চাচাত ভাই আকিল ও নওফলসহ সত্তর জন যুদ্ধবন্দীসহ বাড়ির পথ ধরেছিল। ফেরার পথে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত একটা প্রত্যাদেশ পান মুহাম্মদ (সঃ) :

> হে নবী! তোমাদের হাতে ধৃত যুদ্ধবন্দীদেরকে বলো,
> 'আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন,
> তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে
> ভাল কিছু তিনি তোমাদেরকে দেবেন ও তোমাদেরকে
> ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরমদয়ালু।'[১৯]

অপ্রত্যাশিত বিজয়ের উল্লাসের মাঝেও মুহাম্মদ (সঃ) চূড়ান্ত সমন্বয়ের প্রত্যাশা করছিলেন। তিন প্রধান ইহুদী গোত্র এবং ইবন উব্বাঈয়ের দলের ব্যাপক অস্বস্তি সত্ত্বেও মদিনায় পৌঁছার পর মুসলিম বাহিনী উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করে। বদর যুদ্ধের নৈতিক প্রভাব বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। বছরের পর বছর মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন

ভর্ৎসনা আর অপমানের বিষয়, কিন্তু এই চমকপ্রদ এবং অপ্রত্যাশিত বিজয়ের পর আরবের সবাই তাঁকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তিনটি ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদী ধর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায় অপ্রত্যাশিত কোনও বিজয় বা ভাগ্যের আকস্মিক পরিবর্তনকে ঈশ্বরের লীলা হিসাবে দেখা হয়েছে এবং মানুষকে নতুন আস্থা এবং দৃঢ়তা দিয়ে পূর্ণ করেছে তা।[২০] একই রকম নাজুক পরিস্থিতির ক্রিশ্চান ক্রুসেডারদের মত, মুসলিমরা এক ধরনের মাস হ্যালুসিনেশনের স্বীকার হয়েছিল যার ফলে তারা ফেরেশতাদের একটা বাহিনীকে তাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিতে এগিয়ে আসতে দেখেছে। পরবর্তী চিন্তায় সমস্ত কিছু ঈশ্বরের ইঙ্গিতে সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা জন্মেছে, নিজেদের অজান্তেই বলতে গেলে তাদের বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা ছিল না তাদের, যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিল তারা, এমনকি শত্রুপক্ষের সংখ্যা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাকেও ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ বলে মনে হয়েছে।[২১] ঈশ্বর যেন যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করেছেন। এক পর্যায়ে মুহাম্মদ (স:) একমুঠি পাথরকুচি ছুড়ে দিয়েছিলেন, যা সম্ভবত কোনও আচারিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু বিজয়ের পর কোরান তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে অ্যাখ্যায়িত করেছে :

> তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, আল্লাহ তাদেরকে মেরেছিলেন,
> আর তুমি যখন (কাঁকর) ছুড়েছিলে তখন তুমি ছোড়নি,
> আল্লাহই তা ছুড়েছিলেন; আর তা ছিল বিশ্বাসীদের ভাল
> পুরস্কার দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।[২২]

বদরের আগ পর্যন্ত মুসলিমদের আদর্শ প্রায়শঃই পুরোপুরি লক্ষ্যহীন মনে হচ্ছিল। কিন্তু এই বিজয়ের পর তারা উল্লাসময় আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। মনে হচ্ছিল কোনও কিছুই আর তাদের আটকাতে পারবে না :

> ...তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে
> তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে আর যদি থাকে
> একশোজন তবে এক হাজার অবিশ্বাসীর ওপর বিজয়ী হবে,
> কারণ ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা অবোধ।
> আল্লাহ এখন তোমাদের ভার হালকা করবেন।
> তিনি তো জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে।
> সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশোজন ধৈর্যশীল থাকলে
> তারা দুশো জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের
> মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর আদেশে
> তারা দুহাজারের ওপর বিজয়ী হবে।
> আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।[২৩]

কিন্তু জোর দেয়া হয়েছিল ধৈর্যধারণের ওপর এবং আদি জীবনীকারগণ *জিহাদের* বৈশিষ্ট্য হিসাবে সংযম ও সততার প্রতি আলোকপাত করেছেন বেশি। এটা কোনও উগ্র ধর্মান্ধতা নয়, বরং ধৈর্যের চরম পরীক্ষা। মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর বিজ্ঞ সঙ্গীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে ওই বিজয়ের ফলে তাঁরা একটা অনিশ্চিত নাজুক অবস্থানের দিকে এগিয়ে গেছেন যার পরিণতিতে এমনকি *উম্মা* ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কুরাইশরা তাদের সাফল্যের ভিত্তি ও সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেই। মুসলিমরা যদিও চায়নি, তবু ঈশ্বর যেন *উম্মাকে* আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিক্ষেপ করেছেন।

ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ অস্বাভাবিক এবং অরুচিকর মনে হতে পারে, কিন্তু একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে এধরনের ঐশ্বরিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জুডাইজম এবং খৃস্টধর্মেও চলতি ঘটনাপ্রবাহ ধর্মীয় ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবং যুদ্ধ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও সাফল্যে স্বয়ং ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন বলে বিশ্বাস করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা সত্য প্রকাশের মুহূর্তে পরিণত হয়েছে এবং তাকে কিংবদন্তীর রূপ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা প্রতীকী তাৎপর্য বহন করার মাধ্যমে মূল ঘটনাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। ইতিহাসের গূঢ় অর্থ চিন্তা ও বিশ্লেষণকে আপাত অর্থহীন জীবন প্রবাহের মাঝে একটা প্যাটার্ন খোঁজার কাল্পনিক প্রয়াস হিসাবে দেখা যেতে পারে। এরকম পুনর্গঠিত ঘটনাবলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে লোহিত সাগরে সসৈন্য ফেরাউনের ডুবে মরার ব্যাপারটি : শ্লোক রচয়িতা, সাধু আর রূপক কাহিনীকারগণ একে ইতিহাসের ধারায় অলৌকিকের প্রকাশ হিসাবে দেখেছে যা মুক্তির একটা আলাদা চেহারা ধারণ করেছে। ক্রিশ্চানরাও এঘটনাকে জেসাসের মৃত্যু থেকে আবার প্রত্যাবর্তনের প্রতীকী পূর্বাভাস হিসাবে গভীরভাবে বিবেচনা করে থাকে, এটা এক ধরনের ব্যাপ্টিজমে পরিণত হয়েছে যা ক্রিশ্চানদের নৈরাশ্য থেকে জীবন আর আশায় প্রত্যাবর্তন প্রকাশ করে থাকে। কোরানে লোহিত সাগর অতিক্রমকে '*ফুরকান*' বলে অভিহিত করা হয়েছে, এ শব্দের মাধ্যমে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং মুক্তি বোঝানো হয়েছে; কোরানকেও '*ফুরকান*' বলা হয়, যা বিশ্বাসীদের জীবন মহিয়ান করে তোলার পাশাপাশি তাদের নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে নাটকীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করে :

> আমি অবশ্যই মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফোরকান
> (ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসা), আলো ও উপদেশ,
> সাবধানিদের জন্যে, যারা না দেখেও তোমাদের
> প্রতিপালককে ভয় করে ও কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত।
> এ কল্যাণময় উপদেশ, আমিই এ (কোরান) অবতীর্ণ করেছি।[২৪]

কোরানের ক্রমবিকাশমান অস্তিত্ব, যা ক্রমাগত *উম্মাকে* দিক নির্দেশনা দিচ্ছিল এবং ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা দিয়ে চলছিল, তাদের জাগতিক বিষয়াবলীতে ঈশ্বরের রহস্যময় উপস্থিতি এবং জড়িত থাকার এক স্মারক ছিল।

এবার বদরের যুদ্ধও এক *ফুরকান* বা উদ্ধারপ্রাপ্তির নিদর্শনে পরিণত হল। মুসলিমদের বিজয়ের ভেতর দিয়ে ঈশ্বর ন্যায়কে অন্যায় হতে পৃথক করেছেন, ঠিক যেমনটি পৃথক করে দিয়েছিলেন লোহিত সাগরে মিশরীয় ও ইসরাইলীদের :

> 'চলো ইসরাইলীদের কাছ থেকে পালিয়ে যাই', চেঁচিয়ে উঠল মিশরীয়রা। 'মিশরীয়দের বিরুদ্ধে ইয়াহওয়েহ ওদের পক্ষে লড়ছেন!' 'তোমার হাত সাগরের দিকে প্রসারিত করো,' মোজেসকে বললেন ইয়াহওয়েহ, 'যাতে পানি মিশরীয় এবং তাদের রথ আর ঘোড়সওয়ারদের দিকে ধেয়ে যায়।' মোজেস সাগরের দিকে তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, এবং দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাগর তার আপন স্থানে ফিরে গেল। পলায়নপর মিশরীয়রা সোজা সেদিকেই এগিয়ে গেল আর ইয়াহ্ওয়েহ মিশরীয়দের সাগরের মাঝখানে নিক্ষেপ করলেন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগর আবার আপন স্থানে ফিরে গেল। পানির ফিরতি স্রোত ফেরাউনের গোটা বাহিনীর রথ আর ঘোড়সওয়ারদের গ্রাস করে নিল, যারা ইসরাইলীদের ধাওয়া করে সাগরের দিকে ছুটে গিয়েছিল তাদের একজনও রেহাই পেল না। কিন্তু ইসরাইলের সন্তানগণ সাগর পেরিয়ে শুকনো ভূমিতে উঠে গেল, পানির প্রাচীর ছিল তাদের ডান ও বাম দিকে। সেইদিন, ইয়াহওয়েহ মিশরীয়দের হাত থেকে ইসরাইলীদের উদ্ধার করেছিলেন আর ইসরাইল সাগরতীরে মিশরীয়দের মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল। ইসরাইল মিশরীয়দের বিরুদ্ধে ইয়াহ্ওয়েহর চরম কৃতিত্ব দেখেছিল, আর লোকে ইয়াহ্ওয়েহকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, তারা ইয়াহওয়েহ্ এবং তাঁর দাস মোজেসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।[২৫]

বাইবেলের বিবরণ কখনও পড়েননি মুহাম্মদ (স:), কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় দর্শনের একই অভ্যন্তরীণ গতিময়তা থাকায় এর চেতনা ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বদরের দিন আল-লাহ কুরাইশদের হাত থেকে *উম্মাকে* উদ্ধার করেছেন আর মুসলিমরা কুরাইশ নেতাদের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে; *উম্মা* মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে আল-লাহর চরম কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ করেছে এবং লোকে আল-লাহ এবং তাঁর দাস মুহাম্মদ (স:)কে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। পার্থক্যটা হচ্ছে, মুহাম্মদের (স:) জীবনে প্রায়ই যা হয়েছে, এটা কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার কিংবদন্তীতে রূপায়ন নয়, বরং এমন কিছু যা মুসলিমদের বিস্মিত চোখের সামনে সংঘটিত

হয়েছে। প্রতি বছর ইহুদীরা পাসওভারে এই *ফুরকান* পালন করত, মুহাম্মদ (স:) অবশ্য প্রথমে ভেবেছিলেন যে লোহিত সাগরের বিজয়ের ঘটনা ইয়োম কিপ্পুরের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। তাবারি যেমন বলছেন :

> পয়গম্বর (তাঁর ওপর ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হোক) যখন মদিনায় এলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন ইহুদীরা আশুরার দিন উপবাস পালন করছে, তাদেরকে প্রশ্ন করলেন তিনি; তারা তাঁকে জানায় যে এদিনে ঈশ্বর ফেরাউনদের ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং মোজেস এবং তাঁর সহচরদের উদ্ধার করেছিলেন। মুহাম্মদ (স:) মন্তব্য করেছিলেন : ওদের চেয়ে আমাদের অধিকার বেশি, তিনি নিজে উপবাস পালন করেন আর লোকজনকেও ওই দিন উপবাস পালনের নির্দেশ দেন।[২৬]

মুহাম্মদ (স:) তখন *উম্মার* ধর্মীয় জীবন ইহুদীদের আদলে গড়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি ইসলামকে *কিবলা* পরিবর্তনের সময় পুরনো ধর্মের রীতিনীতি থেকে আলাদা করে ফেলেন। বিজয়ের অল্প কয়েকদিন পর, রমযান মাসের ৯ তারিখে মুহাম্মদ (স:) ঘোষণা দিলেন মহরম মাসের এক তারিখে উপবাস পালন মুসলিমদের জন্যে বাধ্যতামূলক নয়, বরং তাদেরকে রমযান মাসে বদরের বিশেষ *ফুরকানের* স্মরণে উপবাস পালন করতে হবে। ৬২৫ খৃস্টাব্দের মার্চে প্রথম চালু করা রমযান মাসের উপবাস ইসলামের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু মুহাম্মদ (স:) উপলব্ধি করেছিলেন যে নতুন পরিস্থিতির একটা অন্ধকার দিকও আছে, কারণ *উম্মা* কুরাইশদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ওদের মর্যাদার ওপর মক্কা নির্ভর করে, সুতরাং আরব পরাশক্তি হিসাবে টিকে থাকতে চাইলে কুরাইশদের বদরের অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। পঞ্চাশ জন সদস্যের হত্যার বদলা নিতে হবে তাদের। আবার প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংগ্রাম (*জিহাদের*) নতুন একটা পর্যায়ে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছিল *উম্মা*। কিন্তু লোহিত সাগর অতিক্রমের পর ইসরাইলীরা যেমন শত্রু নির্মূল করার পবিত্র যুদ্ধ শুরু করেছিল, মুহাম্মদ (স:)-এর কুরাইশদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার তেমন কোনও ইচ্ছা ছিল না। যেভাবেই হোক তাদের স্বমতে আনতে হবে; এই লক্ষ্যে, এমনকি প্রথম বিজয়ের মুহূর্তেও তিনি কুরাইশ বন্দীদের সঙ্গে ভাল আচরণ করেছেন। যুদ্ধের পর পর দুজন বন্দীকে হত্যা করিয়েছিলেন তিনি, কারণ *হিজরার* আগে ওই দুজন তাঁর বিরুদ্ধে অমার্জনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চালিয়েছিল : আমরা দেখেছি মুহাম্মদ (স:) এ ধরনের ক্রিটিক্যাল চ্যালেঞ্জকে গভীর হুমকি হিসাবে দেখতেন। কিন্তু বাকি বন্দীদের নিরাপদে মদিনায় নিয়ে আসা হয়েছিল এবং যারা তাঁদের বন্দী করেছিল তাদের বাড়িতেই চমৎকারভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিল। এর পরপরই

যুদ্ধবন্দীদের জন্যে একটা মানবিক নীতি গঠন শুরু করে কোরান। নির্দেশ দেয়া হয় যে তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করা যাবে না; হয় তাদের মুক্তি দিতে হবে আর নয়ত পণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হবে। যদি মুক্তিপণের কোনও সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে বন্দীদের পরিশ্রমের মাধ্যমে তা জোগার করার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে : বন্দীকারীর প্রতি আহ্বান জানান হয় তাকে নিজ উৎস থেকে পণের টাকা সংগ্রহে সাহায্য করার আর বন্দী মুক্তিদানকে দান ও মহৎ গুণ হিসাবে প্রশংসা করা হয়।[২৭] পরবর্তী সময়ের এক বিবরণে (*হাদিস*) মুসলিমদের বন্দীদের সঙ্গে আপন পরিবারের সদস্যের মত আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই *হাদীস* অনুযায়ী মুহাম্মদ (স:) বলেন : 'তোমরা যা খাও ওদের তাই খেতে দেবে, যদি ওদের কোনও কঠিন কাজ দাও, তাহলে তোমাদেরকেও ঐ কাজে সাহায্য করতে হবে'।[২৮] কোরান ও *হাদিসের* এই নির্দেশনা বা আইনের সঙ্গে, অবশ্যই, বর্তমানে মুসলিমরা তাদের বন্দীদের সঙ্গে যেমন আচরণ করে থাকে তার দুঃখজনক বৈপরীত্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সংগ্রামে এ ধরনের জিম্মি আটকের মাঝে সত্যিকার ইসলামি কিছুই নেই। যেসব শিয়া মুসলিম বৈরুতে তাদের জিম্মিদের সঙ্গে অসদাচরণ করেছে এবং বাড়ি ফিরতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে 'ইসলাম' অনুযায়ী এটা করতে তারা বাধ্য ছিল না; আসলে, তাদের আচরণ তাদের ধর্মের পবিত্র এবং মূল ধারণার পরিপন্থী ছিল।

বদরে আটক বন্দীরা অপরিচিত শত্রু ছিল না, তারা ছিল অভিবাসীদের নিকট আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন। মুহাম্মদের (স:) স্ত্রী সওদাহ তাঁর চাচাত ভাই এবং ভগ্নিপতি সুহায়েলকে ঘরের এক কোণে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় অপমানকর ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। প্রাচীন গোত্রীয় অনুভূতি নিমেষে জেগে উঠেছে, মুহূর্তে নতুন মুসলিম আদর্শ বিলুপ্ত হয়েছে। 'হে আবু ইয়াজিদ,' ভর্ৎসনার সুরে তাঁকে বলেছেন তিনি, 'অনেক তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করেছেন আপনি। আপনার উচিত ছিল সম্মানের সঙ্গে প্রাণ দেয়া।' কিন্তু পেছনে ঘরে ঢোকা স্বামীর কড়া ধমকে চট করে আবার বর্তমানে ফিরে এসেছিলেন তিনি। 'সওদাহ! তুমি কী ঈশ্বরের আর তাঁর প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাও?' [২৯] তবে মুহাম্মদের (স:) আত্মীয়তার অনুভূতিও ছিল শক্তিশালী। চাচা এবং চাচাত ভাই বন্দী অবস্থায় কষ্ট আর দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন ভেবে সেরাতে তিনি ঘুমাতে পারেননি, তবে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। মানবিক এবং সদাচরণের ফল পাওয়া গিয়েছিল। *উম্মার* জীবনধারা দেখে বন্দীদের কেউ কেউ এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় ছিল সম্ভবত: উমায়ের ইবন ওয়াহবের (যিনি বদরে যুদ্ধ না করার জন্য কুরাইশদের সম্মত করানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন) ইসলাম গ্রহণ। মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর স্বগোত্রীয় সাফওয়ান ইবন উমাঈয়াহ্ আবার মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদকে (স:) গুম খুনে প্ররোচিত করেছিল। উমায়ের মদিনায় গেছেন, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) তাঁকে ধরে ফেলেন, এবং উমায়ের মুসলিম হয়ে যান।

বন্দীদের মাঝে একজন ছিলেন মুহাম্মদের (সঃ) মেয়ে জামাই আবু আল-আস, প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী, যায়নাব, পয়গম্বরে মেয়ে, তখনও মক্কায়ই ছিলেন, আবু আল-আসের ভাই আম্‌রকে খাদিজার একটা ব্রেসলেট মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন। ব্রেসলেটটা চিনতে মুহাম্মদের (সঃ) কষ্ট হয়নি, তীব্র আবেগে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মুক্তিপণ ছাড়াই আবু আল-আসকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে মুসলিমদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন, তারা সানন্দেই তা গ্রহণ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন আবু আল-আস ইসলাম গ্রহণ করবেন, কিন্তু তেমনটি ঘটেনি, তাই তিনি যায়নাব ও তাদের ছোট মেয়ে উমামাহকে মদিনায় পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন তাঁকে। সংগ্রামের এই পর্যায়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে পৌত্তলিক ও মুসলিমদের মধ্যে বিয়ে আর চালু থাকছে না। বিমর্ষ চিত্তে রাজি হয়েছিলেন আবু আল-আস, তিনি জানতেন যে যায়নাব যদি তাঁকে ত্যাগ করতে নাও চান, তবু তাঁর পক্ষে মক্কায় অবস্থান করা সম্ভব হবে না।

এ সময়ে যায়নাবের সঙ্গে একত্রিত হওয়াটা মুহাম্মদের (সঃ) জন্যে স্বস্তিদায়ক ছিল, কারণ বদর থেকে ফেরার পর তিনি জানতে পারেন যে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে অপরূপ রুকাইয়াহ্, তাঁর মেয়ে, মারা গিয়েছেন। উসমান বলতে গেলে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) যখন তাঁর অপর মেয়ে উম্ম কুলসুমের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ছোট মেয়ে ফাতিমাহ্‌কে নিয়ে রুকাইয়াহ্‌র কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ), নিজের চাদরের কোণ দিয়ে মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিয়েছেন। ফাতিমাহ্‌র বয়স তখন বিশ বছর, বিয়ের উপযুক্ত বয়স হয়ে গিয়েছিল। আবু বকর এবং উমর উভয়ই তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী থাকলেও মুহাম্মদের (সঃ) প্রথম পছন্দ ছিলেন তরুণ আলী, ফাতিমাহ্‌র সঙ্গে যিনি ভাইয়ের মতই বড় হয়ে উঠেছেন। চরম দারিদ্রতার কারণে প্রথমে দ্বিধান্বিত ছিলেন আলী, বাবা আবু তালিবের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পাননি তিনি। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে অগ্রসর হতে উৎসাহ জোগান এবং বদরের যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়।

মোটামুটি একই সময়ে আবার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)। উমরের বোন হাফসাহ্ সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন, তাঁর স্বামী কুহনায়েস ইবন হুদাফাহ্ আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফেরার পর তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, এবং বদরের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। হাফসার বয়স তখন আঠার বছর। সুন্দরী এবং সফল মহিলা ছিলেন তিনি : বাবার মত লিখতে পড়তে জানতেন, কিন্তু আবার বাবার মতই রগচটাও ছিলেন যা তাঁর সৌন্দর্যের সঙ্গে বেমানান ছিল। হাফসার শোকের কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে উমর তাঁকে উসমানের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে মুহাম্মদের (সঃ) ইচ্ছা উসমান উম্ম কুলসুমকে বিয়ে করবেন। এরপর আবু বকরের কাছে প্রস্তাব রাখেন তিনি, আবু বকর এরকম

বিব্রতকর প্রস্তাব পেয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। উমর যখন দুজন ঘনিষ্ঠ সহযোগির আপাত অসৌজন্যতা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে মুহাম্মদের (স:) কাছে গেলেন, পয়গম্বরের জামাই হবার প্রস্তাবে কোমল হয়ে যান তিনি। হাফসাহকে বিয়ে করার ব্যাপারে মুহাম্মদের (স:) ইচ্ছার কথা আগেই জানতেন বলে উমরের সঙ্গে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি দূর করার ব্যবস্থা নেন আবু বকর। ৬২৫ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় যার ফলে দুজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সঙ্গে পয়গম্বরের রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল। তিনি তখন দুজনেরই মেয়ে জামাই।

হাফসাহকে স্বাগত জানাতে পেরে খুশি হয়েছিলেন আয়েশা। পয়গম্বরের পরবর্তীকালের স্ত্রীদের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত ছিলেন তিনি, কিন্তু তাদের দুজনের বাবার মাঝে ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের কারণে এই দুজন নারীও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। আয়েশার বয়স তখনও কম ছিল বলে এই পর্যায়ে হাফসাহই নেতৃত্ব পাবেন বলে মনে করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওঁরা দুজন সওদাহর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছেন, তবে প্রথম দিকে স্বভাবতঃই বয়স্কা মহিলাকে খেলাতে পছন্দ করতেন তাঁরা। একদিন সওদাহর সঙ্গে রসিকতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন দুজন। তাঁকে তাঁরা বললেন যে *দজ্জাল*, ভণ্ড পয়গম্বর, মুসলিমদের জন্যে দুষ্টশক্তির আগমন ঘটেছে। সওদাহ এতই আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে ভয়ঙ্কর মানুষটার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে রান্নার তাঁবুতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আত্মগোপন করার জন্যে। হাসতে হাসতে ওরা দুজন মুহাম্মদকে (স:) ঘটনাটা বলতে ছুটে যান, শুনে বেচারা সওদাহকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছিলেন মুহাম্মদ (স:), ধূলিমলিন চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন সওদাহ, আসলে *দজ্জাল* আসেনি বুঝতে পেরে এতটাই স্বস্তিবোধ করেছিলেন যে ছোট দু'বোনকে–পয়গম্বরের স্ত্রীরা নিজেদের এভাবেই আখ্যায়িত করতেন-ভর্ৎসনা করতেও ভুলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তরুণী স্ত্রীদের জন্যে জীবন যাপন সবসময় আনন্দমুখর ছিল না। একদিন, আয়েশার তখন কিশোরী বয়স, মুহাম্মদ (স:) এক যুদ্ধবন্দীর ওপর নজর রাখতে বলেছিলেন তাঁকে। আয়েশা অমনোযোগি হয়ে যাওয়ায় লোকটা পালিয়ে যায়। মুহাম্মদ (স:) ফিরে এসে কি ঘটেছে জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন : 'আল্-লাহ যেন তোমার হাত কেটে দেন!' রাগতঃ স্বরে আয়েশার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে বন্দীকে ধরার জন্যে ছুটে বেরিয়ে যান তাঁবু থেকে। পরে, বন্দী ধরা পড়লে তিনি ফিরে এসে দেখতে পান আয়েশা গভীরভাবে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। কী ব্যাপার, জানতে চান তিনি। আয়েশার ওপর কী *জিনের* আসর হয়েছে? আয়েশা জবাবে বলেছেন তিনি ভাবছেন আল্-লাহ তাঁর কোন হাত কাটবেন। মুহাম্মদ (স:) লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত বোধ করলেন, দ্রুত আয়েশার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বললেন যে তিনি প্রার্থনা করবেন আল্-লাহ যেন তিনি কাউকে অভিশাপ দিলে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

বদরের পর মুহাম্মদের (স:) অবস্থান উন্নত হয়েছিল, কিন্তু সাহায্যকারীদের সবাই তাঁর বর্ধিত মর্যাদায় খুশি হতে পারেনি। বিজয়ের উল্লাস আর গর্ব সত্ত্বেও বেশির ভাগ চিন্তাশীল মুসলিমরা জানত যে আরও একবার কুরাইশদের পরাস্ত করা অত সহজ হবে না। তো বদরের পরবর্তী বছরটা কেটে গিয়েছিল উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়, এদিকে মক্কা মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিতে বেদুঈন গোত্রগুলোর প্রতি আহবান জনাচ্ছে জানতে পেরে উদ্বেগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। ইবন উব্বাঈ আর প্রতিপক্ষ শিবির এই আতঙ্ককে পুঁজি করে যুক্তি দেখাতে শুরু করেছিল যে ইসলাম মদিনাকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এটা ঠিক যে, মুহাম্মদের (স:) আগমনের আগে মরুদ্যানটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তো গোটা আরব বিশ্ব এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। এই আতঙ্ক দুর্বোধ্য নয়। ইবন উব্বাঈ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি প্রত্যাদেশ মনতে রাজি থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মদ (স:)কে মানবেন না, কারণ তিনি মদিনাকে বিপজ্জনক এক যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু, কোরান যেমন উল্লেখ করেছে, যখন মুহাম্মদের (স:) কোনও সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে *জিহাদের* প্রয়োজনীয়তাকে নিশ্চিত করা হয়, তখন বিরোধীরা বিপক্ষেই রয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।[৩০]

মদিনায় মুহাম্মদের (স:) নতুন অবস্থান দেখে শঙ্কিত ইহুদী গোত্রগুলোর সমর্থন পাচ্ছিলেন ইবন উব্বাঈ, মক্কাকে তারা স্বাভাবিক মিত্র হিসাবে দেখছিল। যেমন, বিজয়ের অব্যবহিত পরপরই বনি নাদির গোত্রের একজন কবি কা'ব ইবন আল-আশরাফ সোজা মক্কায় গিয়ে উত্তেজক কবিতা রচনা করতে লেগে গিয়েছিল, এইসব কবিতায় সে কুরাইশদের মুহাম্মদের(স:) বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে এবং হত্যার বদলা নেওয়ার আহবান জানিয়েছে :

ওদের যখন হত্যা করা হল, হায়, পৃথিবী
বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সন্তানদের আশ্রয় দিয়েছে,
আর যে এখবর ছড়িয়ে দিয়েছিল সে ছুটে গেছে
আর বেঁচে ছিল কাপুরুষের মত বোবা আর অন্ধ হয়ে।[৩১]

কা'বের রচনা মক্কাবাসীদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল যে মদিনার সবাই মুহাম্মদের (স:) সমর্থনে জোটবদ্ধ নেই। ইহুদী গোত্রগুলো ছিল মারাত্মক। উল্লেখযোগ্য সৈন্য আর চমৎকার যুদ্ধক্ষমতা ছিল তাদের, মক্কা থেকে আক্রমণ এলে ভুইফোঁড় লোকটাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে কুরাইশদের পক্ষে যোগ দেয়া অসম্ভব ছিল না। কবিতা ছিল আরবের রাজনৈতিক জীবনের মূল এবং কা'বের কবিতা কুরাইশদের বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল, পরাজয়ের পর থেকে শোকাবিভূত হয়ে ছিল তারা।

বিপর্যয়ের পর আবু সুফিয়ান মক্কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অপরাপর অধিকাংশ নেতা নিহত হয়েছিলেন এবং বদরের অল্পদিন পরেই মারা গিয়েছিল মুহাম্মদের (স:) বৈরী চাচা। ফলে মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে সংঘাতের নেতৃত্ব চলে আসে আবু সুফিয়ানের হাতে। সিনেটের এক বিশেষ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সিরিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে আসা ক্যারাভানের পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকা মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করা হবে এবং বদর যুদ্ধের মোটামুটি দশ সপ্তাহ পর আবু সুফিয়ান স্বয়ং আসন্ন সংঘাতের সঙ্কেত স্বরূপ একটা *ঘাযুর* নেতৃত্ব দেন। দুশো লোকসহ মদিনার উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হন তিনি, ওখানে ময়দানে তাঁবু খাটান, পরে রাতের অন্ধকারে কা'বের গোত্র বনি নাদিরের এলাকায় ঢুকে পড়েন, গোত্র প্রধান সালাম ইবন মিশকান তাঁর সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং ইবন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী, 'মুসলিমদের সম্পর্কে গোপন তথ্য জানিয়ে দেন।' পরদিন তিনি এবং তাঁর লোকেরা কয়েকটি কৃষিক্ষেত তছনছ করেন, খেঁজুর গাছে আগুন ধরিয়ে দেন (এ ঘটনা সকল আরব নীতিমালার পরিপন্থী ছিল, একে সব সময় যুদ্ধের পূর্ব লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হত) এবং কৃষি কাজে নিয়োজিত দুজন সাহায্যকারীকে হত্যা করেন। এ সংবাদ শোনামাত্র মুহাম্মদ (স:) মুসলিমদের এক বাহিনী নিয়ে ধেয়ে যান, ফলে পালিয়ে যায় কুরাইশরা, পালানোর সুবিধার জন্যে পেছনে ফেলে যায় সব রসদপত্র।

ইহুদী গোত্রগুলো নিঃসন্দেহে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছিল। মক্কার কোনও বাহিনীকে যদি মদিনার দক্ষিণে অবস্থান নিতে হয়, যেখানে দুটো শক্তিশালী গোত্রের সীমানা রয়েছে, ইহুদী বাহিনী অনায়াসে মিত্র হিসাবে বিবেচিত কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। কুরাইশরা যদি উত্তর দিক থেকে শহরের ওপর আক্রমণ চালায়, ইহুদী গোত্রগুলো পেছন থেকে হামলা করতে পারবে, অর্থাৎ পুরোপুরি ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে তারা। মুহাম্মদ (স:) বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে তাঁকে। ইহুদী থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীরা তাঁকে জানিয়েছিল যে তিনটি গোত্রের মধ্যে ক্ষুদ্রতমটি বনি কাঈনুকাহ্ বিশেষভাবে *উম্মার* ঘোর বিরোধী। *হিজরার* আগে তারা ইবন উব্বাঈয়ের মিত্র ছিল এবং বদরের পর তারা মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বরখেলাপ করে পুরনো মৈত্রী জাগিয়ে তুলে প্রতিপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি ও পয়গম্বরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মদিনা 'শহরে'র কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিল তাদের এলাকা : অন্য দুই গোত্রের মত তারা কৃষক নয়-কর্মকার ও কারুশিল্পী ছিল। বদর যুদ্ধ এবং কা'বের মক্কায় গমনের অল্পদিন পরেই মুহাম্মদ (স:) তাদের বাড়ি ঘরে যান এবং তাঁকে পয়গম্বর হিসাবে মেনে নেয়ার আহবান জানান–তাদের সাধারণ ধর্মীয় ঐতিহ্যের খাতিরে। কাঈনুকাহ গোত্রের ইহুদীরা বৈরী নীরবতার সঙ্গে শোনে এবং জানায় যে তাদের '*উম্মায়*' থাকার কোনও ইচ্ছা নেই : 'হে মুহাম্মদ, আপনি বোধ হয় আমাদের আপনার লোক বলে ভেবেছেন। নিজেকে ভুল বোঝাবেন না, কারণ যুদ্ধের কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই আপনি এক গোত্রের (বদরে) মোকাবিলা করেছেন এবং জয়লাভ করেছেন; ঈশ্বরের

দোহাই, আমরা যদি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই, দেখবেন, আমরা সত্যিকারের পুরুষ।'[৩২] এই হুমকির পর মুহাম্মদ (স:) বিদায় নেন এবং পরবর্তী পরিস্থিতির অপেক্ষায় থাকেন।

কয়েক দিন পর কাঈনুকা গোত্রের '*সৌকে*' একটা ঘটনা ঘটে। জনৈক ইহুদী স্বর্ণকার এক মুসলিম মহিলার সঙ্গে প্রতারণা করে বসে : সে গোপনে ওই মহিলার স্কার্টের নিম্নাংশ উর্ধ্বাংশের পোশাকের সঙ্গে এঁটে দিয়েছিল যাতে মহিলা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কাঈনুকা গোত্রের ইহুদী ও মুসলিমদের মনোভাব এমন অহি-নকুল ছিল যে সাহায্যকারীদের একজন তীব্র ক্রোধে স্বর্ণকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিণতিতে ভয়ঙ্কর গতিতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং একজন ইহুদী ও একজন মুসলিম নিহত হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ছিল সমান সমান, মুহাম্মদের (স:) বিরোধ মীমাংসার ঘোষিত দায়িত্ব পালন করে শান্তি স্থাপনের আহবান জানান হয়েছিল। কিন্তু ইহুদীরা তাঁর সালিস মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা নিজস্ব দুর্গসমূহে অবস্থান নিয়ে আরব মিত্রদের সাহায্য করার আহবান জানায়। কাঈনুকা গোত্রে প্রায় ৭০০ জন যোদ্ধা ছিল, পুরনো আরব মিত্র যদি তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে মুহাম্মদের (স:) মোকাবিলা করার জন্যে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসত, মুহাম্মদের(স:) পক্ষে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হত না। কাঈনুকাকে সাহায্য করার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন ইবন উব্বাঈ, অপর মিত্র উবাদাহ্ ইবন সামিতের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। কিন্তু উবাদাহ ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম, তিনি জানিয়ে দেন যে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইহুদীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। ইবন উব্বাঈ উপলব্ধি করলেন যে সাহায্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই, কেননা অবশিষ্ট আরবগণ পয়গম্বরের পেছনে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। কাঈনুকা গোত্র মুহাম্মদের (স:) এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়ার আশায় ছিল, কিন্তু তার বদলে আতঙ্কের সঙ্গে তারা নিজেদের মদিনার সকল আরবের ঘেরাওয়ের মধ্যে আবিষ্কার করে বসল। দুই সপ্তাহ তারা ইবন উব্বাঈয়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এর পরই ইবন উব্বাঈ ছুটে যান মুহাম্মদের (স:) কাছে বন্দীদের সঙ্গে ক্ষমা সুন্দর আচরণ করার অনুরোধ নিয়ে, পয়গম্বর জবাব না দেয়ায় তিনি তাঁর কলার চেপে ধরেন। রাগে শাদা হয়ে গিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), কিন্তু ইবন উব্বাঈ ছিলেন নাছোড়বান্দা : কি করে তিনি পুরনো সাহায্যকারীদের পরিত্যাগ করার কথা ভাবতে পারেন, যারা অতীতে বহুবার তাঁকে সাহায্য করেছে? তিনি জানতেন যে মুহাম্মদ (স:) আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী গোটা গোত্রকে ধ্বংস করে দেয়ার অধিকারী, কিন্তু কাঈনুকা গোত্র অবিলম্বে মরুদ্যান ছেড়ে চলে যাবে, এই শর্তে তিনি তাদের প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেন। ইবন উব্বাঈকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাদের মদিনার বাইরে নিয়ে যাবার। ইবন উব্বাঈয়ের সাহায্য করার ক্ষমতা নেই বুঝতে পেরে কাঈনুকা

বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। একটা জুয়া খেলতে গিয়েছিল তারা, যেটা ফলপ্রসূ হয়নি, কেননা মুহাম্মদ (সঃ) কতখানি ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছেন তা বুঝতে পারেনি তারা, উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে প্রাচীন ব্যবস্থা চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়েছে, এবং বিশ্বাস করে বসেছিল প্রাক্তন আরব মিত্ররা আবার তা ফিরিয়ে আনার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। প্রাণ নিয়ে যেতে পারাটাই ভাগ্যের ব্যাপার বুঝতে পেরে কোনওরকম প্রতিবাদ ছাড়াই মরুদ্যান ছেড়ে চলে যায় তারা। প্রাক-ইসলাম যুগে যুদ্ধের সময় আগেও বহুবার বিভিন্ন গোত্রকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে : মদিনাবাসীরা এই শাস্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল; কাঈনুকাও চলে যাবে বলে ধরে নিয়েছিল সবাই। ওয়াদি আল-কুরায় আরেক ইহুদী দলের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল তারা এবং শেষ পর্যন্ত সিরিয় সীমান্তে বসতি গড়ে।

মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে মুহাম্মদের (সঃ) আচরণ বোঝা পশ্চিমে আমাদের জন্যে কঠিন, কারণ এটা আমাদের লজ্জাজনক ইতিহাসের অসংখ্য লজ্জাকর দৃশ্য ফিরিয়ে আনে। কিন্তু মরুদ্যানের তিনটি প্রধান ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (সঃ) সংগ্রাম প্রায় হাজার বছর ধরে ক্রিশ্চান ইয়োরোপের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী বর্ণ ও ধর্মীয় ঘৃণা বোধের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। ক্রিশ্চানদের যুক্তিবর্জিত সন্ত্রাস ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিটলারের সেক্যুলার ক্রুসেডের ভেতর চূড়ান্ত প্রকাশ খুঁজে পেয়েছিল। মুহাম্মদের (সঃ) মনে তেমন কোনও ভয় বা কল্পনা ছিল না, মদিনাকে '*জুদেনরাইনে*' পরিণত করার কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কাঈনুকার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক; মদিনায় বসবাসরত ছোট ছোট ইহুদী গোত্র যারা চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়েছে তাদের প্রতি সেই বিরোধ প্রকাশিত হয়নি এবং তারা মুসলিমদের পাশাপাশি শান্তিতেই বসবাস করেছে।

উম্মার জন্য খুব বিপজ্জনক সময় ছিল এটা, সদস্যরা জানত মক্কা থেকে ব্যাপক আক্রমণ আসতে পারে, ফলে তাদের পক্ষে নিজেদের ভেতরেই শত্রু পোষা সম্ভব ছিল না। ইবন উব্বাঈ এবং বনি নাদিরের মত অন্যান্য সম্ভাব্য বিরোধীদের প্রতি কাঈনুকার বহিষ্কারের ঘটনাটি সতর্কবাণী ছিল। এতে বোঝা গিয়েছিল যে মুহাম্মদ (সঃ) হেলাফেলার পাত্র নন। কয়েক মাস পরে কবি কা'ব মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে বিদ্রোহে উস্কানি দেয়ার জন্যে আরও মানহানিকর কবিতা রচনা শুরু করেছিল, মুহাম্মদ (সঃ) তাকে হত্যা করান। বৈরী কবিদের কারণে শঙ্কিত বোধ করতেন মুহাম্মদ (সঃ)। আমরা দেখেছি তাদের উচ্চারণের প্রায় যাদুকরি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হত- আরবে একজন কবি মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত হতে পারত; মুহাম্মদের (সঃ) পক্ষে মদিনার বিরূপ পক্ষগুলোকে খেপিয়ে তোলা বা বেদুঈন গোত্রগুলো তার কবিতা শুনে মদিনার বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের কোয়ালিশনে যোগ দিতে উৎসাহিত হোক, এমনটি হতে দেয়া সম্ভব ছিল না। কাঈনুকার পরাজয়ের ফলে বনি নাদির ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং কা'ব নিহত হলে তারা মুহাম্মদের (সঃ) কাছে এই অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিল যে তিনি তাদের একজন প্রধান ব্যক্তিত্বকে মৃত্যুর

দিকে ঠেলে দিয়েছেন। মুহাম্মদ (স:) জানতেন ওরা কা'বের মতই তাঁর প্রতি বৈরী, কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে চুপ করে আছে, তিনি ওদের জানিয়ে দেন যে বিরুদ্ধ-চিন্তা ও মতামত সহ্য করা গেলেও তাঁর পক্ষে বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এরপর তিনি বনি নাদির গোত্রের সঙ্গে আগের চুক্তির অতিরিক্ত একটা বিশেষ চুক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রস্তাব রাখেন, তাদের নিরাপত্তা ও নীরবতা নিশ্চিত করার জন্যে। সানন্দেই রাজি হয় বনি নাদির। মক্কার আক্রমণের অপেক্ষার অবসরে মুহাম্মদ (স:) সাফল্যের সঙ্গেই অভ্যন্তরীণ শত্রুকে দমন করেছিলেন।

এই সঙ্কট মোকাবিলায় মুহাম্মদের (স:) দক্ষতায় মদিনায় তাঁর অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে, কিন্তু তখনও তিনি *উম্মার* প্রধান হিসাবে বিবেচিত হননি। উবাদাহ ইবন সামিতের সমর্থন ছাড়া তাঁর পক্ষে কাঈনুকা এবং ইবন উব্বাঈয়ের যৌথ হুমকি মোকাবিলা করা সম্ভব হত না। কাঈনুকার রেখে যাওয়া রসদপত্রের এক পঞ্চমাংশের (*খুমস*) অধিকার পেয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)। রেওয়াজ অনুযায়ী জনগণের ব্যবহার করার জন্যে এধরনের দ্রব্যাদির চারভাগের একভাগ নেয়ার অধিকার ছিল কোনও গোত্র প্রধানের : তিনি উপহার বিতরণ করবেন, গরীব জনগণের সেবা করবেন এবং আপ্যায়ন করবেন এটাই ছিল প্রত্যাশিত। ওই *খুমস্* মুহাম্মদ (স:)-কে অন্যান্য প্রধান থেকে একটু আলাদা করে উপস্থাপন করেছিল, তবে এটাও বোঝা গিয়েছিল যে তিনি মোটামুটি তুলনামূলক একটা অবস্থান অর্জন করেছেন। মক্কার আক্রমণের জন্যে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করার সময় বদর যুদ্ধে অর্জিত সম্মান ও মর্যাদা সংগঠিত করেন মুহাম্মদ (স:)। মক্কার প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যখনই কোনও যাযাবর গোত্র মদিনায় আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে বলে খবর পেয়েছেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে গেছেন সেই হামলা পণ্ড করে দেয়ার জন্যে এবং দেখা গেছে মুসলিম বাহিনী উপস্থিত হওয়ামাত্র শত্রুপক্ষ পাশ্চাদপসরণ করছে। গ্রীষ্মকালে কুরাইশদের ওপর আরও একদফা অপমান চড়িয়ে দিতে সক্ষম হন তিনি। বদরের পর থেকে ক্যারাভানগুলো আর লোহিত সাগরের পথ দিয়ে সিরিয়ায় যেতে পারছিল না ; কিন্তু সাফওয়ান ইবন উমাইয়াহ মদিনার পুব দিয়ে নজদ রুট দিয়ে ইরাক যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই পথটি সুবিধাজনক ছিল না, কারণ জলাশয়গুলো ছিল বেশ দূরে দূরে, কিন্তু সাফওয়ান এক লক্ষ দিরহাম মূল্যমানের রোপ্যবাহী উটের দলের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও কিছু পানিবাহী উটের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। মুহাম্মদ (স:) এই ক্যারাভানের সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং বাধা দেয়ার জন্যে যায়েদকে পাঠান। ক্যারাভান যখন কারাদা কূপের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিল অসতর্ক অবস্থায় তার নাগাল পেয়ে যান যায়েদ এবং তাঁর দল : বদরের পর মুসলিম বাহিনীর ভীতিকর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, মক্কাবাসীরা ওদের অগ্রসর হতে দেখেই ক্যারাভান ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

মদিনায় আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে কুরাইশরা তাদের প্রস্তুতি জোরদার করছিল, কিন্তু শীত পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল তারা। অবশেষে ১১ মার্চ ৬২৪ তারিখে

৩,০০০ পুরুষ, ৩,০০০ উট আর প্রায় ২০০ ঘোড়ার এক বিশাল বাহিনী মক্কা ত্যাগ করে ধীরে সুস্থে মদিনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাদের মিত্র পক্ষের আহাবিশ নামে পরিচিত বেদুঈন সম্প্রদায়, তায়েফের সাকিফ এবং আব্দ মানাত গোত্র। ২১ মার্চ ওই বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে পৌছে মরুদ্যানের উত্তর-পশ্চিমে উহুদ পর্বতের সম্মুখবর্তী সমতলে তাঁবু খাটায়। এর মাত্র এক সপ্তাহ আগে শত্রু বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:) এবং মদিনাবাসীরা। ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলার তখন আর সময় ছিল না, তবে তারা বসতির বাইরের দিকে বসবাসরত অধিবাসীদের ভেতরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, 'নগর' অভ্যন্তরে উট, গবাদি পশু, ভেড়া আর ছাগলসহ নিজেদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তারা। মক্কার বাহিনী পৌছার পরপর মদিনার গোত্র প্রধানরা যুদ্ধ সভায় মিলিত হন। অভিজ্ঞব্যক্তিরা চরম সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন : প্রত্যেককে 'নগরী'র অভ্যন্তরে থাকতে হবে, শত্রুর সঙ্গে মিলিত হতে বাইরে যাওয়া চলবে না। আরবে অবরোধ টিকিয়ে রাখা সবসময় কষ্টকর ছিল আর অতীতে যখন এধরনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে শত্রুবাহিনী সবসময়ই বিনাযুদ্ধে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু এবার তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউ অ্যাকশন দেখতে চাইল। তারা যুক্তি দেখাল যে মাত্র ৩৫০ মানুষ নিয়ে বদরের যুদ্ধে মুহাম্মদ (স:) বিরাট সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন : নিশ্চয়ই ঈশ্বর আবার তাদের সাহায্য করবেন। কৃষকদের কেউ কেউ এতে সমর্থন জোগাল, তারা 'নগরী'র বাইরে ফেলে আসা ফসল মাড়িয়ে কুরাইশদের আগে বাড়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারছিল না। উত্তেজিত এ-দলটি এত মারমুখী হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু পরে ওরা পিছিয়ে যায়, বিশেষ করে সা'দ ইবন মুয়াধের মত লোক যখন বলেন যে ওরা বিপর্যয় ডেকে আনছে। মুহাম্মদকে (স:) তারা জানায়, এখন 'নগরী'র ভেতরে অবস্থান করতে তারা রাজি আছে, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) সঙ্গতভাবেই যুদ্ধের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। 'একজন পয়গম্বর যখন যুদ্ধসাজ গ্রহণ করেন,' ব্যাখ্যা দেন তিনি, 'তখন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই সজ্জা ত্যাগ করা ঠিক নয়।'[৩৩] এই পর্যায়ে দোদুল্যমানতা বিপজ্জনক হয়ে উঠত। সুতরাং ২২ মার্চ, ৬ শাওয়াব তারিখে মুহাম্মদ (স:) তাঁর প্রিয় ঘোড়ার পিঠে আসীন হলেন এবং প্রায় এক হাজার পুরুষকে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন উহুদের দিকে, প্রায় বিশমাইল দূরে, প্রায় তিনগুন বিশাল এক সেনাদলের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। সাবাথ থাকায় ইহুদীরা সেদিন যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল; মুসলিমরা খুব ভাল করেই জানত যে তারা মক্কার সাফল্য কামনায় প্রার্থনা করছিল। মদিনা ও উহুদের মাঝামাঝি জায়গায় সেরাতে তাঁবু গেড়েছিল সেনাদল, এবং সকালে তিন শত লোককে সঙ্গে নিয়ে নগরে পালিয়ে চলে আসেন ইবন উব্বাঈ। তিনি মুহাম্মদকে(স:) নিজের সিদ্ধান্ত জানানোরও প্রয়োজন মনে করেননি, তবে সাহায্যকারীদের কারও কারও কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে

তিনদিন তারা মক্কার সেনাবাহিনীকে অনুসরণ করে। রাতের বেলা মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর লোকদের পরস্পরের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে দিতেন, প্রত্যেকেই একটা করে আগুন জ্বালত, ফলে মনে হত এক বিশাল বাহিনী তাঁবু খাটিয়েছে। এর ফলে যেসব কুরাইশ আবার মদিনায় ফিরে গিয়ে ধ্বংসোন্মুখ *উম্মার* ওপর আরেক দফা হামলা চালাতে চেয়েছিল তারা অনুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু সান্ত্বনা হিসাবে এটা যথেষ্ট ছিল না। উহুদের পর অধিকাংশ মুসলিম গভীরভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে : বদর যদি মুক্তির নিশানা বা নিদর্শন হয়ে থাকে তবে কি উহুদের পরাজয়ের অর্থ ঈশ্বর মুহাম্মদকে (সঃ) পরিত্যাগ করেছেন? তৃতীয় সুরার মাধ্যমে এসব উদ্বেগ উৎকণ্ঠার জবাব দিতে গিয়ে কোরান উল্লেখ করে বিপর্যয়কে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে চিন্তা করা ঠিক নয়। পরাজয়ের জন্যে মুসলিমরাই দায়ী। তারা পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত ছিল, গোটা যুদ্ধের সময় আদেশ অমান্য করেছে, বিদ্রোহী মনোভাব দেখিয়েছে। তারপরেও এক অর্থে নিদর্শন ছিল উহুদের যুদ্ধ : যেসব কাপুরুষ ইবন উব্বাঈয়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের থেকে প্রকৃত মুসলিমদের আলাদা করে দিয়েছে এ লড়াই।

ইবন উব্বাঈ আর ইহুদীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল ভাবাটাই স্বাভাবিক। ইবন উব্বাঈ এবং তাঁর সমর্থকরা জোর গলায় দাবী করতে শুরু করেছিল যে, তাঁর নীতি মেনে চললে এত ক্ষয়ক্ষতি হত না। ইহুদীরা বলতে থাকে মুহাম্মদ (সঃ) স্রেফ একজন উচ্চাভিলাষী মানুষ, তাঁর কোনও নবীত্ব নেই : কে কবে শুনেছে সত্যিকার পয়গম্বর এরকম পরাজয়ের মুখোমুখি হয়? এইসব বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন উমর, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে নিবৃত্ত করেন। কুরাইশরা আর কখনও *উম্মাকে* এভাবে পর্যুদস্ত করতে পারবে না বলে তিনি শপথ নেন, একদিন আবার কা'বাগৃহে প্রার্থনা করতে সক্ষম হবেন তাঁরা। মুহাম্মদের (সঃ) এরকম আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও উহুদ তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছিল এবং ইবন উব্বাঈয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত মুসলিমদের প্রতিপক্ষ নিষ্ক্রিয়ভাবে সীমান্তে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু উহুদের পর ইবন উব্বাঈ স্বভাব বিরুদ্ধভাবে মুহাম্মদকে (সঃ) ধ্বংস করার যে কোনও এবং প্রত্যেকটা সুযোগ সন্ধান শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের পরবর্তী শুক্রবার জনসমক্ষে মসজিদে ইবন উব্বাঈয়ের নিন্দা করা হয়। তিনি কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়ালে দুজন সাহায্যকারী তাঁকে জাপ্টে ধরে বলেছিল বিশ্বাসঘাতকতার পর তাঁর উচিত মুখ বন্ধ রাখা। ক্রুদ্ধ অবস্থায় মসজিদ থেকে ছুটে বেরিয়ে যান তিনি এবং মুহাম্মদের (সঃ) কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় অস্বীকৃতি জানান, প্রার্থনাও করবেন না বলে জানিয়ে দেন। উহুদের পর তাঁর দলকে কোরান একটা নতুন নাম দিয়েছিল, ইবন উব্বাঈ এবং তাঁর অনুসারীদের কোরান '*মুনাফিকিন*' বলে আখ্যায়িত করে, সাধারণভাবে যার অনুবাদ করা হয় 'কপটাচারী' হিসাবে। কিন্তু ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট বলছেন, 'ক্রিপারস' (সরীসৃপ) বা 'ইদুর' আরও সঠিক অর্থ হতে পারে : উহুদের যুদ্ধের সময় তারা হামাগুড়ি দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ক্ষুদ্র জন্তুর মত গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল।[৩৮]

জরুরি বাস্তব কিছু সমস্যার সমাধানও আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। উহুদে নিহত পঁয়ষট্টিজন মুসলিমের প্রত্যেকেই স্ত্রী এবং পরিবার রেখে গিয়েছিল যাদের ব্যবস্থা করার দরকার ছিল; মনে হয় উহুদের পরাজয়ের পরেই মুসলিমদের চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিদানকারী প্রত্যাদেশ পান মুহাম্মদ (স:) :

> আর তোমরা পিতৃহীনকে তাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করবে
> আর ভালোর সঙ্গে মন্দ বিনিময় করবে না। আর
> তোমরা তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে
> মিলিয়ে খেয়ে ফেলো না। এতো মহাপাপ! আর
> তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনদের সুবিচার
> করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের
> মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চারজনকে।
> আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না,
> তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে।
> এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি।[৩৯]

বহুবিবাহের এই বৈধতাকে মুহাম্মদের (স:) পশ্চিমা সমালোচকগণ খাঁটি পুরুষ তান্ত্রিকতার প্রমাণ হিসাবে দেখে থাকেন। 'হারেমে'র মত জনপ্রিয় ছায়াছবিগুলো মুসলিম শেখদের যৌন জীবনের অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরেছে যা বাস্তবতার পরিবর্তে বরং পাশ্চাত্যের কল্পনাকেই বেশি প্রকাশ করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে বহুবিবাহ পুরুষদের যৌনজীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে বৈধ করা হয়নি–এটা ছিল সামাজিক আইন। পয়গম্বরত্বের শুরু থেকেই এতীমদের সমস্যা মুহাম্মদকে (স:) পীড়া দিয়ে আসছিল, উহুদের মৃত্যুগুলো সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে। উহুদে মৃত্যুবরণকারীরা কেবল স্ত্রীই নয়, মেয়ে, বোন আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন রেখে গিয়েছিল যাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। তাদের নতুন অভিভাবকরা এইসব এতীমদের সম্পত্তি দেখাশোনায় বিবেকের পরিচয় নাও দিতে পারত : কেউ কেউ হয়ত সম্পত্তি কুক্ষিগত রাখার জন্যে মেয়েদের বিয়েই দিত না। আশ্রিতা নারীদের সম্পদ নিজ দখলে নেয়ার জন্যে তাদের বিয়ে করাটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।

আরবে হয়ত পুরুষের সংখ্যা কমে গিয়েছিল যার ফলে উদ্বৃত্ত নারী প্রায়শঃই অশ্লীলভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল। এই সমস্যা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল কোরান এবং তা সমাধানের একটা উপায় হিসাবে বহুবিবাহের পথ বেছে নিয়েছিল। এতে করে অভিভাবকহীন মেয়েদের সবার বিয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এখানে জোর দেয়া হয়েছে পুরুষরা তখনই একাধিক বিয়ে করতে পারবে যদি তারা তাদের সম্পত্তি সমানভাবে দেখভাল করার শপথ নেয়। এতে আরও বলা হয়েছে যে কোনও

এতীম মেয়েকে অস্থাবর সম্পত্তির মত বিবেচনা করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করা যাবে না।[৪০] কোরান তালাকেরও ব্যবস্থা রেখেছে। প্রাক-ইসলামি যুগে স্ত্রীরা যখন বাবা মায়ের কাছে থাকত, একজন নারী বা তার পুরুষ আত্মীয় সম্পর্কের অবসান ঘটাতে পারত। কোরান পুরুষকে তালাকের জন্যে নারীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তবে নারীর পক্ষেও একটা ধারা রয়েছে। আরবে পুরুষের জন্যে নববিবাহিতা স্ত্রীকে *মাহল* বা যৌতুক দেয়ার রীতি ছিল। নারীর পুরুষ আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত: এটা আত্মসাৎ করত : কিন্তু ইসলামে নারীর যৌতুক সোজাসুজি নারীকে দেবার বিধান জারি করা হয়। আজও নারীরা এই অর্থ দিয়ে তাদের যা ইচ্ছা করতে পারে : দান করে দিতে পারে, সুইমিং পুল নির্মাণ করতে পারে কিংবা শুরু করতে পারে ব্যবসা। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে পুরুষকে এই *মাহল* ফেরত চাওয়ার অধিকার দেয়া হয়নি, ফলে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।[৪১]

পাশ্চাত্যের সমালোচকবৃন্দ প্রায়ই নারীর প্রতি আচরণের জন্যে কোরানকে দোষারোপ করে থাকেন, যাকে তাঁরা অসাম্য হিসাবে দেখেন; কিন্তু নারীমুক্তির প্রশ্ন ছিল পয়গম্বরের হৃদয়ের আর্তি। কোরান ডাবলস্ট্যান্ডার্ড সমর্থন করে বলে অভিযোগ রয়েছে : যেমন উত্তরাধিকার আইনের কথা বলা যায়, এখানে বলা হয়েছে একজন নারী তার ভাইদের প্রাপ্যের (যাদের নতুন পরিবার শুরু করার জন্যে *মাহল* দিতে হয়) তুলনায় অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হবে। আবার নারীদের আদালতে সাক্ষী দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের মূল্য একজন পুরুষ সাক্ষীর অর্ধেক। বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে–যখন, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন–আমরা এখনও নারীদের সমান অধিকারের জন্যে সংগ্রাম চালাচ্ছি–কোরানের এই আইনকে প্রতিবন্ধক স্বরূপ বলে মনে হয়। কিন্তু সপ্তম শতকের আরবে এটা ছিল বিপ্লবাত্মক। আমাদের অবশ্যই প্রাক-ইসলাম যুগে নারীদের জীবন কেমন ছিল তা মনে রাখতে হবে, তখন নারী-শিশুকে হত্যা করাই ছিল রীতি, তখন নারীদের কোনও অধিকারই ছিল না। ক্রীতদাসদের মত নারীদের নিম্নস্তরের প্রাণী হিসাবে দেখা হত, যাদের কোনও আইনগত অস্তিত্ব ছিল না। এরকম এক আদিম সমাজে, নারীদের জন্যে মুহাম্মদের (স:) অর্জন ছিল অনন্যসাধারণ। নারী যে সাক্ষী হতে পারে বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন ধারণাই ছিল বিস্ময় সৃষ্টিকারী। আমাদের এও স্মরণ করতে হবে যে ক্রিশ্চান ইয়োরোপে একই ধরনের অধিকার পাওয়ার জন্যে নারীদের উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে : এমনকি তারপরেও আইনের পক্ষপাতিত্ব ছিল পুরুষদের প্রতিই।

আবার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের বহুবিবাহের আইনটিকে দেখতে হবে। সপ্তম শতকের আরবে পুরুষরা যখন যত খুশী বিয়ে করতে পারত, সেটা মাত্র চারজনে সীমিত রাখার প্রস্তাব ছিল একটা নিষেধাজ্ঞা–নতুন করে নিপীড়ন চালানোর লাইসেন্স নয়। তাছাড়া চারটি বিয়ে করার অনুমোদনদানকারী আয়াতের পরপরই কোরানে তার যোগ্যতা স্থির করে দেয়া হয়েছে। কোনও পুরুষ যদি সকল স্ত্রীর প্রতি

সমব্যবহার করার ব্যাপারে আস্থাশীল না হয় সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই এক বিয়েতেই স্থির থাকতে হবে।[৪২] মুসলিম আইন এর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে : একজন পুরুষকে স্ত্রীদের সঙ্গে সমান সময় কাটাতে হবে; প্রত্যেক স্ত্রীকে আর্থিক ও আইনগত দিক থেকে সমানভাবে সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি কোনও একজনের প্রতি অতিরিক্ত দুর্বলতা দেখান যাবে না, বরং প্রত্যেককে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে হবে। ইসলামি জগতে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে কোরানের এই দাবী পূরণ সম্ভব নয় : এরকম নিরপেক্ষতা দেখানো একেবারে অসম্ভব, এর ফলে মুহাম্মদের (স:) চাহিদা, যেটা তাঁর বলার প্রয়োজন ছিল না, বোঝায় যে কোনও মুসলিমেরই একাধিক স্ত্রী থাকা উচিত নয়। যেসব দেশে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, কর্তৃপক্ষ সেক্যুলার নয় বরং ধর্মীয় ভিত্তিতেই তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সুতরাং উহুদের পরাজয়ের পর কোরান কিন্তু পুরুষদের আনন্দময় হারেম গড়ে তোলার প্রেরণা দেয়নি। কোরান শুধু মুসলিমদের সম্ভাব্য স্ত্রীর সংখ্যাই সীমিত করে দেয়নি, বরং ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাসের রেখে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। কোরান বারবার নারী-শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছে : যা একটি মৌল নির্দেশনায় পরিণত হয় এবং নবদীক্ষিত প্রত্যেককে এতে সম্মতি প্রকাশ করতে হয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি ব্যবহারের পরিবর্তে কোরান মুসলিমদের স্রষ্টায় বিশ্বাস রাখার তাগিদ দিয়েছে–এমন এক সমাজে যেখানে সকল দুর্বলেরা–বয়োবৃদ্ধ, এতীম আর শিশু–পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার ভোগ করবে এবং সমান আচরণ পাবে।[৪৩] মোটামুটি একইভাবে কোরান মুসলিমদের প্রতি প্রকৃতিতে 'নিদর্শনসমূহে'র মাঝে ঈশ্বরের দয়ার ভেতর আস্থা স্থাপনের তাগিদ দিয়েছে। *জাহিলিয়াহ্‌র* নিষ্ঠুর ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার শরণাপন্ন না হয়ে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আনন্দময় আস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাদের অবশ্যই অভাবগ্রস্তা নারীকে বিয়ে করে বিরাট পরিবার গড়তে হবে, ঈশ্বরই শেষ পর্যন্ত তাদের বাঁচতে সাহায্য করবেন বলে বিশ্বাস রাখতে হবে :

> তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই, তাদের
> বিয়ে সম্পাদন করো; আর তোমাদের দাসদাসীদের
> মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে
> আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন;
> আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৪৪]

এটা বিশ্বাস ভিত্তিক কাজ, যার জন্যে সাহসের প্রয়োজন। মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং *উম্মার* দুস্থ মহিলাদের প্রতি তাঁর দায়িত্বের উদাহরণ রেখেছেন। উহুদের পর তিনি চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন, বদর যুদ্ধে শহীদ উবায়দাহ ইবন আল-হারিসের বিধবা পত্নী–যায়নাব বিনত্ কুযাঈমাহ্‌কে একটা থাকার ব্যবস্থা করে দেন। বেদুঈন গোত্র

আমিরের গোত্র প্রধানের মেয়ে ছিলেন যায়নাব, ফলে এতে করে একটা রাজনৈতিক মৈত্রীও গড়ে ওঠে। মসজিদের পাশে তাঁর জন্যে একটা ঘর নির্মিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর বোনদের–সওদাহ্, আয়েশা এবং হাফসা–সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

ভবিষ্যতের দিকে আস্থা রাখার জন্যে মুসলিমদের তাগিদ দিচ্ছিলেন মুহাম্মদ (স:), যদি তারা সমভাবে আচরণ করবে বলে বিশ্বাস করে তাহলে আবু সুফিয়ান যখন উম্মাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে একটা বিরাট কনফেডারেসি গড়ে তুলছেন, তখন তাদের নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তবে, যথারীতি, স্বাভাবিক সাবধানতাও অবলম্বন করছিলেন তিনি। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বের বেদুঈন গোত্রগুলো যাতে মক্কা-জোটের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে সেজন্যে আগেই তাদের সমর্থন আদায় করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। বেদুঈনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন মুহাম্মদ (স:), কিন্তু ৬২৫ সালের গ্রীষ্মকালে দুটো ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে মদিনা কতখানি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে।

নজদের দুটো বেদুঈন গোত্র মুহাম্মদের (স:) কাছে ইসলাম ধর্মের নির্দেশনা জানতে চায় : তাদের কোনও কোনও সদস্য মুসলিম হয়েছে, কোরান আবৃত্তি শিখতে চায় এখন। তো মুহাম্মদ (স:) ছজন দক্ষ ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। যাবার পথে মক্কার নিকটবর্তী রাজি কূপের কাছে বিশ্রাম নেয়ার সময় তারা হুদায়েল গোত্রের এক প্রধান দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুসলিমদের মধ্যে তিনজন নিহত হয় আর বাকি তিনজনকে বন্দী করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে আবার পালানোর চেষ্টা চালানোর অপরাধে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়, অন্যদের মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিপক্ষ কুরাইশদের কাছে বিক্রি করার জন্যে। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে বন্দীদের একজনকে কিনে নেয় সাফওয়ান ইবন উমাঈয়াহ্, বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল জুমাহ গোত্রের বৃদ্ধ এই প্রধান। দুজন মুসলিমকেই উপাসনাগৃহ চত্বরে নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

প্রায় একই সময়ে বেদুঈন গোত্র আমিরের দলপতি এবং মুহাম্মদ (স:) এর শ্বশুর আবু বারা একইভাবে তাঁর গোত্রের লোকদের ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এটা আবার তাঁর নিজের গোত্রের বিবদমান অংশগুলোর বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদনও ছিল। চল্লিশ জন মুসলিমকে এ উদ্দেশ্যে পাঠান হয় এবং আমিরের এলাকার ঠিক বাইরে মা'উনাহ কূপের কাছে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আবু বারার গোত্রের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নিকটবর্তী সুলায়েম গোত্রের কয়েকজন সদস্যকে দিয়ে এ কাজটি করায়। অবশ্য মুসলিমদের দুজন আশপাশে কোথাও উট খুঁজছিল, তাঁবু এলাকার ওপর শকুন উড়তে দেখে তারা ধ্বংসশীলা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। দ্রুত ছুটে যায় তারা এবং সঙ্গীদের মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে। জীবিতদের একজনকে বন্দী করা হয় এবং অপরজন কোনওমতে মদিনায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়। তবে ফেরার পথে বনি আমির গোত্রের দুজন সদস্যকে একটা গাছের তলায় আরামে ঘুমাতে দেখে সে। আমিরই ওই হত্যাকাণ্ডের

জন্যে দায়ী মনে করে তরবারি উন্মুক্ত করে ওদের হত্যা করে সে এবং এই ঘটনাটি মুহাম্মদকে (স:) জানাতে দ্রুত ফিরে আসে। অবশ্য তাকে অবাক করে দিয়ে জানান হয় যে, কাজটা ভুল হয়েছে, এবং *উম্মা*কে রক্তপণ আদায় করতে হবে–অন্যায়ভাবে রক্তপাতের মাশুল, আরেকজনের জীবনের পরিবর্তে এ মাশুল কোনও কোনও গোত্র গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। মুহাম্মদের (স:) বিশ্বাস ছিল আমিরিদের হত্যা করা ঠিক হয়নি। এটা ঠিক যে আমির গোত্রের কেউ কেউ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, কিন্তু কার্যত: অপরাধ ছিল সুলায়েমের। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহবল আবু বারাকে রক্তপণ দিয়ে গোটা গোত্রকে ইসলামে শামিল করার আশা করেছিল মুহাম্মদ (স:)। তাঁর কবিগণ তাঁদের নিজস্ব প্রচারণা রচনা শুরু করে দিয়েছিল, রাজি এবং মা'উনাহর শহীদদের জন্যে শোকগাঁথা রচিত হচ্ছিল : আবু বারার প্রতি মুহাম্মদের (স:) সদ্ব্যবহারে *উম্মার* কোনও কোনও সাবেক শত্রু বেশ সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, বর্ণিত আছে যে, হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী সুলায়মাইটদের কেউ কেউ মৃত্যুক্ষণে মুসলিমদের বিশ্বাস আর সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মদিনায় রক্তপণ সংগ্রহ শুরু করেছিলেন মুহাম্মদ (স:)। ইহুদী গোত্র নাদিরের, এরা আবার আবু বারার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল, কাছে গিয়েছিলেন তিনি। আবু বকর এবং উসায়েদ ইবন হুদায়ের নামে একজন সাহায্যকারী নিয়ে তাদের পরিষদের কাছে আবেদন রাখলেন পয়গম্বর। ইহুদীদের সম্মত এবং সহযোগি মনোভাবাপন্ন বলে মনে হয়েছিল, প্রস্তাব বিবেচনা করার সুবিধার্থে তারা মুসলিমদের বাইরে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু অপেক্ষা করার সময় হঠাৎ করে মুহাম্মদ (স:) কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ফিরে যান। পরে তিনি জানিয়েছিলেন, জিব্রাইল তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা জানানোর তিনি চলে গেছেন। আসলে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের কোনও প্রয়োজন ছিল না। নাদির গোত্রের কেউ কেউ হয়ত তখনও কবি কা'ব ইবন আল-আশরাফের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছিল, আর মুসলিম সূত্রগুলো ঠিক কে কাছের একটা বাড়ির ছাদ থেকে পাথর ফেলে হত্যা প্রচেষ্টা চালাতে চেয়েছিল তা জানার দাবী তুলেছে।

এরপর সাহায্যকারীদের একজনকে চরমপত্র পৌঁছে দেয়ার জন্যে মুহাম্মদ (স:) তাঁর পক্ষে পাঠিয়েছিলেন। আউস গোত্রের একজন সদস্য মুহাম্মদ ইবন মাসলামা যথারীতি তাদের জানিয়ে দেন–*হিজরার* আগে আউস আর নাদির গোত্র ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল। 'ঈশ্বরের বার্তাবাহক আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, "আমাকে হত্যা প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত আমার চুক্তিভঙ্গ করেছ তোমরা।" নাদির গোত্র আর থাকতে পারবে না। আউস গোত্রের একজন সদস্য এমন একটা সংবাদ দেয়ায় ইহুদীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল : আগের বছরের কাইনুকা গোত্রের মত তারাও পুরনো নিয়মের পুরোপুরি বিলুপ্তির

বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। ইবন মাসলামা ওদের সরাসরি একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন : 'হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটেছে, ইসলাম পুরনো মৈত্রী ঘুচিয়ে দিয়েছে।'[৫৬]

ইহুদীরা আপোসরফায় পৌঁছার জন্যে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু ইবন উব্বাঈ একে মুহাম্মদকে (স:) সরিয়ে দেয়ার আরেকটা সুবর্ণসুযোগ হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন তারা যদি *উম্মার* সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে রাজি থাকে তাহলে সদলে যোগ দেবেন। তো আগের বনি কাঈনুকার মত নাদির গোত্রের ইহুদীরাও তাদের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, মুসলিমরা ঘেরাও করে ফেলছিল তাদের। ইবন উব্বাঈ দলবল নিয়ে ওদের উদ্ধার করতে আসবে বলে আশায় ছিল তারা। কিন্তু কিছুই ঘটেনি। আরও একবার মুহাম্মদের (স:) অবস্থানের শক্তি বিচার করতে ভুল করেছিলেন ইবন উব্বাঈ, তিনি ভেবেছিলেন উহুদে অনেক বেশি ক্ষতির স্বীকার হয়েছেন পয়গম্বর। দুসপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর, নাদির গোত্র যখন বুঝতে পারল তাদের পক্ষে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়, মুহাম্মদ (স:) তখন তাদের খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধের এই সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখে ইহুদীরা আশঙ্কিত হয়ে পড়ে, তারা আত্মসমর্পণ করে, মুহাম্মদের (স:) কাছে কেবল প্রাণ ভিক্ষা চায়। একটা শর্তে রাজি হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), অবিলম্বে তাদের মরুদ্যান ত্যাগ করতে হবে, সঙ্গে কেবল উটের পিঠে চাপিয়ে নেয়া যায় এমন রসদ নেয়া যাবে। নাদির গোত্র তাদের সব জিনিস, এমনকি দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত ভেঙে, উটের পিঠে বোঝাই করে এবং মুহাম্মদের (স:) জন্যে কোনও কিছু না রেখে গর্বিত মিছিল নিয়ে অনেকটা বিজয়ীর মত মরুদ্যান ত্যাগ করে চলে যায়। মহিলারা তাদের সমস্ত অলঙ্কার ও সাজ-সজ্জা পরেছে, টাম্বুরিন বাজিয়েছে, আর বাঁশি ও ড্রামের শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান গেয়েছে। মদিনার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে অবশেষে তারা সিরিয়াগামী উত্তরের পথ ধরেছিল। ওদের কেউ কেউ নিকটবর্তী খায়বরের ইহুদী বসতিতে রয়ে যায় এবং সেখান থেকে আবু সুফিয়ানকে উত্তরাঞ্চলীয় গোত্র গুলোর সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে কনফেডরেসি গঠনে সাহায্য করে।

উহুদের এক বছর পর, হৃত মর্যাদা খানিকটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:); আর বনি নাদিরের ব্যাপারটা ইবন উব্বাঈয়ের জন্যে আরেকটা পরাজয় ছিল। সম্ভাব্য সকল হামলা দমন অব্যাহত রেখেছিলেন পয়গম্বর। ৬২৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক ব্যাপক নৈতিক বিজয় অর্জিত হয় তাঁর। উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে আসার সময় আবু সুফিয়ান বার্ষিক মেলার সময় আবার মুসলিমদের বদরে মিলিত হওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। তো, ৬২৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ১,৫০০ সঙ্গী নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়ে ওখানে গোটা একটা সপ্তাহ অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। কিন্তু আবু সুফিয়ান আর হাজির হননি। মুহাম্মদ (স:) হাজির হতে পারেন বলে ভাবেননি তিনি, মুসলিমরা মদিনা ছেড়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে জানার পর বিদায় নেয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে স্রেফ লোক দেখানোর জন্যে একটা বাহিনীসহ রওনা দিয়েছিলেন বটে; প্রচণ্ড খরা ছিল সেবছর, কোথাও এতটুকু ঘাসের

চিহ্ন ছিল না যে উটকে খাওয়ানো যাবে, ফলে দিন দুই পর আবু সুফিয়ান আবার সসৈন্য বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। কথা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় অন্য নাগরিকগণ তীব্র ভর্ৎসনা করে তাঁকে; বিশেষ করে বদরে দ্বিতীয়বারের মত বিশাল মক্কাবাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস আর ইচ্ছা দেখানোয় মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে বেদুঈনরা, মদিনায়ই কেবল মুহাম্মদের (স:) অবস্থানই সংহত হচ্ছিল না, আরবের অন্যত্রও স্রোত তাঁর অনুকূলে প্রবাহিত হতে শুরু করছিল।

যদিও মুসলিমরা জানত যে দ্বিতীয় দফা বদরে অপমানিত হওয়ার পর মক্কাবাসীরা *উম্মার* বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে তাদের প্রস্তুতি জোরদার করছে, তবু চূড়ান্ত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশা করছিলেন মুহাম্মদ (স:)। ৬২৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর নতুন স্ত্রী যায়নাব মৃত্যুবরণ করেন, বিয়ের প্রায় আট মাস পর; এর কয়েক মাস পর তিনি চাচাত ভাই আবু সালামাহ্র বিধবা পত্নী হিন্দ বিনত আল-মুঘিরার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সাধারণভাবে তিনি উম্ম সালামাহ নামে পরিচিত ছিলেন, মক্কাস্থ শক্তিশালী মাখযুম গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বোন ছিলেন তিনি, যা উপকারী সম্পর্ক হিসাবে প্রমাণিত হতে পারত। উম্ম সালামাহর বয়স ছিল তখন উনত্রিশ বছর এবং তখনও অসাধারণ রূপবতী; সম্ভবতঃ প্রাজ্ঞ মহিলাও ছিলেন এবং মুহাম্মদের (স:) ভাল সঙ্গী। মুহাম্মদ (স:) প্রায়ই তাঁকে বড় বড় অভিযানে নিয়ে গেছেন এবং অন্তত একবার তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য প্রথমে মুহাম্মদকে (স:) বিয়ে করতে অনিচ্ছুক ছিলেন তিনি। বয়স হয়ে গেছে জানিয়েছিলেন, আর তাঁর মাঝে ঈর্ষাবোধ কাজ করে : হারেমের জীবন বেছে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না। মুহাম্মদ (স:) মৃদু হেসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তাঁর নিজের বয়স আরও বেশি এবং ঈশ্বর তাঁর ঈর্ষার দায়িত্ব নেবেন। হারেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে ভয় পাওয়ার যথার্থ কারণ ছিল উম্ম সালামাহর। মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে তাঁর বিয়ের ফলে অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে ফাটল ধরেছিল, *উম্মার* মাঝে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী বিভিন্ন দলের অস্তিত্বে তার প্রমাণ মেলে। মাখযুমাইট হিসাবে উম্ম সালামাহ্ অভিবাসীদের মাঝে অধিকতর অভিজাত গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করতেন, অন্যদিকে আয়েশা আর হাফসাহ, মুহাম্মদের (স:) দুজন ঘনিষ্ঠ সহচরের মেয়ে, ক্ষমতার বেশ নিচু সারির প্রতিনিধি ছিলেন। নতুন স্ত্রীগণ হারেমে প্রবেশের পর এদুটো প্রতিদ্বন্দ্বী দলে যোগ দেয়ার আগ্রহ দেখাতেন। উম্ম সালামাহ প্রায়ই সংখ্যালঘু একটি দলের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতেন, এরা ছিলেন *আহল আল-বায়েত* বা বাড়ির লোকজন, যাঁরা মুহাম্মদের (স:) নিজ পরিবারের সদস্য এবং মোটামুটি লাজুক ও ভীতু ফাতিমাহকে তাদের নেত্রী মনে করতেন। মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীদের মাঝে এই বিভক্তি *উম্মার* মাঝে জটিল বিভক্তি সৃষ্টি করেছিল যা পরবর্তীকালে, পয়গম্বরের ইন্তেকালের পর, গুরুতর আকার ধারণ করে, এবং আজও একটা পর্যায়ে মুসলিমদের বিভক্ত করে রেখেছে। *আহ্ল আল-বায়েত* চেয়েছিল ফাতিমাহ্ এবং আলী ও তাঁদের বংশধর মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দেবেন, এরা

পরিণত হয়েছিলেন শিয়ায়। উম্ম সালামাহর বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই আরেকজন স্ত্রীর আগমন ঘটে হারেমে যিনি এদলকে ভারি করেছেন এবং ঘনঘন অভিজাত দলের সঙ্গে নিজেকে স্থাপন করতেন। পয়গম্বরের চাচাত বোন যায়নাব বিনত জাহশকে তালাক দিয়েছিলেন যায়েদ, এবং মুহাম্মদ (স:)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষাপট অনেকেরই ভ্রূ কুঞ্চনের কারণ হয়েছে এবং ইসলামের সমালোকরা পয়গম্বরের মর্যাদা হানি করার জন্যে ব্যবহার করেছেন।

ভলতেয়ার এবং প্রিডঅ'র মত ব্যক্তিগণ এ ঘটনাকে মুহাম্মদের (স:) অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা এবং প্রত্যাদেশকে আপন ইচ্ছা পূরণের জন্যে নৈপুণ্যের সঙ্গে কাজে লাগানোর নমুনা হিসাবে দেখেছেন। মুসলিমদের চেয়ে অনেক অশ্লীলভাবে তাঁরা এ ঘটনার বিবরণ দেন। একদিন অপরাহ্নে মুহাম্মদ (স:) যায়েদকে দেখতে গিয়ে ছিলেন, কিন্তু যায়েদ তখন বাড়ি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী দরজা খোলেন, মেহমানের আগমন প্রত্যাশিত ছিল না বলে খুবই সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে ছিলেন তিনি। যায়নাবের বয়স তখন চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই, কিন্তু তখনও নাকি অসাধারণ রূপসী ছিলেন এবং ওই দিন মুহাম্মদ (স:) তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রুত সরে এসেছিলেন তিনি, বিড়বিড় করে এমন কিছু বলেছিলেন যা ছিল অনেকটা, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটান।'[৪৭] যায়নাব কখনওই যায়েদকে বিয়ে করতে চাননি, এবার তিনি মুহাম্মদের (স:) মুগ্ধতাকে উদ্ধার পাওয়ার পথ হিসাবে বেছে নিলেন। যায়েদের কাছে বারবার এত জোরের সঙ্গে মুহাম্মদের (স:) ওপর নিজের রূপের প্রভাবের কথা বলতে শুরু করেছিলেন যে জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। যায়েদ সরাসরি মুহাম্মদের (স:) কাছে যান এবং বলেন মুহাম্মদ (স:) যদি চান তাহলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে রাজি আছেন। কিন্তু পয়গম্বর তাঁকে ঈশ্বরের ভয় করতে বলে স্ত্রীকে কাছে রাখার নির্দেশ দিয়ে বিদায় করে দেন। কিন্তু বিয়ে টিকে থাকার কোনও আশাই ছিল না : যায়নাবের জ্বালাতনে যায়েদ এতটাই অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি তাঁকে তালাক দেন এবং শেষ পর্যন্ত পয়গম্বর যায়নাবকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রস্তাবিত বিয়ের সমালোচনা হয়েছে : কেউ কেউ একে অবৈধ বলেছেন, কারণ যায়নাব মুহাম্মদের (স:) পোষ্যপুত্রের স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) একটি প্রত্যাদেশ লাভ করেন যেখানে বলা হয়েছে, ওই বিয়ে অবশ্যই অসঙ্গত ছিল না।[৪৮] যায়েদ ছিলেন মুহাম্মদের (স:) পালকপুত্র এবং দুজনের সম্পর্ক ছিল কৃত্রিম : যায়নাবকে বিয়ে করার মাধ্যমে পয়গম্বর কোনও প্রচলিত বিধান লঙ্ঘন করেননি। এ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় মুহাম্মদ (স:) আয়েশার সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেছেন, কিঞ্চিৎ তীর্যক সুরে : 'সত্যিই ওদের বিয়েতে একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন প্রভু।' পাশ্চাত্যবাসীরা সাধারণভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে থাকেন, কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, এই আপাত জটিল বিবরণটি এটাই দেখায় যে মুহাম্মদের (স:) সমসাময়িকগণ অনেক বেশি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। মুহাম্মদকে (স:) তাঁরা আবেগপ্রবণ মানুষ হিসাবে দেখেছেন, আল-লাহ যদি তাঁর

বার্তাবাহককে কিছু বাড়তি সুবিধা দিতে চান, তাদের সমালোচনার কী আছে? বর্তমানে মুসলিমরা মুহাম্মদ (সঃ) কামনাবশতঃ যায়নাবকে বিয়ে করেছিলেন, এটা স্বীকার করেন না: প্রকৃতপক্ষেই উনচল্লিশ বছরের একজন নারী যিনি কিনা সারা জীবন অপুষ্টিতে ভুগে কষ্ট করেছেন, আরবের উত্তপ্ত সূর্যের অত্যাচার সয়েছেন, তাঁর পক্ষে কারও হৃদয়ে আবেগের ঝড় তুলতে পারাটা অস্বাভাবিকই বটে, ছোটবেলা থেকে চিনতেন এমন একজন চাচাত ভাইয়ের কথা তো আসতেই পারে না। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) সবসময় যায়নাবসহ জাহ্‌শ পরিবারের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। মুসলিমদের যুক্তি ছিল বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি যায়নাবের প্রতি দায়িত্ব বোধ করেছেন, *উম্মার* অসহায় নারীদের প্রতি তাঁর উদ্বেগের কথা আমরা জানি। যায়নাবকে যদি তাঁর যৌনআবেদনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করতেন তিনি, বহু বছর আগেই বিয়ে করতে পারতেন। এই ঘটনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে দত্তক বা পোষ্য সম্পর্ক রক্তের বাঁধন নয় এবং বিয়ের ক্ষেত্রে তাঁর বাধা হওয়ার প্রয়োজন নেই।

যায়নাবের বিয়ে অনুষ্ঠানের অল্প দিন পরে, এবং সম্ভবতঃ ব্যাপারটা সম্পর্কিত, পর্দাপ্রথা সংক্রান্ত আয়াত হিসাবে পরিচিত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, যার মাধ্যমে মুহাম্মদের (সঃ) স্ত্রীদের *উম্মার* বাকি অংশ থেকে আলাদা করার বিধান জারি হয়। মুসলিম বিবরণ সমূহ '*হিজাব*' যা সাধারণতঃ পর্দা বা বোরকা হিসাবে অনূদিত হয়ে থাকে, তার প্রবর্তনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন কঠোর পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উমর মুহাম্মদকে (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের পর্দার সাহায্যে দৃষ্টির অন্তরালে নেয়ার তাগিদ দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগেই মুহাম্মদের (সঃ) স্ত্রীরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে কপটাচারী বা *মুনাফিকরা* তাঁদের অপমান করেছিল। অন্যদের ভাষ্য হচ্ছে, মুহাম্মদ (সঃ) আরও গুরুত্বপূর্ণ আর সভ্যদেশগুলোর জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন, তিনি উচ্চশ্রেণীর নারীদের আলাদা করার পারসিয়ান ও বাইযানটাইন রীতি গ্রহণের মাধ্যমে আপন স্ত্রীদের নতুন মর্যাদা বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য প্রত্যেকে মত প্রকাশ করেছেন যে প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে যৌননীতিবোধ শিথিল ছিল। অশ্লীল কথাবার্তা, বক্রোক্তি, ছেনালি আর বাজে আলাপের ছড়াছড়ি দেখা যেত। রীতিসিদ্ধ সমাজে যৌন কেলেঙ্কারী মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করতে পারে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। মুহাম্মদ (সঃ) সম্ভবতঃ ওয়াকিবহাল ছিলেন যে ইবন উব্বাঈ এবং তাঁর সমর্থকরা তাঁর পরিবারের কোনও অসম্মানের দিকে ইঙ্গিত করে মুসলিম আদর্শের ক্ষতি করে আনন্দিত হয়ে উঠতেন।

বর্ণিত আছে যে, যায়নাবের বিয়ে উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভোজসভায় কিছু অতিথি দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং অসঙ্গত আচরণ করেছিল। এর পরিণতিতে একটা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় যার দ্বারা *উম্মার* অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মুহাম্মদের (সঃ) স্ত্রীদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল :

> হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া হলে, খাবার তৈরির জন্যে অপেক্ষা না করে, খাওয়ার জন্যে তোমরা নবীর বাড়ির ভেতর ঢুকবে না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা যাবে ও খাওয়ার পর চলে আসবে। কথাবার্তায় তোমরা মেতে যেয়ো না; এমন (ব্যবহার) নবীর বিরক্তি সৃষ্টি করে। সে তোমাদেরকে উঠে যাওয়ার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতর।...[৪৯]

এটা স্মরণযোগ্য যে মসজিদে মুহাম্মদের (স:) আলাদা কোনও ঘর ছিল না, তিনি পালাক্রমে স্ত্রীদের ঘরে রাত্রি যাপন করতেন। কিন্তু মদিনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় তাঁর বাড়ি একেবারে জনগণের এলাকায় পরিণত হয়েছিল, কারণ ক্রমবর্ধমান হারে লোকে তাঁর কাছে ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ নিতে বা বিরোধ মীমাংসার জন্যে আসছিল। কোনও কোনও মুসলিম স্ত্রীদের মাধ্যমে তাঁর কাছে যেত, যেন অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আয়েশা একজন বিশেষ যুবকের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ করেছিলেন বলে জানা যায়, পরে যখন একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে *উম্মার* বিভক্তির হুমকি দেখা দিয়েছিল তখন একথা সবাই স্মরণ করেছিল। *হিজাব* বা পর্দা নির্যাতনের উপায় হিসাবে প্রবর্তিত হয়নি। একটা অসম্মানজনক অবস্থা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, নইলে মুহাম্মদের (স:) শত্রুরা তাঁর অমর্যাদা করার জন্যে পরিস্থিতিকে কাজে লাগাত।

এখানে *হিজাবের* প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্যে আমাদের একটু বিরতি দেয়া প্রয়োজন। পশ্চিমে প্রায়শঃই একে পুরুষের নির্যাতন হিসাবে দেখা হয়, কিন্তু কোরানে এটা কেবল মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীদের জন্যে প্রযোজ্য একটি নিয়মমাত্র। মুসলিম নারীদের পুরুষের মতই শালীন পোশাক পরতে হয়, কিন্তু মহিলাদের পর্দার আড়ালে নিজেদের লুকাতে বলা হয়নি, বাড়ির আলাদা অংশে নিজেদের পুরুষদের থেকে আলাদা করতেও বলা হয়নি। এসব পরবর্তীকালের সংযোজন এবং মুহাম্মদের (স:) পরলোকগমনের তিন বা চার প্রজন্ম পরে ইসলামি বিশ্বে পারসিয়া ও বাইযানটিয়াম থেকে এসেছে, ওখানে মহিলাদের দীর্ঘদিন এভাবে রাখা হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বোরকা বা পর্দা মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীদের অসম্মান করার জন্যে প্রবর্তন করা হয়নি, বরং তা ছিল তাদের উচ্চতর মর্যাদার প্রতীক। মুহাম্মদের (স:) পরলোকগমনের পর তাঁর স্ত্রীগণ অত্যন্ত ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন : ধর্মীয় বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সম্মানিত কর্তৃপক্ষ এবং প্রায়শঃই মুহাম্মদের (স:) অনুশীলন (*সুন্নাহ*) বা মতামত বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হত। রাজনৈতিকভাবে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন আয়েশা এবং ৬৫৫ খৃস্টাব্দে চতুর্থ খলিফা আলীর বিরুদ্ধে একটা

অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পরে হয়ত অন্য মহিলারা মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীদের উচ্চ মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল এবং তারাও পর্দা পরার অনুমতি দাবী করেছে। ইসলামি সংস্কৃতি অত্যন্ত সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন, পয়গম্বরের স্ত্রীগণ এভাবে আলাদা এবং সম্মানিত হবেন, একে বেমানান বলে মনে হয়েছে। এভাবে প্রথম দিকে যেসব মুসলিম নারী পর্দা ব্যবহার করেছে তারা একে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির প্রতীক হিসাবে দেখেছে, পুরুষ-নির্যাতনের তকমা নয়। নিঃসন্দেহে ক্রুসেডারদের স্ত্রীরা যখন মুসলিম মহিলাদের সম্মান দেখে তখন তারাও পর্দা বেছে নিয়েছিল এই আশায় যে তাদের পুরুষ সঙ্গীদের কাছ থেকে আরও ভাল ব্যবহার পাওয়া যাবে। অপর একটি সংস্কৃতির প্রতীক এবং রীতিনীতি বোঝা সমসময়ই কঠিন। ইয়োরোপে আমরা ইদানীং বুঝতে শুরু করেছি যে আমাদের সাবেক কলোনি এবং প্রটেক্টরেটসমূহের ভিন্ন প্রচলিত সংস্কৃতিকে আমরা প্রায়ই অপব্যাখ্যায়িত করেছি, ভুল বুঝেছি; বহু মুসলিম নারী বর্তমানে, এমনকি যারা পাশ্চাত্যে বেড়ে উঠেছে, তারাও পশ্চিমের নারীবাদীরা যখন তাদের সংস্কৃতিকে নারী বিদ্বেষী বলে নিন্দা করে তখন তাকে চরম আক্রমণাত্মক হিসাবেই দেখে থাকে। বেশির ভাগ ধর্মই পুরুষের ব্যাপার ছিল এবং ওগুলোর যাজকতন্ত্র রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের তুলনায় এক্ষেত্রে ইসলামের ত্রুটি বেশি ধরে নেয়াটা ভুল হবে। মধ্যযুগে অবস্থাটা ছিল একেবারে বিপরীত! তখন মুসলিম নারীরা ক্রুসেডার রাজ্যসমূহে নারীদের প্রতি পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের মনোভাব দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠত, আর ক্রিশ্চান পণ্ডিতগণ দাস ও নারীর মত নিম্নস্তরের প্রাণীদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়ার জন্যে ইসলামের নিন্দা করতেন। বর্তমানে কিছু মহিলা যখন ঐতিহ্যবাহী পোশাক বেছে নিচ্ছে, সেটা পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম কর্তৃক ব্রেইনওঅশ হওয়ার কারণে নয়, আসলে তারা নিজস্ব সংস্কৃতির মূলে ফিরে যাওয়াকে গভীর সন্তোষের বিষয় হিসাবে দেখছে। এটা আবার পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাখ্যানও–যেটা তাদের চেয়ে ঐতিহ্য সম্পর্কে বেশি ধারণা রাখার দাবী করে।

৬২৭ খৃস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে, পয়গম্বরের স্ত্রীদের জন্যে *হিজাব* প্রবর্তনের অল্প কিছুদিন পর, একটা ঘটনা থেকে বোঝা গিয়েছিল তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কোনও কলঙ্ক কত দ্রুত মুহাম্মদের (স:) মর্যাদার হানি ঘটাতে পারে। মদিনায় হানা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল খুযা'আহ্ গোত্রের এক উপশাখা বনি আল-মুসতালিক, পয়গম্বর গিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে। লোহিত সাগর উপকূলে মুরাঈসি কূপের কাছে, মদিনার উত্তর-পশ্চিম আচমকা তাদের বাধা দেন তিনি এবং পালাতে বাধ্য করেন; এখানে ২,০০০ উট, ৫,০০০ ভেড়া ও ছাগল এবং গোত্রপ্রধানের মেয়ে জুয়াইরিয়াহ বিনত আল-হারিসসহ ২০০ জন মহিলার অধিকার পান তাঁরা। আয়েশাকে এই অভিযানে সঙ্গে নেয়া হয়েছিল, জুয়াইরিয়াহকে–মুক্তিপণ বিষয়ে দরকষাকষির জন্যে মুহাম্মদের (স:) কাছে এসেছিলেন তিনি–দেখে হৃদয় কেঁপে উঠেছিল তাঁর, কারণ মহিলা ছিলেন সুন্দরী। 'আল্-ল্লাহ'র শপথ, আমার ঘরের দরজায় তাঁকে দেখামাত্র অপছন্দ করে ফেলেছিলাম,' পরে খোলাখুলি

স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। 'আমি জানতাম আমার মত উনিও তাঁকে দেখতে পাবেন।'[৫০] জুয়াইরিয়াহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ঠিকই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং এভাবে এক শত্রু গোত্রকে মিত্রে পরিণত করেন।

আরও দিন দুই মুরাঈসি কূপের কাছে অবস্থান করেছিল মুসলিমরা। ব্যাপক লুণ্ঠিত মালের আশায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সংখ্যক কপটাচারী বা *মুনাফিক* এই আক্রমণে যোগ দিয়েছিল এবং সহসা তুচ্ছ একটা ঘটনায় *উম্মার* অভ্যন্তরীণ টানাপড়েন প্রকাশিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় দুজন গোত্র সদস্যের মাঝে ঝগড়া বাধে, মুসলিমদের ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্যে ওদের ভাড়া করা হয়েছিল। ওরা দুজনেই যার যার গোত্রের চিরাচরিত মিত্রদের শরণ নিয়েছিল : একজন কুরাইশ এবং অপরজন খাসরাজ। অচিরেই অভিবাসী ও সাহায্যকারীরা এই গোত্রীয় চ্যালেঞ্জে সাড়া দেয় এবং কয়েক মিনিটের জন্যে পরস্পরের ওপর চড়াও হয়–মুসলিমরা অসতর্ক হলে প্রাচীন আনুগত্য যে সহজেই নতুন ইসলামি আদর্শকে উপড়ে ফেলতে পারে এটা ছিল তার একটা আলামত। উমরসহ মুহাম্মদের (সঃ) কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এতে হস্তক্ষেপ করেন এবং যুদ্ধ থামাতে সক্ষম হন, কিন্তু হিংস্র হয়ে ওঠেন ইবন উব্বাঈ। মদিনাবাসীদের এ কী হাল হয়েছে যে তারা বিদেশীদের হুকুম মেনে চলছে? 'ওরা আমাদের অগ্রাধিকারে বাদ সাধছে, আমাদের নিজের দেশে সংখ্যায় হারিয়ে দিচ্ছে, প্রবাদ বাক্য 'কুকুরকে খাওয়াও, সে তোমাকেও হজম করে ফেলবে' কুরাইশ ভবঘুরে আর আমাদের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে গেছে। 'আল্-ল্লাহর শপথ মদিনায় ফিরে যাই, তখন শক্তিমানেরা দুর্বলদের হটিয়ে দেবে।'[৫১] সাহায্যকারীদের একজন এসংবাদ মুহাম্মদের (সঃ) কাছে পৌছে দিলে নিমেষে তরবারি বের করেন উমর। 'কি? মুহাম্মদ (সঃ) তার সঙ্গীদের হত্যা করেছে?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চেয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ)। তবে অবিলম্বে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও দিনের সবচেয়ে উত্তপ্ত সময়ে ভ্রমণের প্রয়োজন হয়েছিল তাতে–একাজ আগে কখনও করেননি তিনি। ফিরতি যাত্রার সময় সুরা ১৩-সুরা রা'দ–অবতীর্ণ হয়, কিন্তু মদিনায় পৌছা পর্যন্ত মুহাম্মদ (সঃ) তা কাউকে জানাননি।

পথে এক যাত্রা বিরতির সময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আড়ালে গিয়েছিলেন আয়েশা, তিনি তাঁবু-স্থানে ফিরে দেখলেন তাঁর গলার হার হারিয়ে গেছে। আবার ওটা খুঁজতে যান তিনি, এ সময় যে লোক তাঁর উটে সাজ পরাচ্ছিল সে অবৃত্ত হাওদায় আয়শা আছেন ভেবে ওটাকে উটের পিঠে তুলে দেয়। এরপর অভিযাত্রী দল রওনা হয়ে যায়। অকুস্থলে ফিরে আয়েশা দেখেন চারদিক খাঁ খাঁ করছে। খুব একটা অস্বস্তি বোধ করেননি তিনি, কারণ জানতেন যে শিগগিরই তাঁর খোঁজ পড়বে, তাই শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। *হিজাব* প্রবর্তনের বহু আগে থেকেই আয়েশাকে চিনতেন সাফওয়ান ইবন আল-মু'আত্তাল, অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি, ওপথে অগ্রসর হওয়ার সময় আয়েশাকে চিনতে পারেন। দ্রুত নিজেকে পর্দা দিয়ে আড়াল করেন আয়েশা: সাফওয়ান তাঁকে নিজের উটের পিঠে

তুলে নেন। আয়েশার অনুপস্থিতি তখনও অজ্ঞাত ছিল, আচমকা তাঁকে সাফওয়ানের সঙ্গে উপস্থিত হতে দেখে নানান গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল। *মুনাফিকরা* দ্রুত কলঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সুপ্ত গোত্রীয় বৈরিতা চাপিয়ে দিতে শুরু করে। অভিবাসীরাই এসব যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। *হিজরার* পর থেকে মুহাম্মদের (সঃ) বিজয় বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরছিলেন কবি হাসান ইবন সাবিত, তিনি এবার পুরনো দেবীদের ত্যাগ করার নিন্দা জানাতে শুরু করেন এবং নিজেকে মদিনায় শরণার্থীদের সমুদ্র দ্বারা পরিবেশিত বলে বর্ণনা করতে থাকেন। এমনকি অভিবাসীদেরও কেউ কেউ আয়েশার সততার ব্যাপারে সন্দেহ বোধ করতে শুরু করেছিল, তাঁর আপন চাচাত ভাই মিসতাহ এবং যায়নাবের বোন হামনাহ বিনত্ জাহ্‌শ–আয়েশাকে মুহাম্মদ (সঃ) বেশি ভালবাসতেন বলে ঈর্ষান্বিত ছিলেন তিনি– সন্দেহবাদীদের মাঝে ছিলেন। তবে যায়নাব দৃঢ়তার সঙ্গে আয়েশার পক্ষ নিয়েছিলেন।

অভিযাত্রী দলটি মদিনায় ফেরার পর আয়েশা অসুস্থ হয়ে পড়েন, আস্তে আস্তে গুজব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আয়েশা লক্ষ্য করলেন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সঙ্গে শীতল ব্যবহার করছেন, দূরত্ব বজায় রাখছেন এবং পরিচর্যার সুবিধার কথা বলে বাবা-মায়ের বাড়ি যেতে বলছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)। আকস্মিকভাবে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়াটা তাঁর জন্যে বিপদবাহী ছিল–এটা ছিল তাঁর স্পষ্ট বিভ্রান্তি আর হতাশার চিহ্ন। এবার সাহায্যের জন্যে সাধারণ সঙ্গীদের কাছে যাবার উপায় ছিল না। আবু বকরের সঙ্গে তাঁর মেয়ের প্রসঙ্গে আলাপ করতে পারছিলেন না, আবার উমরের মতামতও চাইতে পারছিলেন না, সম্ভবতঃ নারীদের প্রতি উমরের সর্বজনবিদিত নিষ্ঠুরতার কারণে। অগত্যা তিনি তরুণ প্রজন্মের মুখোমুখি হন। তিনি যখন যায়েদের পুত্র উসামার কাছে আয়েশা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তরুণ আন্তরিকতার সঙ্গে আয়েশার পক্ষে কথা বলল, পরিচারিকা বুরাইয়ার মত। বুরাইয়া মুহাম্মদকে (সঃ) বলেছিল : 'আমি কেবল তাঁর ভালটাই জানি। আয়েশার একটা দোষই আমি দেখতে পাই, সেটা হল আমি ময়দা মাখার সময় তাঁকে নজর রাখতে বলি, কিন্তু তাঁর পোষা ভেড়া এসে সব খেয়ে ফেলে!' কিন্তু আলী ছিলেন শত্রুভাবাপন্ন সন্দেহবাদী : 'মহিলাদের কোনও অভাব নেই,' নাকচ করার ভঙ্গিতে বলেছিলেন তিনি, 'আপনি যেকোনও সময় আরেকজনকে বেছে নিতে পারেন'।[২২] আয়েশা কখনও তাঁকে ক্ষমা করেননি।

পয়গম্বরের সম্মানহানির সুযোগ পেয়ে ঝামেলা বাধানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখেন ইবন উব্বাঈ। মুহাম্মদকে (সঃ) মদিনার গোত্র প্রধানদের একটা সভা ডাকতে হবে– যদি তিনি মনে করেন যে তাঁর পরিবারের অনিষ্ট করার প্রয়াস গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন আছে। তিনি ভাল করেই জানতেন খাসরাজ গোত্রের কিছু সংখ্যক মুসলিম নির্ঘাৎ তাদের অনুমোদন ছাড়া ইবন উব্বাঈয়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়া হলে অসন্তুষ্ট হত। এই সভায় নতুন মুসলিম *উম্মার* নাজুক অবস্থা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই ইস্যুটি আউস ও খাসরাজ গোত্রের মাঝে গভীর

ভাঙন সৃষ্টি করে যা আজও বিদ্যমান। আউস গোত্রের প্রবীণদের কয়েকজন খুব ভাল করে জানতেন যে আয়েশার শত্রুরা খাসরাজ গোত্রের সদস্য, তাঁরা গুজবের ইন্ধনদাতাদের শিরোচ্ছেদ করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন খাসরাজাইট তাদের বিরুদ্ধে *মুনাফেকির* অভিযোগ তুলে বসে এবং দুটো গোত্র মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। *উম্মার* অস্তিত্বের স্বার্থে এই সঙ্কটের একটা গ্রহণযোগ্য সুরাহায় পৌঁছা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সুতরাং অবশেষে, মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং আয়েশার মোকাবিলা করতে যান। আয়েশা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁকে শোকাকূল দেখাচ্ছিল। এর আগে দুদিন ধরে তিনি কান্নাকাটি করেছেন, বাবা-মা কোনও উপকারে আসেননি। তাঁর মা উম্ম রুমান স্রেফ বলে দিয়েছিলেন সুন্দরী মেয়েদের এরকম সমস্যার মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়; আর বাবা আবু বকর কোনও কিছু ভেবে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন : শেষ পর্যন্ত তিনি মেয়েকে মসজিদে নিজ কুটিরে ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (স:) যখন পৌঁছলেন, বাবা-মা আয়েশার সঙ্গেই ছিলেন, তিনজনেই প্রবলবেগে কাঁদছিলেন তখন। কিন্তু পয়গম্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আয়েশার অশ্রু শুকিয়ে গেল। মুহাম্মদ (স:) তাঁকে অপরাধী হয়ে থাকলে খোলাখুলি তা স্বীকার করার আহবান জানালেন : ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু অসাধারণ আত্মসম্মানের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের বালিকা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামী ও বাবা-মার দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর কিছু বলার অর্থ হয় না, বলেছিলেন তিনি। যে অপরাধ তিনি করেননি সেটার কথা কখনও স্বীকার করবেন না, আবার নিজের নির্দোষিতার ওপর জোর দিলে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতে চাইবে না। একটা কাজই করতে পারেন, আর তা হল কোরানে উল্লিখিত সেই গোষ্ঠীপতিকে অনুসরণ–মরিয়াভাবে স্মৃতির পাতা হাতড়ে তাঁর নাম মনে করার চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু নামটা মনে পড়েনি– যাহোক তিনি ছিলেন জোসেফের বাবা যাঁর বক্তব্য ছিল : 'আমার দায়িত্ব হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা আর তোমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করা।' কথা শেষ করে তিনি নীরবে সরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), কারণ আয়েশার কথা শেষ হওয়ার পরপরই ঘোরের ভেতর চলে যান তিনি, সাধারণতঃ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগে এমন হত : অবসন্ন হয়ে পড়লেন তিনি, দিনটা ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও দরদর করে ঘামতে শুরু করলেন। একটা চামড়ার গদি তাঁর মাথার নিচে দিয়েছিলেন আবু বকর, একটা ম্যান্টল দিয়ে আবৃত করে দিয়েছেন, তারপর সন্ত্রস্ত চিত্তে উম্ম রুমানকে নিয়ে ঈশ্বরের বাণীর অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। তবে সবচেয়ে বিপদাপন্ন আয়েশা ছিলেন একেবারে বরফের মত শীতল : তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর অন্যায় আচরণ করবেন না। অবশেষে সচেতন হয়ে ওঠেন মুহাম্মদ (স:) : 'সুসংবাদ, আয়েশা!' আহবান জানান তিনি, 'ঈশ্বরের নিকট হতে আপনার নিষ্কলুষতার বার্তা এসেছে।' স্বস্তি ফিরে পেয়ে আয়েশার বাবা-মা তাঁকে উঠে মুহম্মদের (স:) কাছে আসার

তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু আয়েশা সোজাসুজি জবাব দিয়েছেন : 'আমি তাঁর কাছে যাব না, ধন্যবাদও দেব না। ধন্যবাদ দেব না আপনাদের দুজনকেও, আপনারা মিথ্যা অপবাদ শুনেও অস্বীকার করেননি। আমি কেবল আল-লাহকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে উঠব'।[৫৩] এই ভর্ৎসনা মেনে নিয়ে সমাবেশের মোকাবিলা করতে বেরিয়ে গেছেন মুহাম্মদ (স:), আয়েশার নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য আয়াত আবৃত্তি করেছেন এবং অপবাদটিকে 'স্পষ্ট মিথ্যা রটনা' বলে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।[৫৪]

এ ঘটনা দেখায় যে আয়েশা একজন গর্বিত নির্ভয় নারীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং মুহাম্মদের (স:) ভালবাসার নিজস্ব স্থান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে আয়েশার মর্যাদাবোধের প্রকাশ দেখিয়ে দেয় ইসলাম একজন নারীকে কতটা আত্মবিশ্বাস দিতে পারে। পয়গম্বরের কোনও স্ত্রীকেই কখনও তাঁদের স্বামীর ভয়ে ভীত হতে দেখা যায়নি। তাঁরা সবসময় তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকতেন এবং মুহাম্মদও (স:) মনোযোগের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য শুনতেন। অবশ্য প্রায়শঃই অন্য স্ত্রীরা আয়েশার প্রতি মুহাম্মদের (স:) পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলতেন। মুহাম্মদ (স:) নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন : পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন তিনি আর অভিযানে বের হলে কে সঙ্গী হবেন সেটা নির্ধারণ করার জন্যে সবাইকে একসঙ্গে সমবেত করতেন। কিন্তু যেহেতু মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর আসল পছন্দ গোটা *উম্মার* কাছে স্পষ্ট ছিল। আয়েশা যেদিন সঙ্গে থাকতেন সেদিনই মসজিদে ইচ্ছুক মুসলিমরা উপহার পাঠাত, কারণ তাদের ধারণা ছিল এতে তিনি খুশি হবেন। এটা অন্য স্ত্রীদের জন্যে অপমানকর ছিল, উম্ম সালামাহ্ তাই মুহাম্মদের (স:) কাছে গিয়ে মুসলিমদের তাদের সকল উপহার ঘরে পাঠানোর নির্দেশ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আয়েশার ব্যাপারে জ্বালাতন না করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন মুহাম্মদ (স:), তাঁর যুক্তি ছিল জীবিত স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশার উপস্থিতিতেই তিনি প্রত্যাদেশ পেয়ে থাকেন। উম্ম সালামাহ এরপর ফাতিমাহকে পাঠান তিনি বাবাকে রাজি করাতে পারবেন ভেবে। 'আদরের মেয়ে আমার,' কোমল কণ্ঠে তাঁকে বলেছেন মুহাম্মদ (স:), 'আমি যাকে ভালবাসি তুমি কি তাকে ভালবাসনা?' ফলে ফাতিমাহ্ পুরোপুরি দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। সবশেষে যায়নাব আসেন প্রতিবাদ জানাতে, মেজাজ গরম করে আয়েশাকে গালি দিয়েছিলেন তিনি। মুহাম্মদ (স:) তখন আয়েশার কাছে গিয়ে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বললেন, আয়েশা কাজটি এমন আবেগ আর চমৎকার ভাষা প্রয়োগে করেছিলেন যে যায়নাব নীরব হয়ে যান। আমোদিত বোধ করেছেন মুহাম্মদ (স:) কোনও সন্দেহ নেই, বলেছিলেন তিনি, বাবা আবু বকরের যোগ্য কন্যা তিনি। কিন্তু আয়েশা যে সবসময় সব ব্যাপারে রেহাই পেয়েছেন, তা নয়। একদিন, মুহাম্মদের (স:) হৃদয়ে খাদিজার আসন দেখে ঈর্ষান্বিত আয়েশা তাঁকে (খাদিজা) 'দাঁতবিহীন বুড়ি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। দারুণ নাখোশ হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)-খাদিজার চেয়ে প্রিয় হতে পারে না কেউ, সারা পৃথিবীর প্রত্যাখ্যানের মুখে খাদিজাই তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

৬২৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে, আয়েশাকে ঘিরে রটানো অপবাদ ঘুচে যাবার কয়েক সপ্তাহ পর, মক্কাবাসী এবং তাদের কনফেডারেটগণ ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিল। মদিনা এবং বেদুঈন মিত্রদের মধ্যে থেকে মাত্র ৩,০০০ লোক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), তো উহুদে যেমনটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেভাবে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হতে এগিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না; ফলে মুসলিমরা মদিনা নগরীর অভ্যন্তরেই আশ্রয় নিয়েছিল। মদিনা রক্ষা করা কঠিন ছিল না। তিনদিক থেকে টিলা আর আগ্নেয় শিলার বিস্তার দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল এলাকা, বিভিন্ন দিক হতে মরুদ্যানের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাগুলোর ওপর নজরদারি করাও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কেবল পশ্চিম দিক থেকেই মদিনার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে বেশি, মুহাম্মদ (স:) এমন একটা কৌশল বেছে নিয়েছিলেন যা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে অসাধারণ বলে মনে হয়েছে। কুরাইশ এবং তাদের মিত্রপক্ষের মাঝে কোনও তাড়াহুড়োর লক্ষণ দেখা যায়নি, সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তারা, ফলে মুসলিমরা প্রস্তুতি নেয়ার পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিল। আশপাশের ক্ষেত থেকে ফসল ঘরে তুলে নিয়েছিল তারা, যাতে শত্রুপক্ষ আগেরবারের মত পশু খাদ্য না পায়, এরপর সমগ্র *উম্মা* মরুদ্যানের উত্তরাংশের গোটা বিস্তার জুড়ে এক বিরাট পরিখা খনন করতে শুরু করেছিল। বর্ণিত আছে যে, পারসিয়ান নবদীক্ষিত সালমান এই পরিকল্পনার রূপকার, সম্প্রতি তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। পরিখাটির লাগাতার হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ জায়গায় জায়গায় দুর্গ ছিল যা পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা দিয়েছে, কিন্তু সময় মত কাজ শেষ করার জন্যে বেশ সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক পারিবারিক গ্রুপ পরিখার একটা নির্দিষ্ট অংশ খননের দায়িত্বে ছিল, মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং সবার সঙ্গে কাজে নেমেছেন, *হিজরার* পর মসজিদ নির্মাণের সময় গীত সেই গান গাইতে গাইতে। সবার মনোবল ছিল চাঙা : সঙ্গীদের কেউ কেউ মুহাম্মদকে (স:) খুবই সুন্দর আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর মনে হচ্ছিল বলে উল্লেখ করেছেন, সবার সঙ্গে হাসাহাসি করছিলেন, ঠাট্টা করেছেন। একটা নতুন গানেও নেতৃত্ব দিয়েছে তিনি :

> হে প্রভু, তোমার সাহায্য ছাড়া আমরা কোনওদিন পথ খুঁজে পেতাম না
> কখনওই প্রার্থনা করতাম না, দিতাম না সাহায্য।
> আমাদের ওপর করুণা বর্ষণ কর,
> আমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তা দাও
> শত্রুরা আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, আমাদের প্রতিহত
> করতে চেয়েছে, কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি।[৫৫]

৩১ মার্চ ৬২৭, কুরাইশরা সসৈন্য পৌঁছানোর পর গভীর পরিখার দিকে বোকার মত তাকিয়ে ছিল। পরিখা খোঁড়ার সময় উত্তোলিত মাটি দিয়ে এক বিরাট বাঁধ তৈরি

করা হয়েছিল, সা'ল পর্বতের পাদদেশে অবস্থান গ্রহণকারী মুসলিমদের কার্যকর আড়াল দিয়েছিল ওটা, আবার ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপের আদর্শ জায়গার কাজও দিচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে পরিখার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হাজার হাজার তীর উড়ে এসে জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। দুরদার করে নিশানার বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা। বলতে গেলে প্রায় কৌতুককরভাবে সালমানের পরিখা ব্যাপক আক্রমণকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে এবং কুরাইশ নেতারা পাল্টা উপায় বলতে কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তারপরেও, তাদের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান এবং ইকরিমাহ্ (আবু জাহলের ছেলে), আর খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ-আমর ইবন আল-আসের সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আল-আস ছিল মুহাম্মদের (স:) চিরশত্রু কুরাইশাইট। কিন্তু যে অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর ছিল তাদের সব আশা, তা একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল, কারণ ঘোড়ার পক্ষে পরিখা পার হওয়া সম্ভব ছিল না। দু-একটি ক্ষেত্রে দু-একজন লাফ দিয়ে উল্টোদিকে যেতে সক্ষম হলেও ওগুলোর সওয়ারিকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছিল। পদাতিক বাহিনীকে আগে বাড়ানোর অর্থ হত ক্ষয়ক্ষতি অত্যন্ত বেশি হওয়া; আবার তাদের সঙ্গে কোনও সিইজ এঞ্জিন বা মইও ছিল না। সে যাই হোক, কায়িক পরিশ্রম কুরাইশদের অপছন্দ ছিল আর পরিখাকে তারা চরম অরুচিকর বলে ভেবেছে : এটা ক্রীড়াসুলভ নয়, অনারব এবং বীরত্ব প্রকাশক লড়াইয়ের সকল প্রচলিত রীতির পরিপন্থী। সময়ে সময়ে ইকরিমাহর লোকজন বেপরোয়াভাবে আগে বাড়ার প্রয়াস পেলেও মাঝপথে আটকা পড়ে আক্ষরিক অর্থেই পড়ে যাচ্ছিল :

> কুরাইশদের কিছু কিছু অশ্বারোহী... বর্ম পরিহিত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে তেড়ে গেছে সামনে, বনি কিনানার অবস্থানের দিকে, তারা বলছিল, 'যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও, তারপর তোমরা বুঝবে আজকের প্রকৃত বীর কে।' দ্রুত বেগে ছুটে গেছে তারা একেবারে পরিখা পর্যন্ত। কিন্তু ওটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'এমন একটা কৌশল আরবরা কখনও প্রয়োগ করেনি!'[৫৬]

কুরাইশরা এরপর আরও কুশলী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, মরুদ্যানের দক্ষিণের বনি কুরাইযাহ্ নামের ইহুদী গোত্রকে দলে টানে তারা শহরে ঢোকার জন্যে। বছরের শুরুতে খায়বরে বসবাসরত নির্বাসিত ইহুদী গোত্র নাদিরের প্রধান হুয়াই ইবন আখতাব মক্কায় আবু সুফিয়ানের সঙ্গে দেখা করে মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সাফওয়ান এবং অন্যান্য কুরাইশদের সঙ্গে কা'বায় গিয়েছিলেন তিনি ঈশ্বরের সামনে শপথ নিতে যে উম্মাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আবু সুফিয়ান ভেবেছিলেন এসুযোগে মুহাম্মদের (স:) ধর্ম সংক্রান্ত দাবী সম্পর্কে ওদের

মনোভাব জেনে নেয়া উচিত : 'আপনারা, হে ইহুদীগণ, কিতাবধারী জাতি, মুহাম্মদের সঙ্গে আমাদের বিরোধের ধরন আপনারা জানেন। আমাদের ধর্ম নাকি তাঁর ধর্ম, কোনটি শ্রেষ্ঠ?' হুয়াই জবাব দিয়েছিলেন যে কুরাইশদের ধর্ম অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। হুয়াই এভাবে অংশীবাদের সাফাই গেয়েছেন জানতে পেরে মুসলিমরা ক্ষেপে উঠেছিল।[৫৭] খায়বরের ইহুদীরা এক বিরাট সেনাদল মদিনায় পাঠিয়েছিল, উত্তরের আরব গোত্রগুলোকেও মদিনার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে সক্ষম হয় তারা- প্রয়োজনে উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেক ঘুষ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফলে আসাফ গোত্র, ঘাতাফান গোত্র এবং সুলাঈম গোত্র আবু সুফিয়ানের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে মদিনা অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেছিল। হুয়াই এবার বনি কুরাইযাহ্‌কে পেছন দিক থেকে মুসলিমদের ওপর হামলা চালানো বা নাদির ও ঘাতাফান গোত্রের ২,০০০ সদস্যকে বসতিতে ঢুকতে দেয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য রাজি করাতে সচেষ্ট হলেন যাতে তারা বসতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দুর্গগুলোয় আশ্রয়গ্রহণকারী নারী ও শিশুদের হত্যা করার মাধ্যমে আক্রমণ শুরু করতে পারে। দ্বিধান্বিত ছিল ইহুদীরা : মুহাম্মদের (স:) বিরোধিতা করার পর কাইনুকাহ্‌ ও নাদির গোত্রের পরিণতি তাদের জানা ছিল, কেউ কেউ এও ভাবতে শুরু করেছিল যে তিনি সত্যি হয়ত সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পয়গম্বর। কিন্তু তারা যখন দেখল কুরাইশদের সঙ্গে বিপুল বাহিনী নগরীর সামনের প্রান্তরে দিগন্ত পর্যন্ত বিছিয়ে আছে, কুরাইযাহ্‌ গোত্র প্রধান কা'ব ইবন আসাদ কনফেডারেসিকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যান।

উমরই প্রথমে কুরাইযাহ্‌র বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারেন এবং দ্রুত মুহাম্মদকে (স:) অবহিত করেন; মুহাম্মদ (স:) স্পষ্টতঃই বিচলিত বোধ করেছেন। সবসময়ই এমন কিছু ঘটার আশঙ্কা ছিল তাঁর, এও জানতেন চতুর্পাশ থেকে এরকম হামলা এলে মুসলিম বাহিনী টিকতে পারবে না। *হিজরার আগে* কুরাইযাহ্‌ গোত্রের প্রধান আরব মিত্র ছিলেন সা'দ ইবন মুয়াধ, মুহাম্মদ (স:) তাঁকে পাঠান ওই অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর জন্যে। তিনি জানান যে ইহুদীরা উদ্ধত হয়ে উঠেছে : 'ঈশ্বরের এই বার্তাবাহকটা আবার কে?' জানতে চেয়েছিল তারা, 'মুহাম্মদের সঙ্গে আমাদের কোনও সমঝোতা কিংবা চুক্তি নেই।'[৫৮] এক পর্যায়ে মনে হয়েছিল ওদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মরুদ্যানের দক্ষিণ পুব পাশ থেকে আক্রমণ শুরু করেছে এবং মুসলিম নারী-শিশুদের আশ্রয়স্থল একটা দুর্গ ঘেরাও করে ফেলেছে, কিন্তু এচেষ্টাটা ব্যর্থ হয়ে যায়। মুহাম্মদ (স:) কুরাইযাহ্‌র মাঝে নিজস্ব কূটনৈতিক আক্রমণ শুরু করেন যাতে ইহুদীরা সাহস হারিয়ে কুরাইশদের অবিশ্বাস করতে শুরু করে। কিন্তু পরবর্তী প্রায় তিনটি সপ্তাহ ইহুদীরা কোন পক্ষ অবলম্বন করবে তা অনিশ্চিত রয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল মুসলিম বাহিনী; *মুনাফিকেরাও* ভয় আর হতাশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল যেন, সাহায্যকারীদের মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ মদিনা থেকে পালিয়ে আবু সুফিয়ানের দলে যোগ দেয়ার চেষ্টাও করছে বলে মনে হয়েছে। কোরান এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মুসলিমরা হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং কেউ কেউ বিশ্বাস হারাতে বসেছিল :

...তোমাদের চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল
এবং তোমাদের প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত, আর তোমরা
আল্লাহ সম্পর্কে দোদুল্যমান ছিলে। তখন
বিশ্বাসীরা এক পরীক্ষায় পড়েছিল ও ভয়ঙ্কর
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।[৫৯]

কিন্তু আতঙ্কের এই গভীর অমানিশা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তাদের। ঠিক কী ঘটেছিল তা পরিষ্কার নয়, তবে বনি কুরাইযাহ্ সম্ভবত: মক্কাবাসীদের অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল এবং তাদের সততা নিশ্চিত করার জন্যে কুরাইশদের কাউকে জিম্মি হিসাবে হস্তান্তরের ওপর জোর দিতে শুরু করেছিল : মক্কাবাসীরা যদি ইহুদীদের মুহাম্মদের (স:) করুণার ওপর ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তখন কী হবে? কুরাইশরাও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল। আরবে অবরোধ টিকিয়ে রাখা সবসময়ই কঠিন ছিল; ওদের সঙ্গে রসদ ছিল না, মানুষ এবং ঘোড়া উভয়ই ছিল ক্ষুধার্ত। কুরাইশরা সৈন্য হিসাবে দক্ষ বা অভিজ্ঞ ছিল না; পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনে সহজেই টলে উঠেছিল তারা, যেন আবহাওয়া বদলে যাওয়ায় তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্যই কোরানে তাপমাত্রা কমার উল্লেখ রয়েছে, বাতাস এবং বৃষ্টিকে ঈশ্বরের লীলা বলা হয়েছে। আবু সুফিয়ান মনস্থির করে ফেলেছিলেন :

হে কুরাইশগণ, এটা আমাদের স্থায়ী শিবির নয়; উট আর ঘোড়াগুলো মরতে বসেছে; বনি কুরাইযাহ্ শপথ ভঙ্গ করেছে, ওদের সম্পর্কে অস্বস্তিকর সংবাদ পেয়েছি আমরা। বাতাসের তাণ্ডব দেখতে পাচ্ছ তোমরা, রান্নার পাত্র, আগুন, তাঁবু কিছুই ঠিক রাখা যাচ্ছে না। আমি বিদায় নিচ্ছি, তোমারও তাই করো![৬০]

কথা শেষ করার আগেই উটের পিঠে চেপে বসে ওটাকে আঘাত করে ছোটার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি, তাড়াহুড়োয় খেয়াল ছিল না যে ওটা তখনও বাঁধা রয়েছে। তাঁর নিজ গোত্র এবং কয়েকদিন ধরে প্রতিবাদমুখর ও অস্থির বেদুঈনরা তাঁকে অনুসরণ করে, দ্রুত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে তারা। কনফেডারেসি অপমানকর পশ্চাদধাবনের সময় আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে খালিদ বলেছিলেন : 'বিবেকবান যে কোনও লোকই জানে মুহাম্মদ (স:) মিথ্যা বলেন না।'[৬১] পরদিন সকালে মুসলিমরা যখন বাধের চূড়ার ওপর দিয়ে তাকিয়ে ছিল, খাঁ খাঁ করছিল বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

কিন্তু *উম্মাকে* ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার অপরাধে বনি কুরাইযাহ্ গোত্রের ইহুদীদের নিয়ে কী করবেন মুহাম্মদ (স:)? দলীয় লোকদের বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেননি তিনি, বরং পরদিন সকালে, বর্ণিত আছে, জিব্রাইল কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বাহিনীকে কুরাইযাহ্দের গ্রামে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা এক ভয়ঙ্কর কাহিনী এবং আজও আমাদের কাছে ভয়াল বলে মনে হয়। কুরাইশ এবং কনফেডারেটরা মদিনা ছেড়ে চলে যাবার পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হুয়াই

কুরাইযাহ্‌দের সঙ্গে যোগ দেন। তারা যখন শুনল মুহাম্মদ (স:) তাদের এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, কুরাইযাহরা যথারীতি নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রায় ২৫ দিন টিকে ছিল তারা। তারা খুব ভাল করে জানত অবিশ্বাসী মিত্র হিসাবে ক্ষমা পাওয়ার কোনও আশা নেই, হুয়াই আর কা'ব সম্ভবতঃ তাদের অনিবার্য বিষয়টিকে মেনে নিতে রাজি করিয়েছিল। গোত্রীয় লোকদের সামনে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করে তারা : মুহাম্মদের (স:) কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে (তাঁর অসাধারণ সাফল্য থেকে মনে হয় তিনি সত্য পয়গম্বর হতেও পারেন); কিংবা গোত্রের নারী-শিশুদের হত্যা করার পর মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালানো যায় : মারা গেলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চিন্তা থাকবে না, আর জিতলে অনায়াসে আবার বিয়ে করতে পারবে; অথবা সাবাথ দিবসে মুহাম্মদকে (স:) অসতর্ক অবস্থায় হামলা চালানো যেতে পারে, ওই সময় তিনি এরকম পদক্ষেপ আশা করবেন না।

ইহুদীরা তিনটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে, মুহাম্মদের (স:) কাছে বনি নাদির গোত্রের মত একই শর্তে মরুদ্যান ছেড়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে। মুহাম্মদ (স:) তাদের আবেদন নাকচ করে দেন : মদিনা ত্যাগ করার পর *উম্মার* জন্যে আরও বেশি বিপজ্জক হয়ে উঠেছিল নাদির, সুতরাং এবার পূর্ণ আত্মসমর্পণ চান তিনি। কুরাইযাহ্‌কে তাদের প্রাক্তন এক মিত্রের সঙ্গে আলোচনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন : আবু লুবাবাহ ইবন আব্দ আল-মুনধির আউস গোত্রের প্রধান। ঘটনার এ অংশটুকু অস্পষ্ট। ইহুদীরা আবু লুবাবাহর কাছে বোধ হয় জানতে চেয়েছিল মুহাম্মদের (স:) অভিপ্রায় কী; আবু লুবাবাহ তাঁর গলা স্পর্শ করে আভাসে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি এমন বিমর্ষ হয়ে পড়েন যে একটানা পনের দিন নিজেকে মসজিদের একটা পিলারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন, পরে মুহাম্মদ (স:) তাঁকে মুক্ত করেন। তিনি যদি ইহুদীদের এভাবে তাদের ভাগ্যের কথা জানিয়েও থাকেন, তাতে করে তাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রভাবিত হয়নি, সেজন্যে বলা হয়ে থাকে যে তিনি বোধ করি কুরাইযাহ্‌র সঙ্গে তাঁর পুরনো মৈত্রীকে সম্মান করবেন এ রকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পরদিন কুরাইযাহ্‌ গোত্র মুহাম্মদের (স:) বিচার মেনে নিতে রাজি হয়ে মুসলিম বাহিনীকে দুর্গের দরজা খুলে দেয়, ধরে নেয়া যায় আউস গোত্রে তাদের সাবেক সহযোগিদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে আউস গোত্র মুহাম্মদের (স:) প্রতি কঠোর না হওয়ার আবেদন জানিয়েছিল, একজন খাসরাজাইট ইবন উব্বাঈয়ের অনুরোধে তিনি কী বনি কাইনুকাকে ছেড়ে দেননি? মুহাম্মদ (স:) জানতে চান তারা তাদের একজন নেতৃস্থানীয় লোকের সিদ্ধান্ত মেনে নেতে রাজি আছে কিনা। অবরোধ চালকালে সা'দ ইবন মুয়াধ মারাত্মকভাবে আহত হন, তাঁকে একটা গাধার পিঠে চাপিয়ে কুরাইযাহ্‌দের এলাকায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর সতীর্থ প্রধানরা তাঁকে সাবেক মিত্রদের রক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সা'দ বুঝতে পারেন যে সেটা হবে মদিনায় আবার বিপদ ডেকে আনার প্রথম পদক্ষেপ। *উম্মার* প্রতি অঙ্গীকারের

চেয়ে কি পুরনো সম্পর্ক বড় হওয়া উচিত? সা'দ রায় দিলেন যে ৭০০ জন পুরুষের সবাইকে হত্যা করতে হবে, তাদের স্ত্রী এবং শিশুদের দাস হিসাবে বিক্রি করে দিতে হবে এবং মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করতে হবে সকল সম্পত্তি। মুহাম্মদ (স:) জোর গলায় বলে উঠেছিলেন : 'আপনি সপ্ত আকাশের ওপরের আল্-ল্লাহর বিচার অনুযায়ীই বিচার করেছেন!'[৬২]

পরদিন সকালে আরেকটা পরিখা খননের নির্দেশ দেন মুহাম্মদ (স:), সেটা মদিনার *সৌকে*। মুসলিমদের অনুরোধে কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, কিন্তু বাকিদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে একসঙ্গে বেঁধে শিরোচ্ছেদ করা হয়; পরিখায় ছুড়ে ফেলা হয়েছিল তাদের মৃতদেহ। মাত্র একজন নারীকে হত্যা করা হয়, গোত্রকে অবরুদ্ধ করে রাখার সময় জনৈক মুসলিমের ওপর পাথর ছোড়ার অপরাধে। তার কথা স্পষ্ট মনে করতে পেরেছেন আয়েশা :

> আসলে আমার সঙ্গেই ছিল সে, পয়গম্বর যখন তার পুরুষদের বাজার এলাকায় হত্যা করছেন তখন আমার সঙ্গে আবাধে হাসছিল আর কথা বলছিল, হঠাৎ অজ্ঞাতকণ্ঠে তার নাম উচ্চারিত হল। 'সর্বনাশ,' চেঁচিয়ে উঠেছি আমি, 'ব্যাপার কী?' 'আমাকে হত্যা করা হবে!' জবাব দিয়েছে সে!' 'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করেছি। 'এমন একটা কাজ করেছি সেজন্যে,' জবাব দিয়েছে সে। তাকে নিয়ে গিয়ে শিরোচ্ছেদ করা হয়। আয়েশা প্রায়ই বলতেন, 'মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরও তার মনোবল আর উচ্চকণ্ঠ হাসির কথা কোনওদিন ভুলতে পারব না'।[৬৩]

এ ঘটনাকে নাৎসি নির্যাতন থেকে আলাদা করা আমাদের পক্ষে হয়ত অসম্ভব এবং এটা বহু মানুষকেই মুহাম্মদের (স:) কাছ থেকে অনিবার্যভাবে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করবে। কিন্তু ম্যাক্সিম রডিনসন এবং ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াটের মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে বিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে এ ঘটনাকে বিচার করা সঠিক হবে না। এটা খুবই আদিম প্রকৃতির সমাজ ছিল–প্রায় ৬০০ বছর আগে যে ইহুদী সমাজে জেসাস বসবাস করে গসপেলের ঘোষণা দিয়েছিলেন তারচেয়েও অনেক বেশি আদিম। এই পর্যায়ে আরবদের সর্বজনীন প্রকৃতিক আইন সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না–যা কিনা প্রাচীন বিশ্বের রাজরাজড়াদের মত আরোপ করা অন্ততঃ কিছুটা রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের অনুপস্থিতিতে মানুষের জন্যে অর্জন করা দুঃসাধ্য–অসম্ভবই বলা যায়, মুহাম্মদের (স:) আমলে মদিনার অবস্থা সম্ভবত কিং ডেভিডের সময়কালের জেরুজালেমের মত ছিল, ডেভিড ছিলেন ঈশ্বরের শত্রুদের চরম শত্রু, একবার দুশো প্যালেস্টাইনীকে হত্যা করে তাদের গোপনাঙ্গ কেটে রক্তাক্ত চামড়ার স্তূপ তাদের রাজার দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ডেভিডকে উদ্দেশ্য করে রচিত বহু শ্লোকই অনেক শতাব্দীর পরের ঘটনা–কোনও কোনওটি ৫৫০ খৃস্ট পূর্বাব্দের-কিন্তু সেগুলোও ইসরাইলীরা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যেমন

আচরণ করার আশা করে তার ভয়ঙ্কর বিবরণ ধারণ করে। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে আরবের কোনও গোত্র প্রধান কুরাইযাহর গোত্রের মত বিশ্বাসঘাতকদের দয়া দেখাবেন, এটা প্রত্যাশিত নয়।

অবরোধের ফলে মুসলিম *উম্মার* অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল, স্বভাবতঃই আবেগের প্রাবল্য ছিল খুব বেশি। কুরাইযাহ্ মদিনাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুহাম্মদ (সঃ) যদি ওদের মুক্তি দিতেন, তারা খায়বরের ইহুদী বিরোধীপক্ষকে শক্তিশালী করে তুলত এবং ফের মদিনার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর প্রয়াস পেত। পরের বার মুসলিমদের ভাগ্য এতটা ভাল নাও হতে পারত; আর আরও ভোগান্তি, আরও রক্তপাতের ভেতর দিয়ে অব্যাহত থাকত বেঁচে থাকার, টিকে থাকার সংগ্রাম। সংক্ষিপ্ত বিচার এবং মৃত্যুদণ্ডে মুহাম্মদের (সঃ) প্রতিপক্ষ প্রভাবিত হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডে কেউ শোকাহত হয়নি। কুরাইযাহ্ গোত্রও একে অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মেনে নিয়েছিল বলে মনে হয়। মৃত্যুদণ্ড খায়বরে অবস্থানরত ইহুদীদের একটা ভীষণ বার্তা পৌঁছে দিয়েছে; আরব গোত্রগুলোও বুঝে গিয়েছিল কুরাইযাহ্ গোত্রের কোনও বন্ধু বা মিত্রের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রক্ত বিবাদ বাধানোর ভয় করছেন না মুহাম্মদ (সঃ)। অবরোধের পর মুহাম্মদের (সঃ) অর্জিত অসাধারণ ক্ষমতার প্রতীক ছিল এ ঘটনা, যখন তিনি আরবে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপের নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।

কুরাইযাহ্র হত্যাকাণ্ড মুহাম্মদের (সঃ) জীবনকালে আরব বিশ্বের বেপরোয়া পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা অবশ্যই কোনওরকম দ্বিধা ছাড়া এর নিন্দা জানাতে পারি। মুহাম্মদ (সঃ) ব্যাপক নিয়ম কানুনসহ এক বিশ্ব সাম্রাজ্য বা প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ ছিলেন না। তাঁর কাছে টেন কমান্ডমেন্টসের মত কিছুই ছিল না (যদিও বলা হয়ে যাকে যে মোজেস 'তোমাদের জন্যে হত্যা করা ঠিক হবে না' বলার অল্প পরেই কানানের সকল অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্যে ইসরাইলীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন)। মুহাম্মদের (সঃ) ছিল প্রাচীন গোত্রীয় নীতিবোধ, যাতে আপন দলকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এ উপায়ের অনুমোদন রয়েছে। বিজয়ের ফলে মুহাম্মদ (সঃ) আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপের প্রধান পরিণত হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল, এমন এক গ্রুপের প্রধান ছিলেন তিনি যা প্রচলিত অর্থের কোনও গোত্র নয়। কেবল গোত্রীয় প্রথা অতিক্রম করে আসছিলেন তিনি, এবং সামাজিক উন্নতির দুটো পর্যায়ের মাঝামাঝি নো ম্যানস ল্যান্ডে ছিল তাঁর অবস্থান।

তবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, এই করুণ সূচনা ইহুদীদের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিকে চিরদিনের মত প্রভাবিত করেনি। মুসলিমরা নিজস্ব রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর যখন তাদের নিজস্ব পবিত্র আইনের মধ্যে আরও আধুনিক ও মানবিক নীতিমালা গড়ে তুলছিল, তখন সহিষ্ণুতার একটা ব্যবস্থা চালু করে তারা, যেমনটি মধ্যপ্রাচ্যের সভ্য অঞ্চলে দীর্ঘদিন আগে থেকে বিরাজিত ছিল।

ওইকিউমিনের (Oikumene) ওই অংশে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করেছিল। অ্যান্টি-সেমিটিজম খৃস্টধর্মের দোষ, ইসলামের নয়, মদিনার ভয়ঙ্কর ঘটনাকে সরলীকরণ করার প্রলোভন জাগলে আমাদের এটা মনে রাখার প্রয়োজন পড়বে। এমনকি মুহাম্মদের (স:) আপন সময়কালেও, ৬২৭ খৃস্টাব্দের পরে ছোট ছোট ইহুদী গোষ্ঠীগুলো মদিনায় রয়ে গিয়েছিল এবং আর কোনও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই তারা শান্তিতে বসবাস করেছে। মনে করা হয় যে ওই বসতিতে ইহুদী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত *মদিনা স্মারক* বা *কোভেন্যান্ট অব মেদিনা* এসময়ের পর প্রস্তুত করা হয়েছে। ইসলামি সাম্রাজ্যে ইহুদীরা ক্রিশ্চানদের মত পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে: আমাদের বর্তমান শতাব্দীতে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত ইহুদীরা সেখানে নির্বিঘ্নে বসবাস করেছে। ক্রিশ্চান মিশনারিরা গত শতাব্দীর শেষ দিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইয়োরোপের সেমেটিক মিথ নিয়ে এসেছে, সাধারণ জনগণ সবসময় যার নিন্দা করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনও কোনও মুসলিম মদিনার বিদ্রোহী ইহুদী গোত্রগুলোর উল্লেখ আছে কোরানের এমন অনুচ্ছেদসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং ইহুদী ও তাদের পয়গম্বরের সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্যধারী অসংখ্য আয়াত তারা অগ্রাহ্য করতে চায়। ইহুদী ও মুসলিমদের ১২০০ বছরের সম্পর্কের ইতিহাসে এটা একেবারে নতুন একটা দিক।[৬৪]

কোরান যুদ্ধকে সবসময় খারাপ বলে শিক্ষা দেয়। মুসলিমদের পক্ষ থেকে বৈরিতার জন্য দেয়া নিষেধ: কারণ আত্মরক্ষার লড়াইই প্রকৃত ন্যায় লড়াই, কিন্তু একবার যদি তারা যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে মুসলিমদের পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে লড়াই করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।[৬৫] শত্রু যদি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেয় বা শান্তি স্থাপনের দিকে ঝোঁকে, কোরান মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছে অবিলম্বে বৈরিতার অবসান ঘটানোর, যদি শান্তির শর্তাদি অনৈতিক বা অসম্মানজনক না হয়।[৬৬] আবার সশস্ত্র বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির বেলায়ও কোরান জোর দিয়েছে শত্রুকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করার ওপর। বিরোধ অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে এমন সিদ্ধান্তহীনতা বা দোদুল্যমানতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।[৬৭]

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তি পুন:প্রতিষ্ঠা করাই যেকোনও যুদ্ধের উদ্দেশ্য হতে হবে। ৬২৭ খৃস্টাব্দে মদিনার *সৌকে* সংঘটিত ভয়ানক ঘটনায় আমরা শিউরে উঠতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে ওটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। ওটা ছিল ওই ধরনের শেষ নৃশংসতা, কারণ *জিহাদের* সবচেয়ে খারাপ দিকটার সমাপ্তির সূচনা ঘটিয়েছিল তা। পরিখার যুদ্ধে একক শত্রুর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ বৃহত্তম আরববাহিনীকে পরাজিত করেছেন মুহাম্মদ (স:), তিনটি শক্তিশালী ইহুদী গোত্রের বিরোধিতার অবসান ঘটিয়েছেন এবং স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন *উম্মার* বিরুদ্ধে নতুন কোনও ষড়যন্ত্র বা বেঈমানি বরদাশত করা হবে না। তিনি নিজেকে আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন, যিনি শক্ত হাতে

বছরের পর বছর দীর্ঘায়িত হতে পারত এমন রক্তাক্ত বিরোধের অবসান ঘটেয়েছিলেন।

ইসলাম শব্দটি এমন এক মূল থেকে এসেছে যার মানে শান্তি ও সমন্বয়। কুরাইযাহর হত্যাকাণ্ডের পর আমরা *জিহাদের* নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করব। এখন আর আত্মরক্ষার্থে লড়তে হচ্ছে না বলে মুহাম্মদ (সঃ) গোটা আরবে '*প্যাক্স ইসলামিকা*' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে পেরেছিলেন। পরবর্তী বছর শান্তি ও সমন্বয়ের এমন এক নীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি যার ফলে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহচররাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন প্রায়।

৯. পবিত্র শান্তি

মদিনা আক্রান্ত হওয়ার পর কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (স:) জয়লাভ ছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত বিজয়। ঠিক পাঁচ বছর আগে একজন ক্লান্ত পথশ্রান্ত শরণার্থী হিসাবে মরুদ্যানে এসে হাজির হয়েছিলেন তিনি, মক্কাবাসীরা তাড়া করে আরেকটু হলে হত্যা করতে যাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু এবার তিনি একেবারে পাল্টে দিয়েছেন সেই পরিস্থিতি, গোটা আরব বিশ্বের চোখে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন যে মক্কার প্রাধান্যের অবসান ঘটেছে। *উম্মা* ও মুহাম্মদকে (স:) উৎখাতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তারা এবং তাদের ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মূলভিত্তি যে মর্যাদা তার পুনরুদ্ধার তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। মক্কা একটা ধ্বংস-উন্মুখ নগরীতে পরিণত হয়েছে এবং মুহাম্মদ (স:), অবরোধ তুলে নেয়ার সময় খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ যেমন বলেছিলেন, নতুন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। আদি গোত্রীয় ব্যবস্থা, *হিল্‌ম*-এর আদর্শ আর কুরাইশদের আগ্রাসী পুঁজিবাদ ইসলামের নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। *জিহাদের* রক্তাক্ত পর্যায় শেষ হয়েছে। মুহাম্মদ (স:) সবসময়ই কুরাইশদের পুরোপুরি ধ্বংস নয় বরং নিজের পক্ষে আনতে চেয়েছেন এবং অবরোধ অবসানের পর কোনওরকম দুর্বলতা বা সিদ্ধান্তহীনতার পরিচয় না দিয়ে, এর প্রয়োজন ছিল, সমন্বয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।

এ সময় নিজ মিশন সম্পর্কে মুহাম্মদের (স:) ধারণায় আবার পরিবর্তন আসে বলে মনে হয়। বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর থেকে আরব ঐক্যকে তাঁর কাছে আর অসম্ভব বলে মনে হয়নি। এবার কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় এবং বনি কুরাইযাহ্‌র সঙ্গে আচরণে বেদুঈন গোত্রগুলো প্রভাবিত হয়েছিল, যাদের অনেকেই তখন কুরাইশদের পক্ষ ত্যাগ করে মদিনার *উম্মার* সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে প্রস্তুত ছিল। মুহাম্মদের (স:) দৃষ্টি তখন মক্কা ছাড়িয়ে গেছে। নগরী নিজের পক্ষে আনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, কারণ তা ছিল তাঁর ধর্মীয় দর্শনের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু ইসলামের বিস্তার ঘটানোর সুযোগ তৈরির জন্যে তিনি মদিনার উত্তরের এলাকার কথা ভাবছিলেন। তবে এর মানে এই নয় যে তিনি গোটা বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, বরং তাঁর ইচ্ছা ছিল আরবী কোরানের বাণী উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর মাঝে পৌঁছে দেয়া, আবার সম্ভবত: বাইযানটাইন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা আত্মীকৃত সিরিয়া ও ইরাকের আরবরাও তার লক্ষ্য ছিল। একেবারে প্রথম দিকের সূত্রগুলোয় উল্লেখ

না থাকলেও এক বিবরণে জানা যায় মুহাম্মদ (স:) বাইযানটিয়াম ও পারসিয়ার সম্রাট, আবিসিনিয়ার নেজাস এবং মিশরের মুকাওকিসের কাছে ইসলামে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। এ বিবরণ প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রামাণিক নয়, কারণ ইসলামকে বিশ্বজনীন ধর্ম– যা ঐশীগ্রন্থধারীদের প্রত্যাদেশসমূহকে বাতিল করবে– হিসাবে মুহাম্মদ (স:) বিবেচনা করেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। এটা এখনও ইসমাইলের বংশধরদের ধর্ম, জুডাইজম যেমন জ্যাকবের বংশধরদের ধর্ম। পয়গম্বরের পরলোকগমনের প্রায় একশো বছর পরেও মুসলিমগণ ইসলামকে কেবল আরবদের ধর্ম হিসাবেই দেখে এসেছিল, তবে প্রতিবেশী দেশগুলোয় দূত পাঠানোর এসব কাহিনীতে কিছুটা সত্যতা থাকতে পারে। এ থেকে মুহাম্মদের (স:) নতুন আত্মবিশ্বাস এবং প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আর এক নির্যাতিত অংশের নেতা নন, মদিনার আর দশজন প্রধানের একজনও নন, বরং গোটা আরব বিশ্বের একজন অন্যতম সম্মানিত *সায়ীদ*। তিনি হয়ত সংগ্রামের এই শেষ পর্যায়ে মক্কাবাসীদের বিদেশী সাহায্য লাভের চেষ্টা আগেই নাকচ করে দিতে চেয়ে থাকতে পারেন। আমরা যেভাবে পাই, তাতে দেখা যায় চিঠিগুলোয় মুহাম্মদ (স:) এইসব শাসকদের কাছে তাঁকে পয়গম্বর হিসাবে স্বীকার করে নেয়ার আহবান জানিয়েছেন। মুহাম্মদ (স:) তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছিলেন যে আল্-লাহ তাঁকে সকল আরবদের পয়গম্বর হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি যখন বিভিন্ন সম্রাটের কাছে–নেজাস ও মুকাওকিস–চিঠি লিখছিলেন ঠিক সেই একই সময়ে উত্তরাঞ্চলীয় আরব গোত্র ঘাসান ও হানিফাহর কাছেও চিঠি পাঠান –এদুটো গোত্র ক্রিশ্চান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ওরা খৃস্টধর্ম ত্যাগ করুক তা চাননি তিনি, বরং চেয়েছিলেন তারা মদিনার অবশিষ্ট ইহুদীদের মত একই রকম শর্তে *উম্মায়* যোগ দিক।

৬২৭-৮ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ (স:) তাঁর নিজস্ব কনফেডারেসি গঠন শুরু করেন, আহাবিশরা যেভাবে কুরাইশদের মিত্র হয়েছিল ঠিক সেভাবে বিভিন্ন গোত্রকে তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বেদুঈনদের মাঝে কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কেউ কেউ আবার সত্যিকার অর্থেই মদিনায় *হিজরা* করেছে, যদিও এবছর গড়ে তোলা মৈত্রীগুলো কঠোরভাবে রাজনৈতিক চরিত্রের ছিল, তাঁর আশা ছিল শেষ পর্যন্ত তা ধর্মীয় অঙ্গীকারের দিকেই গড়াবে। তাঁর ক্রমবর্ধিষ্ণু শক্তি আর দৃঢ়সংকল্পের ভাবমূর্তি বজায় রাখাটা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। একই বছর আসাদ ও তালাবাহর মত অতীতের কনফেডারেসির সদস্য ছিল এরকম বিভিন্ন গোত্রের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তারা হয়ত সে বছরের ভয়বহ খরার কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে মদিনার একটু বেশি নিকটবর্তী হয়েছিল। *ঘাযু* এক ধরনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। পয়গম্বর খায়বরের ইহুদীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পরিকল্পনা করার কারণে সা'দ গোত্রের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন। বেদুঈনদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে *উম্মার* শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখাটা অত্যন্ত

বিপজ্জনক, আর *উম্মার* শক্তি হয়ত মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর ধর্মের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়ানোর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।

ওই বছর মক্কা আক্রমণ করার কোনও পরিকল্পনা মুহাম্মদের (স:) ছিল না, তবে মক্কার একচেটিয়া বাণিজ্যকে দুর্বল করার প্রয়াসে ছিলেন তিনি। নবদীক্ষিত আরও মুসলিম মদিনায় *হিজরা* করার ফলে ওখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও মরুদ্যানে রসদ আনার ব্যবস্থা গ্রহণ *উম্মার* জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সম্ভবত: সিরিয় বাণিজ্যের একটা অংশকে মদিনায় আনার লক্ষ্যে তিনি উত্তরে অভিযান পরিচালিত করেছিলেন, ধর্মীয় বাণী প্রচারও উদ্দেশ্যে ছিল বটে। উদাহরণ স্বরূপ, আব্দ আল-রাহমান সিরিয়াগামী পথে একটা ক্যারাভান নিয়ে দুমাত আল-জান্দালে গিয়েছিলেন, এখানে প্রতিবছর এক মেলা অনুষ্ঠিত হত। বদরের পর থেকে মদিনা ক্রমশঃ মক্কার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলছিল, লোহিত সাগর পথ তখন থেকে কুরাইশদের জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মদিনা অবরোধের পরের বছর মুহাম্মদ (স:) এই অবরোধ আরও জোরদার করার পাশাপাশি মুসলিমদের জন্যে বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। যায়েদকে সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পাঠান হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ক্যারাভান আক্রান্ত হয় এবং তিনি নিহত হয়েছেন ভেবে রেখে যাওয়া হয়, যদিও কোনওমতে মদিনায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এর অল্প পরেই সিরিয়া থেকে ফিরে আসা মক্কার একটা ক্যারাভানে হানা দেয়া এক *ঘাযুতে* সাফল্যের মুখ দেখেন যায়েদ। ঘটনাক্রম কুরাইশ ব্যবসায়ীদের একজন ছিলেন মুহাম্মদের (স:) পৌত্তলিক মেয়েজামাই আবু আল-আস। তিনি প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হন এবং রাতের অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে মদিনায় প্রবেশ করে প্রাক্তন স্ত্রী যায়নাবের সঙ্গে দেখা করেন। পরদিন সকালে, প্রাতকালীন প্রার্থনার সময়, মসজিদে এসে যায়নাব ঘোষণা দেন যে তিনি আবু আল-আস ইবন আল-রাবিকে আশ্রয় দিয়েছেন। এসবের কিছুই জানতেন না মুহাম্মদ (স:), তিনি মেয়ের এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানান, যদিও মেয়েকে তাঁর সঙ্গে শয্যায় যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

যায়নাব মুহাম্মদকে (স:) জানিয়েছিলেন যে পণ্যসামগ্রী হারিয়ে মারাত্মকভাবে কষ্টভোগ করছেন আবু আল-আস, কারণ মক্কার বিভিন্ন লোকের পক্ষে ওগুলো সংগ্রহ করেছিলেন তিনি যারা তাঁকে বিশ্বাস করে রসদপত্রের দায়িত্ব দিয়েছিল। মুহাম্মদ (স:) সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ পরিচালনাকারীদের রসদপত্র ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, তারাও সে আদেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে, এমনকি পুরনো চামড়ার পানির পাত্র, বোতল, অপ্রয়োজনীয় কাঠের টুকরোও তাঁকে ফিরিয়ে দেয় তারা। এতে কাজ হয়। আবু আল-আস মক্কায় ফিরে মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে *হিজরা* করেন, ইসলামে আত্মসমর্পণের পর আবার যায়নাবের সঙ্গে মিলিত হন। পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি নিষ্ঠ থেকে স্ত্রী কন্যাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি, কিন্তু এখন তাঁর গোত্রের আর আশা নেই : অনিবার্যকে মেনে নিতে হয়েছে তাঁকে। মক্কার কেউ কেউ একই রকম

অনুভূতি বোধ করছিল, মুহাম্মদ (স:) এটা জানতেন নিশ্চয়ই। প্রাচীন দেবতাদের সম্মান দেখাতে তারা মদিনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল; উহুদ রণাঙ্গনে তাদের রণহুঙ্কার ছিল 'হে আল-উয্যা, হে হুবাল!' কিন্তু এইসব দেবীরা মুহাম্মদের (স:) আল্-লাহ্'র ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সাফওয়ান, ইকরিমাহ আর আমির গোত্রপতি সুহায়েলের মত ব্যক্তিরা মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়ে গিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ (স:) নিঃসন্দেহে নবদীক্ষিত আবু আল-আস ও তাঁর নিজস্ব গোয়েন্দা মারফত (বেশ সংগঠিত একটা গোয়েন্দা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাঁর) এসব মানসিকতা পরিবর্তনের সংবাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক কিভাবে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় বোঝা দুরূহ ছিল, কেননা, আমরা দেখব, পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে সামরিক হামলা পরিচালনার কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না। যথারীতি নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা ছিল না তাঁর, তবে নিশ্চয়ই অবচেতন মনে সমস্যাটা নিয়ে বেশ ভাবনা চিন্তা করেছিলেন, কারণ ৬২৮ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে, ঐতিহ্যবাহী *হজ্জ* তীর্থযাত্রার মাসে, একটা সমাধান বা বলা যায় সমন্বয় এবং বিজয়েরর পূর্বাভাস দেখা দেয় এক স্বপ্নের ভেতর। স্বপ্নে তিনি দেখলেন মুণ্ডিত মস্তকে ঐতিহ্যবাহী *হজ্জের* পোশাক পরে কা'বার সামনে চাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নদৃশ্য তাঁকে বিজয়ের আশায় পূর্ণ করে দিয়েছিল যেন, পরে এইভাবে কোরানে তার প্রকাশ ঘটে :

> আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদ-উল-হারামে
> নিরাপদে প্রবেশ করবে, কেউ কেউ মুণ্ডিত মাথায়, কেউ কেউ
> চুল কেটে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না।...[১]

পরদিন সকালে তিনি *হজ্জে* যাবার ঘোষণা দিয়ে সঙ্গীদের কা'বায় সহযাত্রী হবার আহবান জানান। এরকম একটা অসাধারণ আহবানে মুসলিমদের মন ভয়, বিস্ময় আর অনিশ্চিত আনন্দে কিভাবে ভরে উঠেছিল তা সহজেই অনুমেয়। মুহাম্মদ (স:) স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এটা সামরিক অভিযান হবে না। মুসলিমরা হজ্জযাত্রীদের ঐতিহ্যবাহী শাদা পোশাক পরবে, কেউ অস্ত্র বহন করতে পারবে না। অবশ্যই দারুণ বিপজ্জনক ছিল এটা, এবং *উম্মার* বেদুঈন কনফেডারেটরা এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, তবে প্রায় একহাজার অভিবাসী ও সাহায্যকারী মুহাম্মদের (স:) সঙ্গী হতে রাজি হয়। এমন কি ইবন উব্বাঈ এবং তাঁর কিছু সমর্থকও সঙ্গী হন, এতে বোঝা যায় বিগত বছরের মত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় এবং বনি কুরাইযাহর পরিণতি দেখে তিনি প্রবলভাবে সংশোধিত হয়ে গিয়েছেন। মুহাম্মদ (স:) তাঁর সঙ্গে স্ত্রী উম্ম সালামাহকে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন আর দ্বিতীয় 'আকাবায় উপস্থিত ছিল এমন দুজন নারীকেও *হজ্জ* যাত্রায় অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিল হজ্জযাত্রীরা, সত্তরটি উট জোগাড় করে তারা, প্রাচীন রীতি অনুযায়ী পবিত্র চত্বরে উৎসর্গ করা হবে ওগুলো। মুহাম্মদ (স:) প্রচলিত *হজ্জের* পোশাক পরেছিলেন, সেলাইবিহীন দুটুকরো কাপড়ের তৈরি তা: এক টুকরো কোমরে জড়ানো থাকে, অন্যটি কাঁধে : এখনও মক্কায় হজ্জ উপলক্ষ্যে গমনকারীরা এ পোশাক পরে থাকে। উমর যুক্তি দেখিয়েছিলেন কুরাইশরা মুসলিমদের ওপর হামলা চালাবেই, আক্রমণ এলে যাতে প্রতিহত করা যায় সেজন্যে তীর্থযাত্রীদের সশস্ত্র অবস্থায় ভ্রমণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) ছিলেন অটল : 'আমি অস্ত্র বহন করব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন তিনি, 'আমি একমাত্র *হজ্জের* উদ্দেশ্যেই এগিয়ে এসেছি'।[৮] তখনও তিনি স্বপ্নের আস্থা আর নিশ্চয়তায় ভরপুর ছিলেন– যে কোনওভাবে 'নির্ভয়ে' আবার কা'বার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন, যদিও, আমরা দেখব, সেটা কীভাবে সম্ভব হবে তার কোনও ধারণা ছিল না তাঁর। কিন্তু এযাত্রায় যুদ্ধ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন তিনি, তো হজ্জযাত্রীরা কেবল শিকার উপযোগি ছোট ছোট তরবারী বহন করেছিল যা আবার তাদের খাপবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

প্রথম যাত্রা বিরতির সময় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রথম উটটি বিশেষ চিহ্ন এঁকে, গলায় মালা ঝুলিয়ে মক্কার দিকে মুখ করিয়ে আলাদা করেছিলেন মুহাম্মদ (স:)। তারপর কা'বার দিকে এগাতে এগোতে তীর্থযাত্রীদের প্রাচীন ঘোষণা উচ্চারণ করেছেন, '*লাব্বায়েক আল-ল্লাহুমা লাব্বায়েক!*' যার অর্থ 'আমি হাজির, হে ঈশ্বর, আপনার উপাসনায়!' তীর্থ যাত্রীদের কেউ কেউ তাঁকে অনুসরণ করে, বাকিরা আনুষ্ঠানিক উৎসর্গের কাজটি পরবর্তী সময়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কারণ *হজ্জের* সময়ে বন্যপ্রাণী শিকার করার ক্ষেত্রে প্রথাগত নিষেধাজ্ঞা ছিল।

মুহাম্মদ (স:) খুব ভাল করেই জানতেন, কুরাইশদের কঠিন অবস্থায় ফেলে দেয়া গেছে। মক্কার অভিভাবক হিসাবে হাজারখানেক আরব যারা কঠোরভাবে প্রাচীন আচার পালন করছে তাদের মক্কার উপাসনালয়ে প্রবেশে বাধা দেয়াটা তাদের জন্যে মানহানিকর হবে, আবার মুহাম্মদ (স:) যদি এভাবে পবিত্র নগরীতে ঢুকতে সক্ষম হন তাহলে সেটা হবে তাঁর বিশাল নৈতিক বিজয় এবং তাঁর হাতে কুরাইশদের অপমান নিশ্চিত হয়ে যাবে। সুহায়েল, ইকরিমাহ্ এবং সাফওয়ান মুহাম্মদকে (স:) নগরীতে প্রবেশে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাতে বেদুঈন গোত্রগুলো ক্ষুব্ধ হলেও। কিন্তু আবু সুফিয়ান অস্বাভাবিকভাবে নীরব ছিলেন। প্রখর বুদ্ধিমত্তা ছিল তাঁর, তিনি সম্ভবত: বুঝতে পেরেছিলেন যে খেলা শেষ হয়ে গেছে এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে আর মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে কুলিয়ে ওঠা যাবে না।

কিন্তু সিনেটে একমাত্র তাঁরই এ মত ছিল। মুসলিমদের নগরীতে প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্যে ২০০ অশ্বারোহীর এক বাহিনীসহ খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদকে পাঠানো হয়। *হজ্জযাত্রীরা* যখন মক্কার মোটামুটি পঁচিশ মাইল উত্তর-পুবের উসফান কূপের কাছে পৌঁছাল স্কাউট তখন সংবাদ নিয়ে এল যে খালিদ মাত্র আট মাইল

দূরে আছেন। মুহাম্মদ (স:) আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলেন : 'হায় কুরাইশ, যুদ্ধ ওদের গ্রাস করেছে! আমাকে আর বাকি আরবদের আমাদের পথে যেতে দিলে কী ক্ষতি হত ওদের? ...আল্-ল্লাহর দোহাই, ঈশ্বর আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে তা অর্জন কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত আমি লড়াইতে ক্ষান্ত দেব না'।[৩] *হজ্জযাত্রীদের* একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক খুঁজে বের করতে বললেন তিনি যে ওদের স্যাঙ্কচুয়ারিতে, যেখানে সব রকম লড়াই ও সহিংসতা নিষিদ্ধ, নিয়ে যেতে পারবে। আসলাম গোত্রের একজন সদস্য স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং খালিদের নাগালের বাইরে এক বন্ধুর পথে ওদের নিয়ে যায়। সমতলে পৌঁছে স্যাঙ্কচুয়ারি বা নিষিদ্ধ এলাকার একেবারে বহিস্থঃ বিন্দুতে আসার পর মুহাম্মদ (স:) *হজ্জযাত্রীদের* অভিযানের ধর্মীয় চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেন। পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তারা, তিনি তাদের আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমস্ত পাপ পেছনে ফেলে যাবার আহবান জানিয়েছিলেন, বলেছেন : 'আমরা ঈশ্বরের ক্ষমাপ্রার্থী এবং তাঁর কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করি'।[৪] এরপর তিনি ওদের স্যাঙ্কচুয়ারির প্রান্তে, হুদাইবিয়াহর পথ ধরতে বলেছেন, এমনভাবে উট হাঁকাতে বললেন যাতে ধুলো ওড়া দেখে খালিদ বুঝে যান যে তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছেন।

স্বপ্নের কারণে হয়ত মুহাম্মদের (স:) প্রত্যাশা ছিল যে কুরাইশরা চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে এবং মুসলিম তীর্থযাত্রীদের নগরে প্রবেশ করতে দেবে; কিন্তু খালিদের সশস্ত্র বাহিনী বুঝিয়ে দিয়েছিল তারা কা'বায় ঢুকতে দেয়ার চাইতে বরং তাঁর নিরস্ত্র সঙ্গীদের হত্যা করতে প্রস্তুত আছে। যতারীতি, পরিস্থিতি অনুযায়ী সাড়া দিয়েছিলেন তিনি, যদিও ঘটনা কোনদিকে গড়াবে, জানা ছিল না। হুদাইবিয়াহয় পৌঁছার পর মুহাম্মদের (স:) উট কাসওয়া আচমকা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আর এগোতে অস্বীকৃতি জানাতে শুরু করে–একাজে যেন বিশেষত্ব অর্জন করেছিল পশুটা, তীর্থযাত্রীরা ওটাকে ঘিরে সমবেত হয়ে যথারীতি 'হাল! হাল!' বলে চেঁচাতে শুরু করে, কিন্তু কাসওয়া সাড়া দেয়নি, লোকজন তাঁর একগুঁয়েমির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) বলেছিলেন এটা উটের স্বভাব নয়, হস্তীবর্ষে আবিসিনিয়ানদের পরাজয়ের কথা তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যখন বিশাল প্রাণীটি কা'বার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হয়েছিল। 'সেদিন যিনি হাতীকে মক্কায় যেতে বাধা দিয়েছেন তিনিই আজ কাসওয়াকে আটকে রেখেছেন। আজ স্বজাতির জন্যে দয়া দেখাতে কুরাইশরা আমাকে যা করতে বলবে আমি তাতেই সম্মতি দেব।'[৫] যুদ্ধ নয়, সমন্বয়ই এ অভিযাত্রার বৈশিষ্ট্য হতে হবে। *হজ্জযাত্রীদের* তিনি নেমে পড়ার আদেশ দিয়েছেন তাই। যখন পানির অভাবের প্রশ্ন তুলল তারা, বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ(স:) সঙ্গীদের একজনের হাতে একটা তীর ধরিয়ে দিয়েছিলেন; সঙ্গী যখন তীরখানা একটা শুকনো জলাধারে গাঁথে সঙ্গে সঙ্গে পানি বেরিয়ে আসতে শুরু করে।

উটের দল পেট ভরে পানি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল, তীর্থযাত্রীরাও সম্ভবত: আরও বীরত্বব্যাঞ্জক কিছু করার নির্দেশ না পাওয়ায় হতাশ হয়ে ওদের পাশেই বসে

পড়েছিল। এর ফলাফল দাঁড়িয়েছিল এক 'অবস্থান ধর্মঘটে' যা বেদুইনদের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে। এসময় সবার দৃষ্টি ছিল মুহাম্মদের (সঃ) ওপর; গোত্র থেকে গোত্রে দ্রুত সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল, কুরাইশরা শান্তিপূর্ণ আরব তীর্থযাত্রীদের ওপর হামলা চালাতে প্রস্তুত এবং সকল আরবের পবিত্র অধিকার কা'বায় প্রবেশ প্রতিহত করার প্রয়াস পাচ্ছে শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল গোত্রগুলো। স্যাঙ্কচুয়ারির সীমানায় পুরোপুরি হজ্জের পোশাক পরিহিত অবস্থায় মুহাম্মদ (সঃ) দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে এব্যাপারে মুসলিমরা কা'বার অভিভাবকদের চেয়ে ঢের বেশি আন্তরিক। সুতরাং তাদের পৌঁছানোর পরপরই মক্কায় অবস্থানরত খুযা'আহ গোত্রের একজন প্রধান বুদায়েল ইবন ওয়ারকা সংবাদ পেয়ে এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বুদায়েল যখন মুহাম্মদকে (সঃ) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মদ (সঃ) জবাব দিয়েছেন যে মুসলিমরা যুদ্ধ করতে নয় বরং পবিত্রভূমি দর্শনে এসেছে; প্রয়োজনে তারা লড়বে, যদিও সঙ্গে তেমন অস্ত্রশস্ত্র নেই, কা'বা দর্শনের অধিকার আদায়ের জন্যে; কিন্তু তারা করণীয় সম্পর্কে মনস্থির করার জন্যে কুরাইশদের সময় দিতে চায়। শান্তিপূর্ণ তীর্থযাত্রীদের প্রবেশে বাধা দেয়ার কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন বুদায়েল, তিনি কথা দেন যে মুসলিমরা যতক্ষণ হুদাইবিয়াহয় অবস্থান করবে ততক্ষণ খুযা'আহ খাদ্য ও তথ্য সরবরাহ করবে।

এরপরই তিনি মক্কায় ফিরে কুরাইশদের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন–আরবরা পূতঃ পবিত্র মনে করে এমন সকল ঐতিহ্য লঙ্ঘন করেছে ওরা। মুহাম্মদ (সঃ) কি বলেছেন তা শুনতে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ইকরিমাহ, কিন্তু সাফওয়ান শুনতে চেয়েছে। বুদায়েল যখন মুহাম্মদের (সঃ) শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা জানালেন, কুরাইশদের কেউ কেউ বিশ্বাসই করল না : 'হয়ত যুদ্ধ করার জন্যে আসেননি তিনি,' বলেছিল তারা, 'কিন্তু আল-লাহর দোহাই, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর এখানে আসা হবে না, আরবরাও কখনও বলতে পারবে না যে আমরা তার অনুমতি দিয়েছি।'[৮] মুহাম্মদকে (সঃ) প্রবেশ করতে দেয়ার বদলে তারা বরং শেষ ব্যক্তিটি নিহত হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মদ (সঃ) ও কা'বার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর শপথ নিয়েছিল। কিন্তু মুসলিমদের মাঝে বিভেদ তৈরি করার জন্যে তারা ইবন উব্বাঈয়ের কাছে কা'বায় অধিকার আদায়ের জন্যে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কারণ তাঁকে মক্কার একজন সুহৃদ বলে জানত তারা। কিন্তু তাদের বিস্মিত করে ইবন উব্বাঈ জানিয়ে দেন যে মুহাম্মদের (সঃ) আগে প্রদক্ষিণ করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। অতীতের অভিমত যাই থাক–এবং ভবিষ্যতেও আবার মুহাম্মদের (সঃ) বিরোধিতা করবেন–হুদাইবিয়াহয় ইবন উব্বাঈ নিজেকে সৎ মুসলিম হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন।

কুরাইশদের অন্য সদস্যরা–সাফওয়ান এবং সুহায়েলসহ– ভাবল মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা চালানো উচিত। মক্কা ভ্রমণরত এক কনফেডারেট, তায়েফের উরওয়াহ ইবন মাসউদ মধ্যস্থতার প্রস্তাব রাখলেন, তাঁর যুক্তি ছিল মুহাম্মদের (সঃ) যৌক্তিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে হিতে বিপরীত হবে; বিশেষ

করে যেখানে তিনি ছাড় দিতে প্রস্তুত আছেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরাইশরা উরওয়াহ্‌র প্রস্তাব গ্রহণ করলেও প্রথমে তাদের এক বেদুঈন মিত্র আল-হারিস গোত্রের আল-হুলায়েস ইবন আলকামাকে পাঠিয়েছিল, গোটা আহাবিশ গোত্রের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। গোঁড়া পৌত্তলিক ছিলেন আলকামা, তাঁকে দেখামাত্র তীর্থযাত্রীদের মুহাম্মদ (স:) বলেছিলেন : 'একজন ধার্মিক ব্যক্তি আসছেন, উৎসর্গের উট ওর দিকে পাঠাও।' হুলায়েস সত্তরটি উটকে নিজের দিকে ছুটে যেতে দেখে–প্রত্যেকটাই চমৎকারভাবে সাজানো : গলায় মালা পরা, আর উৎসর্গের বিশেষ চিহ্ন দেয়া, ভাবলেন যথেষ্ট দেখা হয়েছে। এমনকি মুহাম্মদকে (স:) কোনওরকম প্রশ্ন করারও প্রয়োজন মনে করেননি তিনি, সোজা কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলেছেন ওরা প্রকৃতই তীর্থযাত্রী এবং অধিকার অনুযায়ী অবশ্যই ওদের কা'বায় প্রবেশাধিকার দিতে হবে। কিন্তু এরকম অপ্রত্যাশিত সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সাফওয়ান এবং তাঁর সহকারীরা। হুলায়েসকে তারা চুপ করে বসে থাকতে বলেছেন : স্রেফ অজ্ঞ একজন বেদুঈন তিনি। এটা ছিল মারাত্মক ভুল, কারণ আত্মসম্মানের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন :

> কুরাইশগণ, আমরা এজন্যে আপনাদের সঙ্গে মৈত্রী গঠন ও চুক্তি সম্পাদন করিনি। আল্-ল্লাহর ঘরকে সম্মান দেখানোর জন্যে আগত কাউকে কি বাধা দেয়া যায়? আমার জীবন যার হাতে তার দোহাই, হয় মুহাম্মদকে তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন সেটা পূরণের অনুমতি দিতে হবে আর নইলে আমি আমার বাহিনীর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।[৭]

কুরাইশরা অবিলম্বে ক্ষমা চেয়েছে এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা আপোস রফায় না পৌঁছানো পর্যন্ত হুলায়েসকে সঙ্গে থাকার অনুরোধ জানিয়েছে।

এরপর উরওয়াহ ইবন মাসউদকে হুদাইবিয়াহ্‌য় পাঠায় তারা। মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে আলাপে বসে তাঁকে তিনি জানিয়ে দেন যে কুরাইশরা আপাদমস্তক অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে : এ অবস্থায় বিভিন্ন গোত্রের লোক যারা অতীতে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের সঙ্গে নিয়ে এমন একটা আক্রমণের মোকাবিলা করার আশা করছেন কীভাবে। আবু বকর এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি 'আল-লাতের নিপ্‌ল চোষ!' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন; কিন্তু উরওয়াহ্‌ তাঁকে বলেন ঘটনাচক্রে তিনি আবু বকরের কাছে ঋণী, তা নাহলে অপমানের বদলা দিতে তাঁকে বাধ্য করা হত। মুহাম্মদের (স:) মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে পরিচিত আরবদের ঐতিহ্যবাহী ভঙ্গিতে তাঁর দাড়ি ধরেছিলেন তিনি, কিন্তু অন্য এক মুসলিম ঝাঁকি দিয়ে তাঁর হাত সরিয়ে দিয়েছিল। মুহাম্মদের (স:) প্রতি মুসলিমদের গভীর ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে শিবির ত্যাগ করেন উরওয়াহ। ইবন ইসহাকের ভাষ্য অনুযায়ী, উরওয়াহ দেখেছেন 'যখনই তিনি পবিত্রতা অর্জন করেছেন, তারা ছুটে গেছে সেই পানি সংগ্রহের জন্যে, তিনি থুতু ফেললেও সেদিকে দৌড়ে গেছে তারা, আর একগাছি চুল মাটিতে পড়লে সেটা

পর্যন্ত তুলে নিয়েছে'। বহুদেশে যাবার অভিজ্ঞতা ছিল ব্যবসায়ী উরওয়াহর, তিনি ফিরে গিয়ে কুরাইশদের জানিয়ে দেন যে, এমনকি বাইযানটিয়াম বা পারসিয়ার সম্রাটগণও কখনও এত সম্মান পাননি। 'আমি এমন এক গোষ্ঠীকে দেখেছি যারা কোনও অবস্থাতেই তাঁকে ছেড়ে যাবে না, সুতরাং আপনারা মনস্থির করুন।' ওদের বলেছেন তিনি।[৮]

মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় নিজস্ব দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমে একজন সাহায্যকারীকে পাঠান তিনি, তার ধারণা ছিল এতে ঝামেলা কম হবে; কিন্তু কুরাইশরা তার উটের রগ কেটে দেয়, হুলায়েস যদি বাধা দিতে এগিয়ে না আসতেন তাহলে তাকেও হত্যা করা হত। এরপর উমরকে পাঠান মুহাম্মদ (সঃ), কিন্তু এমনকি উমরও সতর্ক এবং দ্বিধান্বিত ছিলেন : তাঁর গোত্রের কেউ তাঁকে রক্ষা করার মত শক্তিশালী ছিল না এবং উসমান ইবন আফফানের যাওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। নগরীর অভিজাতদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উসমানের, ফলে কুরাইশরা যদিও তাঁর কথা শুনেছে, কিন্তু প্রভাবিত হয়নি। তারা বলে দিয়েছিল তিনি ইচ্ছা করলে কা'বার চারদিকে *তাওয়াফ* করতে পারেন, কিন্তু ইবন উব্বাঈয়ের মত উসমানও মুহাম্মদের (সঃ) আগে আচার পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কুরাইশরা এরপর তাঁকে জিম্মি হিসাবে আটক করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে মুসলিম শিবিরে খবর পাঠিয়েছিল।

মুহাম্মদ (সঃ) এ সংবাদ পাওয়ার পর শপথ নেন, শত্রুর মোকাবিলা না করে তিনি হুদাইবিয়াহ্ ত্যাগ করবেন না। এটা ছিল এক সঙ্কট-মুহূর্ত, গোটা অভিযান, যেটাকে আক্ষরিক অর্থেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, তা একেবারে ভেস্তে গেছে বলে মনে হয়। চরম এই মুহূর্তে, বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ (সঃ) ঘোরের মধ্যে চলে যান, প্রত্যাদেশ লাভের সময় যেমন নির্জীব হয়ে পড়তেন ঠিক সে রকম, তবে এবার চেতনা হারালেন না তিনি, নিশ্চয়ই মরিয়াভাবে মনের গভীরে একটা সমাধান হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। এরপর মুসলিমদের ডেকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বলেন তিনি। এক হাজার তীর্থযাত্রী একের পর এক এগিয়ে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে *বায়্যাত আল-রিদওয়ান* বা 'শুভ আনন্দের অঙ্গীকার' হিসাবে পরিচিতি লাভকারী শপথ উচ্চারণ করে। বিভিন্ন সূত্র শপথের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বিবরণ দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, মুসলিমরা আমৃত্যু কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছিল, কিন্তু এটা সংখ্যালঘুর ধারণা। অনেক বেশি বিবরণে দাবী করা হয়েছে যে, মুসলিমরা পালিয়ে যাবে না বলে অঙ্গীকার করেছিল, কিন্তু ওয়াকিদি বলছেন : প্রত্যেক মুসলিম মুহাম্মদের (সঃ) হাত ধরে 'তাঁর মনে যা আছে' তাকে অনুসরণ অর্থাৎ সঙ্কটের সময় তাঁকে মেনে চলার শপথ নিয়েছিল।[৯] প্রত্যেকেই শপথ নিয়েছিল, *হজ্জযাত্রায়* যোগদানকারী ইবন উব্বাঈ এবং অন্য কপট ধার্মিকরাও।

এখানে ওয়াকিদির ভাষ্য অনুসরণই যৌক্তিক বলে মনে হয়। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একান্ত এবং সম্ভবত: বুদ্ধিবৃত্তির স্তরে এমন একটা পথ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন তিনি যেটা কেবল অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে, তা নয়, বরং অনুসারীদের মাঝে বিদ্রোহ জাগাতে পারে বলে তাঁর জানা ছিল। কুরাইশদের প্রতি পুরনো নীতির আমূল পরিবর্তন বলে মনে হবে একে। কিন্তু তখন পর্যন্ত এটা স্পষ্ট ও যৌক্তিক নীতি না হয়ে মোটামুটি একটা অনুমানের পর্যায়ে ছিল। হুদাইবিয়াহর ঘটনাবলীর অন্তস্থঃ যুক্তির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি, ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল মদিনা থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে রওনা দেয়ার সময় এমনটা তাঁর প্রত্যাশায় ছিল না। সবার শপথ উচ্চারণ শেষ হওয়ার কিছু পরেই জানা গেল উসমান আসলে নিহত হননি। এরপর দুজন সঙ্গীসহ সুহায়েলকে শিবির অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে মুহাম্মদ (সঃ) বুঝতে পারেন যে কুরাইশরা আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুহায়েলের সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা করেন তিনি, নিবিড় আলোচনার পর যেসব শর্তে সম্মতি প্রকাশ করেন তাতে তাঁর সঙ্গীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

মুহাম্মদ (সঃ) কা'বা পরিদর্শন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন, যার ফলে আরব গোত্রগুলোর কারও একথা বলার উপায় থাকল না যে তিনি চাপ প্রয়োগ করে কুরাইশদের রাজি করিয়েছেন। কিন্তু পরের বছর একই সময়ে মুসলিমরা আবার *হজযাত্রী* হিসাবে মক্কায় আসবেন, তখন কুরাইশদের তিন দিনের জন্যে নগরী মুক্ত করে দিতে হবে যাতে তারা শান্তিতে কা'বার চারপাশে *উমরা* বা ছোট *হজ্জ* সম্পাদন করতে পারে। মক্কা ও মদিনার মধ্যে দশ বছর মেয়াদী এক শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হবে এই শর্তে যে মুহাম্মদ (সঃ) কুরাইশ গোত্রের কোনও সদস্য অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে *হিজরা* করলে তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু কোনও মুসলিম পক্ষ ত্যাগ করে মক্কায় এলে কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। সবশেষে বেদুঈন গোত্রগুলোকে আগের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে মক্কা বা মদিনা যে কারও সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের স্বাধীনতা দেয়া হয়। কোরানে উল্লেখ আছে যে যুদ্ধ বিরতি বা শান্তির সম্ভাবনা থাকলে মুসলিমদের শত্রু প্রস্তাবিত যে কোনও শর্ত মেনে নিতে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু এই শর্তগুলো মুসলিমদের কাছে অসম্মানজনক মনে হয়েছিল। তীর্থযাত্রার ব্যাপারটি জোর করে আদায়ের দিকে না গিয়ে নমনীয়ভাবে ফিরে যেতে সম্মতি জানিয়ে অভিযানে অর্জিত সুবিধা ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি, ব্যাপারটা এরকম দেখাচ্ছিল। মক্কার সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের অর্থ : মুসলিমরা আর কুরাইশদের ক্যারাভানে হামলা চালাতে পারবে না : অভিবাসীরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে? আর কেনইবা মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার একচেটিয়া বাণিজ্যের টুঁটি চেপে ধরা অর্থনৈতিক অবরোধ পরিত্যাগ করতে যাচ্ছেন? সর্বোপরি, নবদীক্ষিত কোনও মুসলিমকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে কেন রাজি হলেন মুহাম্মদ (সঃ), যেখানে মুসলিম পক্ষ বা ধর্মত্যাগীকে ফিরিয়ে দিতে মক্কার বাধ্যবাধকতা থাকছে না? মুহাম্মদ (সঃ) যেন *জিহাদ* পরিত্যাগ করেছেন, যেখানে অংশ নিয়ে অসংখ্য মুসলিম প্রাণ দিয়েছে আরও অনেকে সর্বস্ব হারানোর ঝুঁকি নিয়েছে, ঠাণ্ডা মাথায় সব সুবিধা মক্কার হাতে তুলে

দিচ্ছেন তিনি। ইবন ইসহাক যেমন বলেছেন, 'পয়গম্বর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখেই তাঁর সঙ্গীরা মনে কোনওরকম সংশয় না রেখে মক্কা অধিকারের উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিল : যখন তারা শান্তি আলোচনা প্রত্যক্ষ করল, প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নিতে দেখল, আর পয়গম্বর নিজের প্রতি যা বেছে নিলেন, তাতে করে শোকে প্রায় মারা যাবার অবস্থা হল তাদের।'[১০]

আরও বিপদের কথা, বাতাসে বিদ্রোহের আভাস ছিল। চুক্তিটা উমরের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল, তিনি আসন ছেড়ে আবু বকরের দিকে এগিয়ে যান। 'আমরা কী মুসলিম নই, আর ওরা বহুঈশ্বরবাদী নয়?' জানতে চান তিনি। 'আমাদের ধর্মের অপমানকর কোনও কিছু কেন মেনে নেব আমরা?'[১১] আবু বকরও বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু উমরকে বলেছিলেন মুহাম্মদের (স:) উপর তখনও আস্থা রয়েছে তাঁর। পরে উমর বলেছেন যে যদি এক শো অনুসারীও পেতেন তাহলে হয়ত *উম্মা* ত্যাগ করতেন। কিন্তু হুদাইবিয়াহয় অন্য যে কারও চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পেয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), যদিও তাঁর প্রত্যাশানুযায়ী তীর্থযাত্রার ফলাফল হয়নি, তবে এখানে প্রাপ্ত প্রেরণা তাঁকে শান্তির পথে পরিচালিত করেছে। একেবারে নজীর বিহীন এক প্রয়াস নিয়েছিলেন তিনি যা তাঁর একেবারে বিশ্বস্ত ও অনুগত সঙ্গীদেরও বোধের অতীত ছিল, আকস্মিক পটপরিবর্তন মেনে নেয়ার চেষ্টারত সাধারণ মুসলিমদের বোঝার তো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য গভীর অন্তরে ঠিক কী করতে যাচ্ছেন সেটা জানতেন মুহাম্মদ (স:), যদিও অন্ধকারে পথ হাতড়ে এগোচ্ছিলেন তিনি, যতদিন তিনি কা'বাগৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন ততদিন বেদুঈনগোত্রগুলো তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে ইতস্তত করবে। তাঁর এটা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল যে মুসলিমরা আরবের পবিত্র স্থানকে ওদের মতই বিবেচনা করে, মক্কার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার মাধ্যমে তিনি প্রপাগান্ডা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পবিত্র এলাকায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন; আবার কুরাইশদের কাছ থেকে মক্কা ও মদিনার সমঅবস্থানের স্বীকৃতিও আদায় করে নিয়েছিলেন। যাযাবর গোত্রগুলোকে তাদের পুরনো মৈত্রী থেকে মুক্তি দিয়ে কুরাইশদের ছেড়ে *উম্মার* কনফেডারেট হওয়ার অনুমোদন সংক্রান্ত ধারায় বিশেষ করে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল : খুযা'আহ গোত্র বিবাহসূত্রে আগেই মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছিল, এবার তারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে যোগ দেয়। মদিনায় কুরাইশদের পরাজিত করার পর চাপ অব্যাহত রেখে সামরিক উপায়ে তাদের ধ্বংস করাটাই আবশ্যক ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) কখনওই এমনটা চাননি। অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নিয়ে কুরাইশদের মুগ্ধ করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের স্বপক্ষে আনার আশা করেছেন তিনি। আরবদের জন্য এক নজীরবিহীন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন মুহাম্মদ (স:), যার মানে প্রত্যাশিত ও নিশ্চিত কিছু করার উপায় তাঁর ছিল না, কারণ তাহলে একটা স্থিতাবস্থায় আটকা পড়ে যেতে হত।

সুহায়েলের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে বসার সময় মুহাম্মদ (স:) জানতেন যে তিনি মুসলিমদের আনুগত্যের ওপর অসহনীয় চাপ প্রয়োগ করে ফেলেছেন। তারা কি 'শুভ আনন্দের অঙ্গীকার'-এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, নাকি বিদ্রোহ ঘটবে? মুসলিমরা যখন চুক্তির আসল ভাষা শুনতে পেল, আরও টানটান হয়ে উঠল পরিস্থিতি। মুহাম্মদ (স:) আলীকে আহবান জানিয়েছিলেন তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্যে, তিনি যখন *বিসমিল্লাহ*– মুসলিমদের বিশেষ সূচনা সূত্র, 'আল্-লাহর নামে, যিনি পরমদাতা (*আল-রাহমান*,) ও দয়ালু (*আল-রহিম*)-দিয়ে শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানান সুহায়েল। কুরাইশরা সব সময় এসব ঐশ্বরিক উপাধিকে ঘৃণা করে এসেছে, এখন মুহাম্মদ (স:) যখন নতি স্বীকারে রাজি আছেন বলে মনে হচ্ছে তখন এসব নাম মেনে নেয়া যায় না : 'আমি এটা স্বীকার করি না, তবে "তোমার নামে, হে আল-লাহ্!" লিখতে পারেন।' মুসলিমদের হতচকিত করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন মুহাম্মদ (স:), আলীকে লেখা বদলানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল, মুহাম্মদ (স:) বলে চললেন : 'এটা সেই চুক্তি যা , ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ সুহায়েল ইবন আমরের সঙ্গে সম্পাদনে সম্মত হয়েছেন।' আবার আপত্তি জানান সুহায়েল, 'আমি যদি আপনাকে প্রেরিত পুরুষ বলে স্বীকারই করতাম, তাহলে তো আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল না,' বললেন তিনি, যুক্তিসঙ্গতভাবেই, 'আপনার নিজের নাম আর বাবার নাম লিখুন।' আলী ইতিমধ্যে 'ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ' লিখে ফেলেছিলেন, তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন ওগুলো কেটে ফেলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন মুহাম্মদ (স:) কাগজের ওপর লেখাটা দেখিয়ে দিতে বললেন এবং নিজের হাতে তা কেটে দিলেন। তারপর আবার বললেন : 'এটা সেই চুক্তিপত্র যা মুহাম্মদ ইবন আব্দাল্লাহ সুহায়েল ইবন আমরের সঙ্গে সম্পাদনে সম্মত হয়েছেন।'[১৬]

যেন পরিস্থিতি খারাপ হতে আরও বাকি ছিল, সুহায়েলের ছেলে আবু জান্দাল আচমকা ঠিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার মুহূর্তে অকুস্থলে হাজির হলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় সুহায়েল তাঁকে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে যাতে যোগ দিতে না পারেন সেজন্যে ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু পালাতে সক্ষম হয়ে বিজয়ীর বেশে শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের মুখে আঘাত করেন সুহায়েল তারপর শিকল হাতে তুলে নেন তিনি। 'মুহাম্মদ!' দাবী তুলেছিলেন তারপর, 'এলোক উপস্থিত হওয়ার আগেই আমাদের মধ্যকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে।' অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মুসলিমরা : মুহাম্মদ (স:) নিশ্চয়ই জান্দালকে নিরাশ করে তাঁকে বিনা বাক্যব্যয়ে বাবার হাতে নির্যাতন আর অপমানের শিকার হতে তুলে দেবেন না? কিন্তু মুহাম্মদ (স:) গম্ভীরভাবে চুক্তির শর্তের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গেলেন এবং বাবার অনুমতি ছাড়া আবু জান্দালকে *হিজরার* অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। সুহায়েল তাঁকে টেনে হিঁচড়ে মক্কার দিকে নিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে তিনি বলছিলেন, 'আমাকে কী অংশীবাদীদের কাছে ফিরে যেতেই হবে যাতে ওরা আমাকে ধর্ম ত্যাগ করাতে পারে, হে মুসলিমগণ?' ইবন

ইসহাক বলেছেন, ধ্রুপদী ভঙ্গিতে কমিয়ে : 'এতে লোকজনের হতাশা বেড়ে গিয়েছিল।' মুহাম্মদ (স:) যখন তাঁকে বলেছেন, 'হে আবু জান্দাল, ধৈর্য ধারণ করো আর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখো। ঈশ্বর তোমাকে শান্তি আর তোমার মত যারা অসহায় তাদের মুক্তির পথ জানিয়ে দেবেন। আমরা ওদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছি এবং তারা আমাদের চুক্তিতে আল-লাহর নাম উচ্চারণ করেছে, আমরা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারব না!'[১৪] তখন তেমন স্বস্তি পায়নি কেউ।

উমরের বেলায় এটা ছিল শেষ অবলম্বন। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বার বছর ধরে মেনে চলা মানুষটির মুখোমুখি হয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি : তিনি কি ঈশ্বরের বার্তাবাহক নন? মুসলিমরা ন্যায় এবং তাদের শত্রুরা কি অন্যায় পথে নেই? কেন এমন অসম্মানজনক একটা শান্তি স্থাপন করছেন তাঁরা? কিছুদিন আগে মদিনা ছেড়ে আসার সময় মুহাম্মদ(স:) কা'বায় আবার উপাসনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নাকি দেননি? প্রতিশ্রুতি দেয়ার কথা স্বীকার করে মুহাম্মদ (স:) আবার যোগ করেছেন : 'কিন্তু সেটা এবছরই ঘটবে তা কি বলেছি?' উমর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন পয়গম্বর তা বলেননি, তখন মুহাম্মদ (স:) আবার বলেছেন : 'আমি ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। আমি তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারব না আর তিনি আমাকে পরাজিত করবেন না।'[১৫] যদিও তখন পর্যন্ত হতাশ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিলেন উমর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে আলী, আবু বকর, আব্দ আল-রাহমান আর আব্দাল্লাহ ইবন সুহায়েলের (আবু জান্দালের ভাই) এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামার সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন।

কিন্তু তীর্থযাত্রীদের মধ্যে তখনও বিক্ষোভ কাজ করছিল এবং এক পর্যায়ে বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়ার মত বিপজ্জনক মুহূর্তও দেখা দিয়েছিল। চুক্তির স্বাক্ষ্যপ্রদান শেষ হওয়ার পর মুহাম্মদ (স:) উচ্চস্বরে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে কা'বায় না পৌঁছালেও হুদাইবিয়াহ্‌তেই তাঁরা *হজের* আনুষ্ঠানিক পালন করবেন। পুরুষদের সবাইকে মাথা মুণ্ডন করে সত্তরটি উট জবেহ করতে হবে। চরম নীরবতা নেমে এসেছিল তখন। তীর্থযাত্রীরা একটুও না নড়ে তিক্ত দৃষ্টিতে মুহাম্মদের (স:) দিকে তাকিয়ে ছিল। হতাশ হয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে যান মুহাম্মদ (স:), জানতেন এরকম সঙ্কট মুহূর্তে তাদের আনুগত্য ও সমর্থন হারালে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। কী করা উচিত তাঁর? লাল-চামড়ার তাঁবু থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন উম্ম সালামাহ, তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন। পরিস্থিতি সঠিকভাবেই যাচাই করেছিলেন তিনি : মুহাম্মদের (স:) উচিত আবার দলের কাছে যাওয়া, বললেন তাঁকে, এবং সমগ্র *হজযাত্রীদলের* সামনে প্রত্যেকে যার যার উট উৎসর্গ না করা পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করতে হবে তাঁকে। সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল এটা। নাটকীয় ও দর্শনীয় রক্তপাতের ফলে উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছিল। মুহাম্মদ (স:) তাঁবু থেকে বের হয়ে ডান-বাম কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের হাতে আলাদা করে রাখা উটের কাছে গিয়ে আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ সম্পাদন করেছিলেন। একে পবিত্র কাজ, আরবদের সবার পরিচিত, আবার একই সঙ্গে অস্বীকৃতি ও স্বনির্ভরতার পরিচায়কও, কেননা মক্কার

বাইরে উট কোরবানী দিয়ে মুহাম্মদ (স:) ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। নীরব জনতার মাঝে এর ফলে স্বীকৃতির একটা ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং হতাশা ও অবোধ্যতার আবরণ ভেদ করে এক শুদ্ধতা বিলিয়ে দিয়েছে। অচিরেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই, দৌড়ে গেছে যার যার উটের কাছে, সম্ভবত: একটা কিছু করার সুযোগ পেয়ে প্রবলভাবে স্বস্তি ফিরে পেয়েছিল তারা। প্রাচীন আরব সূত্র 'তোমার নামে, হে আল্-লাহ'র সঙ্গে মুসলিম শ্লোগান 'আল-লাহু আকবার!' যোগ করার মাধ্যমে উট উৎসর্গ করেছে তারা। মুহাম্মদ(স:) যখন সাহায্যকারীদের একজনকে ডেকে তাঁর মস্তক মুণ্ডিত করে দিতে বললেন, মুসলিমরা সবাই তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে অদম্য আগ্রহে পরস্পরের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল প্রায় এবং এমন উৎসাহের সঙ্গে পরস্পরের মাথা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, পরে উম্ম সালামাহ বলেছেন, অতিউৎসাহে একে অন্যকে মারাত্মকভাবে আহত করে বসতে পারে ভেবে ভয় হচ্ছিল তাঁর। বর্ণিত আছে যে, *হজ্জযাত্রীরা* হুদাইবিয়াহ্ ত্যাগ করার মুহূর্তে দমকা বাতাস এসে কালো চুলের স্তূপ মক্কার দিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল যার অর্থ ঈশ্বর তাদের উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন।

কিছুটা হালকা মনে বাড়ির পথ ধরেছিল তীর্থযাত্রীরা, তবে খানিকটা তিক্ততা রয়ে গিয়েছিল; মুহাম্মদ (স:) জানতেন যে চুক্তিকে অনিশ্চিত না করে নতুন অভিযানের পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের আবার খুশি করে তুলতে হবে। হয়ত নিজের ওপর প্রলম্বিত সন্দেহ ছিল তাঁর, কারণ নিঃসন্দেহে জটিল চুক্তি স্বাক্ষর না করে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা ছিল। ফিরতি পথে মুহাম্মদকে (স:) চিন্তিত এবং অনেক দূরের বলে মনে হচ্ছিল; উমর আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন এই ভেবে যে তাঁর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা দুজনের বন্ধুত্বকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নিজের মূর্খতাকে নিন্দা জানিয়ে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবার আশঙ্কায় ভুগছিলেন তিনি, তাঁর একটা মন্তব্যের জবাবে মুহাম্মদকে (স:) দায়সারা জবাব দিতে দেখে আরও প্রবল হয়ে ওঠে আশঙ্কাটা। আচমকা এক অশ্বারোহী এসে তাঁকে সামনে এগিয়ে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ পৌঁছে দিলে উমরের মন আতঙ্কে জমে গিয়েছিল। কিন্তু প্রবল স্বস্তির সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন পয়গম্বরকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, যেন বিশাল উদ্বেগের বোঝা নেমে গেছে তাঁর কাঁধ থেকে। ' আমার ওপর একটা সুরা অবতীর্ণ হয়েছে' :' ঘোষণা করেছিলেন পয়গম্বর, 'আমার কাছে দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে এটা প্রিয়।' সুরা নম্বর ৪৮-সুরা ফাতহ্–হুদাইবিয়াহ্র ঘটনাবলীর পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশ করেছে, ন্যায়যুদ্ধের ধর্মতত্ত্বে এটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান ও মন্তব্য। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ যখন ইসলামকে উৎপত্তিগতভাবে আক্রমণাত্মক ধর্ম বলে অভিযুক্ত করে থাকেন, তখন তাঁদের উচিত মুহাম্মদের(স:) শান্তির ধর্মতত্ত্বকেও বিবেচনায় নেয়া যা যুদ্ধ বিধ্বস্ত আরবে *প্যান ইসলামিকা* আরোপ করার মত একটা পর্যায়ে পৌঁছার পর তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল।

এর আগের অধ্যায়গুলোয় আমরা দেখেছি, যদিও জেসাসের মত মুহাম্মদ (সঃ) সবসময় নিজেকে এত বোধগম্যভাবে প্রকাশ করেননি কিন্তু তাঁর বাণী ক্রিশ্চানরা যেমন কল্পনা করতে চায় ততটা আলাদা নয়। পার্থক্য হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ) একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত অধিকতর বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োগ ঘটাতে চাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জেসাসের রাজনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানি না। সম্প্রতি মত প্রকাশ করা হয়েছে যে বিদ্রোহের প্রয়াস চালানোর অপরাধে রোমানরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে করে হত্যা করেছিল : বাইবেলের কোনও কোনও পণ্ডিত টেম্পল-এ অর্থলগ্নিকারীদের টেবিল উল্টে দেয়ার ঘটনাকে অভ্যুত্থানের রূপ হিসাবে দেখেছেন, যার মাধ্যমে জেসাস এবং তাঁর সঙ্গীরা তিন দিনের জন্যে টেম্পলের দখল নিয়েছিলেন। সে যাই হোক, জেসাস এক শান্তির বাণী শিক্ষা দিয়েছিলেন বলেই মনে হয়, অপর গাল পেতে দেয়া, এমনকি নিজের পক্ষে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পর্যন্ত অস্বীকার গেছেন, যারা তরবারি ব্যবহার করে তাদের নিন্দা জানাননি। তাঁর স্পষ্ট পরাজয় ও অপমান শিষ্যদের হতবিহ্বল করে দিয়েছিল এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে বেশির ভাগ তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। হুদাইবিয়াহ্য় অপ্রত্যাশিত এক পরিস্থিতিতে অনুমান নির্ভর সাড়া দিয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ), কুরাইশদের অপর গাল পেতে দিয়ে এমন এক বাহ্য অপমান গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের হারানোর উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু বিজয়ের সুরায় আপাতঃ এই পরাজয়ের গভীর তাৎপর্য মুসলিমদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জেসাসের মৃত্যুর পরপর সেইন্ট পলের মত লেখকগণ ক্রুশের ঘটনার গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।

সুরাটা শুরু হয়েছে হুদাইবিয়াহ্য় মুহাম্মদ (সঃ) পরাস্ত হননি এমন উজ্জ্বল আশ্বাসের মাধ্যমে, যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে সেরকমই মনে হয় :

আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার জন্যে বিজয় অবধারিত করেছেন।
এজন্যে যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মাফ করবেন,
তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন এবং তোমাকে
সরল পথে পরিচালিত করবেন, আর তিনি তোমাকে জোর সাহায্য করবেন।[১৭]

বদর যুদ্ধে লড়াইয়ের মাঝেই ঈশ্বর নিজের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যা ছিল নিদর্শন ও মুক্তি, আবার হুদাইবিয়াহ্র আপাতঃ অপমানের মাঝেও তিনি উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি তাঁর '*সাকিনা*'– প্রশান্তি ও স্থিরতার চেতনা পাঠিয়েছেন :

তিনি তো তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্যে
বিশ্বাসীদের অন্তরে সাকিনা (প্রশান্তি) দেন।[১৮]

আগেও একবার ঈশ্বর তাঁর '*সাকিনা*' পাঠিয়েছিলেন, যখন আবু বকর এবং মুহাম্মদ (স:) মক্কার অনতি দূরে একটা গুহায় তিনদিন আত্মগোপন করে ছিলেন, তাঁরা আপন গোত্রের ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের শিকার হয়েছিলেন, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন অত্যাসন্ন অর্থহীন মৃত্যুর। *সাকিনা* শব্দটি, মনে করা হয়, হিব্রু '*শেকিনাহ*'র সঙ্গে সম্পর্কিত–পৃথিবীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোঝানোর জন্যে যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং বদর আর হুদাইবিয়াহ্, উভয়ই মুক্তির নিদর্শন যা চলমান ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে ঈশ্বরের রহস্যময়ভাবে উপস্থিত ছিলেন বলে প্রকাশ করে। যুদ্ধের মত শান্তির ক্ষেত্রেও সমান তৎপর ছিলেন তিনি এবং আপাতঃ পরাজয়কে স্পষ্ট বিজয়ে পরিণত করতে পেরেছেন।

সুরায় একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তীর্থযাত্রীরা যখন নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কার উদ্দেশে বিপদসঙ্কুল যাত্রা শুরু করে তখনই তারা এমন এক বিশ্বাসের পরিচয় রেখেছে মুহাম্মদের (স:) সঙ্গী হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীরা যার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।[৯] অ্যাকাশে গাছের নিচে মুহাম্মদের (স:) কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়ার সময়ও বিশ্বাসের পরিচয় রেখেছে তারা। কুরাইশরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারত, অথচ তারা মুহাম্মদকে (স:) অনুসরণ করেছে, যদিও তিনি তাদের অপমানের অন্ধকার ছায়ায় নিয়ে গেছেন, পরবর্তী চুক্তিও একটা '*নিদর্শন*' ছিল, শাব্দিক অর্থের গভীরে গিয়ে মুসলিমদের যাকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।[১০] বদরে বিজয় ছিল '*ফুরকান*' যা ন্যায়কে অন্যায় থেকে পৃথক করেছে; আর হুদাইবিয়াহ্‌র বিজয় (*ফাত্‌হ্*) শান্তির চেতনা দ্বারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের পার্থক্য নির্দেশ করেছে :

> যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে *জাহিলিয়া* (প্রাক ইসলামি)
> যুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করেছিল তখন আল্লাহ
> তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদেরকে প্রশান্তি দান করলেন
> এবং তাদেরকে সংহত করলেন আত্মসংযমের নীতিতে।[১১]...

মুহাম্মদ (স:) এমন এক নির্দেশের অনুসরণ করছিলেন রাজনৈতিক বিচারে যা সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ছিল। অবচেতনে তিনি আরবের পরিবর্তনের গতি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন, পরবর্তী ঘটনাবলী তাঁর উপলব্ধিকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। *উম্মাকে* ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার পর, এ পর্যায় থেকে, *জিহাদ* রূপ নিয়েছিল শান্তি স্থাপনের এমন এক প্রয়াসে যার জন্যে তাঁর সম্পূর্ণ ধৈর্য ও মেধা প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং বদর এবং হুদাইবিয়াহ্ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, কোরানের দর্শনের জন্যে দুটোই অত্যাবশ্যক। কখনও কখনও উন্নত মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যুদ্ধ চলার সময় মুসলিমদের অবশ্যই পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে কোনওরকম দুর্বলতার চিহ্ন প্রকাশ না করে লড়াই করতে হবে, বৈরিতাকে দীর্ঘস্থায়ী করে আরও রক্তপাত, আরও অর্থহীন

যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু শান্তির সময়ও আছে, যদি তাতে মর্যাদার হানিও ঘটে, কারণ দীর্ঘ মেয়াদে তাই অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। ইসলাম আপোসহীনতার শিক্ষা দেয় আর অন্ধ মৌলবাদে উৎসাহ দেয়, একথা ঠিক নয়। বরং কোরান যুদ্ধ ও শান্তি পরিপূরক এই ধর্মতত্ত্বের সৃষ্টি করেছে, যা গ্রহণ করতে অধিকাংশ ক্রিশ্চানের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু কোরানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী হুদাইবিয়াহতেও বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। মুহাম্মদের (স:) ধর্মীয় দর্শন সর্বোচ্চ পর্যায়ে যদি না থাকত, তাঁর পক্ষে অনুসারীদের সঙ্গে রাখা সম্ভব হত না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জন যদি দ্রুত রাজনৈতিক বিজয় আশা করত, তাহলে এই বিশ্বাস প্রকাশ করতে তৈরি থাকত না তারা। বিজয়ের সুরা প্রাথমিকভাবে এমন এক ধর্মীয় চেতনা দ্বারা বৈশিষ্টায়িত গোষ্ঠীর স্মরণ করিয়ে দেয় যা এর আগের জুডাইজম ও খৃস্টধর্মীয় প্রত্যাদেশের সঙ্গে স্পষ্টতই মিলে যায় :

> মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। তার সহচরগণ
> অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর আর নিজেরা পরস্পরের
> প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগত্য ও সন্তুষ্টি
> কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় নত দেখবে।
> তাদের মুখের ওপর সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাদের
> সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা রয়েছে তাওরাতে আর ইঞ্জিলেও।
> তাদের উপমা একটি চারাগাছ যা থেকে কিশলয় গজায়,
> তারপর তা দৃঢ় ও পুষ্ট হয়, পরে কাণ্ডের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়–
> চাষিকে আনন্দ দেয়। এভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের উন্নীত
> করে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস
> করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও
> মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।[২২]

এরকম ধার্মিকতার মাঝে আক্রমণাত্মক সুর রয়েছে বলে আপত্তি উঠতে পারে, অবিশ্বাসীদের 'অন্তর্জ্বালা' সৃষ্টি যেন এর উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদের তিনটি ধর্মই এই আপোসহীনতা আর ধর্মীয় বিষয়ে ছাড় না দেয়ার ক্ষেত্রে একই রকম। এমনকি শান্তিবাদী জেসাসও বলেছিলেন যে তিনি শান্তি নয় তরবারি আনার জন্যে এসেছেন[২৩], আর গসপেলসমূহের জনপ্রিয় ধার্মিকতায় সাধারণত যেমন দেখা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি ভয়ঙ্কর চিত্র আমরা দেখতে পাই।

উম্মার বিকাশের জন্যে এবং পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশগুলোর কাছাকাছি অবস্থান নেয়ার স্বার্থে এর বেড়ে ওঠা ও নতুনদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজন ছিল। এখানে মুহাম্মদ (স:)-এর নতুন সমন্বয়ের নীতিকে অবিলম্বে ফলপ্রসু হিসাবে দেখা গিয়েছে, কারণ যুদ্ধ বিরতি অধিকতর শিথিল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যা মুসলিম ও পৌত্তলিকদের

মাঝে আলোচনাকে উৎসাহিত করেছে এবং অবাধ মত বিনিময় সম্ভবপর করে তুলেছে। হুদাইবিয়াহ্‌র 'স্পষ্ট বিজয়' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবন ইসহাক বলেছেন :

> ইসলামের অতীতের কোনও বিজয় এত মহীয়ান ছিল না। আগে মানুষ মুখোমুখি হলেই যুদ্ধ বেধে যেত; কিন্তু যখন যুদ্ধাবসান ঘটল, যুদ্ধ অপসারিত হল, মানুষেরা তখন নিরাপদে মিলিত হল তখন ইসলামে প্রবেশ না করে কেউ ইসলাম সম্পর্কে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলতে পারত না। এই দুই বছরে (৬২৮-৩০) দ্বিগুন বা দ্বিগুনের চেয়েও বেশি মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছিল।[২৪]

হুদাইবিয়াহ্‌য় মুহাম্মদ (স:) প্রমাণ করেছেন যে আরব জাতির পবিত্র ঐতিহ্যে ইসলামের শেকড় প্রোথিত এবং আরবে তাঁর চোখ ধাঁধান উত্থান প্রমাণ করেছে যে তাঁর ধর্ম সফল। আরবরা ধর্মান্ধ ছিল না, কিন্তু মরুপ্রান্তরের কঠিন সময় তাদের গভীরভাবে বাস্তববাদী করে তুলেছিল। যখন তারা *উম্মার* বাস্তব সাফল্য বিবেচনা করেছে, তারা ভাবতে শুরু করেছিল যে সম্ভবত: জনগণ দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবর্তনই খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু হুদাইবিয়াহ্‌র চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মদিনায় *হিজরাকারী* যেকোনও নবদীক্ষিত মুসলিমকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য ছিলেন মুহাম্মদ (স:)। এবার তিনি নিজেকে এই শর্ত থেকে মুক্ত করার প্রয়াস পেলেন। উদাহরণ স্বরূপ, চুক্তিতে একথা উল্লেখ ছিল না যে নারী নব-মুসলিমদেরও ফেরত পাঠাতে হবে, ফলে উসমানের বৈমাত্রেয় বোন হুদাইবিয়াহ্‌র অল্প পরেই মদিনায় গেলে মুহাম্মদ (স:) তাঁকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। এ পরীক্ষার পর, মহিলাদের *হিজরার* অনুমতি দেয়া হয়, তবে তারা অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া এলে মুহাম্মদ (স:) তাদের যৌতুকের টাকা কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতেন। প্রায় একই সময় এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পুরুষ নবমুসলিম মদিনায় উপস্থিত হন। আবু বাসির ইবন আসিদ ছিলেন যুহ্‌রা গোত্রের একজন কনফেডারেট, অভিভাবক ও আশ্রয়দাতাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। একজন দূত পাঠিয়েছিল কুরাইশরা, একজন স্বাধীন দাসকে সঙ্গে নিয়ে আবু বাসিরকে ফিরিয়ে নিতে আসে সে, মুহাম্মদ (স:) তখন দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দেন যে তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠানো ছাড়া তাঁর উপায় নেই। কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না আবু বাসির। মদিনার আট মাইল দক্ষিণে ধু আল-হুলাঈফায় বিশ্রাম নেয়ার সময় দূতের তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেন তিনি। মুক্ত দাস আতঙ্কে মদিনায় ছুটে গিয়ে মুহাম্মদের (স:) পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভয়ঙ্কর সংবাদ জানাচ্ছিল যখন, ঠিক তখনই মসজিদে উপস্থিত হন আবু বাসির। আবু বাসির মুহাম্মদকে (স:) বলেন তাঁর আর কোনও দায়িত্ব নেই, কারণ পয়গম্বর যখন তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দিয়েছেন তখনই চুক্তির প্রতি সম্মান দেখান হয়ে গেছে। তিনি *হিজরা* সম্পাদন করতে না পারায়

কৌশলগত অর্থে মুসলিম নন, সুতরাং দূতের মৃত্যুর জন্যেও মুহাম্মদ (সঃ) দায়ী নন। কিন্তু তারপরও তাঁকে *উম্মার* সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁকে মুক্ত দাসের হাতে তুলে দেন, কিন্তু আবু বাসিরের সঙ্গে ২০০ মাইল পথ পাড়ি দেয়ার কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে মুক্ত দাস, অপারগতা স্বীকার করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় সে। এরপর আবু বাসিরকে মুহাম্মদ (সঃ) বললেন যে, তিনি মদিনায় অবস্থান করতে না পারলেও যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন, কেউ বাধা দেবে না। তিনি বিদায় নেয়ার পর দ্ব্যর্থবোধক সুরে মুহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন : 'কী তেজ! সঙ্গে আরও লোক থাকলে আগুন জ্বালাতে পারত সে!'[২৫]

শেষ কথায় লুকিয়ে থাকা ইঙ্গিত ধরতে পেরেছিলেন আবু বাসির, যুদ্ধবিরতির পর থেকে কুরাইশরা আবার লোহিত সাগরের উপকূলের কাছাকাছি বাণিজ্যপথ ব্যবহার করছিল, তিনি সোজা সেখানকার আল-ইসাস্থ শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এ ঘটনার খবর মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, মুহাম্মদের (সঃ) মন্তব্য এবং আবু জান্দাল ইবন সুহায়েলের মত যারা অধীর আগ্রহে *হিজরার* অপেক্ষায় ছিল তারা প্রবলভাবে একে গ্রহণ করে। হুদাইবিয়াহ্‌র পর থেকে অভিভাবকদের নজরদারি শিথিল হয়ে গিয়েছিল, ফলে প্রায় সত্তর জন তরুণ খুব সহজেই মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় মুহাম্মদের (সঃ) কাছে যাবার বদলে আল-ইসায় আবু বাসিরের কাছে চলে যেতে সক্ষম হয়। হুদাইবিয়াহ্‌র চুক্তিতে এতে বাধা দেয়ার মত কোনও শর্ত ছিল না। এ তরুণদের কেউই *উম্মার* সদস্যও ছিল না। ডাকাতে পরিণত হয়েছিল তারা এবং বাণিজ্য পথ দিয়ে যাওয়া মক্কার প্রত্যেকটা ক্যারাভানের ওপর হামলা চালাতে শুরু করেছিল। ওদের কর্মকাণ্ডের জন্যে মুহাম্মদ (সঃ) দায়বদ্ধ ছিলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনা যায়নি, কিন্তু কুরাইশরা আবিষ্কার করেছিল যে পুরনো অর্থনৈতিক অবরোধ আবার অংশতঃ বহাল হয়েছে। পরাজয়ের পর কুরাইশদের মর্যাদা এতই পড়ে গিয়েছিল যে, তরুণ ছিনতাইকারী দলকে শেষ করার উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় সেনা প্রেরণ করলেও তাদের দ্বারা আর বেদুঈনদের সমর্থন লাভ সম্ভব হত না। শেষ পর্যন্ত ওদের *উম্মায়* অন্তর্ভুক্ত করে হুমকি অপসারণ করার জন্যে মুহাম্মদকে (সঃ) অনুরোধ জানাতে বাধ্য হয়েছিল তারা। মুহাম্মদ (সঃ) সানন্দে তাদের ডেকে পাঠান, কিন্তু আবু বাসিরের জন্যে দেরি হয়ে গিয়েছিল, পরলোকগমন করেছিলেন তিনি আগেই।

কৌশলগত কারণে চুক্তির একটা শর্ত পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)। আরবে এটা ছিল স্বীকৃত কৌশল। আমরা দেখব, এক বছর পরে কুরাইশরাও মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে যুদ্ধে মোটামুটি একই রকম কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করছে। একজন দক্ষ রাজনীতিক মুহাম্মদ (সঃ) জানতেন গোত্রীয় ব্যবস্থার নিয়মকানুন কিভাবে নিজের সুবিধামত কাজে লাগানো যায়; একজন পাশ্চাত্যবাসীর কাছে বোধগম্য কারণেই গোত্রীয় নীতিকে নিষ্ঠুর ও খেয়ালী বলে মনে হতে পারে

এবং মুহাম্মদ (স:) এমন কিছু ব্যবহার করতে রাজি থাকতে পারেন দেখে বিতৃষ্ণ বোধ করতে পারে। বহুদিন আগেই আমরা গোত্রীয় বা সাম্প্রদায়িক নীতিমালা অতিক্রম করে এসেছি, যদিও আরও আদিম সময়ে মোটামুটি শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্যে এটাই ছিল একমাত্র পথ। শতশত বছর ধরে আরবে চমৎকার কাজ দিয়েছে এটা, কিন্তু এখন সে সময় পেরিয়ে গেছে। তবু মুহাম্মদ (স:) তাঁর সকল সমসাময়িকদের মত গভীরভাবে গোত্রীয় ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলেন এবং এর মৌলনীতিমালাকে গ্রহণ করেছিলেন। এটাই ছিল তার ধারণায় একমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তার পদ্ধতি; এবং এই সময়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর ছিল না। আবু বাসিরের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (স:) *উম্মাকে* জোরদার করার জন্যে গোত্রীয় আইনের চমৎকার একটা দিককে কাজে লাগিয়েছিলেন; ভেঙে পড়া ব্যবস্থাকে সংস্কার এবং এর কিছু মারাত্মক ক্ষতিকর দিকের সংশোধনের সন্ধানে ছিল *উম্মা*।

সুতরাং কোরানের সামাজিক আইন কানুনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (স:) গোত্র প্রথার সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাননি। কোরান প্রতিশোধ গ্রহণকে সৎগুণ হিসাবে দেখেছে, আবার সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবেও। মুসলিমদের সঠিক প্রতিশোধ নিতে হবে, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।[২৬] যারা সারমন অন দ্য মাউন্টেনের ভিত্তিতে বেড়ে উঠেছে তাদের পক্ষে এটা মেনে নেয়া কষ্টকর, একটি পবিত্র গ্রন্থ কেন চোরের হাত কেটে ফেলার সুপারিশ করবে, আমাদের কাছে তা অশ্লীল মনে হয়; আমরা বুঝতে পারি না মুহাম্মদ (স:) কেন প্রতিশোধ গ্রহণকে বেআইনী ঘোষণা করে ক্ষমার বাণী প্রচার করেননি। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে হুদাইবিয়াহ্‌র পর মুহাম্মদ (স:) যেমন রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হয়েছিলেন জেসাস তেমন কিছু ছিলেন না। জেসাসকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়নি, একাজটা এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যাকে তিনি নিন্দা করেছিলেন, আর রোমের কর্মকর্তারা সম্পাদন করত। তিনি সামাজিক আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পেলে খুবই সম্ভব যে প্রায় একই রকম নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন, কেননা অধিকাংশ প্রাক-আধুনিক সমাজে নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে আইন প্রতিষ্ঠা করতে হত আজ যা আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। এমনকি মোটামুটি সাম্প্রতিক কালেও ব্রিটেনে আমরা কেবল চোরের অঙ্গহানিই ঘটাইনি : হয় তুচ্ছ অপরাধে তাকে হত্যা করেছি কিংবা উপনিবেশগুলোয় দাস হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছি। এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক যে কোনও কোনও ইসলামি দেশ, কোনও কারণ ছাড়াই, এসব প্রাচীন শাস্তি বহাল রেখে দিয়েছে, কিন্তু সেজন্যে কোরান ও ইসলাম ধর্মকে নিষ্ঠুর বলে তকমা এঁটে দেয়া ঠিক হবে না। এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে ভবিষ্যতের ইসলামি শাসকগণ কুরানিক আইন-কানুনকে স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে চলতে দিতে পারেননি, কেননা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে কার্যকর হওয়ার জন্যে বড় বেশি কোমল ছিল তা, মোটামুটি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে তাঁদের নতুন আইনের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে।[২৭]

উম্মাকে অনেকটা অতি-গোত্র হিসাবে দেখেছেন মুহাম্মদ (স:), শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুরনো পদ্ধতিই অব্যাহত রেখেছিলেন তিনি। মদিনা বা আরবে কোনও পুলিসবাহিনী ছিল না; স্মরণাতীত কাল থেকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব ছিল নিকটাত্মীয়ের ওপর, আর সহিংসতা যথাসম্ভব নিষিদ্ধ করার জন্যে বাধা সৃষ্টি করার দায়িত্ব ছিল আত্মীয়-স্বজনের ওপর। কোরান এই ব্যবস্থা বহাল রেখেছে এবং আত্মীয়দের বলেছে যে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া তাদের কর্তব্য।[২৮]

এই প্রতিশোধ একেবারে সীমিত হতে হবে : একটা চোখের বদলে মাত্র একটা চোখেরই প্রয়োজন, দাঁতের বদলে দাঁত; তা না হলে নতুন 'নির্যাতিত' যাকে অতিরিক্ত সাজা দেয়া হয়েছে, তাকে 'সাহায্য' করা হবে, অর্থাৎ তার নিকটাত্মীয়রা '*নস্‌র*' দেবে এবং বৈরিতার নতুন পালা এবং দুর্দম সহিংসতার চক্র শুরু হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে কোরান দেখাচ্ছে যে প্রাপ্যের চেয়ে কম পেয়ে সন্তুষ্ট থাকা একটা গুণ। তোরাহর হিব্রু পয়গম্বরদের ওপর প্রেরিত ঈশ্বরের আইনের উল্লেখ রয়েছে কোরানে– যেসব আইন পরবর্তীতে সেজ এবং রাব্বিরা সমর্থন করেছেন– এবং এক পদক্ষেপ আগে বেড়ে উল্লেখ করেছে :

> আর তাদের জন্য তার মধ্যে (তাওরাত) বিধান দিয়েছিল যে
> প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক,
> কানের বদলে কান, দাঁতের বদল দাঁত ও জখমের বদল
> অনুরূপ জখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে
> তারই পাপ মোচন হবে।[২৯]...

জেসাসকে যখন তোরাহর এই বাণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তিনি তাঁর অনুসারীদের শত্রুকে ভালবাসতে বলেছিলেন : বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন তিনি এবং এই বৈপরীত্যের ভেতর এক গভীর অথচ জটিল ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে যা ব্যাখ্যা করা সবসময় সহজ নয়। মুহাম্মদ (স:) জেসাসের মত এত দূরে যাননি। তিনি যখন মুসলিমদের পরস্পরকে ক্ষমা করে প্রতিশোধের কথা ভুলে যেতে বলেছেন, তখন সম্ভবত: আরেকটা প্রাণ সংহার না করে ব্লাড-ওয়াইটে সন্তুষ্ট থাকারই তাগিদ দিয়েছিলেন। তবে ক্ষমার এই আদর্শ সীমিত পরিসরে হলেও আরবে ছিল নতুন আবিষ্কার এবং পুরনো ব্যবস্থা থেকে নৈতিক উত্তোরণ।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে, খৃস্টধর্ম প্রেমের ধর্ম এবং ইসলাম সামাজিক বিচারের ধর্ম। প্রতিবেশীকে ভালবাসা ক্রিশ্চানদের দৃষ্টিতে ধর্মের আসল পরীক্ষা; ধর্মীয় চেতনার কোরানিক সংজ্ঞা এতটা উচ্চাভিলাষী নয়, তবে যৌক্তিকভাবে বাস্তবিক :

> পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পূণ্য নেই;
> কিন্তু পূণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, সব কিতাব ও
> নবীদের ওপর বিশ্বাস করলে আল্লাহর ভালবাসায় আত্মীয়

স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্যে অর্থদান করলে, আর নামাজ কায়েম করলে ও যাকাত দিলে...[৩১]

উম্মায় সমতার নীতির ভিত্তিতে সমাজ গঠন করতে হবে : প্রত্যেককে একই দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এখানে অভিজাত বা পুরহিত ও সাধুদের প্রাধান্য থাকবে না। *যাকাত* প্রদান বা দান ধনী ও গরীবের ব্যবধান ঘোচাবে, আর দাস মুক্তি দেয়া হবে এক মহৎ কাজ।[৩১] নীতিগতভাবে *উম্মার* প্রত্যেক সদস্য একই রকম আচরণ পাবে, কোরান এবং পরবর্তীকালে ইসলামি পবিত্র আইন : (শরী'আ) মুসলিমদের গভীর সাম্যবাদী চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।[৩২] মুহাম্মদের (স:) ইন্তেকালের অল্পকাল পরেই জাবালাহ ইবন আল-আয়হাম নামের এক বেদুঈন গোত্রপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একদিন *উম্মার* জনৈক নিচুশ্রেণীর সদস্য তাঁর গালে আঘাত করে। ইসলামি আইন অনুযায়ী জাবালাহ'র অপর গাল পেতে দেয়ার প্রয়োজন ছিল না; তাঁর পূর্ণ আশা ছিল যে উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁর ওপর হামলাকারীর ওপর চরম কঠিন শাস্তি আরোপ করা হবে। কিন্তু তাঁকে কেবল বলে দেয়া হয়েছিল যে অপমানের সঠিক এবং সুষ্ঠু প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আঘাতকারীর গালে একবার মাত্র আঘাত দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। জাবালাহ্ এতটাই খেপে উঠেছিলেন যে ইসলাম ত্যাগ করে আবার খৃস্টধর্মে ফিরে যান তিনি।

সবাইকে একই সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে নামিয়ে আনার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বসুলভ আন্তরিকতা গড়ে তোলার বাস্তবভিত্তিক উপায় হিসাবে ইসলামের সম্যতার নীতিকে দেখা খুবই সম্ভব। *হিজরার* ঠিক পরপর, বর্ণিত আছে, যে মুহাম্মদ (স:) এই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার চর্চা শুরু করেছিলেন, যার ফলে প্রত্যেক অভিবাসীকে একজন সাহায্যকারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে তাকে ভাই হিসাবে দেখার জন্যে বলে দেয়া হয়েছিল। এটা ছিল তিনটি গোত্রীয় গোষ্ঠীকে একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজে একত্রিত করার প্রয়াস, রক্তের সম্পর্ক ছাপিয়ে যাওয়া নতুন ধর্মীয় সম্পর্কের বাস্তব প্রয়োগ। একেশ্বরবাদী তিনটি ধর্মেই গোষ্ঠীর আদর্শ সুউচ্চ পবিত্র মূল্যের অধিকারী। জুডাইজম ও খৃস্টধর্ম উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা মৌল বিষয়, যেখানে বলা হয় যে দুজন বা তিনজন একত্রিত হলেই সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি ঘটে। সেইন্ট পল লিখেছেন যে জেসাসের দেহ দ্বারা ক্রিশ্চান ধর্মগোষ্ঠীর শরীর গঠিত এবং আমরা দেখব *উম্মাও* মুসলিম ধর্ম নিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রায় পবিত্র গুরুত্ব অর্জন করেছিল। মুহাম্মদ (স:) আরবে আসন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছিলেন : এভাবে কোরান নির্দেশ জারি করেছে যে নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা কেবল ঘাতককেই শাস্তি দিতে পারবে, আক্রমণকারী গোত্রের যেকোনও সদস্যকে নয়, যা পুরনো ব্যবস্থায় বৈধ ছিল।[৩৩] কিন্তু গোষ্ঠী আদর্শও গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে এবং ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা মুসলিমদের মাঝে অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে।

আরবদের প্রাচীন গোত্রীয় মানবতাবাদ *মুরুবাহ্‌র* ওপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, যার অন্তর্গত ছিল সকলের কল্যাণ, সহযোগিতা এবং দরিদ্র ও দুর্বলদের জন্যে সেবাদান। মুহাম্মদের (সঃ) প্রধান আবিষ্কার ছিল এইসব নীতিমালা সকল মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া– বিশেষ গোত্র নয় বরং গোটা *উম্মাকে* অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তিনি। সঙ্গীদের মাঝে সবাই মুসলিম–তারা আউস, খাসরাজ বা কুরাইশ যে গোত্রেরই হয়ে থাকুক–এখন তারা পরস্পর ভাই, এ ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করার মাধ্যমে ভবিষ্যতের একেবারে আলাদা ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। মুসলিমদের পক্ষে পশ্চিমের জাতি রাষ্ট্রের ধারণা গ্রহণ করা এই কারণে কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ এতে *উম্মা* আবার সম্ভাব্য বৈরী 'গোত্র' বা আলাদা গ্রুপে পরিণত হয়।[৩৪]

প্রকৃতপক্ষে আপন আচরণের ভেতর দিয়ে মুহাম্মদ (সঃ) ভ্রাতৃত্ববোধের একটা আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। শত্রুদের কাছে ক্রমবর্ধমান হারে ভীতিকর হয়ে ওঠা মানুষটিকে *উম্মা* গভীরভাবে ভালবাসত, লাগাতার বিপদের মুখোমুখি থাকা সত্ত্বেও যেটা অত্যন্ত সুখী একটা গোষ্ঠী ছিল বলেই বিশ্বাস জন্মে। মুহাম্মদ (সঃ) নিজের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিমদের আনুষ্ঠানিকতার দূরত্ব সৃষ্টি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি আড়ম্বরপূর্ণ সম্ভাষণ ঘৃণা করতেন, প্রায়ই মসজিদের মেঝেতে নির্বিকারভাবে বসে পড়তেন এবং তাঁর অগ্রাধিকার থাকত সমাজের দরিদ্রতম সদস্যদের প্রতি। শিশুরা বিশেষ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। সারাক্ষণ তিনি তাদের কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করতেন, চুমু খেতেন। যখন কোনও অভিযানে বাইরে যেতেন ফেরার সময় *উম্মার* শিশুদের জন্যে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হওয়া রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারা পয়গম্বরকে বিজয় মিছিল করে মরুদ্যানে নিয়ে আসত। শুক্রবারের প্রার্থনার সময় মসজিদের অভ্যন্তরে কোনও শিশুর কান্নার আওয়াজ পেলে প্রায় সবসময়ই প্রার্থনার সময় সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। শিশুর মায়ের কষ্টের কথা ভাবতেও পারতেন না তিনি।

কোরান প্রবর্তিত আইন আজ আমাদের কাছে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, কিন্তু পয়গম্বর স্বয়ং খুবই কোমল বলে খ্যাত ছিলেন। এক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে যে, এক দরিদ্র লোকের বিরুদ্ধে তুচ্ছ অপরাধের দায়ে সাজা ঘোষণা করেছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) : শাস্তি ছিল তাকে দান-খয়রাত করতে হবে। লোকটি জবাব দিয়েছিল, তার কাছে বিলিয়ে দেয়ার মত খাবার বা পণ্য কিছুই নেই। ঠিক সেই সময় পয়গম্বরকে উপহার হিসাবে পাঠানো বিরাট এক ঝুড়ি ভর্তি খেজুর মসজিদে নিয়ে আসা হয়। 'এই ধরো,' বলেছেন মুহাম্মদ (সঃ), তারপর লোকটিকে খেজুরগুলো দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অপরাধী জবাব দিয়েছিল এই বলে, গোটা বসতিতে তার চেয়ে দরিদ্র আর কেউ আছে বলে তার জানা নেই। একথায় হেসে উঠেছেন মুহাম্মদ (সঃ), তারপর বলেছেন খেজুর খাওয়াটাই হবে তার শাস্তি।

গোড়া থেকেই দয়া ও করুণা বোধের বিকাশ ইসলামি বাণীর মৌল বিষয় ছিল। এই পর্যায়ে আইনকে ভোঁতা যন্ত্র বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির

পরিমার্জনার প্রক্রিয়া (*তাযাক্কা*) শুরু হয়ে গিয়েছিল। আবার উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন মুহাম্মদ (স:)। বর্ণিত আছে, একদিন তিনি দেখলেন এক মুক্ত দাস হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে। তিনি চুপিচুপি বাচ্চাদের মত ঐ লোকের পেছনে গিয়ে চোখে হাতচাপা দিলেন। মুক্ত দাস বলেছিল একমাত্র পয়গম্বরই এমন ভালবাসার পরিচয় দিয়ে তার ভার লাঘব করার কথা ভাবতে পারেন।

শত শত বছর ধরে পশ্চিমে আমরা মুহাম্মদকে (স:) গম্ভীর, নিষ্ঠুর যোদ্ধা এবং নির্মম রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে দেখতে চাই। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান ও সংবেদনশীল। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তিনি জীব জানোয়ারকে ভালবাসতেন, যদি দেখতেন একটা বিড়াল তাঁর চাদরের ওপর ঘুমাচ্ছে, ওটাকে বিরক্ত করার কথা কল্পনাতেও আসত না তাঁর। বলা হয়ে থাকে যে, জীব-জানোয়ারের প্রতি আচরণ থেকে কোনও সমাজের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সকল ধর্মই জীবজগতের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়, এবং মুহাম্মদ (স:) মুসলিমদের এটা শেখাতে চেয়েছিলেন। *জাহিলিয়াহ্‌র* সময় আরবরা পশুর সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করত : পশু জীবিত অবস্থাতেই তারা খাওয়ার জন্যে উরুর মাংস কেটে নিত, উটের গলায় যন্ত্রণাদায়ক রিঙ পরিয়ে দিত। মুহাম্মদ (স:) যন্ত্রণাদায়ক মার্কা বসানো বা জানোয়ারের মারপিটের আসর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এক বিবরণে উল্লেখ আছে, তিনি একটা গল্প বলেছিলেন যেখানে তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর জন্যে এক ব্যক্তির স্বর্গপ্রাপ্তি ও একটা বিড়ালকে না খাইয়ে মারার অপরাধে এক মহিলার নরকবাস ঘটেছে। এসব ঘটনার সংরক্ষণ থেকে বোঝা যায় মুসলিম বিশ্বে মূল্যবোধ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং সমাজ কত দ্রুত অধিকতর মানবিক ও করুণাময় দর্শনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

এবার ইহুদীদেরও অধিকতর মানবিক আরবে একীভূত করার প্রয়োজন। হুদাইবিয়াহ্‌র অল্প কিছুদিন পর মুহাম্মদ (স:) আবিসিনিয়ার মুসলিমদের মদিনায় তাঁকে সংগ্রামে সাহায্য করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে বার্তা পাঠান। এরপর আবার উত্তরে মনোযোগ দিয়েছেন তিনি। মদিনা অবরোধের সময় বিপজ্জনক ভূমিকা পালনকারী খায়বরের ইহুদী বসতি বনি কুরাইযাহ্‌র পরিণতি দেখে সংযত হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরেও উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর মাঝে শত্রুতা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিল। খায়বর যেন আর কখনও *উম্মার* নিরাপত্তার ব্যাপারে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে চাইলেন মুহাম্মদ (স:), তাই হুদাইবিয়াহ্‌ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরপরই প্রায় ৬০০ লোকের বাহিনী নিয়ে খায়বরের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান তিনি। সম্ভাব্য লুণ্ঠিত মালের পরিমান বেশি হবে ভেবে এবার বেদুঈন মিত্ররা সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) তাদের যাবার অনুমতি দেননি : হুদাইবিয়াহ্‌র কারণে বঞ্চিত ও হতাশ মুসলিমদের পুরস্কৃত এবং দমিত উত্তেজনার প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু

খায়বর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী বসতি, এবং অজেয় মনে করা হত একে। মদিনার মত এটাও আগ্নেয়পাথরের বিস্তার দিয়ে ঘেরা ছিল; আর এখানকার খেজুর খামারগুলো সাতটি বিশাল দুর্গের পাহারায় থাকত। মুহাম্মদ (স:) যে এমন একটা অপরিণামদর্শী অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারেন, কুরাইশরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না : এত ছোট মাপের একটা বাহিনী নিয়ে এ যেন বিপদকে ডেকে আনা বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু অনৈক্যের পুনরাবৃত্তিই যেন ছিল আবার মুহাম্মদের (স:) প্রধান মিত্র, যা আরবের গোত্রীয় ব্যবস্থার বিলোপের একটা উপসর্গে পরিণত হয়েছিল। *উম্মার* বিপরীতে খায়বর গভীরভাবে বিভক্ত ছিল। বসতির প্রত্যেকটা গোত্র ছিল স্বায়ত্বশাসিত এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি তারা। তারা মিত্র ঘাতাফান গোত্রের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছিল, কিন্তু তারা কখনও এগিয়ে আসেনি। কেউ কেউ বলেছে এক রহস্যময় কণ্ঠস্বর নাকি তাদের নিজেদের এলাকায় ডেকে নিয়ে গেছে; তবে মুহাম্মদ (স:) হয়ত মদিনার খেজুর ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দেয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তাদের বিরত রেখে থাকতে পারেন। রাতের অন্ধকারে খায়বরে পৌঁছে মুসলিমরা, সকালে কৃষকরা কোদাল আর ঝুড়ি হাতে কাজ করার জন্যে মাঠে এসে ভয়ঙ্কর নীরব এক শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হয়। 'মুহাম্মদ আর তাঁর বাহিনী!' চিৎকার ছেড়ে যার যার বসতিতে ফিরে গিয়েছিল তারা। '*আল-ল্লাহু আকবার*' জোর গলায় উচ্চারণ করেছেন মুহাম্মদ (স:)। 'খায়বর ধ্বংস হয়ে গেছে।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খায়বর অবরোধ গোটা একমাস স্থায়ী হয়েছিল। মুসলিমরা পদ্ধতিগতভাবে প্রত্যেকটা দুর্গ আলাদা আলাদাভাবে ঘেরাও করে ক্রমাগত তীর বর্ষণ করার মাধ্যমে শত্রুদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়েছে, তারপর জিম্মি আটক ও রসদ দখল করে নিয়েছে। শেষমেষ ইহুদীরা জয়লাভের কোনওই আশা নেই বুঝতে পেরে মুহাম্মদের (স:) কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আসে। কোরানের নীতি অনুযায়ী শর্তাবলী মেনে নিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), যেগুলো খায়বরের জন্যে অসম্মানজনক ছিল না। ঠিক এধরনের চুক্তি আরবরা অপেক্ষাকৃত ভাল সৈন্য বেদুঈনদের সঙ্গে প্রায়ই করত। উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেকের বিনিময়ে মুহাম্মদ (স:) খায়বরের ইহুদীদের নিরাপত্তা দেবেন এবং বেদুঈনদের পরিবর্তে মুহাম্মদকে (স:) নিরাপত্তা দানকারী হিসাবে মেনে নিয়ে তারা মদিনার সামন্তচাষীতে পরিণত হয়েছিল। খায়বরের উত্তর-পুবের ছোট অথচ সমৃদ্ধ একটি মরুদ্যান ফাদাকের ইহুদীরা যখন এই চুক্তির সংবাদ পেল, মুসলিমদের সম্ভাব্য হামলা ঠেকানোর সিদ্ধান্ত নিল তারা এবং অনুরূপ শর্তাধীনে মুহাম্মদের (স:) কাছে আত্মসমর্পণ করল। চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্যে মুহাম্মদ (স:) সতের বছর বয়স্কা সুন্দরী সাফিয়াহকে (পুরনো শত্রু হুয়াঈয়ের মেয়ে) বিয়ে করেছিলেন; যুদ্ধে বিধবা হয়েছিলেন সাফিয়াহ্। তিনি নাকি স্বপ্নে মদিনার কাছে ইহুদীদের পরাজয়ের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম

গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় মাঝপথে আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল।

মদিনায় পৌছার পর তাঁরা দেখলেন আবিসিনিয়ার মুসলিমরা এসে গেছে। চাচাত ভাই জা'ফরকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন মুহাম্মদ (স:), তের বছর আগে সাতাশ বছরের এক যুবক হিসাবে শেষবারের মত তাঁকে দেখেছিলেন। জা'ফরের কপালে চুমু খেয়ে তিনি বলেছিলেন, খায়বরের বিজয় নাকি এই পুনর্মিলন, কোনটাতে যে বেশি আনন্দিত হয়েছেন বুঝতে পারছেন না। আরেকজন নতুন স্ত্রীকেও স্বাগত জানাতে হয়েছিল তাঁকে। একই বছর, এর আগে তিনি খবর পেয়েছিলেন যে চাচাত ভাই এবং ব্রাদার-ইন-ল' উবায়দাল্লাহ ইবন জাহ্শ আবিসিনিয়ায় মারা গেছেন। স্মরণযোগ্য, উবায়দাল্লাহ ছিলেন মুহাম্মদের (স:) আবির্ভাব পূর্ববর্তী একেশ্বরবাদী এবং আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিষণ্ণ করে তিনি ইসলাম ত্যাগ করে ক্রিশ্চান হয়েছিলেন। মুহাম্মদ (স:) তাঁর স্ত্রী রামলাহকে, যিনি তাঁর '*কুনিয়া*' উম্ম হাবিবা নামে বেশি পরিচিত, বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন এবং শোকের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নেজাসের সামনে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এটা ভালবাসার বিয়ে নয় বরং কৌশলী রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল; কেননা উম্ম হাবিবা ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। মসজিদের পাশে তাঁর জন্যে একটা কামরা নির্মাণ করা হয় এবং মদিনায় আসার পর তিনি সোজা সেখানে গিয়ে ওঠেন, অথচ সাফিয়াহকে তাঁর ঘর নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী একটা বাড়িতে অবস্থান করতে হয়েছিল।

এই নতুন স্ত্রীর সংবাদ শুনে বিমূঢ় হয়ে যান আয়েশা। উম্ম হাবিবা তাঁর জন্যে হুমকি ছিলেন না বটে, কিন্তু ইহুদী এই নারী ছিলেন অসম্ভব কমনীয়া। মুহাম্মদ (স:) যখন সাফিয়াহ্ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন, আয়েশা অসংযত হয়ে পড়েছিলেন। কি নিয়ে এত হট্টগোল হচ্ছে বুঝতে না পেরে বলে বসেছিলেন সব ইহুদীই এক। 'এভাবে বলবেন না', জবাব দিয়েছেন মুহাম্মদ (স:), 'কারণ উনি ইসলামে প্রবেশ করেছেন এবং আত্মসমর্পণ পূর্ণাঙ্গ করেছেন।' প্রথম দিকে হারেমে অসুবিধা হয়েছিল সাফিয়াহর, কারণ অন্য স্ত্রীরা তাঁকে তাঁর বাবা হুয়াঈয়ের কথা বলে খেপাতেন। একদিন কাঁদতে কাঁদতে মুহাম্মদের (স:) কাছে যান তিনি, পয়গম্বর তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং অন্যদের একথা বলতে শিখিয়ে দেন যে : 'অ্যারন আমার বাবা আর মোজেস আমার চাচা।'[৩৩] তবে শেষ পর্যন্ত আয়েশার সঙ্গে তাঁর চমৎকার বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং তিন তরুণী স্ত্রী আয়েশা, হাফসা এবং সাফিয়াহ্–অন্যদের চেয়ে আলাদা এক ত্রয়ী গঠন করেন।

বছরের বাকি অংশ গৎবাধা হামলা পরিচালনায় ব্যয়িত হয় যার কিছু কিছু উত্তরাঞ্চলের ইহুদী মিত্রদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে হাতে নেয়া হয়েছিল। এরপর ৬২৯ খৃস্টাব্দের মার্চে পবিত্র ধূ-আল-হিজ্জা মাসে হুদাইবিয়াহ্র চুক্তির শর্তানুযায়ী কা'বায় ছোট তীর্থযাত্রা বা *উমরার* উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার সময় হল মুহাম্মদের

(সঃ)। এবার ২,৬০০ তীর্থযাত্রী তাঁর সঙ্গী হল: মক্কার স্যাঙ্কচ্যুয়ারির কাছাকাছি পৌঁছার পর প্রতিশ্রুতি আনুযায়ী কুরাইশরা শহর খালি করে দেয় যাতে মুসলিমগণ নির্বিঘ্নে তাদের পবিত্র স্থানগুলো দর্শন করতে পারে। গোত্র প্রধানরা একসঙ্গে আবু কুবায়েস পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অসাধারণ এক দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। কাসওয়ার পিঠে আসীন মুহাম্মদের (সঃ) নেতৃত্বে তীর্থযাত্রীদের বিশাল মিছিল শাদা পোশাকে ধীর পদক্ষেপে তাদের পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করছে, তাদের চিৎকারে গমগম করছে গোটা উপত্যকা : 'হে ঈশ্বর, তোমার সেবায় আমি উপস্থিত হয়েছি!' কা'বায় পৌঁছার পর উটের পিঠ থেকে নেমে কৃষ্ণ পাথরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং তারপর শুরু করেন প্রদক্ষিণ, গোটা তীর্থ মিছিল অনুসরণ করে তাঁকে। এই *উমরার* প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ করতে, *হজ্জের* মত এক্ষেত্রে আরাফাত পর্বত ও মিনা উত্যাকায় গমনের প্রয়োজন পড়ে না, তীর্থযাত্রীরা সাতবার সাফা ও মারওয়াহ্ পর্বতের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করল।

শহরে প্রবেশ করার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) এবং অভিবাসীদের কাছে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা ছিল : আবার এক সময়ের সামান্য কৃষ্ণ ক্রীতদাস বিলালকে কা'বাগৃহের ছাদে উঠে দিনে তিনবার প্রার্থনার আহ্বান জানাতে দেখাটাও নিঃসন্দেহে কুরাইশদের ভয়ের কারণ ছিল। মুহাম্মদের (সঃ) চাচা আব্বাস ভাতুষ্পুত্রকে দেখতে নগরীতে এসে বোন মায়মুনাহ্‌র সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে মায়মুনাহ্ বিধবা হয়েছেন। সম্ভবত শেষ পর্যন্ত আব্বাসকে নিজের ধর্মে আকর্ষণ করার জন্য রাজি হয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং কুরাইশদের বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেছিলেন। এতে করে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে এবং সুহায়েল আবু কুবায়েস পর্বত থেকে নেমে এসে মুহাম্মদকে (সঃ) স্মরণ করিয়ে দেন যে নির্ধারিত তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে, অবিলম্বে তাঁর নগর ত্যাগ করা উচিত। এসময় সাহায্যকারীদের একজন সা'দ ইবন উবাদাহ মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে ছিল, স্পষ্ট অসৌজন্য প্রকাশে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে, কিন্তু দ্রুত তাকে চুপ করিয়ে দেন মুহাম্মদ (সঃ) : 'হে সা'দ, আমাদের শিবিরে আগত অতিথিদের সঙ্গে কোনও রূঢ় কথা চলবে না।'[৩৬] কুরাইশদের বিস্মিত করে তীর্থযাত্রীদের পুরো দলটি মক্কাবাসীদের কাছে বিস্ময়কর বলে প্রতিভাত শৃঙ্খলার মধ্যে রাত নামার আগেই নগর ত্যাগ করেছিল। মক্কাবাসীদের অনৈক্য আর উচ্ছৃঙ্খলতাই তাদের পতনের পেছনে ক্রীয়াশীল ছিল।

এই *হজ্জের* সময় কুরাইশদের কোনও কোনও তরুণ সদস্য দেয়াল লিখন পড়তে পেরেছিল, যেটা ছিল মুহাম্মদের (সঃ) জন্যে এক বিশাল নৈতিক বিজয় এবং সারা আরবে উৎসাহের সঙ্গে আলোচিত হয়েছিল। ঠিক এই মুহূর্তে থেকে নগরীর পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আরও অধিক হারে বেদুঈনরা মুহাম্মদের (সঃ) কনফেডারেটে-এ পরিণত হচ্ছিল এবং মক্কার তরুণদের আরও অনেকেই *হিজরা* করছিল। নবদীক্ষিতদের মধ্যে দুজন ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমর ইবন আল-

আস এবং খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ বদরের পর নগরীর সর্বাধিক আলোচিত বীরে পরিণত হন, কিন্তু এবার তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে মক্কায় তাঁদের আর ভবিষ্যৎ নেই। খালিদ যেমন বলেছেন : 'পথ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ লোক নির্ঘাৎ পয়গম্বর আর আল্-ল্লাহ্‌র দোহাই, আমি মুসলিম হতে যাচ্ছি।'[৩৭] মুহাম্মদের (সঃ) অসাধারণ সাফল্যের একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে ঐশী সাহায্য। কথিত আছে, খালিদ এবং আমর একসঙ্গে *হিজরা* করেন এবং মদিনায় তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হয়। অতীত ইতিহাস বিপক্ষে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল খালিদের। উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধের নেতৃস্থানীয় সেনা হিসাবে অসংখ্য মুসলিমের প্রাণহানির জন্যে তিনি দায়ী ছিলেন, প্রতিশোধের মুখোমুখি হবার ভয় ছিল তাঁর। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন ইসলামের আইন পুরনো দেনা মুছে দিয়েছে এবং একেবারে নতুন সূচনার প্রতিনিধিত্ব করছে। এটা ছিল *উম্মার* এক আবশ্যকীয় উপাদান। এটা কেবল এক নতুন আধ্যাত্মিক জন্মকেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেনি, আরবে শান্তি স্থাপন করার জন্যে ইসলামের এছাড়া আর পথ ছিল না।

মুহাম্মদের (সঃ) জন্যে বিজয়ের বছর ছিল এটা, আবার শোকের বছরও। *উমরার* অল্পদিন পরেই তাঁর মেয়ে যায়নাব পরলোকগমন করেন; এরপর সিরিয় সীমান্তে এক অভিযানে পরিবারের আরও দুজন সদস্যকে হারান তিনি। জীবনের শেষ বছরগুলোয় পয়গম্বর ক্রমবর্ধমান হারে উত্তরে মনোনিবেশ করেছিলেন। এর কারণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, তবে আরবের বাইরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটছিল। পারসিয়া আর বাইযানটিয়াম বহুদশক ধরে ক্লান্তিকর সংঘাতে লিপ্ত ছিল। মুহাম্মদের (সঃ) জীবনের গোড়ার দিকে উত্থান ঘটছিল পারসিয়ার, সিরিয়ায় আগ্রাসন চালায় তারা এবং কনস্ট্যান্টিনোপলকে অতীষ্ঠ করে তোলে। এতে কুরাইশরা নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এবং নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি স্রোত আবার বাইযানটিয়ামের অনুকূলে বাঁক নিয়েছিল এবং ৬২৫ খৃস্টাব্দে, উহুদ যুদ্ধের বছর, হেরাক্লিয়াস পারসিয়ানদের হটিয়ে দিয়ে উল্টে তাদের এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) যদি উত্তরে আরবদের দিয়ে ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য প্রতিস্থাপিত করতে পারতেন, তাঁর পক্ষে হয়ত বাইযানটাইন এবং স্যাসানিড উভয়কেই চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হত। সুতরাং শেষের বছরগুলোয় তিনি বোধ হয় সীমান্তে নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করে উত্তরের ক্রিশ্চান গোত্রগুলোকে *উম্মায়* আকৃষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, ইহুদী বসতিগুলোর মত একই রকম শর্তাধীনে।

তা যাই হোক, ৩০০০ সৈন্যের দায়িত্ব দিয়ে যায়েদ এবং জা'ফরকে সিরিয় সীমান্তে পাঠান তিনি। এই অভিযান মোটামুটি রহস্যাবৃত্তই রয়ে গেছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই অজ্ঞাত রয়েছে। মনে করা হয় অগ্রসর হওয়ার সময় মুসলিমরা জানতে পারে যে প্রায় ১,০০,০০০ সৈন্যসহ আশপাশেই অবস্থান করছেন হেরাক্লিয়াস। কিন্তু তবু এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা। ডেড সীর কাছে

বর্তমানে জর্ডানের অন্তর্গত মু'তা গ্রামে বাইযানটাইনদের একদল সৈন্যের হামলার শিকার হয় এই বাহিনী। যায়েদ এবং জা'ফরসহ অন্য দশজন মুসলিম নিহত হন এবং অভিযানের সহযাত্রী খালিদ সৈন্যদল নিয়ে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

এ সংবাদ শুনে মুহাম্মদ (স:) সরাসরি যায়েদ ও জা'ফরের পরিবারে কাছে চলে যান। জা'ফরের স্ত্রী আসমা স্মৃতিচারণে বলেছেন, মুহাম্মদ (স:) যখন আসেন তিনি তখন রুটি সেঁকছিলেন এবং পয়গম্বরের মুখের অভিব্যক্তি দেখেই অমঙ্গল আশঙ্কা করেছেন। মুহাম্মদ (স:) জা'ফরের দুছেলেকে ডাকতে বলেন এবং ওদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুজনকেই গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে কেঁদে ফেলেন। প্রচলিত আরবীয় প্রথানুসারে উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করেছিলেন আসমা, অন্য মহিলারা তাঁর দিকে দ্রুত ছুটে গেছে। চলে যাবার সময় মুহাম্মদ (স:) তাদের বলেছিলেন পরবর্তী কয়েক দিন পরিবারের দেখাশোনা ও তাদের খাবার পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে। রাস্তা দিয়ে মুহাম্মদ (স:) যখন মসজিদে ফিরে যাচ্ছিলেন, যায়েদের ছোট মেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে তাঁর কোলে ঝাপিয়ে পড়ে। মুহাম্মদ (স:) ওকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

আমরা জানি না কেন ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন খালিদ, যেখানে ক্ষয় ক্ষতির মাত্রা ছিল সামান্য; কিন্তু তাঁরা মদিনার পৌঁছার পর তীব্র ভর্ৎসনার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন, যে কারণে তাঁদের শক্ত নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং। মাস খানেক পর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছিল : আমর ইবন আল-আস উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর ওপর আক্রমণ চালানোর জন্যে আরেকটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন– গোত্রগুলো সীমান্তে জড়ো হচ্ছিল, তবে আল-আস সহজেই তাদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হন।

তবে সেবছর মুহাম্মদের (স:) এক বিরাট ব্যক্তিগত আনন্দের ব্যাপার ঘটেছিল। মিশরের মুকাওকিস মুহাম্মদের (স:) জন্যে কোঁকড়া-চুল অপূর্ব সুন্দরী মিশরীয় দাসী মারিয়াম নামের এক কপ্টিক ক্রিশ্চানকে পাঠিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ (স:) তাঁকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রতিদিনই তাঁর কাছে যেতেন মুহাম্মদ (স:), বেশি বেশি সময় অতিবাহিত করতেন তাঁর সঙ্গে, সম্ভবত: হারেমের ঈর্ষাতুর পরিবেশ থেকে রেহাই পাওয়ার একটা উপায় ছিল এটা। এখানে কেউ বেমানান কিছু পায়নি। ইসরাইলীরা যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি পড়ে তোলার একই রকম পর্যায়ে তোরাহ্ উপপত্নী গ্রহণের বিধান দিয়েছিল। অব্রাহাম স্বয়ং হ্যাগারকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসরায়েল, আরবজাতির পিতা সেই সম্পর্কজাত সন্তান ছিলেন। মারিয়ামের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাই শুভলক্ষণ বলে মনে করা হয়েছে, পরবর্তী বছর ছেলে জন্মগ্রহণ করার পর মুহাম্মদ (স:) তার নাম রাখেন ইব্রাহিম।

কিন্তু তাঁর স্ত্রীরা স্বভাবতই পয়গম্বরের সন্তান ধারণকারী পরিচয়হীনার প্রতি চরমভাবে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। আয়েশা এবং হাফসা হারেমে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন। এই বিচিত্র ব্যাপারটি বোঝা কঠিন, যা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট সৃষ্টি

করে এবং যতটা মনে হয় তার চেয়ে বেশি কিছু এতে জড়িত ছিল হয়ত। প্রচলিত বিবরণে উমরকে দায়ী করা হয়ে থাকে, নারীদের ব্যাপারে জঙ্গী মনোভাব ছিল তাঁর; তিনি বিশ্বাস করতেন নারীদের প্রকাশ্যে বেরুনো এবং কথা বলা উচিত নয়; তিনি ভাবতেন অবিশ্বাসীদের স্ত্রীরা মদিনার নারীদের কাছ থেকে বাজে অভ্যাস রপ্ত করছে। অবশ্য মুহাম্মদ (স:) তাঁর নারীদের বেলায় অনেক বেশি কোমল ও শিথিল ছিলেন এবং একদিন মুহাম্মদের (স:) বসতবাড়ি থেকে বিশ্রী কোলাহল শুনে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন উমর। মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীগণ সম্প্রতি লুণ্ঠিত মালের ভাগ নিয়ে ঝগড়া করছিলেন এবং *উম্মার* বাকি সদস্যদের চেয়ে পরিবারকে বড় অংশ দেয়ার জন্যে মুহাম্মদকে (স:) চাপ দিচ্ছিলেন। উমর মুহাম্মদের (স:) কাছে যান এবং ভেতরে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা নেমে আসে। উমর ভেতরে ঢুকে দেখতে পান পয়গম্বর হাসি সামলাতে পারছেন না। উমরের কণ্ঠস্বর শোনামাত্র মহিলারা আতঙ্কে *হিজাবের* আড়ালে আশ্রয় নিতে ছুটে গিয়েছিলেন। গম্ভীরভাবে উমর মন্তব্য করেছিলেন যে, পয়গম্বরের স্ত্রীদের স্বামীর প্রতি একই রকম শ্রদ্ধা থাকলে ভাল হত; পর্দার আড়ালে আশ্রয় নেয়া মহিলাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেছিলেন : 'আপনারাই আপনাদের শত্রু। আমাকে ভয় পান অথচ ঈশ্বরের বার্তাবাহককে ভয় পান না।' 'অবশ্যই', স্ত্রীদের একজন জবাব দিয়েছিলেন, 'কারণ ঈশ্বরের বার্তাবাহকের চেয়ে আপনি অনেক রুক্ষ এবং কঠোর।'[৩৮]

উমর আগে থেকেই এই ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তাঁর মেয়ে হয়ত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে; তিনি তাঁকে তাঁর ঈর্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, ক্লান্তির সঙ্গে মুহাম্মদ (স:) আর মরিয়ামের কাছে যাবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে পরিস্থিতির উন্নতি দেখতে পাননি। আয়েশা এবং হাফসার উস্কানিতে অন্যান্য স্ত্রী মারিয়ামকে সোৎসাহে ভর্ৎসনা করছিলেন আর পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায় যে মুহাম্মদ (স:) প্রায় এক মাস নিজেকে সকল স্ত্রীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু, এসব হারেম কাহিনীগুলোর সূত্রে, বাকি *উম্মার* মাঝে বিদ্যমান একটা সমস্যা যেন অনুভূত হচ্ছিল। খায়বরের বিজয়ের পর মুসলিমরা নতুন সমৃদ্ধি ভোগ করছিল : আয়েশা বলেছেন যে খায়বরের আগে কখনও তৃপ্তির সঙ্গে খেজুর খাওয়ার কথা মনে পড়ে না তাঁর। কিন্তু নতুন সম্পদ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। উৎপাদকদের কেউ কেউ পায়ের ওপর পা তুলে আয়েশ করার চিন্তাভাবনা করছিল, অন্যরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের আরও বড় অংশ প্রাপ্তির প্রয়াস পাচ্ছিল আর মুহাম্মদের (স:) পরিবারও যেন দরিদ্রজনগোষ্ঠীর প্রাপ্য বিশেষ উপহার আশা করতে শুরু করেছিলেন। মুহাম্মদ (স:) বিশেষ করে হারেমের প্রাচুর্যের কারণে নৈতিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্ত্রীদের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদের উমরের বর্ণনার সঙ্গে এব্যাপারটা

খাপ খায়। মুহাম্মদ (স:) হারেম ত্যাগ করেছেন জানতে পেরে গোটা মুসলিম সমাজ ভীত হয়ে উঠেছিল। কারও মুখে অন্য কোনও কথা ছিল না, লোকজন মসজিদের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ছোট ছাদের ঘর, যেখানে মুহাম্মদ (স:) বসেছিলেন সেদিকে দেখছিল। উমর বলেছেন, এই দৃশ্য দেখে কেউ একজন সোজা তাঁর বাড়ির দিকে ছুটে গিয়ে এত জোরে দরজায় করাঘাত করেছিল যে তিনি ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলো নগরী আক্রমণ করেছে। ব্যাপার আরও গুরুতর, চেঁচিয়ে জানিয়েছে আগন্তুক : মুহাম্মদ (স:) তাঁর স্ত্রীদের ত্যাগ করেছেন!

সামান্য অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ছিল না এটা। মুহাম্মদের (স:) বিয়েগুলো ছিল সযত্নে পরিকল্পিত রাজনৈতিক মৈত্রী। আবু বকর ও উমরের মেয়েদের তিনি ত্যাগ করলে ওদের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। মাত্র কয়েকজন নারীর ঝগড়া বিবাদের ফলে সবকিছু অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। মদিনার অভ্যন্তরীণ বিরোধও বিক্ষোভের কারণ হয়ে থাকতে পারে যা মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীদের প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু আমরা যার কিছুই জানি না। কি করা যায় দেখার জন্যে দ্রুত মসজিদে এসে হাজির হয়েছেন উমর, কিন্তু প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান মুহাম্মদ (স:)। তবে শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়ার পর ছোট অগোছাল রুম দেখার কথা মনে আছে তাঁর, ঘরের ভেতর তিনখানা কাঁচা চামড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। চাদরবিহীন একটা ম্যাটের ওপর বসেছিলেন মুহাম্মদ (স:), তাঁর গালে আঁশের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। প্রবল স্বস্তির সঙ্গে উমর জানতে পারেন, মুহাম্মদ (স:) তাঁর স্ত্রীদের ত্যাগ করতে যাচ্ছেন না, এরপর আস্তে আস্তে মদিনায় অভিবাসী হওয়ার পর থেকে মহিলাদের সঙ্গে নিজের সমস্যার কথা শুনিয়ে পয়গম্বরের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। মদিনায় পুরুষদের পক্ষে তাদের স্ত্রীদের সামাল দেয়া যেন কঠিনই ছিল। পয়গম্বর শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক হলে উমর তাঁর পাশে মাটিতে বসে জানতে চেয়েছিলেন আল-লাহ্ কেন তাঁর বার্তাবাহককে বাড়তি আরাম দেননি, হাজার হোক বাইযানটিয়াম আর পারসিয়ার সম্রাটগণ তো চরম প্রাচুর্যের মাঝে জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন : ওরা পৃথিবীতেই সকল আনন্দ ভোগ করে ফেলেছেন।

বর্তমানে এ-কাহিনী আমাদের কাছে একটু জটিল বৈকি। এতে রয়েছে অসংখ্য অপ্রত্যাশিত পুরুষবাদী উপাদান। এটা সম্ভবত: *উম্মায়* গড়ে ওঠা যৌন-ঈর্ষার চেয়ে অনেক বেশি বস্তুবাদিতার ব্যাপার। মুহাম্মদ (স:) এক মাস স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তাঁদেরকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয় : তাঁদের মুহাম্মদের (স:) শর্ত মেনে শোভন ইসলামি জীবন যাপন করতে হবে, নয়ত তাঁদেরকে সম্মানজনকভাবে বিচ্ছেদ দেয়া হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুরা আজহাবের আয়াতসমূহে মারিয়াম বা নারী ঈর্ষার কোনও উল্লেখ নেই; বরং জোর দেয়া হয়েছে বিলাস ও ইহজাগতিক বিষয়াদির প্রতি ঝোঁকের উপর :

হে, নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলো : 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই, আর তোমাদেরকে ভদ্রতার সাথে বিদায় দিই। আর তোমরা যদি আল্লাহ্, তার রাসুল ও পরকাল চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।'[৩৯]

নারীগণ এই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং এই সময় থেকে মুহাম্মদের (স:) স্ত্রীগণ *উম্মায়* আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। কোরান তাঁদের 'বিশ্বাসীদের মাতা' আখ্যা দিয়েছে এবং বিধান জারি করেছে যে মুহাম্মদের (স:) পরলোকগমনের পর তাঁদের বিয়ে করা চলবে না, সেটা তিনি ভবিষ্যতের স্বামীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত বলে নয়, বরং এ ধরনের বিয়ে *উম্মাকে* বিভক্তকারী বংশ ও গুপ্ত সংস্থার জন্ম দিতে পারে বলে।

প্রকৃতপক্ষে সুরা আজহাবের পরেই কোরান বিপরীত লিঙ্গের সম্পর্কের ব্যাপারে অধিকতর ইতিবাচক চিত্র প্রদান শুরু করে, দেখায় যে নারী-পুরুষ উভয়ই এক সাম্যবাদী সমাজে পাশাপাশি থেকে ইসলামের দায়িত্ব ও সুবিধাদির অংশ নিচ্ছে :

আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌন অঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী– এদের জন্য তো আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।[৪০]

পরবর্তীকালে কখনও কখনও মুসলিমরা হয়ত সমতার এই কোরানিক দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের যেসব নারীবাদী ইসলামকে নারীবিদ্বেষের দায়ে অভিযুক্ত করে তাদের সম্ভবত: মনে রাখা উচিত যে ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাসও নারীদের প্রতি চরম নেতিবাচক ছিল। নিউ টেস্টামেন্ট নারীদের জন্যে মোটামুটি ইতিবাচক বার্তা দিলেও প্রকৃতপক্ষে শত শত বছর ধরে গসপেলসমূহ 'দ্বিতীয় লিঙ্গে'র জন্য আর যাই হোক সুসংবাদ নয়।[৪১] খৃস্টীয় নারী-বিদ্বেষ অদ্ভুতভাবে নিউরোটিক, কারণ যৌনতাকে প্রত্যাখ্যান ছিল এর ভিত্তি যা বিশ্বের ধর্ম সমূহের মাঝে একক, জুডাইজম বা ইসলামে অবশ্যই এর জুড়ি নেই। নারী বিদ্বেষের জন্য মুহাম্মদ (স:) এবং ইসলামকে দোষ দেয়া ঠিক নয়। মুসলিম নারীরা যদি আজ আমাদের পক্ষ থেকে দেয়া কিছু স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করে, তার কারণ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বরং নারীর প্রতি পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিপরীত লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে বিভ্রান্তি রয়েছে বলে। আমরা সমতা ও স্বাধীনতার কথা বলি, কিন্তু একই সময়ে বিজ্ঞাপন, পর্নগ্রাফি

আর জনপ্রিয় বিনোদনে নারীদের ব্যবহার করি, অসম্মান করি যা মুসলিমদের চোখে অচেনা আর আগ্রাসী ঠেকে।

অনিবার্যভাবেই হারেমের দৈনন্দিন জীবনের চেয়ে মুহাম্মদের (সঃ) স্ত্রীদের মাঝে টানাপড়েন আর দলাদলির কথা বেশি শুনতে পাই, তাই বলে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে সেখানে সুখ আর ভালবাসার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। মুহাম্মদ (সঃ) আয়েশার কাছে সুরা আজহাবের আয়াত আবৃত্তি করার সময়, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে খুব ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করতে বলেছিলেন তাঁকে; বাবা-মায়ের পরামর্শও গ্রহণ করতে বলেছেন। কিন্তু পরামর্শ উড়িয়ে দিয়েছেন আয়েশা। চিন্তাভাবনাও করতে হয়নি তাঁকে : তিনি আল-লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে বেছে নিয়েছেন। খুব ঈর্ষান্বিত ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে গোপনে মুহাম্মদের (সঃ) ওপর নজর রাখতেন যাতে তিনি ভিন্ন নারীর কাছে যাচ্ছেন না, নিশ্চিত হওয়া যায়। মারিয়মের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে কষ্টকর ছিল : অন্য স্ত্রীদের আগের সংসারে সন্তান থাকলেও আয়েশা ছিলেন নিঃসন্তান। এক দুঃখজনক বিবরণে জানা যায়, তিনি মুহাম্মদের (সঃ) কাছে অন্যদের মত একটা *'কুনিয়া'* চেয়েছিলেন, পয়গম্বর তাঁর *'কুনিয়া'* রেখেছিলেন 'উম্ম আব্দাল্লাহ' কারণ এ-নামের ছোট ভাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর জীবন অসহনীয় দুঃখকষ্টের ছিল কল্পনা করা একেবারেই ভুল হবে। স্বামী হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন আন্তরিক : আয়েশার প্রতি তিনি তাঁর বাবার চেয়ে স্নেহশীল ছিলেন : আবু বকর মেয়েকে প্রহার করতেন বলে জানা যায়। তিনি স্ত্রীদের শাদামাঠা জীবন যাপন করতে বলেছিলেন বটে কিন্তু আয়েশা আমাদের জানাচ্ছেন যে মুহাম্মদ (সঃ) সবসময় ঘরকনার কাজে তাঁদের সাহায্য করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন : কাপড় সেলাই ও ধোয়ার কাজ, জুতো মেরামত আর ছাগলের দেখাশোনা– সব। মুসলিমরা যাতে নারীদের প্রতি আরও সম্মান প্রদর্শনের অভ্যাস রপ্ত করে তিনি সেই শিক্ষাই দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। এসব বিবরণ এমন একটা সময়ে রক্ষিত হয়েছে যখন অধিকাংশ ধর্মাবলম্বী জাতিই একজন মহান পয়গম্বর ঘরের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এটা ভাবতেই পারত না– এ সত্যটুকুই দেখায় যে তাঁর বার্তা গৃহীত হয়েছিল, যদিও আবু বকরের মত মুসলিমরা নিজেদের স্বভাব বদলাতে পারেননি।

খাদিজার স্থান কেউই পূরণ করতে পারেননি। কিন্তু আয়েশার ক্ষেত্রে যেন মুহাম্মদ (সঃ) নমনীয় হতে পারতেন। একদিন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আয়েশাকে রেসে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তিনি। জেতার পর বিজয়ীর সুরে চিৎকার করে বলে উঠেছেন : এখন ওঁরা দুজন সমান সমান : আয়েশা যখন মক্কায় ছোট বালিকা ছিলেন, একবার মুহাম্মদের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যান, তিনি তাঁর নাগাল পাননি। অবশ্য এরচেয়ে অন্তরঙ্গ মুহূর্তও আছে। আয়েশা মুহাম্মদের (সঃ) প্রিয় সুগন্ধী তাঁর চুলে মাখাতে পছন্দ করতেন, একই পাত্রে হাত-মুখ ধুতেন আর একই কাপ থেকে খেতেন। অসুস্থতার সময় মুহাম্মদের (সঃ) শুশ্রূষা করতেও পছন্দ করতেন আয়েশা, আবার মুহাম্মদ (সঃ) বেশি সেবা পেতে চাচ্ছেন বলে মনে হলে

রসিকতা করতেও ছাড়তেন না। একদিন, একসঙ্গে বসেছিলেন দুজন, ব্যস্ত হাতে একজোড়া স্যান্ডেল মেরামত করছিলেন মুহাম্মদ (স:), আয়েশা হঠাৎ দেখলেন কি ভেবে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা। এক মুহূর্ত তাঁকে জরিপ করলেন আয়েশা, তাঁর উজ্জ্বল সুখী অভিব্যক্তির জন্যে প্রশংসা জানালেন। মুহাম্মদ (স:) উঠে আয়েশার কপালে চুম্বন দিয়ে বললেন : 'হে আয়েশা, আল-লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। আপনি যেমন আমার আনন্দের উৎস আমি আপনার তেমন আনন্দের উৎস নই।'[৪২]

কিন্তু আয়েশার একটা গম্ভীর দিকও ছিল, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি। এক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে, মুহাম্মদ (স:) যখন মদিনায় অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হতেন সেই সময় তিনি ধর্মীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আয়েশার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে মুসলিমদের উপদেশ দিয়ে যেতেন। পয়গম্বরের পরলোকগমনের পর আয়েশা তাঁর জীবন ও ধর্মীয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন যা অবশ্যই বিস্ময়কর, বিশেষ করে যখন আবু বকর, উমর এবং আলীর মত খলিফাগণ নারীদের প্রতি পয়গম্বরের মত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এরকম ২,২১০টি বিবরণ বা *হাদিস* আয়েশার জবানীতে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও আল-বুখারি এবং মুসলিম, যাঁরা নবম শতকে *হাদিসের* ব্যাপক সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন, এগুলোর বেশিভাগই বাদ দিয়েছেন। তাঁরা আয়েশাকে পয়গম্বর কর্তৃক সরাসরি প্রদত্ত মাত্র ১৭৪টি বিবরণ গ্রহণ করেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রাথমিক কালে অস্থির রাজনীতিতেও আয়েশা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। আলীর খেলাফতের সময় এক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন তিনি। পশ্চিমে মানুষ যেমনটি ধারণা করে, ইসলাম আসলে নারীকে দমন করে না। কেউ কেউ দেখতে পেয়েছিল যে ইসলাম তাদের এমন কিছু একটা সম্ভাবনা পূরণে সক্ষম করেছিল যা *জাহিলিয়াহয়* চিন্তাতীত ছিল।

বছরের শেষ দিকে মক্কাবাসীরা হুদাইবিয়াহর চুক্তি ভঙ্গ করে আবার নাজুক অবস্থায় পড়েছিল। বকর গোত্র কুরাইশদের কেনফেডারেট রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দশকের পর দশক মুহাম্মদের (স:) কনফেডারেসিতে যোগদানকারী খুযা'আহ গোত্রের সঙ্গে চরম শত্রুতা ছিল তাদের। ৬২৯ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বকরের এক সদস্য রাতের অন্ধকারে আচমকা খুযা'আহ'র এলাকায় তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বসে, কুরাইশরাও এই আক্রমণে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল বলে ধারণা জন্মেছিল : বকরকে তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে এবং কথিত আছে যে সাফওয়ান স্বয়ং সংঘর্ষে অংশ নেয়। দ্রুত প্রতিশোধ নিয়েছিল খুযা'আহ, মক্কার স্যাঙ্কচুয়ারিতে পর্যন্ত দু-গোত্রের মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল, ফলে খুযা'আহ মুহাম্মদের (স:) কাছে আবেদন পাঠায় এবং তিনিও তাদের সাহায্যে এগিয়ে যান।

অচিরেই কুরাইশদের কেউ কেউ মক্কা আক্রমণ করার জন্যে মুহাম্মদকে (স:) নিখুঁত একটা অজুহাত সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে বুঝতে পেরে দ্বিতীয় চিন্তা করে। সাফওয়ান এবং ইকরিমাহ্ একগুঁয়ে আর খেপাটে রয়ে গেলেও এমনকি সুহায়েল পর্যন্ত– যাঁর মা খুযা'আহ গোত্রের সদস্য ছিলেন– বকর গোত্রকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত

ছিলেন। মুহাম্মদের (স:) নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল এবং তিনি সঙ্গীদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে অচিরেই মদিনায় আবু সুফিয়ানকে আশা করা যেতে পারে। পরিখার যুদ্ধে পরাজয় বরণের পর থেকে আবু সুয়িয়ান সম্ভবত: বুঝতে শুরু করেছিলেন যে উম্ম হাবিবার সঙ্গে সাম্প্রতিক বিয়ের সুবাদে জামাই মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে বিবাদ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ভঙ্গের অল্পদিন পরে আবু সুফিয়ান ঠিকই শান্তির প্রস্তাব নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হন–এমন একটা ঘটনা দুবছর আগেও ছিল অচিন্ত্যনীয়।

মদিনায় আবু সুফিয়ানের শান্তি প্রচেষ্টার নানান বর্ণনা রয়েছে। বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর মেয়ের কাছে গিয়ে মুহাম্মদের (স:) ওপর তাঁর প্রভাবকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উম্ম হাবিবা তাঁকে এমনকি মুহাম্মদের (স:) কম্বলের ওপর বসতে পর্যন্ত দেননি। এ বর্ণনা সত্যি হওয়ার কথা নয়, কারণ সারা জীবনেও মুহাম্মদ (স:) এ ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা গ্রহণ করেননি। এরপর, আবু সুফিয়ান আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলীর পরামর্শ কামনা করেছিলেন বলে বলা হয়, এটাও খানিকটা সন্দেহজনক, কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে তিনি ইসলামের চার খলিফার কাছে একেবারে পর্যায়ক্রমে গিয়েছেন। তবে আবু সুফিয়ান এপর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি নিজেকে ইসলামে আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত করতে না পারলেও এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে মুহাম্মদের (স:) চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যম্ভাবী এবং কুরাইশদের উচিত সেরা শর্ত বেছে নেয়ার চেষ্টা করা। বকর গোত্রের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে সুহায়েল এবং আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের এই বিবাদের বাইরে রাখার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, এক বছর আগে আবু বাসির গোত্রের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (স:) একইরকম কৌশলগত কারণের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এ কৌশল কাজে লাগানোর মতো শক্তি কুরাইশদের ছিল না। আবু সুফিয়ানকে আলী বলেছিলেন যে মুহাম্মদকে (স:) তাঁর জিজ্ঞেস করা উচিত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক কোনও মক্কাবাসীর আশ্রয়দাতা হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করতে তিনি সম্মত আছেন কিনা। এতে করে মুসলিমরা নগরী দখল করলে তাদের মুখরক্ষা আর জীবন বাঁচানোর একটা উপায় থাকবে, কারণ সরাসরি মুহাম্মদের (স:) কাছে নয়, নিজের লোকের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এ বিষয়ে চিন্তা করতে রাজি হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন আবু সুফিয়ান, এবং ফেরার পর সম্ভবত: স্বগোত্রীয়দের অনিবার্যকে মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। ৬৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ১০ রমযানে মদিনা থেকে সর্বকালের বৃহত্তম সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে বের হয়ে আসেন মুহাম্মদ (স:)। *উম্মার* প্রায় সকল পুরুষ সদস্য যোগ দিয়েছিল; চলার পথে বেদুঈন গোত্রগুলো অভিযাত্রীদলে যোগ দিয়ে সৈন্যসংখ্যা ১০,০০০-এ বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে এটা তখনও নিশ্চিত করে জানতে পারেনি কেউ। নিশ্চয়ই মক্কার দিকেই হয়ত যাচ্ছিল তারা,

আবার এমনও হতে পারে দক্ষিণের কোনও গোত্র বা তায়েফ নগরীর ওপর হামলার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে–যারা ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন রয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের হাওয়াযিন গোত্রও মুহাম্মদ (স:) ওদিকে অগ্রসর হচ্ছেন শুনে একই রকম চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে আল্-লাতের শহর ও পৌত্তলিকতাবাদের কেন্দ্রভূমি তায়েফে বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছিল। মক্কায় কুরাইশরা সম্ভবত: সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল। আব্বাস তাদের বিপর্যয় এড়ানোর আবেদন জানিয়েছিলেন : 'হায় কুরাইশগণ, ওরা এসে আশ্রয় চাইবার আগেই যদি পয়গম্বর জোর করে মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে কুরাইশদের রক্ষা পাবার উপায় থাকবে না।'[৪৩] রাতের অন্ধকারে তিনি মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে মিলিত হবেন বলে বেরিয়ে পড়েন এবং পথে আবু সুফিয়ান ও খুযা'আহ গোত্রপতি বুদায়েলকে অতিক্রম করেন–ওই দুজনও মুসলিম শিবিরের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনজনই মুসলিম শিবিরে রাত্রি যাপন করেন এবং সকালে মুহাম্মদ (স:) আবু সুফিয়ানের কাছে জানতে চান তিনি *ইসলাম* গ্রহণে প্রস্তুত আছেন কিনা। আবু সুফিয়ান জানান তিনি মুসলিম বিশ্বাস ঘোষণার প্রথমাংশের সঙ্গে একমত প্রকাশ করতে পারেন : 'আল্-লাহ ছাড়া কোনও ঈশ্বর নেই'–পৌত্তলিক দেবীগণ অপ্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হয়েছিল– কিন্তু মুহাম্মদের (স:) পয়গম্বরত্বের ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ রয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও প্রাতকালীন প্রার্থনার সময় বিশাল সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে মক্কার দিকে ফিরে সেজদা দিতে দেখে তিনি হতবাক ও অভিভূত হয়ে যান; এরপর নানান গোত্রকে কুচকাওয়াজ করে নিজের শহরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখার পর বুঝে ফেলেন কুরাইশদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

দ্রুত মক্কায় ফিরে আসেন তিনি, গলা চড়িয়ে জনতাকে আহবান জানাতে শুরু করেন : 'হে কুরাইশগণ, মুহাম্মদ এবার এমন এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এসেছেন যাকে তোমরা ঠেকাতে পারবে না।' এরপর আলীর পরামর্শ মত বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন কুরাইশদের। আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক যে কাউকে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং মুহাম্মদ (স:) এর সম্মান রক্ষা করবেন : হয় তাদের সরাসরি তাঁর বাড়ি যেতে হবে আর নয়ত মুসলিমরা পৌঁছার পর যার যার ঘরে অবস্থান করতে হবে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী তাঁর পাশে ক্রোধে জ্বলছিল। আবু সুফিয়ানের গোঁফ আঁকড়ে ধরে জনতার উদ্দেশ্যে সে বলেছে : 'এই মোটা, চর্বিদার বস্তাটাকে খতম কর। নিজের লোকের কী জঘন্য আশ্রয়দাতা, রক্ষক!'[৪৪] কিন্তু আবু সুফিয়ান জনতাকে তার কথায় কান না দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান : এ ধরনের ঔদ্ধত্যের সময় পার হয়ে গেছে। এমন এক বাহিনীকে দেখে এসছেন তিনি যার মোকাবিলা মক্কার পক্ষে অসম্ভব। কুরাইশরা বরাবর বাস্তববাদী, তারা 'আরবীয় মাসাদা' সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিল না, সুতরাং যার যার বাড়ি গিয়ে আত্মসমর্পণের চিহ্ন হিসাবে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে তারা।

তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লড়াই করতে চেয়েছিল। ছোট একটা বাহিনী নিয়ে আবু কায়েসের চূড়ায় সমবেত হয়েছিলেন সুহায়েল, সাফওয়ান এবং ইকরিমাহ্।

সেনাদল নগরীতে প্রবেশ করার সময় খালিদের নেতৃত্বাধীন অংশের ওপর হামলা চালিয়ে ছিলেন। খুব দ্রুত পরাস্ত হন তাঁরা, সাফওয়ান ও ইকরিমাহ মক্কা থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু সুহায়েল আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে যান। মুসলিম বাহিনীর বাকি অংশ কোনওরকম বাধা ছাড়াই নগরীতে প্রবেশ করে। কা'বার কাছেই খাটানো হয়েছিল মুহাম্মদের (স:) লাল তাঁবু, এখানে আলী এবং ফাতিমাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী হিসাবে আগত দুই স্ত্রী উম্ম সালামাহ্ এবং মায়মুনাহ্‌র সঙ্গে তিনি মিলিত হন। ওঁরা স্থির হয়ে বসার পরেই আলীর বোন উম্ম হানি, পৌত্তলিকের সঙ্গে যাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং যিনি কখনও *হিজরা* করেননি, খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তাঁর দুই জন আত্মীয়ের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে আসেন। যদিও আলী ও ফাতিমাহ্ তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন, মুহাম্মদ (স:) সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ওই দুই ব্যক্তি উম্ম হানির আশ্রয়ে নিরাপদ থাকবে। রক্তাক্ত প্রতিশোধ শুরু করার কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি, কেউ তেমন চাপ আছে বলেও মনে করেনি। জনগণকে নির্যাতিত দেখতে চাননি মুহাম্মদ (স:), চেয়েছিলেন সমন্বয় ঘটাতে।

কুরাইশদের ওপর অত্যাচার চালানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেননি তিনি, এসেছেন তাদের হতাশ করা ধর্মকে বাতিল করতে। একটু সময় ঘুমোনোর পর জেগে উঠে পবিত্রতা অর্জন করে প্রার্থনা করেছেন তিনি। তারপর কাসওয়ার পিঠে চেপে সাতবার কা'বাগৃহকে প্রদক্ষিণ করেন, প্রত্যেকবার কৃষ্ণপাথর স্পর্শ করে 'আল্-লাহু আকবার!' বলে জোরে ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঘোষণায় যোগ দিয়েছিল তাঁর ১০,০০০ সৈন্য এবং অচিরেই গোটা শহর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক হিসাবে এই ঘোষণায় অনুরণিত হতে শুরু করে। এরপর মুহাম্মদ (স:) উপাসনালয়ের চারদিকে স্থাপিত ৩৬০ খানা প্রতিমার দিকে নজর দেন : কুরাইশগণ যার যার বাড়ির ছাদ আর বেলকনি থেকে লক্ষ্য করে মুহাম্মদ (স:) কোরানের আয়াত আবৃত্তি করছেন আর একটা করে মূর্তি ভাঙছেন :

> বলো, 'সত্য এসেছে আর মিথ্যা অন্তর্ধান করেছে।
> মিথ্যাকে অন্তর্ধান করতেই হবে।'[৬২]

কা'বাগৃহের অভ্যন্তরের দেয়ালগুলো পৌত্তলিক দেব-দেবীর ছবিতে অলঙ্কৃত ছিল; মুহাম্মদ (স:) সেসব মুছে ফেলার নির্দেশ দেন, যদিও বলা হয়ে থাকে, তিনি জেসাস ও মেরির ফ্রেসকো অক্ষত রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশেষে ইসলাম উপাসনার ক্ষেত্রে সবরকম প্রতিরূপ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, কেননা এর ফলে একেবারে মানবীয় প্রতীক সমূহের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে সরে আসে।

মক্কাবাসীদের কেউ কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কা'বাগৃহের দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সেখানে তারা মুহাম্মদ (স:) কখন উপাসনালয় ত্যাগ করবেন তার অপেক্ষা করেছে। মুহাম্মদ (স:) আল্-লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে নতুন ব্যবস্থা, উম্মার ঐক্য মেনে নেয়ার আবেদন জানিয়েছেন, উদ্ধত অহঙ্কার আর পৌত্তলিকতাবাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ত্যাগ করতে বলেছেন, কারণ তাতে কেবল ভেদাভেদ আর অন্যায় জন্ম নেয়। কোরানের একটা আয়াত আবৃত্তি করে বক্তব্য শেষ করেন তিনি, মুসলিমরা পরে যেটাকে বর্ণবাদের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে, এ অভিশাপ থেকে ইসলাম আপেক্ষিকভাবে মুক্ত :

> হে কুরাইশগণ, ঈশ্বর তোমাদের কাছ থেকে পৌত্তলিকতার ঔদ্ধত্য এবং পূর্বপুরুষের ভক্তি সরিয়ে নিয়েছেন। মানুষ এসেছে আদম থেকে, আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে :
>
> > হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে
> > সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি
> > ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।
> > তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন
> > যে বেশি সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।[৪৬]

সবশেষে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেন মুহাম্মদ (স:)। মাত্র দশজন ব্যক্তিকে কালো-তালিকা ভুক্ত করা হয়েছিল। যার অন্যতম ছিল ইকরিমাহ্ (কোনও কারণে সাফওয়ান নয়), যারা মুসলিম বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছিল আর যারা পয়গম্বরের পরিবারের সদস্যদের আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু এদের যেকেউ ক্ষমা প্রার্থনা করলেই তা মঞ্জুর হয়েছে।

উত্তম নীতি ছিল এটা। উদাহরণ স্বরূপ, মুহাম্মদ (স:) জানতেন সুহায়েল আত্মগোপণ করে আছেন, অনুসারীদের তাই তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'সুহায়েলের সঙ্গে দেখা হলে রাগি চোখে তাকাবে না!' আদেশ ছিল তাঁর। 'ওঁকে স্বেচ্ছায় আসতে দেবে, কারণ তিনি বুদ্ধিমান এবং সম্মানিয় ব্যক্তি, ইসলামের সত্যের প্রতি অন্ধ নন!'[৪৭] কা'বায় বক্তব্য রাখার পর সাফা পর্বতে অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি, মক্কাবাসীদের তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। কুরাইশগণ একে একে উমর ও আবু বকরের সঙ্গে দাঁড়ানো মুহাম্মদের (স:) কাছে এগিয়ে এসেছিল। সামনে এসে দাঁড়ানো মহিলাদের একজন পর্দার আড়ালে ছিল, কথা বলে উঠতেই মুহাম্মদ (স:) তাকে চিনে ফেলেন : আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ, হামযাহ্র মৃতদেহ বিকৃত করার দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের তালিকায় নাম ছিল তার। 'তুমি হিন্দ বিনত উতবা?'

জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি। 'হ্যাঁ', উদ্ধত জবাব ছিল হিন্দের। 'অতীতের সবকিছুর জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন আর ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন।' মুহাম্মদ (সঃ) জেরা অব্যাহত রেখেছিলেন। সে কি ব্যাভিচার বা চুরি থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেবে? বাচ্চাদের হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি আছে সে? জবাবে হিন্দ বলেছে : 'ওদের ছোট থেকে বড় করেছি আমি, কিন্তু বড় হওয়ার পর বদরের দিন আপনি ওদের হত্যা করেছেন, ওদের সম্পর্কে আপনারই ভাল জানার কথা!'[৫৮] হিন্দ ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মুহাম্মদকে (সঃ) সে বলেছে : 'আল্-লাহর বার্তাবাহক, আমি যেহেতু একজন ঘোষিত মুসলিম তাই আপনি আর আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারবেন না।' মৃদু হেসে পয়গম্বর বলেছিলেন 'অবশ্যই, তুমি মুক্ত।'[৫৯] অচিরেই আবু সুফিয়ানের সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে এবং তাঁর দুছেলেকে *উম্মার* গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়, দেখতে পেয়েছে সে। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররা উম্মাইয়াদ বংশের প্রতিষ্ঠা করে।

সাফওয়ান এবং ইকরিমাহর আত্মীয়-স্বজনরা তাদের প্রাণভিক্ষা চাইলে মুহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিলে তারা বিনা বাধায় নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে। দুজনই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ইকরিমাহ আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বিনিময়ে স্নেহের সঙ্গে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর বাবা আবু জাহলকে গালি দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। সাফওয়ান এবং সুহায়েল মুহাম্মদের (সঃ) আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল কিন্তু তখনও ঘোষিত মুসলিম হতে পারেনি। কালো তালিকাভুক্ত একজনকে সালমান রুশদী তাঁর *দ্য স্যাটানিক ভার্সেস*-এ অমর করে তুলেছেন, যদিও এই কাল্পনিক বর্ণনায় মুহাম্মদ (সঃ)কে একজন শীতল, নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধ পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, বাস্তব থেকে যা বহুদূর। উসমানের দুধ ভাই আব্দাল্লাহ্ ইবন সা'ইদ ৬২২ খৃস্টাব্দে *হিজরা* করেছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদের (সঃ) প্রেরণায় সম্ভবতঃ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। শ্রুতিলেখক হয়েছিলেন সা'ইদ এবং রসিকতা বা পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে কোরানের বিবরণে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) '*আলিমুন সামি'উন* (আল-লাহ সব জানেন, সব শোনেন) আবৃত্তি করার সময় আব্দাল্লাহ লিখেছিলেন, *আলিমুন হাকিমুন* (আল্-লাহ সব জানেন এবং প্রজ্ঞাময়)। মুহাম্মদ (সঃ) এই পার্থক্য ধরতে না পারায় ধর্মত্যাগ করে আবার মক্কায় চলে আসেন সা'ঈদ, কুরাইশরা তাঁর গল্পকে পুঁজি করে নেয়। মুহাম্মদ (সঃ) স্বয়ংকে কোরান জানিয়ে দিয়েছিল যে তিনি যদি নিজের সুবিধার জন্যে কোরানের পবিত্র বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেন, তাহলে পরিণতি হবে ভয়াবহ এবং এ বিষয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর জোর প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় নিজের বাণীর অখণ্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি : সাধারণ ভুল-ত্রুটি অনায়াসে সংঘটিত হতে পারত। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আব্দাল্লাহ পালিয়ে উসমানের কাছে গিয়ে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছিলেন, মক্কা বিজয়ের

উত্তেজনা প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত উসমান তাকে আশ্রয় দেন। এরপর তাঁকে মুহাম্মদের (স:) সামনে এনে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুদণ্ড রহিত করার আগে দীর্ঘ সময় নীরব ছিলেন মুহাম্মদ (স:) এবং পরে নীরবতাকে আব্দাল্লাহকে হত্যার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ না করার জন্যে সহযোগিদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু তালিকা থেকে নাম কাটানোর পর আব্দাল্লাহ আবার মুসলিম হন এবং মুহাম্মদের (স:) পরলোকগমনের পর ইসলামি সাম্রাজ্যে উচ্চমর্যাদার দায়িত্ব পালন করেন।

মক্কা বিজয় ছিল চূড়ান্ত বিজয়, (*ফাত্'হ*), বদর আর হুদাইবিয়াহ্র বিজয়গুলো ছিল যার প্রস্তুতি। *ফাতহ্* শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'উদ্বোধন', এবং ইসলামের জন্যে নতুন দরজা খুলে দেয়া কোনও শহর বিজয় করার সরকারী পরিভাষায় পরিণত হয়েছে এটা। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ (স:) আপন পয়গম্বরত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে এই বিজয় বিনা রক্তপাতে অর্জিত হয়েছিল এবং মুহাম্মদের (স:) শান্তিপূর্ণ নীতি ফলপ্রসু হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে মক্কায় পৌত্তলিকতাবাদের কবর রচিত হয় এবং মুহাম্মদের (স:) বেশ কয়েকজন চরম শত্রু যেমন ইকরিমাহ্, সুহায়েল নিবেদিত এবং একনিষ্ঠ মুসলিমে পরিণত হন।

কিন্তু এই বিজয় উপভোগ করার মত যথেষ্ঠ সময় মেলেনি মুহাম্মদের (স:), কারণ হাওয়াযিন গোত্র তায়েফে সেনা জমায়েত করেছে বলে সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি। বিজয়ের অব্যবহিত পর আল-উয্যার মূর্তি ধ্বংস করার জন্যে খালিদকে নাখলাহ্য় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:); পরে আলীকে পাঠানো হয়েছিল হুদায়েলের মানাতের মন্দির ধ্বংস করার জন্যে। সাকিফ এবং তাঁদের মিত্ররা আল্-লাতের যাতে একই পরিণতি না হতে পারে, সেজন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, দেবীকে রক্ষার জন্যে ২০,০০০ লোক লড়াই করার জন্যে এগিয়ে এসেছিল। সঙ্কটময় এক মুহূর্ত ছিল সেটা, সবকিছু হারাতে হতে পারত; কিন্তু সদ্য পরাস্ত কুরাইশনগণ মুহাম্মদ (স:) এবং মুসলিমদের পাশাপাশি লড়াই চালাতে প্রস্তুত ছিল : তায়েফ এবং হাওয়াযিন ছিল পুরনো শত্রু। রাতারাতি মক্কা বিজয়ী মুহাম্মদ (স:) নগরীর রক্ষাকর্তায় পরিণত হলেন। ৬৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারির শেষ দিকে হুনায়েন উপত্যকায় যুদ্ধের জন্যে মুখোমুখি হয় দুই পক্ষের সেনাবাহিনী, বিজয়ের এক পক্ষ পর। মুসলিমরা এখানে প্রায় পরাস্ত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে নতুন করে হামলা চালিয়ে শত্রুপক্ষকে পালাতে বাধ্য করেছিল তারা। কেউ কেউ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়, বাকিরা প্রাচীর ঘেরা তায়েফ নগরীতে আত্মগোপন করে। মুহাম্মদ (স:) নগরী অরোধের প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই বিজয়ী হতে পারবেন না বুঝতে পেরে সরে আসেন।

হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামাল বন্টনের ব্যাপারটা ছিল এক মহাযজ্ঞ এবং এর ফলে উম্মার অভ্যন্তরীণ কিছু টানাপড়েন প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছিল। আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান এবং সুহায়েলের মত প্রাক্তন শত্রুদের মন জয় করার জন্যে মুহাম্মদ (স:) তাঁদের একটা বড় অংশ দিয়েছিলেন। সাফওয়ান এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে

নিমেষে ইসলামে আত্মসমর্পণ করে সে। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে পয়গম্বরের হৃদয় ছাড়া অন্য কারো হৃদয়ে পরম মহানুভবতা থাকতে পারে না।' জোর গলায় বলেছিল সে। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্-লাহ ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই এবং আপনি তাঁর বার্তাবাহক'।[৫০] সুহায়েলও মুসলিম হয়েছেন। আগাগোড়া ধার্মিক পুরুষ ছিলেন তিনি, নবদীক্ষিতদের মাঝে সবচেয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তবে স্বভাবতই, মুহাম্মদের (স:) বিশ্বস্ত অনুসারীরা বাহ্য স্বজনপ্রীতি দেখে আহত বোধ করেছেন। বিশেষ করে সাহায্যকারীরা ভেবেছিল যে, মুহাম্মদ (স:) যেহেতু আবার কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, এবার তাদের পরিত্যাগ করবেন; ভুলে যাবেন যখন তিনি লাঞ্ছিত শরণার্থী ছিলেন সেই সময় আউস ও খাসরাজ গোত্রে তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিল। এক আবেগঘন ভাষণের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:), মদিনাবাসীদের অবদান স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাতে। এই বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মদিনাই হবে তাঁর বাড়ি। তিনি শেষ প্রার্থনা করার সময় সাহায্যকারীদের গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল :

> যেখানে আমি তোমাদের ইসলামে বিশ্বাসের দায়িত্ব দিয়েছি সেখানে জীবনের মূল্যবান কিছু জিনিস একটা জাতির মন জয় করার জন্যে, যারা মুসলিম হতে পারে, দেয়ায় তোমরা কি মনে কষ্ট পাচ্ছ? লোকে যেখানে পশু-পাখীর দল নিয়ে বিদায় নেবে সেখানে তোমরা কি ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষকে সঙ্গে পেয়ে সন্তুষ্ট নও? যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তার দোহাই, *হিজরা* (অভিবাসী যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল) না হলে আমি নিজেই একজন সাহায্যকারী হতাম। যদি একদিকে সকল লোক গমন করে আর অন্যদিকে সাহায্যকারীগণ, আমি সাহায্যকারীদের পথই বেছে নেব। ঈশ্বর সাহায্যকারী এবং তাদের বংশধরদের ক্ষমা করবেন।[৫১]

এতে সাময়িকভাবে হলেও সাহায্যকারীগণ সন্তুষ্ট হয়েছিল, তবে লুণ্ঠিত মাল বণ্টন, হাওয়াযিনদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ এবং সেনাদল আবার একত্রিত করার পর মুহাম্মদ (স:) *উমরাহ* পালন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রাচীন গোত্র-ব্যবস্থা প্রত্যেক গোত্রের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল : প্রতিশোধের নীতি ছিল সেটা নিশ্চিত করার প্রয়াস, কোনও গোত্রের একজন সদস্য খুন হলে হানাদার গোত্রকে একই মাত্রায় দুর্বল করতে হত। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, এব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি তিনি, আরবে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যাযাবর গোষ্ঠীগুলোর মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন অথবা ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করা *উম্মা* এবং এর মিত্রগুলোর সহজ শিকারে পরিণত হওয়ার স্বাধীনতা ছিল। পরবর্তী দুই বছর একের পর এক বিভিন্ন গোত্র-প্রতিনিধির মদিনায় আগমন ঘটে। তারা প্রতিমা ধ্বংস, আদেশমাত্র সেনা আনয়ন, *উম্মাকে* আক্রমণ না করা, মিত্রদের আক্রমণ না করা

এবং *যাকাত* দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাযাবরদের কেউ কেউ বিশ্বাসীতে পরিণত হলেও অন্যরা আন্তরিকভাবেই আগের ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যায়, মুহাম্মদ (সঃ) এ বিষয়টি অবগত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কড়াকড়িভাবে ধর্মীয় অর্থডক্সি চাপিয়ে দেননি, ভেবেছিলেন রাজনৈতিকভাবে আত্মসমর্পণ এক সময় ইসলামে ধর্মীয় আত্মসমর্পণের দিকে নিয়ে যাবে। প্রায় একাকী *প্যাক্স ইসলামিকা* প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ)।

কিন্তু সংঘাত আর যুদ্ধ টাইপের অভিযান আরবদের জীবনযাত্রারই অংশ ছিল আর আগ্রাসনের অভ্যাস ছিল জন্মগত। মুহাম্মদ (সঃ) উপলব্ধি করেছিলেন, নতুন স্থাপিত শান্তিকে টিকিয়ে রাখতে হলে বহির্মুখী গতিবেগ অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অধিক সংখ্যক গোত্র *উম্মার* কনফেডারেটে পরিণত হওয়ায় তারা মুসলিম রেইডারদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল, মুহাম্মদ (সঃ) তাদের শক্তিকে তখনও বৈরী রয়ে যাওয়া উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর ওপর আক্রমণ চালানোর কাজে একীভূত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। একাদশ শতকে অনেকটা একই রকম ঘটনা ঘটেছিল ক্রিশ্চান ইয়োরোপে, চার্চ তখন নাইট এবং ব্যারনদের পরস্পরকে আক্রমণ করা ঠেকাতে চাইছিল, বিভিন্নভাবে 'ঈশ্বরের শান্তি'র প্রসার ঘটাতে চেয়েছে তারা। অবশেষে ১০৯৫ খৃস্টাব্দে কাউন্সিল অব ক্লারমন্ট, পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রিশ্চানদের প্রতি ঐকবদ্ধভাবে পবিত্রভূমিতে সাধারণ শত্রুর মোকাবিলা করার আহবান জানিয়েছিলেন এবং মুসলিম অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিলেন : পশ্চিমে আসবে ঈশ্বরের শান্তি আর মধ্যপাচ্যে ঈশ্বরের যুদ্ধ।

৬৩০ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক নতুন অভিযানের ঘোষণা দেন মুহাম্মদ (সঃ), এবার তাঁর বরাবরের রীতির বিপরীতে তিনি সবাইকে বাইযানটাইন সীমান্তের দিকে যাবার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যাতে লোকজন দীর্ঘযাত্রার উপযোগি প্রস্তুতি নিতে পারে। ঠিক কি কারণে তিনি এই অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আমরা জানি না, খুবই অজনপ্রিয় ছিল সেটা। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল, খেজুর ফসল তোলার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া বাইযানটাইন বাহিনীর প্রতি অসম্ভব ভীত ছিল মুসলিমরা। মুহাম্মদ (সঃ) ইতিমধ্যে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, এমনটা হওয়ার কথা নয়। হয়ত কেবল মু'তার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা আরবের উত্তরাংশে নিজের অবস্থান আরও সংহত করতে চেয়েছিলেন। বেশির ভাগ মুসলিমই প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য আপত্তি জানিয়েছে। কেউ কেউ এমনকি অভিযানে যেতে অস্বীকারও করেছে; বাকি মুসলিমরা বাড়িতে অবস্থান করতে চেয়েছিল, যাতে খেজুর তুলে অর্থ উপার্জন করা যায়; কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারীদের কেউ কেউ কট্টর মুসলিম ছিল। এমনকি আলী মদিনায় রয়ে গিয়েছিলেন, যদিও বিভিন্ন সূত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে জানায় যে মুহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং তাঁর অবর্তমানে আলীকে পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত আনুমানিক ৩০,০০০ জন কষ্টকর

উত্তরযাত্রায় শামিল হয়। অবশ্য প্রায় নব্বইজন রয়ে গিয়েছিল পেছনে; তারা মুহাম্মদের (স:) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে থাকতে পারে : আসল সাহায্যকারী এবং অভিবাসীদের বিস্মৃত হয়ে আবু সুফিয়ানের মত ব্যক্তিকে মর্যাদা আর দামী উপহার দিতে দেখে স্বভাবতই লোকের মনে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি জাগতে পারে। এব্যাপারটা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় : একটা দলের আদি সমর্থকগণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, আন্দোলনের প্রাথমিক আদর্শকে আঁকড়ে থাকে তারা আর পরে যারা অশুভ সুবিধাবাদী উদ্দেশ্যে জোর নতুন করে সদস্য হয় তাদের দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। মুহাম্মদ (স:) বুঝেশুনেই এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাঁর পুরনো শত্রুরা ইসলাম সম্পর্কে অনুকূল চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, কিন্তু তাতে নিজ ঘরে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। অভিযানে যোগদানকারীদের ভেতরও বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইবন উব্বাঈয়ের শিবিরে গুঞ্জন অব্যাহত ছিল; কেউ কেউ রাতের অন্ধকারে পিছিয়ে পড়েছে, অন্যরা গম্ভীর চেহারায় শক্তিশালী বাইযানটাইন সেনাবাহিনীর সামনে হাজির হওয়ার বিপদ নিয়ে নানা কথা বলছিল। গুঞ্জন উচ্চারণকারীরা কী বলছে যখন জানতে চাইলেন মুহাম্মদ (স:), তারা হালকা চালে জবাব দিয়েছিল : 'আমরা এমনি আলাপ-সালাপ আর ঠাট্টা করছি, হে পয়গম্বর।' কিন্তু কোরান দেখাচ্ছে, মুহাম্মদকে (স:) ভুল বোঝানো যায়নি।[৭২]

অবশেষে মুসলিম বাহিনী মদিনার আনুমানিক ২৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে তাবুকে পৌঁছায়, এখানে দশ দিন অবস্থান করেন মুহাম্মদ (স:)। বাইযানটিয়ামের একেবারে দোরগোড়ায় এমন বিশাল বাহিনী নিয়ে অবস্থান করা ছোটখাট ব্যাপার নয়, ঐ অঞ্চলের বেদুঈনরাও প্রভাবিত হয়েছে এতে। এখানে অবস্থানকালে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে চুক্তিতে উপনীত হন তিনি। লোহিত সাগর উপকূলবর্তী মাকনা, বর্তমান জর্ডানের আধরুহ এবং জারবার ইহুদী বসতিগুলোর মত আধুনিক ইসরাইলের এইলাটের ক্রিশ্চান রাজা ইয়োহান্না মুহাম্মদকে (স:) শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। খালিদকেও একটা ছোট সেনাবাহিনী দিয়ে দুমাত আল-জান্দালের শাসককে বশ মানানোর উদ্দেশ্যে পাঠান হয়েছিল, যথারীতি তিনিও মুহাম্মদের (স:) সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে হাজির হন।

মাঝারি হলেও তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য ছিল এটা, ফেরার সময় উৎফুল্ল ও আত্মবিশ্বাসী বোধ করছিলেন মুহাম্মদ (স:)। বাইরের জগতে মদিনা রাষ্ট্রের এমন একটা সম্ভাবনাময় সূচনার পরদিন শিবিরে প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। কিন্তু ফিরতি পথেও অসন্তুষ্টি আর গুঞ্জন অব্যাহত থাকে, এক পর্যায়ে একটা পাহাড় চূড়া থেকে মুহাম্মদকে (স:) ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলেও মনে করা হয়। যা হোক, শেষ পর্যন্ত, মদিনার অল্প দূরে নিরাপদে পৌঁছাতে পেরেছিলেন তিনি। মরুদ্যান ছেড়ে আসার আগে কু'বায় একটা নতুন মসজিদ উদ্বোধনের অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁকে, ফেরার পথে তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুহাম্মদ (স:)। তাঁর হয়ত ধারণা জন্মেছিল যে মসজিদটাই অসন্তোষের মূল কারণ। এমনকি কোরানেও আভাস দেয়া হয়েছে যে মসজিদ নির্মাণকারীরা

মুহাম্মদের (সঃ) কিছু পুরনো শত্রু যারা তাঁর সাফল্যে যোগ দেয়নি তাদের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করেছে।[৫৩] তো, মদিনায় প্রবেশের আগে দুজন লোককে মসজিদে আগুন লাগানোর জন্যে কু'বায় পাঠিয়ে দেন মুহাম্মদ (সঃ)। পরদিন সকালে মদিনায় অবস্থানকারীদের আচরণ সম্পর্কে এক তদন্ত পরিচালনা করেন তিনি। বেশির ভাগই চটজলদি বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত দেখায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনজনকে প্রায় দুমাসের জন্যে কভেন্ট্রিতে পাঠান হয়েছিল।

এতে করে মুসলিম প্রতিপক্ষ দমন হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে। তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরেই মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পুরনো প্রতিপক্ষ ইবন উব্বাঈয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা আর সমন্বয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। পৌত্তলিক বিরোধিতারও অবসান ঘটেছিল এতে। ৬৩১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পৌত্তলিকতাবাদের শেষ শক্ত ঘাঁটি তায়েফ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়, মুহাম্মদ (সঃ) অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়ার ঠিক একবছর পরের ঘটনা এটি। হুনায়েনের পর হাওয়াযিনও মুহাম্মদের (সঃ) মিত্রে পরিণত হওয়ায়, ক্রমাগত হয়রানির শিকার হচ্ছিল তারা, আলাদা হয়ে পড়ছিল ক্রমশঃ ফলে তাদের টিকে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। তায়েফ থেকে আগত প্রতিনিধিদল মুহাম্মদের (সঃ) কাছে বিশেষ শর্ত চেয়ে আবেদন করেছিল। বণিক ছিল তারা, প্রচুর দেশ ভ্রমণ করতে হত বলে ব্যবসায়িক কাজে বিদেশে অবস্থানকালে স্ত্রী নয় এমন নারীর সঙ্গে ঘুমানো, নিজস্ব আঙুর ক্ষেত থেকে মদ্যপান এবং সর্বোপরি আরও কয়েক বছর– অন্তত একবছর– আল্-লাতের মন্দির অক্ষত রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা আবেদনই নাকচ করে দেন মুহাম্মদ (সঃ)। একটা ছাড়ই দেয়া হয়েছিল, সেটা হচ্ছে, নিজের হাতে আল্-লাতের প্রতিমা ধ্বংস করে জনগণের আক্রোশের লক্ষ্যে পরিণত না হওয়া। তো আবু সুফিয়ানকে তায়েফে পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পক্ষে দেবীকে ধ্বংস করার জন্যে।

এটা ছিল প্রাতীকী মুহূর্ত। পাঁচ বছর মুহাম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আবু সুফিয়ান, মুখে আল্-লাতের নাম নিয়ে এগিয়ে গেছেন যুদ্ধের ময়দানে। পৌত্তলিকতার বিনাশের পরিষ্কার লক্ষণ ছিল এটা। এই ধর্মবিশ্বাস আরবদের উপকারে এলেও সপ্তম শতকের নতুন চাহিদা আর স্থায়ী জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্গত গতিশীলতা এখন মুহাম্মদের (সঃ) পক্ষে। অসামান্য সাফল্য ছিল মুহাম্মদের (সঃ)। কেবল ঐশী প্রেরণার ওপর নির্ভর করে থাকেননি তিনি, বরং কোরানের নীতি অনুযায়ী, সকল প্রাকৃতিক উপাদান এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত মেধা কাজে লাগিয়েছিলেন সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্যে। কিন্তু ৬৩১ খৃস্টাব্দে তিনি একজন বয়স্ক মানুষ, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে শুরু করেছে। তাঁর পরলোকগমনের পর *উম্মা* টিকবে কী?

১০. পয়গম্বরের পরলোকগমন ?

৬২২ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ (স:) যখন *হিজরা* সম্পন্ন করেন, ছোট ইসলামি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ ছিল সেটা : দশ বছর পর তা-ই গোটা আরবে প্রাধান্য বিস্তার করার ভেতর দিয়ে এক নতুন আরব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে যা মুসলিমদের প্রায় হাজার বছর ধরে এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে সক্ষম করে তুলেছিল। রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে অব্যাহত প্রচেষ্টা আর প্রয়াস জড়িত ছিল: আর মদিনার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বছরগুলো দেখিয়ে দিয়েছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনও সমাজ পুনর্গঠনের কাজটি কত কঠিন এবং বিপজ্জক। মুহাম্মদ (স:) ঈশ্বরের বাণীকে মানুষের ভাষায় রূপান্তরের কষ্ট ভোগ করেছেন যা, কখনও কখনও স্বর্গীয় চাপে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। ঐশী বাণীকে মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম মুসলিমদের তাদের সহ্য ও চিন্তাশক্তির শেষসীমায় নিয়ে গিয়েছে, ফলে অনেক সময় তারা হতাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে আবার কখনও এমনকি স্বয়ং মুহাম্মদকেই (স:) পরিত্যাগ করার মত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সাফল্যই তাঁর অনন্যসাধারণ এক বিতর্কিত নীতিমালার পক্ষে সেরা যুক্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে। মুহাম্মদ (স:) যখন বদরের যুদ্ধ বা ইহুদী গোত্রগুলোকে নিশ্চিহ্ন বা নির্বাসনে পাঠানো, কিংবা হুদাইবিয়াহ্‌য় সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তখন সরাসরি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হননি, বরং সাহায্য আর পরামর্শ কামনা করেছেন এবং নিজস্ব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন। মুসলিমরা তাদের স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা ত্যাগ করবে বা ঈশ্বর অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করবেন ভেবে বসে থাকবে, এটা কোরান আশা করে না। ইসলাম বাস্তব ভিত্তিক এবং প্রয়োগিক ধর্ম-বিশ্বাস, যা মানবীয় বুদ্ধিমত্তা এবং ঐশী প্রেরণাকে পাশাপাশি ক্রিয়াশীল দেখে। ৬৩২ খৃস্টাব্দ নাগাদ মনে হচ্ছিল যে আরবে বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছার পুরোপুরি বাস্তবায়ন ঘটে গেছে। অতীতের অসংখ্য পয়গম্বরের বিপরীতে, মুহাম্মদ (স:) কেবল নারী ও পুরুষের জন্যে ব্যক্তি পর্যায়ে নতুন আশার নিজস্ব দর্শনই আনেননি, বরং মানুষের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করার এবং একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন যেখানে নারী-পুরুষ যার যার নিজস্ব সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। *উম্মার* রাজনৈতিক সাফল্য মুসলিমদের কাছে বলতে গেলে পবিত্র বিষয়ে পরিণত হয় : এটা তাদের মাঝে ঈশ্বরের অদৃশ্য উপস্থিতির প্রকাশ্য চিহ্ন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরবর্তীকালেও পবিত্র দায়িত্ব রয়ে গেছে: মুসলিম সাম্রাজ্যের পরবর্তী সাফল্য ছিল সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার একটা 'নিদর্শন'।

গসপেলের জেসাসের মত গ্যালিলির পাহাড়-পর্বতে সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার আর চিকিৎসার পরিবর্তে মুহাম্মদ (স:)কে আপন সমাজ-সংস্কারের কঠিন রাজনৈতিক প্রয়াস চালাতে হয়েছে এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ সেই সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। আদি-ক্রিশ্চানদের মত *প্যাক্স রোমানার* গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের ব্যক্তি জীবন পুনর্গঠনের সকল প্রয়াস পরিচালিত করার বদলে মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর সহচররা তাদের সমাজকে উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তা না হলে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব ছিল না। কোরান স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে ব্যক্তির অনন্ত পরিণাম অসম্ভব গুরুত্ববহ এবং মুসলিমদের সামাজিক দায়িত্বের অগ্রবর্তী। ইতিহাস এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই শেষ কথা নয়, এর পেছনে রয়েছে দুর্জ্ঞেয় স্বর্গীয় নির্দেশনা : ব্যক্তির অনন্ত পরিণাম সামাজিক সংস্কারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোরানের প্রতীকী বিচার, নরক এবং স্বর্গ যা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে কোরান আরবে অনুভূত হতে শুরু করা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক নতুন চেতনার প্রতি সাড়া প্রদান করেছে এবং এর সামাজিক বিধিবিধানসমূহে তার প্রতিফলন ঘটেছে। গোত্রীয় ব্যবস্থার পতন সত্ত্বেও প্রাচীন সাম্প্রদায়িক আদর্শগুলো টিকে ছিল এবং মুহাম্মদ (স:) এই সত্য অস্বীকার করতে পারেননি, ফলে আমাদের বর্তমান পশ্চিমের উদার আদর্শের উপযোগি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দিতে পারেননি– তবে সূচনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রক্তপাত আর শোষণের অন্তহীন চক্রটি আরবে ক্রিয়াশীল থাকলে ব্যক্তির মুক্তি অর্জন সম্ভব হত না : দুর্নীতিগ্রস্ত এবং পতন-উন্মুখ সমাজ অনিবার্যভাবে অনৈতিকতা, অস্থিরতা আর হতাশার জন্ম দেয়, ফলে সপ্তম শতকের আরবে ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তি পরিকল্পনার একটা চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল।

মুহাম্মদ (স:) মদিনায় এমন এক সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছেন যেটা চারপাশের গোলমাল থেকে মুক্ত। অন্য গোত্রীয় দলগুলো এতে যোগ দিতে শুরু করেছিল, যদিও তাদের সবাই তাঁর ধর্মীয় দর্শনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারেনি। টিকে থাকার স্বার্থে *উম্মার* শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর হওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মুহাম্মদের (স:) প্রধান লক্ষ্য ছিল '*ভাল*' সমাজ গঠন, রাজনৈতিক শক্তি নয়।

মুহাম্মদের (স:) সাফল্য কোরানের দাবীর– যেসব সমাজ এই আইন প্রত্যাখ্যান করবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য–যথার্থতা প্রমাণ করে বলেই মনে হয়। কিন্তু সংগ্রাম তখনও শেষ হয়নি। মুসলিমরা তাবুক থেকে ফিরে আসার পর কেউ কেউ অস্ত্র ত্যাগ করেছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (স:) তাদের বলেছেন : লড়াই শেষ হয়নি, তাদের নতুন প্রয়াসের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া উচিত। মানব ইতিহাসে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ কখনও শেষ হবার নয় : বারবার নতুন নতুন বিপদ আর সমস্যা মোকাবিলার প্রয়োজন দেখা দেবে। কখনও কখনও মুসলিমদের যুদ্ধ করতে হবে;

অন্য সময় হয়ত তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু তারা ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার এবং মানুষের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, বিশ্বের চলমান বাস্তবতায় অনিবার্যকে ঘটানোর দায়িত্ব। আজও মুসলিমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করছে।

তায়েফের অনিচ্ছুক আত্মসমর্পণ থেকে বোঝা যায় আরবদের অনেকেই নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অনীহ ছিল। বেদুঈন মিত্রদের মুহাম্মদের (স:) প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য ছিল মাত্র: কিন্তু একদল নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম অনুসারী ছিল তাঁর যারা হয়ত পুরোপুরি পয়গম্বরের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এরাই আবার দেখাবে যে তারা অত্যাবশ্যক বার্তাটা ধরতে পেরেছিল। আবু বকর, উমর, এবং উসমান ইবন আফফান বৈবাহিক সূত্রে তাঁদের পয়গম্বরের পরিবারের সদস্য হয়েছিলেন যা তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে জোরদার করেছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মের একটা অগ্রাধিকার রয়েছে : আরবদের সর্বাগ্রে ইসলামের 'স্তম্ভগুলো'র চর্চার মাধ্যমে নিজের সংস্কার করতে হবে, যা তাদেরকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বরের স্থাপন এবং সমাজের দুর্বল সদস্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখার শিক্ষা দেয়।

মুহাম্মদের (স:) চতুর্থ ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন বীর আলী, অন্যদের তুলনায় তরুণ ছিলেন তিনি এবং মাঝে মাঝে প্রবীণদের বেলায় অধৈর্য হয়ে উঠতেন। কিন্তু ৬৩২ খৃস্টাব্দে তিনিও মুহাম্মদের (স:) বাড়ির অন্যতম শেষ সদস্য হন। তাবুক অভিযানের সময় মৃত্যুবরণ করেন উম্ম কুলসুম, যার অর্থ ফাতিমাহ্ (আলীর স্ত্রী) ছিলেন খাদিজার একমাত্র জীবিত সন্তান। আলীর দুই ছেলে হাসান ও হুসাইনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন মুহাম্মদ (স:)। ওদের নিজের পিঠে উঠে ঘোড়ায় চাপার সুযোগ দিতেন তিনি। কিন্তু উপপত্নী মিশরীয় মারিয়ামের গর্ভে মুহাম্মদের (স:) এক নবজাত পুত্র সন্তানও ছিল, তিনি শিশু ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে মদিনায় ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। আয়েশা অবশ্য এতে প্রভাবিত হতে রাজি হননি। 'ছেলেটা দেখতে আমার মত না?' আয়েশাকে জিজ্ঞেস করতেন মুহাম্মদ (স:)। 'আমি কোনও মিল দেখি না,' পাল্টা জবাব দিতেন আয়েশা। 'দেখুন কেমন স্বাস্থ্যবান আর ফর্শা ওর গায়ের রঙ!' উৎসাহের সঙ্গে বলতেন পয়গম্বর। 'ভেড়ার দুধ খেলে যেকেউই স্বাস্থ্যবান আর ফর্শা হতে বাধ্য,' তীর্যক স্বরে জবাব দিতেন আয়েশা,[১] সম্ভবত: ইব্রাহীমের দুধ-মাতার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থায় দুধ সরবরাহ করা হত বলে ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি। কিন্তু এত যত্ন সত্ত্বেও ৬৩২ খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি; সে আর সেরে উঠবে না, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ছেলের মৃত্যুর সময় পাশেই ছিলেন মুহাম্মদ (স:), শেষ মুহূর্তে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হু-হু করে কেঁদেছেন। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, শিগগিরই আবার মিলিত হবেন তাঁরা।

হিজরার দশম বছর থেকে মুহাম্মদ (স:) আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান হারে সচেতন হয়ে উঠেন। মদিনায় অবস্থানের সুযোগ করতে পারলে রমযান মাসে

সবসময়ই ধ্যানে মগ্ন হতেন তিনি, এবছর সহচরদের স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ ধ্যানের কথা বলেন, ফাতিমাহ্‌র কাছে জানান যে, সম্ভবতঃ তাঁর শেষ সময় আসন্ন। তো *হজ্জের* ঐতিহাসিক মাস ধু আল-হিজ্জায় মুহাম্মদ (স:) নিজে *হজ্জযাত্রায়* নেতৃত্ব দেয়ার ঘোষণা দিলেন। এবারই প্রথমবারের মত কেবল একজন ঈশ্বরের উপাসকগণ কা'বা এবং আরাফাত পর্বতের আশপাশে উপাসনাগৃহে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানগুলো পালন করবে। মুহাম্মদ (স:) তাঁর নতুন ধর্মকে আরবের পবিত্র ঐতিহ্যে স্থাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ৬৩২ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সকল স্ত্রী এবং এক বিশাল সংখ্যক তীর্থযাত্রীকে নিয়ে রওনা হয়ে ধু আল হিজ্জা মোতাবেক ৩ মার্চ মক্কার উপকণ্ঠে পৌছেন তিনি। তীর্থযাত্রীদের প্রাচীন ধ্বনি জোর গলায় বলছিলেন তিনি : 'হে ঈশ্বর, তোমার সেবায় আমি হাজির হয়েছি।' এরপর তীর্থযাত্রীদের নিয়ে প্রাচীন আরবদের প্রাণপ্রিয় পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠানগুলো পালন শুরু করেন, একই সময়ে অতীতের সঙ্গে অত্যাবশ্যক এবং সৃজনশীল ধারাবাহিকতা অর্জনের ভেতর দিয়ে আচার অনুষ্ঠানগুলোকে নতুন তাৎপর্যও দান করেন।

পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া সাপেক্ষে প্রত্যেক মুসলিমের জীবনে একবার *হজ্জ* পালনের চেষ্টা চালানো আবশ্যক। বহিরাগত কারও চোখে এসব আনুষ্ঠানিকতাকে অদ্ভুত ঠেকতে পারে– অচেনা যেকোনও ধর্মীয় বা সামাজিক আচারের মত–কিন্তু এগুলো এখনও এক প্রবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণা জোগাতে সক্ষম; এবং মুসলিমরা প্রায়শইঃ *হজ্জকে* তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যক্তি এবং *উম্মার* সদস্য হিসাবে চরম পর্যায় হিসাবে আবিষ্কার করে থাকে। *হজ্জের* আচার এবং অনুশীলনে ইসলামি আধ্যাত্মিকতার গোষ্ঠীক এবং ব্যক্তিক দিকগুলো নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর হাজার হাজার *হজ্জযাত্রী* মক্কায় সমবেত হয়, তারা আরব নয়, কিন্তু এসব প্রাচীন আরবীয় আচার অনুষ্ঠানকে আপন করে নিতে পেরেছে তারা। জাতি বা শ্রেণীর পার্থক্য মুছে দেয়া ঐতিহ্যবাহী তীর্থযাত্রার পোশাকে তারা যখন কা'বায় একত্রিত হয়, তাদের অনুভূতি জাগে যে প্রতিদিনের জীবন যাপনের অহমিকাজাত সীমাবদ্ধতা থেকে তারা মুক্ত হয়ে গেছে এবং এমন এক গোষ্ঠীতে একীভূত হয়েছে যার একটাই লক্ষ্য, একটাই উদ্দেশ্য। কা'বার চারপাশে প্রদক্ষিণ অতিসম্প্রতি ইরানী দার্শনিক আলী শরীয়াতিকে অনুপ্রাণিত করেছে :

> প্রদক্ষিণ করতে করতে আপনি যখন কা'বার নিকটবর্তী হন, আপনার মনে হবে একটা ক্ষীণধারা বিশাল এক নদীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এক স্রোতের ধাক্কায় মাটির সঙ্গে সম্পর্ক হারান আপনি। সহসা আপনি বানের জলে ভাসতে থাকেন। কেন্দ্রের কাছে যাবার পর মানুষের ভিড় আপনার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করে যে আপনি নতুন জীবন লাভ করেন। এখন আপনি তার একটা অংশ; এখন একজন মানুষ, জীবিত এবং চিরন্তন... কা'বা এই পৃথিবীর সূর্য যার মুখ আপনাকে তার কক্ষপথে টেনে নিয়ে যায়। আপনি বৈশ্বিক ব্যবস্থার অংশে পরিণত হন। আল্লাহর চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে অচিরেই নিজেকে বিস্মৃত হবেন

আপনি... এমন একটা পদার্থে পরিণত হয়ে গেছেন আপনি যা ক্রমশঃ গলিত এবং অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এটা ভালবাসার চরম এবং পরম শিখর।[২]

গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিকতার ওপর ইহুদী এবং ক্রিশ্চানরাও গুরুত্ব আরোপ করে। সেইন্ট পলের বডি অব ক্রাইস্ট-এর বর্ধিত ভাবমূর্তিও গির্জার ঐক্য এবং এর সদস্যদের মিলিতরূপকে চরম ভালবাসার প্রকাশ বলে দাবী করেছে। *হজ্জ* প্রত্যেক মুসলিমকে ঈশ্বরকে কেন্দ্রে স্থাপন করে *উম্মার* প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির মিশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা দেয়।

এক অর্থে *হজ্জ* মুসলিমদের আদর্শ সমাজের একটা ধারণা দেয়–আচরণ এবং চর্চার দিক থেকে। অধিকাংশ ধর্মেই শান্তি এবং সমতা তীর্থযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তীর্থযাত্রীগণ একবার স্যাঙ্কচুয়ারিতে প্রবেশ করার পর সব ধরনের সহিংসতা নিষিদ্ধ হয়ে যায় : তীর্থযাত্রীরা এমনকি কোনও কীট-পতঙ্গ হত্যা বা অসংযত বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না। একারণেই ১৯৮৭ খৃস্টাব্দের *হজ্জ*-এর সময় ইরানি *হজ্জযাত্রীদের* দ্বারা সংঘটিত দাঙ্গায় ৪০২ জন নিহত এবং ৬৪৯ জন আহত হলে গোটা মুসলিম বিশ্বে ধিক্কার পড়ে যায়।

কোরান বারবার সকল প্রাণীর ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছে আর *হজ্জ* ঈশ্বরের কাছে স্বেচ্ছায় ফিরে যাবার মুসলিমদের এক শক্তিশালী অভিব্যক্তি– ঈশ্বরের কাছ থেকেই তাদের আগমন ঘটেছে। *হজ্জযাত্রীদের* সমস্বরে উচ্চারিত *হজ্জের* ঘোষণা তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ব্যক্তি এবং *উম্মা* হিসাবে পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের তারা নিয়োজিত করেছে এবং *হজ্জের* দিনগুলোতে তারা সকল সমস্যা ভুলে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে আরও প্রবলভাবে এই অঙ্গীকারটুকুকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মুহাম্মদ (স:) যখন ৬৩২ খৃস্টাব্দে অভিবাসী, সাহায্যকারী এবং বেদুঈনদের সঙ্গে নিয়ে কা'বার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন, নিঃসন্দেহে তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে গূঢ় অর্থে এটা এক ধরনের ফিরতি যাত্রা। পবিত্র স্থানসমূহে অধিকাংশ তীর্থযাত্রাকে কারও শিকড়ে প্রত্যাবর্তন বা জগতের সূচনা হিসাবে দেখা হয়ে থাকে: অভিবাসীদের নিশ্চয়ই বাড়ি ফেরার বিশেষ রকম অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (স:) সকল আরবকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে আরবজাতির পিতা আব্রাহাম এবং ইসমায়েল উপাসনালয়টি নির্মাণ করেছিলেন বলেই তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন। আজও মুসলিমরা তাদের মুসলিম পরিচয়ের শেকড়ে ফেরার অনুভূতি লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে মুহাম্মদকে (স:) স্মরণ করালেও *হজ্জের* আনুষ্ঠানিকতাগুলো মূলতঃ প্রকৃত বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ও ইসমায়েলের স্মরণের জন্যেই পরিকল্পিত। তো যখন তারা সাফা ও মারওয়ায় সাতবার দৌড়ায় তখন তারা স্মরণ করে আব্রাহাম তাঁদের মরুভূমিতে রেখে যাবার পর হ্যাগার শিশুপুত্র ইসমায়েলের জন্যে পানির সন্ধানে কিভাবে পাগলের মত ছোটাছুটি করেছিলেন। এরপর তারা এমনকি মক্কার ১৬ মাইল দূরে আরাফাত পর্বতের ঢালে

দাঁড়িয়ে সাধারণ অতীতে ফিরে যায়, স্মরণ করে ঈশ্বর এবং আদি পয়গম্বর ও মানব জাতির প্রতিষ্ঠা আদমের আদি চুক্তির কথা। মিনায় তারা তিনটি স্তম্ভ লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করে, যা ঈশ্বরের সেবায় *জিহাদের* জন্য রিপুর বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামের স্মারক। এরপর আপন পুত্রকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার পর আব্রাহামের পশু উৎসর্গের ঘটনার স্মরণে তারা ভেড়া বা ছাগল উৎসর্গ করে। সারা বিশ্বের মুসলিম যারা সেবছর *হজ্জ* পালন করতে পারে না, তারা নির্দিষ্ট সময়ে এ আচার পালন করে, এভাবে সমগ্র *উম্মা* ঈশ্বরের সেবায় একান্ত প্রিয় বস্তুসহ নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করার প্রস্তুতি জানিয়ে দেয়।

বর্তমানে আরাফাত পর্বতের যেখানে নামিরা মসজিদটি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে দাঁড়িয়েই মুহাম্মদ (সঃ) ৬৩২ খৃস্টাব্দে তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তিনি তীর্থযাত্রীদের একে অপরের সঙ্গে ন্যায় বিচার করতে বলেছিলেন, নারীদের যথাসম্ভব মর্যাদা দিতে বলেছেন, বলেছেন পৌত্তলিকতার আমলে সংঘটিত সকল আপরাধের প্রতিশোধ ত্যাগ করার জন্যে। *উম্মা* একক সত্তা : 'মনে রাখবে প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই আর মুসলিমরা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। কোনও ভাই স্বেচ্ছায় অপর ভাইকে কিছু দিলে সেটা বৈধ, সুতরাং তোমরা নিজেদের ওপর অন্যায় করো না। হে ঈশ্বর, আমি কি বলিনি?'[৩] সারমন অন দ্য মাউন্টেন বা সেইন্ট পলের হাইম টু চ্যারিটির কাছে এই আদেশ সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন বাস্তববাদী, জানতেন তিনি বৈপ্লবিক কিছু আশা করছেন। আলাদা আলাদা গোত্রের সদস্য নয়, আরব মুসলিমরা এখন একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত, ঠিক কা'বার প্রভু যেমন একজন।

বিদায় *হজ্জের* পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন যখন, অসহনীয় মাথাব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন তিনি। আয়েশা একদিনের কথা স্মরণ করেছেন, মাথা ব্যথার জন্যে তিনি নিজেও শুয়েছিলেন। 'আহ, আমার মাথা!' মুহাম্মদ (সঃ) কামরায় প্রবেশ করলে ককিয়ে উঠেছিলেন। 'না, আয়েশা', জবাব দিয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ), 'এটা "ওহ্ আমার মাথা" হবে।' তবে এই সময়ে তিনি আয়েশার সঙ্গে হালকা রসিকতা করতে সক্ষম ছিলেন। আয়েশা কি তাঁর আগে মৃত্যুবরণ করতে পছন্দ করবেন? সেক্ষেত্রে তিনি তাঁকে কোলে করে কবরে নিয়ে দাফন করার সুযোগ পেতেন। আয়েশা স্বভাবসুলভ ঠাণ্ডা স্বরেই জবাব দিয়েছিলেন : দাফনের পর মুহাম্মদ (সঃ) সোজা আরেক জন স্ত্রীর কাছে চলে যেতেন! 'না, আয়েশা!' বেরিয়ে যাবার সময় বলেছেন মুহাম্মদ, 'ওহ্, আমার মাথা।'[৪]

মাথাব্যথা বেড়ে উঠছিল, মাঝে মাঝেই চেতনা লোপ পাচ্ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) কখনও শয্যাশায়ী হননি। প্রায়শঃই তিনি কপালে চাদর পেঁচিয়ে প্রার্থনার নেতৃত্ব দান কিংবা জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে মসজিদে যেতেন। কিন্তু একদিন সকালে বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে উহুদের যুদ্ধে নিহত মুসলিমদের জন্যে প্রার্থনা করলেন, শেষে যোগ করলেন : 'ঈশ্বর তার এক দাসকে এই পৃথিবী কিংবা ঈশ্বরের

নৈকট্যের মধ্যে একটা বেছে নিতে বলেছেন, দাস শেষেরটিই বেছে নিয়েছে।' তবে একমাত্র আবু বকরই মুহাম্মদের (সঃ) মৃত্যুর এই পূর্বাভাস ধরতে পেরেছিলেন যেন, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। 'আস্তে, আবু বকর, আস্তে, আগামীকাল কোথায় থাকব আমি? আগামীকাল কোথায় থাকব আমি?' আবার কখন আয়েশার সান্নিধ্য পাবেন, মুহাম্মদ (সঃ) এটাই জানতে চাইছেন বুঝতে পেরে তাঁরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলেন যে পয়গম্বরকে আয়েশার কুটিরে নিয়ে গিয়ে সেখানেই তাঁর সেবা শুশ্রূষা করা হবে।

আয়েশার কোলে মাথা রেখে চুপচাপ থাকতেন মুহাম্মদ (সঃ); কিন্তু লোকে একে সাময়িক অসুস্থতা ভেবেছিল, কেননা তিনি তখনও মসজিদে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পয়গম্বরের মৃত্যুর চিন্তা *উম্মার* জন্যে আতঙ্ককর আর অসহনীয় ছিল বলে তারা লক্ষণ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও আবু বকর আয়েশাকে এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে মুহাম্মদ (সঃ) আর বেশিদিন নেই। আরবে মুহাম্মদের (সঃ) অর্জন ছিল অনন্য এবং নজীরবিহীন, তাই নতুন বিধানে তাঁর উপস্থিতিবিহীন দীর্ঘযাত্রা অচিন্তনীয় ছিল। লোকে আশায় বুক বেঁধে খড়ও আকড়ে ধরে, মুহাম্মদ (সঃ) একদিন টলমল পায়ে মসজিদে এসে উত্তরে অভিযানে নেতৃত্বদানের জন্যে যায়েদ পুত্র উসামাহ যোগ্য বলে আশ্বাস দিতে এলে তাই হয়েছিল। অসুস্থতা আরও বেড়ে উঠলে তিনি আবু বকরকে তাঁর পক্ষে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলেছিলেন, এমনকি আয়েশাও এই সিদ্ধান্তে বাধা দিয়েছেন। শেষে নির্দেশ পালিত হওয়ার জন্যে রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে মুহাম্মদকে (সঃ)। পরে আয়েশা বলেছেন, বাবাকে অনুপযুক্ত মনে করে বাধা দেননি তিনি, বরং তিনি ভেবেছিলেন মুহাম্মদের (সঃ) ভূমিকা গ্রহণের জন্যে লোকে তাকে ঘৃণা করবে। এরপরও মুহাম্মদ (সঃ) তাদের মনে আশা জাগিয়ে তুলছিলেন, কারণ মাঝে মাঝেই প্রার্থনায় যোগ দিতেন তিনি, যদিও নিজে আবৃত্তি করার মত শক্তি তাঁর ছিল না; চুপ করে আবু বকরের পাশে বসে থাকতেন।

১২ রবি-তে (৮ জুন ৬৩২) প্রার্থনার সময় আবু বকর লক্ষ্য করলেন যে জনতার মনোযোগ বারবার বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, মসজিদের দরজার দিকে তাকাচ্ছে তারা। নিমেষেই বুঝে ফেলেন তিনি যে মুহাম্মদের (সঃ) আগমন ঘটেছে, অন্য কোনও কিছু এভাবে জমায়েতের মনোযোগ নষ্ট করতে পারত না। বেশ সুস্থ দেখাচ্ছিল মুহাম্মদকে (সঃ); প্রকৃতপক্ষে, কেউ কেউ এও বলেছিল যে তাঁকে এত উজ্জ্বল আর কখনও দেখেনি তারা; আনন্দ আর স্বস্তির একটা ঢেউ বয়ে যায় গোটা মসজিদে। দ্রুত সরে যাবার উপক্রম করেছিলেন আবু বকর, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর কাঁধে হাত রেখে আবার জমায়েতের নেতৃত্বে বসিয়ে দেন এবং প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকেন তাঁর পাশে। পরে আয়েশার কুটিরে ফিরে তাঁর কোলে মাথা রেখে নীরবে শুয়ে পড়েন। তাঁকে এতই সুস্থ দেখাচ্ছিল যে আবু বকর মদিনার অপর প্রান্তে বসবাসরত সদ্য বিবাহিত এক স্ত্রীকে দেখতে যাবেন বলে ছুটি চেয়ে নিয়েছিলেন। বিকেলের দিকে আলী এবং আব্বাস পয়গম্বরকে দেখে যান এবং তাঁর সুস্থ হয়ে

ওঠার খবর ছড়িয়ে দেন: এরপর আব্দ আল-রাহমান তাঁকে দেখতে এলে মুহাম্মদ (স:) তাঁর হাতে একটা খিলাল দেখে সেটা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ওটাকে নরম করে দেন আয়েশা এবং মুহাম্মদ (স:) অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে প্রবল বেগে তা ব্যবহার করেন। কিন্তু অচিরেই আয়েশা লক্ষ্য করেন যে তিনি তাঁর কোলে আরও গভীরভাবে এলিয়ে পড়ছেন এবং যেন চেতনা হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু তখনও কী ঘটছে বুঝতে পারেননি তিনি। পরে যেমন বলেছেন, আমার কম বয়স আর অজ্ঞতার দরুণই পয়গম্বর আমার কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তিনি পয়গম্বরকে বিড়বিড় করে বলতে শুনেছেন 'বেহেশতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী',[৬] এবং এরপরই বুঝতে পারেন পয়গম্বর বিদায় নিয়েছেন। সযত্নে তাঁর মাথা বালিশের ওপর রেখে আরবের সে সময়ের রীতি অনুযায়ী চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বুকে চাপড় আর গালে আঘাত কষতে শুরু করেছিলেন আয়েশা।

মহিলাদের মৃত্যু শোকে বিলাপ করতে শুনে লোকজন ফ্যাকাশে চেহারায় মসজিদের দিকে ছুটে এসেছিল। মরুদ্যানে ঝড়ের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত নগরীতে ফিরে আসেন আবু বকর। মুহাম্মদের (স:) দিকে এক নজর তাকিয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করেন তিনি, এবং বিদায় জানান। এরপর মসজিদে গিয়ে দেখতে পান উমর জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন। মুহাম্মদ (স:) পরলোকগমন করেছেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি হচ্ছিলেন না : সাময়িকভাবে তাঁর আত্মা দেহ ত্যাগ করেছে, যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, নিশ্চয়ই পয়গম্বর আবার ফিরে আসবেন। তাঁর মৃত্যু ঘটবে সবার শেষে। উমরের বক্তৃতায় নিশ্চয়ই চড়া সুর ছিল, কারণ আবু বকর নিচু কণ্ঠে তাঁকে বলেছিলেন, 'আস্তে, উমর', কিন্তু উমর কথা থামাতে পারেননি। এরপর সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আবু বকরের উপায় ছিল না, তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে জনতা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হয়েছিল, কারণ উমরের বক্তব্য শোনা বাদ দিয়ে তারা আবু বকরের চারপাশে জমায়েত হতে শুরু করেছিল।

আবু বকর সবাইকে মনে করিয়ে দেন যে মুহাম্মদ (স:) সারা জীবন ঈশ্বরের একত্বের প্রচার করে গেছেন। কোরান বারবার ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান অন্য কাউকে দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। মুহাম্মদ (স:) বারবার তাঁকে ক্রিশ্চানরা যেভাবে জেসাসকে সম্মান করে সেরকম সম্মান প্রদর্শনে নিষেধ করেছেন, তিনি বাকি সবার মতই একজন মরণশীল মানুষ। মুহাম্মদের (স:) মৃত্যু অস্বীকার করার মানে দাঁড়াবে মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে মূল সত্যকে অস্বীকার করা। কিন্তু মুসলিমরা যতদিন একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে ততদিন মুহামদ (স:) বেঁচে থাকবেন। 'হে জনতা, মুহাম্মদের (স:) যদি কেউ উপাসনা করে থাকে, মুহাম্মদ মারা গেছেন,' অসাধারণ ভঙ্গিতে শেষ করেছেন তিনি, 'আর কেউ যদি ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকে, ঈশ্বর বেঁচে আছেন, তিনি অমর।'[৭] সবশেষে উহুদ যুদ্ধের পরপর মুহাম্মদের (স:) কাছে অবতীর্ণ আয়াত উদ্ধৃত করেন তিনি–মুহাম্মদের (স:) নিহত হবার

মুহাম্মদ রসুল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে বহু রসুল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে কি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পিছু হটবে? আর যে পিঠ ফিরিয়ে সরে পড়ে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।[৮]

এই আয়াত সমবেত জনতার ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যেন এর আগে এগুলো কখনও শোনেনি তারা। উমর পুরোপুরি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন : 'ঈশ্বরের শপথ, আবু বকরকে এ বাণী আবৃত্তি করতে শুনে একেবারে কি বাকরহিত হয়ে পড়ি আমি, আমি হাঁটুতে জোর পাচ্ছিলাম না, পয়গম্বর সত্যি পরলোকগমন করেছেন বুঝতে পেরে মাটিতে পড়ে যাই।'[৯]

মুহাম্মদের (স:) পরলোকগমনের ঘটনার মত এত বড় সঙ্কট আর কখনও মুসলিম সমাজকে মোকাবিলা করতে হয়নি। এর আগে পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে মুহাম্মদ (স:) তাদের পথ বাতলে দিয়েছেন, তো তাঁকে ছাড়া এখন কীভাবে চলবে তারা? কিছু কিছু বেদুঈন গোত্র যাদের অঙ্গীকার কেবল রাজনৈতিক ছিল, মুহাম্মদের (স:) মৃত্যুর ফলে চুক্তি রদ হয়েছে ভেবে *উম্মা* থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আরব বিশ্ব আবার প্রাচীন গোত্রীয় বিভক্তিতে পতিত হওয়ার সত্যিকারের বিপদ ছিল। নিবেদিতপ্রাণ কিছু মুসলিম হয়ত মুহাম্মদের (স:) মৃত্যুর অর্থ তাঁর উদ্যোগেরও মৃত্যু ভেবে বসেছিল,[১০] আর উত্তরাধিকারী নির্বাচনে ইচ্ছুকগণ অচিরেই আলাদা শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল; শেষ বছরগুলোয় মুহাম্মদ (স:) মুসলিম গোষ্ঠীতে যে বিভাজন আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন ছিলেন, সম্ভবত: এগুলো তারই প্রতিফলন ছিল।

মুহাম্মদের (স:) মিশনের একেবারে সূচনালগ্ন থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকরের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল অধিকাংশ অভিবাসী। উমরও সমর্থন দিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু সাহায্যকারীগণ স্বাভাবিকভাবেই তাদের একজন সদস্য সা'দ ইবন উবাদাহকে প্রথম *খলিফা* বা মুহাম্মদের (স:) প্রতিনিধি হিসাবে চেয়েছিল; আর পয়গম্বরের পরিবারের বিশ্বাস ছিল যে তিনি হয়ত আলীকেই উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখতে চাইতেন। শেষ পর্যন্ত আবু বকরই জয়ী হন, কেননা ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর সঙ্কট মোকাবিলা গোটা উম্মাকে অভিভূত করেছিল। নির্বাচিত হওয়ার পর আবু বকর মুসলিম গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেছেন, তিনি সকল মুসলিম শাসকদের অনুসরণীয় নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন :

আমাকে আপনাদের ওপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি আপনাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। আমি ঠিক পথে থাকলে, সাহায্য করবেন; যদি ভুল পথে যাই, আপনারা আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন। আনুগত্যে সত্যের অবস্থান

আর বিশ্বাসঘাতকতায় মিথ্যার। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমি অধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আপনাদের মাঝে দুর্বল জন আমার চোখে শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবেন; আর যতক্ষণ না অধিকার কেড়ে নিতে পারছি ততক্ষণ সবল আমার চোখে হবেন দুর্বল। কোনও জাতি যদি ঈশ্বরের পথে যুদ্ধ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখে, ঈশ্বর তাদের অসম্মান করবেন। কোনও জাতির মধ্যে অশুভ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে না, তবু ঈশ্বর সবার উপরই দুর্যোগ নামান। আমি যতক্ষণ ঈশ্বর এবং তাঁর পয়গম্বরকে মানব আপনারা ততক্ষণ আমাকে মানবেন, আর যদি আমি তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করি, আমার প্রতি অনুগত থাকার প্রয়োজন থাকবে না আপনাদের। প্রার্থনার জন্যে উঠে দাঁড়ান। ঈশ্বর আপনাদের ক্ষমা করবেন।[১১]

শুরুতে আবু বকরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন আলী, কিন্তু পরে আনুগত্য স্বীকার করে নেন। মাত্র দু'বছর পর মারা যান আবু বকর, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন প্রথমে উমর এবং তারপর উসমান এবং সবশেষে ৬৫৬ খৃস্টাব্দে আলী হন চতুর্থ *খলিফা*। তাঁরা *রাশিদুন*–সঠিক পথে পরিচালিত *খলিফা* নামে পরিচিত, কারণ তাঁরা মুহাম্মদের (স:) নীতিমালা অনুসরণে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। বিশেষ করে আলী মুসলিম শাসক যেন স্বেচ্ছাচারী না হন সেদিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের অধীনে প্রজাদের সমমর্যাদার অধিকারী, তাঁকে অবশ্যই দরিদ্র এবং দুস্থজনের ভার লাঘবের প্রয়াস পেতে হবে। কোনও শাসকের টিকে থাকার এটাই একমাত্র উপায় :

সুতরাং আপনার প্রজারা যদি কষ্টের অভিযোগ তোলে, সমস্যার কথা বলে; সেচের পানি বন্ধ হয়ে যাবার অভিযোগ আনে, অনাবৃষ্টি বা বন্যার কারণে জমির অবস্থা পরিবর্তন বা খরায় ভূমির ধ্বংসের কথা বলে, তাদের ভার এমনভাবে লাঘব করবেন ঠিক যেমনভাবে নিজের বেলায় এসবের সংশোধন চাইতেন আপনি। এবং তাদের ভার লাঘবের উপায়কে নিজের ওপর ভার হতে দেবেন না, কারণ এটা একটা আধার যেখানে তারা আপনার এলাকায় সমৃদ্ধি নিয়ে এবং আপনার আইন প্রতিষ্ঠার করে ফিরে আসবে... প্রকৃতই জমিনের ধ্বংস এর অধিবাসীদের দুরবস্থারই পরিণাম আর অধিবাসীরা তখনই দুর্দশায় পড়ে যখন শাসকগণ নিজেদের জন্য সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, নিজেদের শাসন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন এবং যখন তারা সতর্কতামূলক উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন না।[১২]

শাসক অবশ্যই নিজেকে জনগণ থেকে একবারে আলাদা করে নেবেন না। জনগণের ভার বহনে অংশ নিতে হবে, তাদের সমস্যা এবং পরামর্শ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সকল মুসলিম শাসক এই মানদণ্ড অনুসরণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, *রাশিদুনদের* আমলকে মুসলিমরা স্বর্ণযুগ হিসাবে দেখে, এই বাস্তবতা দেখায় যে পরবর্তীকালের *খলিফা* এবং *সুলতানগণ* সমতা ও ন্যায়বিচারের নীতির প্রতি একইভাবে অনুরক্ত ছিলেন না। তবে মাঝে মাঝে একজন মুসলিম হয়ত এসব নীতিমালা অনুসরণ করে জীবন ধারণ আর শাসন করছেন দেখিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যেমন দেখেছি, ক্রুসেডের সময় নূর আদ-দিন এবং সালাদিন উভয়ই অপ্রত্যাশিতভাবে দরিদ্রদের সহায়তা দান, ইসলামি বিধি অনুযায়ী কর ব্যবস্থা সংস্কার এবং জনগণের সঙ্গে মিশেছেন। আমাদের যুগে আমরা দেখেছি মুসলিম জনগণ ইরানের শাহ এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট সা'দাতের মত শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে, কারণ তাঁদের সরকার ইসলামি ছিল না।[১৩] যে সব আদর্শ মুহাম্মদ (স:) এবং *রাশিদুনদের* অনুপ্রাণিত করেছে সেগুলো মুসলিম সমাজে শক্তিশালী শক্তি হিসাবে রয়ে গেছে, শাসকগণ এগুলো উপেক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন।

খৃস্টধর্মে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার প্রতি আবেগ রয়েছে এবং খৃস্টধর্মের প্রধান বিভাজন সমূহ সৃষ্টির পেছনে মতবাদগত বিরোধ ক্রিয়াশীল ছিল। জুডাইজমের মত ইসলামেও ধর্মতত্ত্বীয় 'বিদ্রোহী'র অস্তিত্ব নেই। এর সবচেয়ে গঠনমূলক বিরোধ আর গুরুত্বপূর্ণ বিভাজনগুলো রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। মুহাম্মদের (স:) সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত *উম্মার* ঐক্য মুসলিমদের মাঝে *সুন্নাহ* এবং *শিয়াই-ই আলী*– আলীর দল– নামে পরিচিত দুটো অংশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভাজিত হয়। শেষোক্ত দলের সমর্থকরা বিশ্বাস করে, একমাত্র আলীর বংশধরগণ *উম্মাকে* শাসন করার অধিকারী। সংখ্যালঘু অংশ হিসাবে শিয়াহ্‌রা এক ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল যা মুহাম্মদের (স:) পৌত্র হুসায়েনের মাধ্যমে বিমূর্ত করে তোলা হয়েছে। হুসায়েন উমাঈয়া খেলাফত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কারবালার যুদ্ধে সহচরদের নিয়ে খলিফা ইয়াযিদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। বিভিন্ন *শিয়াহ্‌* ও *সুন্নী* দলসমূহের মাঝে কে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেবে এবং সমাজের প্রকৃতি কী হবে এনিয়ে চলতে থাকা প্রবল বিতর্ক খৃস্টধর্মের ক্রাইস্টোলজিক্যাল বিতর্কের মতই গঠনমূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই বোঝা যায় *উম্মার* রাজনৈতিক বাস্তবতা ইসলামে পবিত্র মূল্য বহন করে। *শিয়াহ্‌* ও *সুন্নীর* মধ্যে মতবাদ সংক্রান্ত কোনও বিরোধ নেই, যদিও উভয়েই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ধর্মাচার গড়ে তুলেছে। আমরা দেখেছি কোরান ধর্মতত্ত্বীয় বিভাজন অস্বাস্থ্যকর এবং নিষ্ফল হিসাবে দেখে। কিন্তু মুসলিম শাসকগণ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করেছেন বলেই ইসলামে রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং ইসলামি প্রয়াস ইতিহাসকে বিলোপ এবং গোলমাল থেকে রক্ষা করার এক গতিশীল ঘটনা ছিল, সমাজ ন্যায় বিচারভিত্তিক এবং সাম্যবাদী আইন দ্বারা শাসিত না হলে যে পরিণতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়াত। একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক জীবনে রাজনৈতিক প্রয়াস অপরিহার্য নয়, বরং *উম্মার*

রয়েছে পবিত্র গুরুত্ব। একে নির্দিষ্ট ধর্মীয় পছন্দ, ব্যক্তি ক্রিশ্চানের আধ্যাত্মিক জীবনে যেমন (ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, মেথোডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট) আছে সেরকম একটা স্থানে রাখা যেতে পারে।

মুহাম্মদের (স:) পরলোকগমনের পরেও মুসলিম প্রচেষ্টার সাফল্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাফল্যেরই প্রমাণবাহী, এবং এও দেখায় যে কোনও সমাজ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী পুনসংগঠিত হয় তাহলে সেটা টিকে থাকে। আরব সেনাবাহিনী দ্রুত গতিতে হিমালয় থেকে পাইরেনিস পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। মূলত: এর পেছনে কোরানের যতটুকু না অনুপ্রেরণা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণা। নতুন প্রজাদের নতুন ধর্মগ্রহণের জন্যে কোনও রকম চাপ দেয়া হয়নি। ইসলামকে আরবদের ধর্ম হিসাবেই দেখা হচ্ছিল, যেমন জুডাইজম ইসরাইলীদের ধর্ম; এমনকি ৭০০ শতকে সংক্ষিপ্ত একটা সময়ের জন্যে ধমান্তরকরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদের (স:) পরলোকগমনের মোটামুটি একশ বছর পর *খলিফারা* সত্যি সত্যি জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করতে শুরু করেছিলেন। ইসলাম অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির জ্ঞান আত্মীকরণ করে নিজস্ব আলাদা একটা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলাম ভয়ঙ্কর বিভাজনের শক্তি ছিল না, বরং সমাজকে একত্রিত করতে সক্ষম বলে প্রমাণ রেখেছে।

নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে মুসলিম জুরিস্টগণ *জিহাদের* নতুন ধর্মীয় ব্যাখ্যা গড়ে তুলেছেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন, যেহেতু ঈশ্বর মাত্র একজন, গোটা বিশ্বকে একটিমাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা প্রশাসনের অধীনে আনতে হবে এবং গোটা বিশ্বকে স্বর্গীয় নীতিমালা গ্রহণ করানো এবং ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্যে অব্যাহত সংগ্রামে যোগ দেয়া সকল মুসলিমের দায়িত্ব। *উম্মা*, ইসলামের ঘর, এক পবিত্র এলাকা যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা জারি রয়েছে ; বিশ্বের বাকি অংশ, যুদ্ধের ঘর, পাপী এলাকা, যাকে ঈশ্বরের শাসনের অধীনে আনতেই হবে। যতক্ষণ না তা অর্জিত হচ্ছে, ইসলামকে চিরকালীন যুদ্ধের মত এক প্রয়াসে যুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সামরিক ধর্মীয়তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়নি এবং মুহাম্মদের (স:) মৃত্যুর একশো বছর পর এটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইসলামি সাম্রাজ্য এর বিস্তারের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এবং মুসলিমরা যুদ্ধের ঘরের সদস্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তখন এই নীতির মৃত্যু ঘটে। ইহুদী, ক্রিশ্চান বা যোরোস্ট্রিয়ানদের ওপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য কোনও চাপ প্রয়োগ করা হয়নি; মুসলিমরা মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মীয় বহুবাদীতা বজায় রেখেছিল এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করতে শিখেছিল, যা কোরান অনুযায়ী, প্রথম দিকের প্রত্যাদেশ মোতাবেক পুরোপুরি বৈধ।

বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও বংশের উত্থান ও পতন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামি সাম্রাজ্যের আরও প্রসার; এবং কোরান ব্যাখ্যার নতুন ও বিবিধ পদ্ধতির সৃষ্টি এ সবগুলোকেই ইতিহাসের সঙ্গে ইসলামি সংলাপের ধারাবাহিকতা হিসাবে দেখা যেতে পারে। মোটামুটি অতিসাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও মুসলিমরা আধুনিকতার চ্যালেঞ্জের

সৃজনশীল মোকাবিলা করে এসেছে। তারা ত্রয়োদশ শতকের মঙ্গোল ধ্বংসলীলার মত বিপর্যয়ে সাড়া দিয়ে নতুন করে আবার ক্ষমতায় আরোহন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সময়ের মানুষকে কোরান বিপর্যয় কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে চলেছে। মাঝে মাঝে নবপ্রয়াসসমূহ নির্দিষ্টভাবে আধ্যাত্মিক সাড়া হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে মহান সুফি জালাল-আদ-দিন রুমি জন্ম দিয়েছিলেন '*মাসনাবি*' যা সম্ভবত: সুফি মতবাদের মহত্তম রূপ–মঙ্গোল যাযাবররা ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদকে ধ্বংস করে দেয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এই মতবাদ জন্ম নেয়। সুফিরা দেখিয়েছেন ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদান কতখানি গভীরভাবে মুসলিমদের আধ্যাত্মিকতাকে প্রভাবিত করে। *উম্মার* প্রতি নিষ্ঠা সবসময়ই অতীন্দ্রিয়বাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। সুফি অতীন্দ্রিয়বাদের মহান বিশেষজ্ঞ লুইস ম্যাসিনন যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন : 'অতীন্দ্রিয় আহ্বান নিয়ম অনুযায়ীই সামাজিক অবিচার, সেটা কেবল অপরের নয়, বরং প্রাথমিকভাবে ও বিশেষ করে নিজের অপরাধের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের ফল : অন্তর্গত শুদ্ধতার দ্বারা যে কোনও মূল্যে ঈশ্বরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তা আরও জোরাল হয়ে ওঠে।'[১৪] সুফি মতবাদ প্রাথমিকভাবে দরবেশ সুলভ : এমন এক আধ্যাত্মিক প্রয়াসে তাঁরা লিপ্ত থাকেন যাকে '*মহত্তম জিহাদ*' বলে আখ্যায়িত করেন (শারীরিক সংঘাতের তুচ্ছ *জিহাদের* বিপরীত)। অবশ্য বর্তমান যুগে এক প্রবল আধ্যাত্মবাদ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সহজেই নিয়ন্ত্রিত করছে। সুফিগণ বহু সংস্কার আন্দোলনের প্রথম কাতারে ছিলেন, কিংবা *উম্মার* প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ানো যেকোনও বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন– সেটা মঙ্গোলদের মত বহিঃশত্রুই হোক কিংবা ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনায় ব্যর্থ কোনও শাসক হোক। সুফিগণ নিজেদের ক্রিশ্চান মঙ্কদের মত জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার থেকে সরিয়ে নেন না : ঈশ্বরকে পাওয়ার সংগ্রামে পৃথিবীই তাঁদের রঙ্গমঞ্চ।

স্বয়ং পয়গম্বর প্রদত্ত উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে এই আধ্যাত্মবাদ গড়ে উঠেছে, মুহাম্মদ (স:) কখনও জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেননি,বরং নিজের সমাজকে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন। কল্পনার স্বর্গরাজ্য বা ঐশী প্রতিশ্রুতিপূরণের অপেক্ষা না করে মুহাম্মদ (স:) নিজেই মদিনায় আদর্শ সমাজ গঠনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম থেকেই মুসলিমগণ তাঁর আদর্শে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলে : তাঁর *হিজরা* ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি এবং *খারেজি সেক্টের* সময় থেকে-যারা সপ্তম শতকে *উম্মা* থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল–সা'দাতের মিশরে '*তাকফির ওয়া'ল হিজরা*' নামে পরিচিত গ্রুপ পর্যন্ত মুসলিমরা সংস্কার করতে চেয়েছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা। আবু বকর মুসলিমদের বলেছিলেন যে, তিনি যদি সুশাসনে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁকে উৎখাত করা মুসলিমদের দায়িত্ব এবং মুসলিমরা একে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল। *উম্মার* কল্যাণ তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে জাগাতিক কর্মকাণ্ড থেকে

সরে দাঁড়ানোকে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক দায়িত্ব বলে ভাবতে পারে না। তাদের অবশ্যই *জিহাদে* অংশ নিতে হবে, তবে সেটা অতীতের চেতনায় বা ধর্মান্ধ আক্রোশে নয়, বরং আত্মত্যাগের ব্রত নিয়ে সাহস ও সহনশীলতার মধ্য দিয়ে। শাহ্‌র শাসনামলে ইরানের জনগণের কাছে প্রয়াত আলী শারীয়াতি যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন, নিজেতে আত্মসমর্পণ সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র কথা নয়, বরং ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষকে বাঁচানোর জীবনপণ সংগ্রামই আসল, যদি তাতে নির্যাতন বা মৃত্যুর শিকার হতে হয়, তবু :

> আপনাদের সন্ন্যাসজীবন কোনও মঠে নয়, বরং সমাজে; আত্মউৎসর্গ, আন্তরিকতা, আত্ম-অস্বীকৃতি, বাঁধন বহন, বঞ্চনা, নির্যাতন, দুঃখ এবং সংঘাত এলাকায় জনগণের স্বার্থে বিপদকে স্বাগত জানান যাতে আপনারা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারেন। পয়গম্বর বলেছেন, 'প্রত্যেক ধর্মের এক ধরনের সন্ন্যাসব্রত রয়েছে এবং আমার ধর্মের সন্ন্যাসব্রত হচ্ছে '*জিহাদ*'।[১৫]

প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বিশেষ জোর রয়েছে, কিন্তু এই সামাজিক বিষয়টি তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মেরই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিশ্চানদের চোখে মুসলিমদের রাজনৈতিক ব্রতের ধারণাকে অদ্ভুত মনে হয়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে তাদের অলৌকিক সত্যের দুর্বোধ্য ধর্মীয় সূত্রাদির প্রতি মতবাদ সংক্রান্ত উদ্বেগ ও আবেগও ইহুদী ও মুসলিমদের চোখে সমান অদ্ভুত ঠেকে।

মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য গড়ে তোলার একটা অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে পয়গম্বর মুহাম্মদের (স:) প্রতি ভক্তি। মুসলিমরা সব সময় জোরের সঙ্গে বলে এসেছে যে মুহাম্মদ (স:) তাদের মতই এক অতিসাধারণ মানুষ মাত্র, কিন্তু শত শত বছরের পরিক্রমায় তারা গুণ আরোপ করেছে। হ্যাঁ, মুহাম্মদ (স:) অন্য সবার মতই, কিন্তু তিনি 'পাথরের ভিড়ে হীরার মত।'[১৬] সাধারণ পাথর যেখানে অস্বচ্ছ এবং ভারি, একটা রত্ন সেখানে ঝকমকে, পরিবর্তিত আলোক রশ্মি খেলা করে তার মাঝে। মুহাম্মদের (স:) জীবনটাই 'নিদর্শন'- এ পরিণত হয়েছে, কোরান প্রকৃতিতে বাস্তব নিদর্শনকে দেখার জন্যে মুসলিমদের তাগিদ দিয়ে থাকে সেগুলোর মত। তাঁর পয়গম্বরত্ব ছিল একটা প্রতীক, একটা থিওফ্যানি, যা পৃথিবীতে সবসময় ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মানুষের আত্মসমর্পণের পরিপূর্ণ রূপটি দেখায়। মুহাম্মদের (স:) জীবনের অর্থ অনুসন্ধান এবং তাকে প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগের এক প্রয়াস হচ্ছে মুহাম্মদের (স:) ন্যায় পবিত্রতা বা ধার্মিকতার আদর্শ সৃষ্টি। ক্রিশ্চানগণও মানুষ জেসাসের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে, যিনি আবার *লগোসও*, ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার নীলনকশা। অবশ্য জেসাসের প্রতি আনুগত্যের বিপরীতে মুহাম্মদের (স:) প্রতি মুসলিমদের ভক্তি ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক চরিত্রটির প্রতি নয়, বরং একটা প্রতীক বা পবিত্রতার প্রতি যা মহৎ কোনও শিল্পের

প্রতীকীরূপের মত জীবনকে আলোকিত করে এবং সত্তার অতীত ভিন্ন এক বাস্তবতার মাত্রার দিকে ইঙ্গিত দেয়ার মাধ্যমে এক নতুন অর্থ প্রদান করে।

সুতরাং প্রতীকীরূপে মুহাম্মদকে (স:) একজন পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে দেখা হয়। আদর্শ মানুষ এবং ঈশ্বরের নিখুঁত গ্রাহকের প্রতিমূর্তি। একারণেই মুহাম্মদের (স:) নিরক্ষরতার বিষয়ে বিশ্বাসের এত কাল্পনিক গুরুত্ব, কেননা এটা তাঁর ঐশী বাণীর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকার পরিচয়বাহী। একইভাবে রাত্রি ভ্রমণকেও সুফিদের উল্লিখিত *'ফানা'* বা ঈশ্বরে বিলীন হবার চরম উদাহরণ হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। ঠিক যেভাবে ক্রিশ্চানগণ জেসাসকে অনুসরণ করার চর্চা করে, মুসলিমগণও তাদের দৈনন্দিন জীবনে মুহাম্মদকে (স:) অনুসরণ করতে চায় যাতে এই সম্পূর্ণতার যথাসম্ভব কাছাকাছি হয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারে। এবং প্রত্যাশিতভাবেই অনুসরণের এই প্রক্রিয়াটি জেসাসকে অনুসরণের চেয়ে ঢের বাস্তবসম্মত এবং মূর্ত। অষ্টম এবং নবম শতকে মুসলিম পণ্ডিতগণ মুহাম্মদের (স:) বাণীসমূহ (*হাদীস* : বিবরণ) এবং নির্দিষ্ট আচরণ (*সুন্নাহ্*)-এর বিশাল সংগ্রহ সংকলনের গবেষণা প্রক্রিয়া শুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে মুহাম্মদ (স:) যেসব কথা বলেছেন বা যেসব কাজ করেছেন সেগুলোর প্রকৃত বর্ণনা জানার জন্যে তাঁরা সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেছেন। এগুলো কোরানের পাশাপাশি ইসলামি পবিত্র আইন (*শরী'আহ*)-এর ভিত্তি গঠন করেছে। এগুলো প্রত্যেক মুসলিমের দৈনন্দিন জীবন এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হয়েও দাঁড়িয়েছে। *সুন্নাহ* মুসলিমদের মুহাম্মদ (স:) কিভাবে কথা বলেছেন, আহার করেছেন, ভালবেসেছেন, স্নান করেছেন এবং উপাসনা করেছেন সে শিক্ষা দেয়, ফলে তারা তাদের জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই পৃথিবীতে তাঁর জীবনকে ফিরিয়ে আনছে এবং এক বাস্তব কিন্তু প্রতীকী অর্থে পুনরায় জীবিত করে তুলছে তাঁকে।

ক্রিশ্চানদের তোরাহ বা *শরী'আর* সমপর্যায়ের কিছু নেই বলে তারা মনে করে পুঙ্খানুপুঙ্খ এই অনুসরণ নিশ্চয়ই বিরাট বোঝা স্বরূপ এবং বাধাদায়ক। এটা এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা নিউ টেস্টামেন্টে যাকে খুব খারাপভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে পল তাঁর ধর্মীয় যুক্তির অংশ হিসাবে তোরাহর বিরুদ্ধে নিন্দা গেয়েছেন সেইসব ইহুদী ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যে যারা এই ধর্মটিকে জুডাইজমের একটি গোত্র হিসাবে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ইহুদী বা মুসলিমরা কেউই এ আইনকে বোঝা মনে করে না। মুসলিমরা *সুন্নাহকে* পবিত্র বিষয় হিসাবে দেখে : এগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোরান নির্দেশিত ঈশ্বর-সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নিজেদের যথাসম্ভব পয়গম্বরের অনুসরণে গঠন করার মাধ্যমে তারা যে কেবল তাঁকে গভীর প্রদেশে গ্রহণ করছে তাই নয় বরং মুহাম্মদের (স:) অন্তরের আচরণের চর্চা করছে এবং অন্তস্তলে বিরাজমান ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করছে। কোনও কোনও *হাদিস* প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ঈশ্বরের উচ্চারণ যা পয়গম্বরের মুখে স্থাপন করা হয়েছে। এসব *হাদিসে কুদসি*, পবিত্র বিবরণ, গুরুত্ব দেয় যে ঈশ্বর

'দূর আকাশে' বিরাজমান অধিবিদ্যিকসত্তা নন, বরং কোনও কোনও অর্থে, রহস্যজনকভাবে তাদের সত্তার সঙ্গে বিজড়িত। বিখ্যাত এসব বিবরণ এই অভ্যন্তরীণ উপস্থিতির পর্যায়গুলো বুঝতে সাহায্য করে : আপনাকে অবশ্যই নির্দেশসমূহ পালনের মাধ্যমে শুরু করতে হবে এবং তারপর এগোতে হবে ধর্ম নিষ্ঠার স্বেচ্ছা কর্মকাণ্ডে :

> আমি আমার দাসের জন্য যা কর্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি সে তার মাধ্যমেই আমার নিকটবর্তী হতে পারে এবং আমার কাছে সেটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। এবং আমার দাস কাজের মাধ্যমে ক্রমশঃ আমার নিকটবর্তী হয় যতক্ষণ না তাকে আমি ভালবাসি : আর আমি যখন তাকে ভালবাসি আমি তার কানে পরিণত হই যার মাধ্যমে সে শোনে, তার চোখে পরিণত হই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা যা দিয়ে সে হাঁটে।[১৭]

বাহ্যিক কাজসমূহ, খৃস্টীয় পবিত্র বিষয়াদির উপাদানের মত, এই অভ্যন্তরীণ মহত্বের বাহ্যিক নিদর্শন এবং একে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন ও রক্ষা করতে হবে। এর মানে হচ্ছে সারা পৃথিবীর মুসলিমগণকে একটা বিশেষ জীবন ধারা অনুসরণ করতে হবে এবং তাদের অন্যান্য পার্থক্য যাই হোক, তারা একটা পরিষ্কার মুসলিম পরিচয় অর্জন করে যা দ্রুত তাদেরকে কাছে টানে। যেভাবে তারা প্রার্থনা করে বা হাত মুখ ধোয়, খাবার টেবিলে তাদের আচরণ কিংবা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা– একটা সাধারণ এবং বিশেষ নকশা অনুযায়ী হয়ে থাকে। চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিমরা, উদাহরণ স্বরূপ, *সালাতের* একইরকম ভঙ্গি অনুসরণ করে থাকে, ঠিক সমান সময় নিয়ে।

যেসব মুসলিম এই প্রতীকী উপায়ে মুহাম্মদকে (স:) সম্মান প্রদর্শন করে তারা ঐতিহাসিক মুহাম্মদকে (স:) খোঁজার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না, যেমন যেসব ক্রিশ্চানের জেসাসের প্রতি একই ধরনের অঙ্গীকার রয়েছে তারাও বর্তমানে জেসাসের জাগতিক জীবন নিয়ে গবেষণার ফলে অস্বস্তি বোধ করবে। কিন্তু সালমান রূশদীর ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে, পয়গম্বরের ওপর হামলা হিসাবে বিবেচিত ব্যাপারটি সারা বিশ্বের মুসলিমদের মনস্তত্ত্বের এক পবিত্র এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছে। মুহাম্মদ (স:) বা তাঁর ধর্মের অসম্মান ইসলামি সাম্রাজ্যে বরাবরই মারাত্মক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের হাতে *উম্মার* অসম্মানের কারণে আজ মুসলিমদের আহত করার আলাদা ক্ষমতা হয়েছে এর। অষ্টাদশ শতকে ইসলামি সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং এ সময়ে আবার নতুন জীবন লাভ বিশেষভাবে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ক্ষয় এবং পতন পশ্চিমে এমন এক সমাজের উত্থানের সমসাময়িক যা এর আগে আর বিশ্ব অর্জন করতে পারেনি, যার দরুণ এর বিরুদ্ধে লড়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কেবল রাজনৈতিক অসম্মান

ছিল না, বরং মুসলিম পরিচয়ের একেবারে মূলে স্পর্শ করেছে। ইসলাম যদি ইতিহাসে প্রথমবারের মত আর সফল হতে না পারে, তাহলে নিজেকে সত্য বলে কিভাবে দাবী করবে? এর আগে পর্যন্ত কোরানিক সামাজিক প্রয়াসের সাফল্য সত্ত্বেও যদি মুসলিম সমাজ ভেঙে পড়ে, তাহলে ইসলামের ইতিহাসে কোথাও নিশ্চয়ই মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে।

আবার, গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনে *উম্মার* সাফল্যের কেন্দ্রীয় এবং প্রায় পবিত্র গুরুত্ব রয়েছে। লায়াল এবং ডারউইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ যেমন ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল বলে মনে হয়েছে এটাও ইসলামি বিশ্বে ঠিক একইরকম গুরুত্বের ধর্মীয় সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ম্যাথু আরনল্ডের '*ডোভার বীচ*' এবং আলফ্রেড টেনিসনের '*ইন মেমোরিয়ামে*'র হতাশা এবং নৈঃসঙ্গ বোধ থেকে আমরা বর্তমানে মুসলিমদের আতঙ্ক ও আশঙ্কা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা অর্জন করতে পারি। পাশ্চাত্য এবং এর বিজয়ী সেক্যুলারিজমের মোকাবিলায় ইসলামের আপাতঃ অক্ষমতার ব্যাখ্যা কী? কোরানের সামাজিক শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে সঠিক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনও সমাজ ব্যর্থ হতে পারে না, কেননা তা স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধীনে *উম্মার* সাফল্য প্রমাণ করেছে এরকম সমাজ সম্ভব; এর সাফল্যের পবিত্রমূল্য ছিল। সাধারণভাবে সঙ্কটের সময়ই খৃস্টধর্ম সবচেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে; ইসলামের সমস্যাটা বিপরীত।

এই গ্রন্থের একেবারে শুরুতে, আমরা যখন মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আমরা সংক্ষেপে নবম শতকে কর্ডোভার শহীদদের বেপরোয়াভাব লক্ষ্য করেছি। বর্তমানে ইসলামি বিশ্বে অনেকেই ইসলামের নতুন উগ্র রূপের দিকে ফিরছে যা মাঝে মাঝে একই রকম আতঙ্ক থেকে উৎসারিত। কর্ডোভানদের মত বহু মুসলিম শেকড়ে প্রত্যাবর্তনের জন্যে একটা নতুন পরিচয় আবিষ্কারের প্রয়াস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথাকথিত মৌলবাদী আন্দোলনসমূহের এটা একটা মূলসুর ছিল। পশ্চিমের বাহ্যিক ক্ষমতার কাছে মুসলিমরা অপমানিত ও অমর্যাদা বোধই লাভই করেনি, বরং নিজেদের দিশাহারা এবং উন্মূল ভাবতে শুরু করেছে, কারণ তাদের নিজস্ব বিশ্বাস যেন পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রভাবে ভেসে গেছে বলে মনে হয়েছে। পশ্চিমে যত্নের সঙ্গে গড়ে তোলা আমাদের সেক্যুলারিজম্ আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু ইসলামি দেশগুলোতে একে অচেনা এবং বিদেশী বলে মনে হয়–ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক আমদানি। একটা প্রজন্ম পূর্ব বা পশ্চিম নয় নিজ-দেশে ইসলামি বিশ্বে বেড়ে উঠেছে এবং ইসলামি শেকড়ে প্রত্যবর্তনকেই অনেকে সমাধান হিসাবে বেছে নিয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) যেমন তাঁর ধর্মকে আরবের পবিত্র ঐতিহ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন-*হজ্জের* অর্থ পরিবর্তন করে, উগ্র মুসলিমগণও ইসলামি অতীতে আরও গভীরভাবে তাদের শেকড়েব সন্ধান করছে।

নব-মৌলবাদের আরেকটা থিম হচ্ছে ইসলামি ইতিহাসকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে *উম্মাকে* আবার কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস। ইরানী বিপ্লব কেবল অতীতে ফিরে যাওয়া ছিল না, বরং ইরানে আবার শুভ মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও ছিল। পাকিস্তান ও ইরানে ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শ গভীর আশাবাদ জাগিয়ে তুলেছিল যা সরকারের সেক্যুলার আদর্শের জন্মদাতা পশ্চিমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে, কিন্তু উভয়েই ইসলামকে আবার কার্যকর করে তোলার জন্য গভীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আহবান ও সুযোগ উপস্থাপন করেছিল। উভয় প্রয়াসের ইতিহাস থেকে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের বাণীর বাস্তবায়নের এরকম প্রয়াস কতখানি সমস্যা সঙ্কুল এবং অলঙ্ঘনীয় অসুবিধায় কণ্টকিত হতে পারে। অথচ অতীতে বিভিন্ন বিপর্যয় ও সঙ্কটের পর– পয়গম্বরের পরলোকগমন, মঙ্গোলদের ধ্বংসলীলা ইত্যাদি– মুসলিমরা আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল–এবার সেটা অনেক বেশি কঠিন বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে এবং একধরনের শঙ্কাভরা হতাশা ধর্মে প্রবেশ করেছে।

ইসলামি মৌলবাদ বিষয়টি জটিল; কঠিন বেদনা থেকে এর উদ্ভব এবং বহু মুসলিমের প্রাচীন সম্মানিত ইসলামি পদ্ধতিতে নিজের হাতে আবার নিয়তিকে তুলে নেয়ার বেপরোয়া ইচ্ছার প্রকাশ। ইসলামের এসব উগ্ররূপের কোনও কোনওটিকে স্বাস্থ্যকর বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় নিরাপত্তাহীন এবং আতঙ্কে পরিপূর্ণ যা কর্ডোভার আত্মঘাতী কাল্টকে উস্কে দিয়েছিল, যারা একই ধরনের চাহিদা এবং ভয় দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আমরা দেখেছি সুয়েয সঙ্কটের সময় ইসলামি পণ্ডিত উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ লিখেছিলেন যে একটি স্বাস্থ্যবান ও কার্যকর ইসলাম অত্যন্ত জরুরি, কারণ তা মুসলিমদের শুভ মূল্যবোধ এবং আদর্শ স্থাপনে সাহায্য করেছিল যা আমরা পশ্চিমবাসীরাও ভোগ করি, কারণ সাধারণ ঐতিহ্য থেকে এর জন্ম হয়েছে। সুয়েযের পর থেকে পশ্চিম মধ্যপ্রাচ্যের জনগণকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে এবং যে উদার সেক্যুলারিজমের বিস্তারের জন্যে এত প্রয়াস তার সুনামহানি ঘটেছে। আমরা পশ্চিমারা কোনওদিন ইসলামের সঙ্গে পেরে উঠিনি : ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ এবং নেতিবাচক ছিল এবং বর্তমানে আমরা যেন মুসলিম বিশ্বের যন্ত্রণা এবং স্মৃতি বিপর্যয়ের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে সহিষ্ণুতা আর সহানুভূতিশীলতার প্রতি আমাদের ঘোষিত অঙ্গীকারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে যাচ্ছি। ইসলাম অদৃশ্য বা ক্ষয়ে যাবে না; স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী হলেই আরও ভাল অবস্থায় থাকত এটা। আমরা কেবল আশা করতে পারি যে সময় ফুরিয়ে যায়নি।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামি বিশ্বের মানুষগুলো নানা সমস্যায় ভুগছে, কিন্তু ১৯৫৬ সালে উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ লিখেছিলেন, পশ্চিমেরও একটা সমস্যা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং খৃস্টধর্ম উভয়ের রয়েছে 'মৌল দুর্বলতা' :

নিম্নপর্যায়ের নয় বরং সমপর্যায়ের সত্তার সঙ্গে এ বিশ্ব ভাগ করার ব্যাপারটি অস্বীকার করা তাদের ব্যর্থতা। পশ্চিমের সভ্যতা যদি অপরকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আর ক্রিশ্চান চার্চ যদি ধর্মীয়ভাবে মৌলিক সম্মানের সঙ্গে দেখতে না পারে তাহলে এরা উভয়ই বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেষ পর্যন্ত অপারগ হবে। এখানে সৃষ্ট সমস্যাগুলো অবশ্যই ইসলামের জন্যে আমাদের স্পর্শ করা যেকোনও কিছুর মতই গভীর।[১৮]

বাস্তবতা হচ্ছে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা একই ঐতিহ্যের অংশীদার। পয়গম্বর মুহাম্মদের (সঃ) সময় থেকেই মুসলিমগণ এটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু পশ্চিম তা মেনে নিতে পারেনি। বর্তমানে কিছু সংখ্যক মুসলিম *আহ্‌ল আল-কিতাবের* বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছে, যারা তাদের অসম্মান আর ঘৃণা করে এসেছে : তারা এমনকি নতুন ঘৃণার ইসলামিকরণ শুরু করেছে। সালমান রুশদী ঘটনার সময় প্রাণপ্রিয় চরিত্র পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ) ইসলাম ও পশ্চিমের সাম্প্রতিকতম সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। মুসলিমদের যদি আজ গভীরভাবে আমাদের পাশ্চাত্য ঐতিহ্যকে বুঝতে হয়, পশ্চিমেও আমাদের কিছু প্রাচীন সংস্কার বিসর্জন দেয়ার প্রয়োজন হবে। এবং সম্ভবতঃ মুহাম্মদের (সঃ) চরিত্র দিয়ে তার সূচনা ঘটানো যেতে পারে : একজন জটিল আবেগপ্রবণ মানুষ, যিনি মাঝে মাঝে এমন কিছু কাজ করেছেন যা আমাদের পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন, কিন্তু তাঁর মেধা ছিল গভীর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার, তিনি একটা ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন করেছেন যার ভিত্তি– পাশ্চাত্য কিংবদন্তী থাকা সত্ত্বেও– তরবারি নয়, যে ধর্মের 'ইসলাম' নামটি শান্তি ও সমন্বয়কেই বোঝায়।

তথ্যসূত্র

মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত কোরানের আয়াতসমূহ আর্থার জে. আরবেরিকৃত *'দ্য কোরান ইন্টারপ্রিটেড*, (অক্সফোর্ড ১৯৬৪) থেকে গৃহীত, ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুবাদের সুবিধার্থে আমি বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের *'কোরান শরীফ : সরল বঙ্গানুবাদ'* থেকে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের অনুবাদ ব্যবহার করেছি, সেজন্যে জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে ঋণ স্বীকার করছি–অনুবাদক)।

ইহুদী ও ক্রিশ্চান ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃত অংশসমূহ জেরুজালেম বাইবেল থেকে নেয়া।

১. প্রতিপক্ষ মুহাম্মদ (সঃ)

১। জন অব জয়েনভিল, *দ্য লাইফ অব সেইন্ট লুই*, অনুবাদ রেনে হেগ, সম্পাদনা ন্যাটালিস ডি ওয়েইলি (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃঃ ৩৬

২। পল আলভ্যারো, *ইন্ডিকুলাস লুমিনোসাস*, আর. ডব্লু. সাদার্নের *ওয়েস্টার্ন ভিউজ অব ইসলাম ইন দ্য মিড্‌ল এজেস* গ্রন্থে উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৬২), পৃঃ ২১

৩। পারফেক্টাস সম্ভবত আরবীয় নাম আল-কামিলের ল্যাটিন রূপ (স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি) : অন্য শহীদের নাম ছিল, সার্ভাস ডেই, নিশ্চয়ই আব্দাল্লাহ (ঈশ্বরের দাস) নামের অনুবাদ।

৪। পল আলভ্যারো, *ভিটা ইয়োলজি*, নরমান ড্যানিয়েল রচিত *দ্য আরবস অ্যান্ড মেডিয়াভেল ইয়োরোপ*, লন্ডন ও বৈরুত, ১৯৭৫)-এ উদ্ধৃত পৃঃ ২৯।

৫। দ্বিতীয় থেসালোনিয়ানস ১:৪-৮। লেখক সেইন্ট পল নন। পলের মৃত্যুর বহু বছর পর চিঠিটি লেখা হয়েছে।

৬। রিভেলেশন ১৯ : ১৯।

৭। *জেস্টা ফ্রানকোরাম অর দ্য ডিডস অব দ্য ফ্র্যাঙ্কস অ্যান্ড আদার পিলগ্রিমস টু জেরুজালেম*, অনুবাদ রোজালিন্ড হিল (লন্ডন, ১৯৬২), পৃঃ ২২।

৮। সাদার্ন, *ওয়েস্টার্ন ভিউজ অব ইসলাম*, পৃ : ২৯।

৯। ড্যানিয়েল উদ্ধৃত, *দ্য আরবস অ্যান্ড দ্য মেডিয়াভেল ইয়োরোপ*, পৃঃ ১৫৬।

১০। *দ্য কমেডি অব দান্তে আলিঘেরি*, ক্যান্টিকা-ওয়ান : হেল, অনুবাদ ডরোথি এল. সেয়ার্স (লন্ডন, ১৯৪৯), ক্যান্টো XXVIII : ২২-৭, পৃঃ ২৪৬।

১১। *জেস্টা রেগাম*, সাদার্নের *ওয়েস্টার্ন ভিউজ অব ইসলাম*-এ পৃঃ ৩৫।

১২। *ক্রনিকল*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

১৩। বেঞ্জামিন কেডারের *ক্রুসেড অ্যান্ড মিশন : ইয়োরোপিয়ান অ্যাপ্রোচেস টু দ্য মুসলিম* (প্রিন্সটন, ১৯৮৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৯।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০১।
১৫। রেজিন পারনৌডের *দ্য ক্রুসেডার্স*, অনু : এনিড গ্রান্ট (এডিনবার্গ ও লন্ডন, ১৯৬৩) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ২২১।
১৬। প্রাগুক্ত।
১৭। কেডার, *ক্রুসেড অ্যান্ড মিশন*, পৃ : ১২৫-৬।
১৮। পারনৌডের *'দ্য ক্রুসেডারর্স'*-এ উদ্ধৃত পৃ: ২২২-৩।
১৯। উমবার্তো ইকো, 'ড্রিমিং অভ দ্য মিড্‌ল এজেস', *ট্রাভেলস ইন হাইপার-রিয়ালিটি-তে* অনুবাদ : উইলিয়াম উইভার (লন্ডন, ১৯৮৭), পৃ: ৬৪।
২০। সাদার্নের *ওয়েস্টার্ন ভিউজ অব ইসলাম*-এ উদ্ধৃত, পৃ: ৭৯-৮০।
২১। ড্যানিয়েল, *দ্য আরবস্ অ্যান্ড মেডিয়াভেল ইয়োরোপ*, পৃ: ৩০২।
২২। নরমান ড্যানিয়েল, *ইসলাম অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট : দ্য মেকিং অব অ্যান ইমেজ* (এডিনবার্গ, ১৯৬০), পৃ: ২৮৪-৫।
২৩। এডওয়ার্ড ডব্লু. সেইডের *ওরিয়েন্টালিজম : ওয়েস্টার্ন কনসেপশনস অব দ্য অরিয়েন্ট* (নিউ ইয়র্ক এবং লন্ডন, ১৯৮৫ সংস্ক)-এ উদ্ধৃত, পৃ: ৬৬।
২৪। হামফ্রি প্রিডম, *দ্য ট্রু নেচার অব ইমপোস্টার, ফুলি ডিসপ্লেইড ইন দ্য লাইফ অব মাহোমেট* (সপ্তম সংস্ক., লন্ডন, ১৭০৮), পৃ: ৮০।
২৫। ড্যানিয়েল, *ইসলাম অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট*, পৃ: ২৯৭।
২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০০।
২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯০।
২৮। *'দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার*, সম্পা : ডেরো ই. সন্ডার্স, একখণ্ডে সংক্ষেপিত (লন্ডন, ১৯৮০), পৃ: ৬৫৭-৮।
২৯। *'অন হিরোজ অ্যান্ড হিরো-ওরশিপ* (লন্ডন, ১৮৪১), পৃ: ৬৩।
৩০। সেঈড, *ওরিয়েন্টালিজম*-এ উদ্ধৃত, পৃ: ১৭২।
৩১। প্রাগুক্ত।
৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭১।
৩৩। *হিস্টয়ার জেনারেলে*, প্রাগুক্তে উদ্ধৃত, পৃ: ১৪৯।
৩৪। এম. বদ্রিকোর্ট, *'লা গুয়েরে এট লে গভার্নমেন্ট ডি লা'আলজেরি'* (প্যারিস, ১৮৫৩), পৃ: ১৬০।
৩৫। সেইড, *ওরিয়েন্টালিজম*-এ উদ্ধৃত, পৃ: ৩৮।
৩৬। *হলি ওঅর : দ্য ক্রুসেডস্ অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন টুডে'জ ওয়ার্ল্ড* (লন্ডন, ১৯৮৮)।
৩৭। রানা কাব্বানি, *লেটার টু ক্রিশ্চানডম* (লন্ডন, ১৯৮৯), পৃ: ৫৪।
৩৮। ফে ওয়েল্ডন, *'স্যাকরেড কাউজ'* (লন্ডন, ১৯৮৯), পৃ: ৬, ১২।
৩৯। কনোর ক্রুজ ও'ব্রায়েন, *দ্য টাইমস*, ১১ মে ১৯৮৯।
৪০। *ইসলাম ইন মডার্ন হিস্ট্রি* (প্রিন্সটন ও লন্ডন, ১৯৫৭), পৃ: ৩০৪-৫।

২. মুহাম্মদ (স:), আল্-ল্লাহর দূত।

১। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পর, বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ (স:) 'আল্-ল্লাহ' (al-Alah) র 'ল' উচ্চারণকে ভারিরূপ দিয়েছিলেন যাতে ঈশ্বরের পৌত্তলিক ধারণা থেকে আলাদা করার জন্যে *'আল্-ল্লাহ'*তে পরিণত হয়। এই প্রয়োগ অতিপরিচিত 'আল্লাহ' (Allah)-এর চেয়ে অধিকতর সঠিক।

৩. জাহিলিয়াহ

১। জেরেমিয়াহ এবং ইসায়াহ যখন জেরুজালেমে ধর্মপ্রচার করছিলেন মোটামুটি সেই একই সময়ে খৃস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতকে ইরানে পয়গম্বর যরোথ্রুস্ট 'যরোসট্রিয়ানিজম' প্রচার করেন। এটা দ্বৈত ধর্ম বিশ্বাস যেখানে অশুভ ও শুভ শক্তির মাঝে চিরকালীন সংঘাত কল্পনা করা হয়।
২। এ. জে. টয়েনবি, *আ স্টাডি অব হিস্ট্রি* (লন্ডন, ১৯৫১), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭-২২।
৩। ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট, *মুহাম্মদ'স মক্কা : হিস্ট্রি ইন দ্য কোরান* (এডিনবার্গ, ১৯৮৮)।
৪। অবশ্য মনে করা হয় যে ইয়াথরিবের কোনও কোনও পৌত্তলিকের বাড়িতে মানাতের মূর্তি ছিল।
৫। শুরুতে প্রদত্ত কুরাইশদের বংশতালিকা দেখুন।
৬। ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয় যে হস্তীবর্ষেই মুহাম্মদ (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পশ্চিমের পণ্ডিতগণ আবিসিনিয় আগ্রাসনকে দশ বছর আগে ৫৬০ খৃস্টাব্দের ঘটনা বলে বিবেচনা করেন।
৭। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক কর্তৃক উদ্ধৃত, *সিরাত রাসুল আল্লাহ* ৩৮, এ. গিয়োম (অনু ও সম্পা.) *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ* (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃঃ ২১।
৮। সুরা ২৯ : ৬১-৩।
৯। সুরা ১০ : ২২-৪ ২২-৩; আরও দেখুন ২৯:৬৫, ৩১:৩১, ১৭:৬৯।
১০। *সিরা* ১৪৩, গিয়োম (অনু ও সম্পা), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃঃ ৯৯।
১১। প্রাগুক্ত, ১৪৫, পৃ : ১০০।

৪. প্রত্যাদেশ

১। সুরা ৯৩:৬-৮।
২। বর্তমানে বহু মুসলিমই বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ (সঃ) আদর্শ নিখুঁত মানুষ ছিলেন এবং সেকারণে তিনি 'ভুল-ত্রুটি'র উর্ধ্বে। এ বিষয়টি নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
৩। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রসুল আল্লাহ ১৫০*, এ. গিয়োম (অনু ও সম্পা.) *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*-এ, (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃঃ ১০৪।
৪। সুরা ৬১:৬। আরও দেখুন টর আন্দ্রে, *মুহাম্মদ : দ্য ম্যান অ্যান্ড হিজ ফেইথ*, অনুবাদ থিয়োফিল মেনযেল (লন্ডন, ১৯৩৬), পৃঃ ৪৪-৫।
৫। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৩৬, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৯৪।
৬। প্রাগুক্ত, ১৩৪, পৃ : ৯৩। আদ এবং ইরাম প্রাচীন আরব জাতি যাদের ধ্বংসের কথা কোরানে উল্লেখ আছে।
৭। *কিতাব আত-তাবাকাত আল-কবির*, আন্দ্রের *মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৩-৪।
৮। *হিলফ আল-ফুযুল*-এর অনুবাদ হিসাবে লীগ অব ভারচুয়াস বা শিভালরাস বিতর্কিত।
৯। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১০৪-৫, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৭১।
১০। আবু বকর আহমাদ আত-বাইহাকি (মৃঃ ১০৬৬), *দালাই'ল আন নাবুব্বা*, ১.১২, অ্যানমেরি শিমেলের *অ্যান্ড মুহাম্মদ ইজ হিজ ম্যাসেঞ্জার : দ্য ভেনেরেশন অব দ্য প্রফেট ইন দ্য ইসলামিক পিয়েটি* (চ্যাপেল হিল এবং লন্ডন, ১৯৮৫), পৃঃ ৬৮।
১১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১১৬-১৭, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃঃ ৮১।
১২। একইভাবে আন্দ্রে, *মুহাম্মদ* পৃঃ ৫০-১।
১৩। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১২১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৮৩।

১৪। প্রাগুক্ত, ১২০, পৃ : ৮২।
১৫। প্রাগুক্ত, ১৫৫, পৃ : ১১১।
১৬। কোনও কোনও আরবকে বিভিন্ন সূত্রে তাদের '*কুনিয়া*' দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আবু তালিব, আবু সুফিয়ান এবং উম্ম সালামাহ।
১৭। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১২৪-৫, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৮৫-৬।
১৮। সুরা ২৮:৮৬।
১৯। মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারি, মার্টিন লিংস'-এর *মুহাম্মদ : হিজ লাইফ বেজড অন দ্য আর্লিয়েস্ট সোর্সেস*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন ১৯৮৩), পৃঃ ৪৩-৪।
২০। সুরা ৯৬:১।
২১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৫৩, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ* পৃঃ ১০৬।
২২। ইসায়াহ ৬:১-৯।
২৩। জেরেমিয়াহ ২০:৭-৯।
২৪। আন্দ্রে, '*মুহাম্মদ*', পৃঃ ৫৯।
২৫। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৫৩, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ* পৃঃ ১০৬।
২৬। প্রাগুক্ত, ১৫৪, পৃ : ১০৭। *নামুস* হচ্ছে গ্রিক *নোমোস*, অর্থাৎ মোজেসের আইন বা ইসরাইল জাতির প্রতি অবতীর্ণ তোরাহ। ওয়ারাকার ব্যবহৃত শব্দ আরবদের কাছে নতুন ছিল। মুসলিমরা একে জিব্রাইল বলে শনাক্ত করেছে। ওয়ারাকা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এটা ঈশ্বর কর্তৃক মানবজাতির নিকট বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত মহান প্রত্যাদেশ।
২৭। সুরা ৩৫:২২ (২৪)।
২৮। উদাহরণ হিসাবে দেখুন, সুরা ৬:১৬০ ফফ (১৫৯)
২৯। সুরা ৩:৭৬ (৮৩)।
৩০। সুরা ৬১:৬।
৩১। সুরা ৮১:১৯-২৪।
৩২। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৫১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ* পৃঃ ১০৫।
৩৩। জালাল আল-দিন সাঈউতি, *আল-ইতকান ফি'উলুম : আল-আক'রান*, ম্যাক্সিম রডিনসনের *মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, অনু. অ্যান কার্টার (লন্ডন, ১৯৭১), পৃঃ ৭৪।
৩৪। বুখারি, *হাদিস* ১.৩, লিংস-এর *মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৪-৫।
৩৫। সুরা ৭৫:১৭-১৯।
৩৬। আরবেরি সুরার শেষ দুটি শব্দের অনুবাদ করেছেন 'ঘোষণা করা হল' কিন্তু আরবীতে আসলে বোঝায় : 'প্রতিপালকের মহানুভবতা'।

৫. সতর্ককারী

১। সুরা ৪২:৭।
২। সুরা ৮৮:২১-২।
৩। সুরা ৭৪:১-৫, ৮-১০। কেউ কেউ মনে করেন এটা, সুরা ৯৬ নয়, কোরানের প্রথম অংশ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিল।
৪। সুরা ৮০:২৪-৩২।
৫। সুরা ৫১:১৯, ৭০:২৪। প্রথম পর্যায়ে একটা নীতি হিসাবে *যাকাত* প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মুহাম্মদের(সঃ) মৃত্যুর পর নিয়মিত কর-এ পরিণত হয়।
৬। দ্রষ্ট. মন্টগোমারি ওয়াট, *মুহাম্মদ অ্যাট মক্কা* (অক্সফোর্ড, ১৯৫৩), একসারসাস ডি 'তাযাক্কা', পৃঃ ১৬৫-৯।

৭। সুরা ৯২:১৮, ৯:১০৩, ৬৩:৯, ১০২:১।
৮। সুরা ৪:২, ৫, ১০, ৬:১৫২, ১৭:৩৪, ৫১:১৯, ৭০:২৪।
৯। সুরা ৯৬:৬-৮।
১০। সুরা ১০৪ : ১-৩।
১১। সুরা ৭০:১১-১৪।
১২। সুরা ১০৫।
১৩। সুরা ৮০:১১।
১৪। সুরা ১০৬।
১৫। সুরা ৫৫:১-১২।
১৬। সুরা ৩৬:৩৩-৪০।
১৭। সুরা ৩৬:৪১-৪।
১৮। ইসায়াহ ৫৫:৮-৯।
১৯। সুরা ২:১৫৮-৯ (১৬৪)।
২০। সুরা ৬:৯৬-৯।
২১। সুরা ১০:৬৯, ২১:২৬-৩০।
২২। সুরা ৮:২-৪, (২-৩)।
২৩। সুরা ২:৮৯, ২৭:১৪।
২৪। মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *কিতাব আত্-তাবাক্বাত আল-কবির*, ৮:১০২, মার্টিন লিংস-এর *মুহাম্মদ: হিজ লাইফ বেজড অন দ্য আর্লিয়েস্ট সোর্সেস*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৮৩), পৃঃ ৫১।
২৫। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রাসুল আল্লাহ* ১৬২, এ. গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ* (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃঃ ১১৬।
২৬। প্রাগুক্ত, ১৬১, পৃঃ ১১৫।
২৭। ইবন সা'দ, *তাবাক্বাত*, ৩:১,৩৭, লিংস-এর *মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৭।
২৮। ওয়াট-এর *মুহাম্মদ অ্যাট মক্কায়* উদ্ধৃত, পৃঃ ৮৭।
২৯। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৬৬, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ১১৭।
৩০। সুরা ২৬:২১৪।
৩১। সুরা ১৭:২৮-৩১।
৩২। আবু জা'ফাহ্ আত্-তাবারি, *তারিক আর-রাসুল ওয়াল-মুলুক* ১১৭১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ১১৭-১৮।
৩৩। সুরা ৮৩:১৩।
৩৪। সুরা ৩৭:১৫।
৩৫। সুরা ৩৭:১২-১৯।
৩৬। সুরা ৪৫:২৩।
৩৭। সুরা ৮৩:৯-১৪।
৩৮। সুরা ৩৬:৭৭-৮৩।

৬. স্যাটানিক ভার্সেস

১। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রাসুল আল্লাহ* ১৬৬-৭, এ. গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ* (লন্ডন, ১৯৫৫)-এ পৃ : ১১৮।
২। সুরা ৩৮:৪-৮ দেখুন।
৩। উদাহরণ হিসাবে সুরা ৪৬:৮ দেখুন।

৪। সুরা ১৭:৭৫-৭ (৭৩-৪)।

৫। দ্রষ্টব্য. মন্টগোমারি ওয়াট, *মুহাম্মদ অ্যাট মক্কা* (অক্সফোর্ড, ১৯৫৩),-এ উদ্ধৃত পৃ : ১০০।

৬। *তাফসির XVII*, ১১৯-২১, ওয়াট, *মুহাম্মদ অ্যাট মক্কায়* উদ্ধৃত, পৃ : ১০২।

৭। *তারিক আর রাসুল ওয়াল মুলুক* ১১৯২, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃ : ১৬৪।

৮। সুরা ৫৩:১৯-২০।

৯। সুরা ৫৩:২৬ যদিও এখানে ফেরেশতাদের দৌত্য সীমিত রাখা হয়েছে।

১০। তাবারি, *তারিক* ১১৯২, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃ : ১৬৬।

১১। সুরা ৭:৯-১৫ (১১-১৫) দেখুন।

১২। উইলিয়াম ও বীম্যান, *ইমেজেস অব দ্য গ্রেট স্যাটান : রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইন দ্য ইরানিয়ান রিভোল্যুশন*, নিকি আর. কেডিড সম্পাদিত *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিকস ইন ইরান : শিয়াইজম ফ্রম কুইটিজম টু রিভোল্যুশন* (নিউ হ্যাভেন, ১৯৮৩), পৃ : ১৯১-২১৭।

১৩। *তারিক* ১১৯২, গিয়োম (অনু ও সম্পা.) *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃ : ১৬৬।

১৪। সুরা ৫৩:১৯-২৬ (২৩)।

১৫। সুরা ২২:৫১ (৫২)।

১৬। সুরা ২:১০০; cf ১৩:৩৭, ১৬:১০১, ১৭:৪১, ১৭:৮৬।

১৭। সুরা ৬৯:৪৪-৭ দেখুন।

১৮। সুরা ২৯:১৭, ১০:১৮, ৩৯:৪৩।

১৯। সুরা ২৫:১৭ ফফ, ১৬:৮৬, ১০:২৮।

২০। সুরা ৩৬:৭৪।

২১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৬৭-৮, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ* পৃ : ১১৯।

২২। প্রাগুক্ত।

২৩। প্রাগুক্ত, ২০৬-৭, পৃ : ১৪৫।

২৪। সুরা ১৯:১৬-২২ (১৬-১৯)।

২৫। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৮৩-৪, গিয়োম (অনু ও সম্পা.) *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ১৩২-৩।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৩১।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৩২।

২৮। সুরা ৪১:১-৬ (৪-৫)।

২৯। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৮৬-৭, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ১৩২-৩।

৩০। সুরা ৫২:৩৪, ২:২৩, ১০:৩৮।

৩১। জর্জ স্টেইনার, *রিয়েল প্রেজেন্স : ইজ দেয়ার এনিথিং ইন হোয়াট উই সে?* (লন্ডন, ১৯৮৯), পৃ: ১৪২-৩।

৩২। সাইয়ীদ হোসেন নসর, *আইডিয়ালস অ্যান্ড রিয়ালিটিজ অব ইসলাম* (লন্ডন, ১৯৬৬), পৃ: ৪৭-৮।

৩৩। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২২৭, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ, পৃ: ১৫৭।

৩৪। প্রাগুক্ত, ২২৮, পৃ: ১৫৮।

৩৫। প্রাগুক্ত, ২৩০, পৃ: ১৫৯।

৩৬। সুরা ২৩: ২২-৪ (২৩-৫)।

৩৭। সুরা ১১:১০৫ (১০৩)।

৩৮। সুরা ১১: ১০২-৩ (১০১)।

৭. হিজরা : এক নতুন দিক নির্দেশনা

১। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রাসুল আল্লাহ*, ২৭৮, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃ: ১৯১।

২। প্রাগুক্ত, ২৪৪, পৃ: ১৬৯-৭০।

৩। মুহাম্মদ ইবন ইসমাই'ল আল বুখারি, *আল হাদীস* ৬৩:২৬, মার্টিন লিংস-এর *মুহাম্মদ : হিজ লাইফ বেজড অন দা আর্লিয়েস্ট সোর্সেস*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৮৩), পৃ: ৯৪।

৪। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২৮০, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ: ১৯৩।

৫। সুরা ৪৬: ২৮-৩২।

৬। সুরা ১৩: ১২ (১১)।

৭। মুহাম্মদের (স:) ধর্মের কারণে তাঁকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান প্রত্যাখ্যানও করেননি। আখনাস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ যদিও তাঁকে গোত্রের প্রধান হিসাবে দেখা হত, আসলে তিনি ছিলেন এর কনফেডারেটদের অন্যতম, এবং বহিরাগতদের আশ্রয়দানের ক্ষমতা তাঁর ছিল না,। সুহায়েল জবাব দিয়েছিলেন এই বলে যে মুহাম্মদ (স:) কুরাইশদের ভিন্ন শাখা থেকে আসার কারণে তাকে তিনি আশ্রয় দিতে অপারগ।

৮। সুরা ১৭ : ১।

৯। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২৭১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃঃ ১৮৬।

১০। সুরা ৫৩: ১৩-১৮।

১১। অ্যানমেরি শিমেলের *অ্যান্ড মুহাম্মদ ইজ হিজ মেসেঞ্জার : দা ভেনেরেশন অব দা প্রফেট ইন ইসলামিক পিয়েটি* (চ্যাপেল হিল ও লন্ডন, ১৯৮৫), পৃ: ১৬১-৭৫ দেখুন।

১২। *ইলাহিনামা*, পূর্বোক্তে উদ্ধৃত, পৃ: ১৬৭-৮।

১৩। *দা মেকিং অব লেইট অ্যান্টিকুইটি* (ক্যামব্রিজ, ম্যাস, ও লন্ডন, ১৯৭৮), হতে। মিটার ব্রাউন দেখাচ্ছেন যে খৃস্টধর্মের গোড়ার দিকে ঘোর এবং মোহাবিষ্টতা প্রচলিত ব্যাপার ছিল। সে সময়ের ধর্মীয় জীবনে স্বপ্নের বিশেষ গুরুত্ব ছিল–পৌত্তলিক ও খৃস্ট উভয় ক্ষেত্রে। এটা ছিল মানুষ ও অলৌকিকের উন্মুক্ত সীমান্তের এক উদাহরণ : মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তার ইন্দ্রিয় অনুভূতিগুলো স্থবির হয়ে পড়ে, তখন সীমান্ত উন্মুক্ত হয় নিজের এবং দেবতার মাঝে।' (পৃঃ ৬৫)।

১৪। *অ্যাক্টস অব পারপেচুয়া অ্যান্ড ফেলিসিটাস*, পিটার ড্রঙ্কের *উইমেন রাইটার্স অব দা মিড্‌ল এজেস : আ ক্রিটিক্যাল স্টাডি অব টেক্সট ফ্রম পারপেচুয়া* (মৃ: ২০৩) টু মারগারিট পরেটি (মৃ: ১৩১০)-এ উদ্ধৃত (ক্যামব্রিজ, ১৯৮৪), পৃ: ২।

১৫। *দা পাওয়ার অব মিথ* (বিল ময়ার্সের সঙ্গে লিখিত) (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮), পৃ: ৮৫।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭।

১৭। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৩৪, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ: ৯৩।

১৮। প্রাগুক্ত, ২৮৭, পৃ: ১৯৮।

১৯। প্রাগুক্ত, ২৪৬, পৃ:১৭১।

২০। প্রাগুক্ত।

২১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২৮৯-এ উদ্ধৃত, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ: ১৯৯। মুসলিমদের শিশু সন্তান হত্যা নিষিদ্ধকারী আদেশ শিশু কন্যা হত্যা রদ করেছিল, ইসলামপূর্ব সময়ে আরবে যা অহরহ ঘটত।

২২। প্রাগুক্ত, ২৯১-২, পৃ:২০০-১।

২৩। প্রাগুক্ত উদ্ধৃত, ২৯৩, পৃ: ২০১।

২৪। সুরা ৫: ৫-৭। শুকর, পচা মাংস, দমবন্ধ হয়ে নিহত পশুর মাংস, স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর মাংস এবং কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস খাওয়া মুসলিমদের জন্যে নিষিদ্ধ। *অ্যাক্টস অব দ্য অ্যাপস্টলস* ১৫: ১৯-২১, ২৯।

২৫। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২৯৫, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ২০২।

২৬। প্রাগুক্ত, ৩০৪-৫, পৃ : ২০৮।

২৭। মুসলিমদের কারও কারও মদিনায় আত্মীয়-স্বজন ছিল, মা আমিনার সূত্রে স্বয়ং মুহাম্মদের সঙ্গে মদিনার সংযোগ ছিল। কিন্তু *হিজরার* অত্যাবশ্যকীয় শর্ত ছিল মুসলিমদের গোটা গোত্র এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পর্কবিহীন অপর এক দলে যোগ দিতে হবে।

২৮। ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট, *মুহাম্মদ'স মক্কা : হিস্ট্রি ইন দ্য কোরান* (এডিনবার্গ, ১৯৮৮), পৃ : ২৪।

২৯। সুরা ৬০: ১, ৯, ৪৭-১৩।

৩০। সুরা ৮ : ৩০, ২৮: ১৯, ৪৮-৫১।

৩১। পশ্চিমের পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় 'আকাবায় আব্বাসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলছেন আব্বাস আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, এটা এবং আরও প্রশংসাসূচক উল্লেখ তাঁর খ্যাতিকে মুছে দেয়ার একটা প্রয়াস। আমরা দেখব, আব্বাস যেন মুহাম্মদের (স:) বিপক্ষে লড়াই করছেন এবং একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি।

৩২। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২৯৬, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ২০৩।

৩৩। প্রাগুক্ত, ২৯৭, পৃ : ২০৪।

৩৪। প্রাগুক্ত, ৩১৬, পৃ : ২১৫।

৩৫। সুরা ৯: ৪০।

৩৬। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৩৩৪, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ২২৭।

৩৭। প্রাগুক্ত, ৩৩৭, পৃ : ২২৯।

৩৮। প্রাগুক্ত, ৩৪২, পৃ : ২৩২।

৩৯। প্রাগুক্ত।

৪০। প্রাগুক্ত, ৩৪১, পৃ : ২৩১-২।

৪১। সুরা ৮: ৭২ (এই অনুবাদটি *মুহাম্মদ'স মক্কা* গ্রন্থে ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াটকৃত, পৃ: ২০) (বাংলা অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের -অনুবাদক)।

৪২। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৩৪১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *'দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ'*, পৃ : ২৩৬।

৪৩। সুরা ৩: ১০৯।

৪৪। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২৪৭, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ২৩৬।

৪৫। মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *কিতাব আত-তাবাক্বাত আল-কবির*, VIII ৪২, লিংসের *মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত, পৃ : ১৩৩-৪।

৪৬। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৪১৪, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ২৮০। ফাখ্খ্ মক্কার বাইরের একটি জায়গা; মাজানা শহরের নিম্নাঞ্চলের একটি বাজার; শামা এবং তাফিল মক্কার দুটো পাহাড়।

৪৭। প্রাগুক্ত।

৪৮। সুরা ২: ৬-১৪।

৪৯। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৪১৩, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ২৭৯।

৫০। প্রাগুক্ত, ৩৬২, পৃ : ২৪৬।

৫১। প্রাগুক্ত, ৩৬১, পৃ : ২৪৬।

৫২। সুরা ২: ২৫, ৪: ১৫৩, ৫: ১৫।

৫৩। সুরা ৩ : ৭২, ৩: ৮৭। ইহুদীদের বিরুদ্ধেও সুবিধানুযায়ী ঐশীবাণীর অর্থ বিকৃতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে (৪: ৪৮ (৪৬), ৫: ১৬ (১৩)। পরবর্তীকালের মুসলিমগণ

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত বোঝানোর জন্য এই আয়াতগুলো ব্যবহার করেছে। অবশ্য বিষয়বস্তু এখানে বলছে যে ইহুদীরা 'আসল অর্থ থেকে শব্দকে পরিবর্তিত করেছে।'

৫৪। সুরা ২: ৭৯, ৫: ৮২।

৫৫। উদহারণ হিসাবে দেখুন, ৪: ১৫৬-৭। এটা জেসাস বা খৃস্টধর্মের প্রতি আক্রমণ নয়, বরং ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুক্তি। জেসাস ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি, এ-ধারণা প্রাচ্যের বিভিন্ন ক্রিশ্চান গোত্র এবং ম্যানিশ্যাইজমের বৈশিষ্ট্য যা আরবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়।

৫৬। দেখুন সুরা ২: ১১০ ১১৩।

৫৭। সুরা ২৯: ৪৬।

৫৮। সুরা ৩: ৫৮-৬২ (৬৭-৬৮)।

৫৯। সুরা ২: ১২৯-৩২ (১৩৬)।

৬০। দেখুন ডি সিডারস্কি, *লেস অরিজিনস ডেস লেজেন্ডস মুসলমানস ড্যানস্ লে কোরান ড্যানস্ লেস ভিয়েস ডেস প্রফেটস* (প্যারিস, ১৯৩৩), পৃ : ৫১-৩।

৬১। জেনেসিস : ২১: ৮-২১।

৬২। সুরা ২: ১২২-৪ (১২৭-২৯)।

৬৩। সুরা ২: ৩৯, আরও দেখুন ২: ১৪০-৬ (১৪৪)।

৬৪। সুরা ৬: ১৬০ (১৫৯), ১৬২-৩ (১৬১-৬৪)।

৮. পবিত্র যুদ্ধ

১। এই মন্তব্যসমূহ কেবল পাশ্চাত্যের খৃস্টধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রাচ্যের অর্থডক্স চার্চ জেসাসের দুর্বল ভাবমূর্তি চর্চা করে না বরং তাদের জেসাস মহাবিশ্বের অধিশ্বর। বাইযানটাইনের সম্রাট তাঁর পার্থিব প্রতিনিধি এবং তাঁর দরবার স্বর্গে জেসাসের দরবারের অনুসরণে নির্মিত।

২। এই প্রবণতা আগে থেকেই নিউ টেস্টামেন্টে উপস্থিত : ১জন ২ : ১২-১৭।

৩। এমনকি পিউরিটানগণও পার্থিব সমৃদ্ধিকে আধ্যাত্মিক অর্জন মনে না করে পুরস্কার বিবেচনা করে থাকে।

৪। *দ্য রোমান মার্টারোলজি* : ক্রিসমাস দিবসের বর্ণনা।

৫। সুরা ৩৩: ৭২।

৬। উদাহরণ হিসাবে দেখুন সুরা ১১: ২৮-১২৫।

৭। সুরা ২২: ৪০-৩ (৩৯-৪০)।

৮। টর আন্দ্রে, *মুহাম্মদ : দ্য ম্যান অ্যান্ড হিজ ফেইথ*, অনু থিয়োফিল ম্যানযেল (লন্ডন, ১৯৩৬), পৃ : ১৯৭।

৯। সুরা ২: ২১৩-১৫ (২১৭)।

১০। সুরা ৫: ১৭, কিন্তু সুরা ৫: ৮৫তে কোরান আবার ধারণা দিচ্ছে ক্রিশ্চানরা ইহুদীদের চেয়ে অনেক বেশি দানশীল।

১১। সুরা ২২: ২৫২ (২৫১)।

১২। *হলি ওয়র : দ্য ক্রুসেডস অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন টুডে'স ওয়ার্ল্ড* (লন্ডন, ১৯৮৮), পৃ : ২২৩-৮৪, এখানে আধুনিক *জিহাদ* প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১৩। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রাসুল আল্লাহ* ৪৩০, এ. গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, (লন্ডন, ১৯৪৫), পৃ : ২৯১।

১৪। প্রাগুক্ত, ৪৩৫, পৃ : ২৯৪।

১৫। প্রাগুক্ত, ৪৩৮, পৃ : ২৯৬।

১৬। প্রাগুক্ত, ৪৪১, পৃ : ২৯৮।

১৭। প্রাগুক্ত।
১৮। প্রাগুক্ত, ৪৪২, পৃ : ২৯৮।
১৯। সুরা ৮: ৭০।
২০। আর্মস্ট্রং, *হলি ওঅর সম্পূর্ণ*।
২১। সুরা ৮ : ৪৫।
২২। সুরা ৮: ১৭।
২৩। সুরা ৮: ৬৬-৭ (৬৫-৬)।
২৪। সরা ২১: ৪৯ (৪৮)।
২৫। এক্সোডাস ১৪: ২৫-৩১।
২৬। *তারিক আর-রাসুল ওয়া'ল মুলুক* ১২৮১: ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট, *মুহাম্মদ অ্যাট মদিনা* (অক্সফোর্ড, ১৯৫৬)-এ উদ্ধৃত, পৃ : ২০৫।
২৭। দেখুন সুরা ৪৭: ৫, ২৪: ৩৪, ২: ১৭৮।
২৮। মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, *ইসলাম: ইটস মীনিং ফর মডার্ন ম্যান* (অক্সফোর্ড, ১৯৬২), পৃ : ১৮২।
২৯। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৪৫৯, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৩০৯।
৩০। সুরা ৪৭ : ২২ (২১)।
৩১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৫৪৩, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৩৬১।
৩২। প্রাগুক্ত, ৫৪৫, পৃ : ৩৬৩।
৩৩। মুহাম্মদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদি, *কিতাব আল-মাঘাযি* ২১৪, মার্টিন লিংস-এর *মুহাম্মদ : হিজ লাইফ বেজড অন দ্য আর্লিয়েস্ট সোর্সেস* (লন্ডন, ১৯৮৩)-এ উদ্ধৃত, পৃ : ৩৭২।
৩৪। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৫৫৯, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৩৭২।
৩৫। প্রাগুক্ত, ৫৬২, পৃ : ৩৭৪।
৩৬। প্রাগুক্ত।
৩৭। প্রাগুক্ত, ৫৮৩, পৃ : ৩৮৬।
৩৮। *মুহাম্মদ অ্যাট মদিনা*, পৃ : ১৮৪।
৩৯। সুরা ৪ : ৩ (২-৩)।
৪০। সুরা ৪ : ২৩।
৪১। সুরা ২ : ২২৫-৪০: ৬৫: ১-৭০।
৪২। সুরা ৪ : ৩।
৪৩। সুরা ৬ : ১৫২ (১৫১-২)।
৪৪। ম্যাথু ৬ : ২৬।
৪৫। সুরা ২৪: ৩৩ (৩২)।
৪৬। ম্যাক্সিম রডিনসন, মুহাম্মদ, অনু : অ্যানা কার্টার (লন্ডন, ১৯৬১), পৃ : ১৯২-তে উদ্ধৃত, উৎস দেয়া নাই।
৪৭। মুহাম্মদ ইবন সা'আদ, *কিতাব আল-তাবাকাত আল-কবির* VIII, ৭১-২, লিংস এর মুহাম্মদ পৃ : ২১৩ তে উদ্ধৃত।
৪৮। সুরা ৩৩: ৩৬-৪০।
৪৯। সুরা ৩৩ : ৫৩।
৫০। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৭২৯, পৃ : ৪৯৩।
৫১। প্রাগুক্ত, ৭২৬, পৃঃ ৪৯১।
৫২। প্রাগুক্ত, ৭৩৫, পৃ : ৪৯৬।
৫৩। প্রাগুক্ত, ৭৩৫, পৃ : ৪৯৬, এবং আহমাদ ইবন হানিলাল VI : ৬০, ১৯৭ ও মুহাম্মদ ইবন আল-বুখারি, III : ১০৮, ২৯৬, *আল-হাদীস*, নাবিয়া আবট-এর *আয়েশা, দ্য বিলাভেড*

অব মুহাম্মদ (শিকাগো, ১৯৪২) পৃ : ৩৬-এ উদ্ধৃত। আয়েশা যে ধর্মগুরুর নাম মনে করতে পারছিলেন না তিনি আর কেউ নন, জ্যাকব। দেখুন কোরান, সুরা ১২: ১৮।
৫৪। সুরা ২৪: ১১।
৫৫। ওয়াকিদি, *কিতাব আল-মাঘাযি*, ৪৪৮-৯; ইবন সা'দ, *তাবাক্বাত*, ২: ৫১, উদ্ধৃত, লিংস, *মুহাম্মদ*, পৃ : ২১৮।
৫৬। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৬৭৭, পৃ : ৪৫৪।
৫৭। দেখনু সুরা ৪: ৫৪ (৫১)।
৫৮। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৬৭৫, পৃ : ৪৫৩।
৫৯। সুরা ৩৩: ১০-১১।
৬০। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৬৮৩, পৃ : ৪৬০।
৬১। ওয়াকিদি, *কিতাব*, ৪৮৮-৯০, উদ্ধৃত লিংস, *মুহাম্মদ*, পৃ : ২২৭।
৬২। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৬৮৯, পৃ : ৪৬৪।
৬৩। প্রাগুক্ত, ৬৮৯, পৃ : ৪৬৪-৫।
৬৪। দেখুন বার্নার্ড লুইস *সেমাইটস অ্যান্ড অ্যান্টি-সেমাইটস, অ্যান এনকয়ারি ইনটু কনফ্লিক্ট অ্যান্ড প্রেজুডিস* (লন্ডন, ১৯৮৬), পৃ : ১১৭-৩৯, ১৬৪-২৫৯।
৬৫। সুরা ২: ১৯১, ২৫১।
৬৬। সুরা ৮: ৬২-৩।
৬৭। সুরা ৩: ১৪৭-৮।
৬৮। ওয়াট, *মুহাম্মদ অ্যাট মদিনা*, ২১৫-১৭; রডিনসন, *মুহাম্মদ*, পৃ : ২১৪।

৯. পবিত্র শান্তি

১। সুরা ৪৮: ২৭।
২। মুহাম্মদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদি, *কিতাব আল-মাঘাযি*, উদ্ধৃত : মার্টিন লিংস, *মুহাম্মদ : হিজ লাইফ বেজড অন দ্য আর্লিয়েস্ট সোর্সেস* (লন্ডন, ১৯৮৩), পৃ : ২৪৭।
৩। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রাসুল আল্লাহ* ৭৪১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃ : ৫০০।
৪। প্রাগুক্ত।
৫। প্রাগুক্ত।
৬। প্রাগুক্ত, ৭৪৩, পৃ : ৫০১।
৭। প্রাগুক্ত, পৃ : ৫০২।
৮। প্রাগুক্ত, ৭৪৫, পৃ : ৫০৩।
৯। ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট, *মুহাম্মদ অ্যাট মদিনা* (অক্সফোর্ড, ১৯৫৬), পৃ : ৫০।
১০। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৭৪৮, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৫০৫।
১১। প্রাগুক্ত, ৭৪৭, পৃ : ৫০৪।
১২। ৬২৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারিতে আল-মুস্তালিকের ওপর হামলার পর খুযা'আহ'র আল-মুস্তালিকের গোত্রপতির কন্যা জুয়াইরিয়াহকে বিয়ের মাধ্যমে।
১৩। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৭৪৭, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৫:০৪।
১৪। প্রাগুক্ত, ৭৪৮, পৃ : ৫০৫।
১৫। উদ্ধৃত : লিংস, *মুহাম্মদ*, পৃ : ২৫৪। উৎস দেয়া নাই।
১৬। প্রাগুক্ত, পৃ : ২৫৫।
১৭। সুরা ৪৮: ১ (১-৩)।

১৮। সুরা ৪৮: ২ (৪)।
১৯। সুরা ৪৮: ১০-১৭ (১১-১৭)।
২০। সুরা ৪৮: ২০।
২১। সুরা ৪৮: ২৬-৭ (২৬)।
২২। সুরা ৪৮: ২৯।
২৩। ম্যাথু ১০: ৩৪-৬।
২৪। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৭৫১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৫:০৭।
২৫। প্রাগুক্ত, ৭৫২, পৃ : ৫০৭।
২৬। সুরা ২ : ১৭৪-৫।
২৭। মার্শাল জি. এস. হজসন, *দা ভেঞ্চার অব ইসলাম : কনসিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন* (শিকাগো, ১৯৭৪), খণ্ড ১, পৃ : ৩৩৯।
২৮। সুরা ১৭: ৩৫।
২৯। সুরা ৫: ৪৯ cf ১৬: ১২৭, ৪২: ৩৭ (৪৫)।
৩০। সুরা ২: ১৭২ (১৭৭)। দাসপ্রথা বিলোপ না করার জন্য মুহাম্মদকে (স:) দোষারোপ করা হয়। কিন্তু এটা কালবিরুদ্ধ বিচার। নিউ টেস্টামেন্টের লেখকগণও এই প্রথাকে স্থায়ী ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *প্যাক্স ইসলামিকা* আরোপের মাধ্যমে মুহাম্মদ (স:) দাসপ্রথাকে সীমিত করেছিলেন যার ফলে পেনিনসুলায় আক্রমণ ও সহিংসতা লোপ পায়।
৩২। এটাও সত্যি যে সাম্যবাদী চেতনা মধ্যপ্রাচ্যে গভীরভাবে প্রোথিত এবং ইসলাম অংশত: এর প্রতি সাড়া দিয়েছে।
৩৩। ওয়াট, *মুহাম্মদ অ্যাট মদিনা*, পৃ : ২৬৮।
৩৪। উইলিয়াম ও ফাইডেলিটি ল্যাঙ্কাস্টার, '*দা গালফ ক্রাইসিস অ্যান্ড আরব ডিসএনচ্যানমেন্ট*', *মিডল ইস্ট ইনটারন্যাশনাল*, ৩৮৫, ১২ অক্টোবর ১৯৯০। মুসলিমদের বিভাজন বিষয়ে আরব দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে। ৩৫। মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *কিতাব আল-তাবাক্বাত আল-কবির* VII, ১৪৭, উদ্ধৃত : লিংস, *মুহাম্মদ*, পৃ : ২৭১।
৩৬। উদ্ধৃত : লিংস, *মুহাম্মদ*, পৃ : ২৮২। উৎস দেয়া নাই।
৩৭। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৭১৭, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৪৮৫।
৩৮। মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারি, *আল হাদিস* LXIII, ৬, উদ্ধৃত : লিংস মুহাম্মদ, পৃ : ২৭৫।
৩৯। সুরা ৩৩: ২৮-৯।
৪০। সুরা ৩৩: ৩৫।
৪১। *দা গসপেল অ্যাকর্ডিং টু উওম্যান : ক্রিশ্চানিটি'স ক্রিয়েশন অব দা সেক্স ওঅর ইন দা ওয়েস্ট* (লন্ডন, ১৯৮৬), গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
৪২। আবু না'ইম আল-ইসফাহানির বিবরণ, *দালা'ইল আনা নাবুওয়া* ৪৫, উদ্ধৃত : নাবিয়া অ্যাবট, *আয়েশা, দা বিলাভেড অব মুহাম্মদ* (শিকাগো, ১৯৪২), পৃ : ৬৭।
৪৩। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৮১২, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৫৪৬।
৪৪। প্রাগুক্ত, ৮১৫, পৃ : ৫৪৮।
৪৫। সুরা ১৭: ৮২ (৮১)।
৪৬। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৮২১, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৫৫৩। কোরানের সুরা ৪৯: ১৩ আয়াত।
৪৭। উদ্ধৃত : লিংস, *মুহাম্মদ*, পৃ : ৩০৪। উৎস দেয়া নাই।
৪৮। আবু জা'ফর আত-তাবারি, *তারিক আর-রাসুল ওয়া'ল মুলুক*, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দা লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৫৫৩।
৪৯। মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, *ইসলাম : ইটস মীনিং ফর মডার্ন ম্যান* (লন্ডন, ১৯৬২), পৃ : ৬০।

৫০। উদ্ধৃত : লিংস, মুহাম্মদ, পৃ : ৩১৯, উৎস দেয়া নাই।
৫১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৮৮৬, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৫৯৬-৭।
৫২। সুরা : ৯ : ৬৬ (৬৫)।
৫৩। সুরা ৯: ১০৮। বলা হয়ে থাকে যে বিদ্রোহী মুসলিমদের সঙ্গে আবু আমিরের যোগাযোগ ছিল। একেশ্বরবাদী আমির 'দ্য মঙ্ক' নামে পরিচিত ছিলেন এবং মুহাম্মদ (স:) মদিনায় আসার পর তিনি মক্কায় পালিয়ে যান।

১০. পয়গম্বরের পরলোকগমন?

১। উদ্ধৃত : মার্টিন লিংস, *মুহাম্মদ : হিজ লাইফ বেজড অন দ্য আর্লিয়েস্ট সোর্সেস* (লন্ডন, ১৯৮৩), পৃ : ৩১৭, উৎস দেয়া নাই
২। আলী শারীয়াতি, হজ্জ অনু : লালেহ বখতিয়ার (তেহরান, ১৯৮৮), পৃ : ৫৪-৬।
৩। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রাসুল আল্লাহ* ৯৬৯। গিয়োম (অনু ও সম্পা.) *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, (লন্ডন, ১৯৫৫) পৃ : ৬৫১।
৪। প্রাগুক্ত, ১০০০, পৃ : ৬৭৮।
৫। প্রাগুক্ত, ১০০৬, পৃ : ৬৭৯।
৬। প্রাগুক্ত, ১০১১, পৃ : ৬৮২।
৭। প্রাগুক্ত, ১,০১২, পৃ : ৬৮৩।
৮। সুরা ৩ : ১৩৮ (১৪৪)।
৯। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১০১৩, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৬৮৩।
১০। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *ইসলাম অ্যান্ড মডার্ন হিস্ট্রি* (প্রিন্সটন ও লন্ডন, ১৯৫৭), পৃ : ৩২, এটা বলছেন কিন্তু খুব বেশি মুসলিম মানবে না বলে সতর্ক করে দিচ্ছেন।
১১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ১,০১৭, গিয়োম (অনু ও সম্পা.), *দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ*, পৃ : ৬৮৭।
১২। মিশরের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর মালিক আল-আশতারকে দেয়া অলীর নির্দেশনা। উইলিয়াম সি. চিট্টিক (অনু ও সম্পা.), *আ শিয়াইট অ্যান্থলজি* (লন্ডন, ১৯৮০), পৃ : ৭৫।
১৩। *হলি ওয়র: দ্য ক্রুসেডস অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন টুডে'জ ওয়ার্ল্ড* (লন্ডন, ১৯৮৮), পৃ : ২২৩-৮৪তে আলোচনা করেছি।
১৪। *এনসাইক্লোপীডিয়া অব ইসলাম* (১ম সংস্ক, লেইডেন, ১৯১৩) 'তাসাউফ' শিরোনামোক্ত বিবরণ: ম্যালাইজ রুদভেনের *ইসলাম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড* (লন্ডন, ১৯৮৪), পৃ : ২৩০-এ উদ্ধৃত।
১৫। শরীয়াতি, হজ্জ, পৃ : ৫৪।
১৬। সাইয়ীদ হোসেইন নাসর, *আইডিয়ালস অ্যান্ড রিয়ালিটিজ অব ইসলাম* (লন্ডন, ১৯৬৬), পৃ: ৮৮।
১৭। সাইয়ীদ হোসেইন নাসর, দ্য সিগনিফিকেন্স অব দ্য *সুন্নাহ* অ্যান্ড *হাদীস* ইন ইসলামিক স্পিরিচুয়ালিটি—*ইসলামিক স্পিরিচুয়ালিটি* ফাউন্ডেশন-এ : স্বসম্পাদিত (লন্ডন, ১৯৮৭), পৃ : ১০৭-৮।
১৮। স্মিথ, *ইসলাম অ্যান্ড মডার্ন হিস্ট্রি*, পৃ : ৩০৫।